

শরহ মুখবাতিল ফিকার

আরবি-বাংলা



অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মাওলানা মোহাম্মদ আলমগীর হুসাইন

মুহাদ্দিস : জামিয়াতুস সুন্নাহ

শিবচর, মাদারীপুর

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থকক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শরহ্ নুখবাতিল ফিকার [আরবি-বাংলা]

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ❖ মাওলানা মোহাম্মদ আলমগীর হুসাইন

প্রকাশক ❖ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমুদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমুদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ১৯৫.০০ [একশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র]

লেখকের কথা

আল্লাহ রাক্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান। দুনিয়ার সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী: কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, যার থেকে ইচ্ছা করিয়ে নেন। তিনি কিছু করতে চাইলে কেউ তা বাধা দিতে পারে না। তিনি চাইলে অযোগ্য বান্দা থেকেও যে খেদমত নিতে পারেন এর আরেকটি প্রকৃষ্ট নজির 'বাংলা শরহ নুখবাতিল ফিকার'। যারা আমাকে চেনেন তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, আমার মতো ইলমহীন ব্যক্তির শরহ লেখা তো দূরের কথা তা পড়ারও যোগ্যতা নেই। এমন অযোগ্য ব্যক্তি থেকে উসূল হাদীসের মতো সুস্থ ও গভীর শাস্ত্রে কলম ধরাটা নিঃসন্দেহে যেমনি অবিদ্বাস্য্য তেমনি অনভিপ্রেতও বটে। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এই অধম থেকে এমন খেদমত নেওয়ার ইচ্ছা করেছেন, তাই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। ওনাহগার, অধম থেকে আল্লাহ তা'আলা এই মহান খেদমত নেওয়ায় তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজের জীবন-মরণ উৎসর্গ করছি। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বকৃতজ্ঞ স্তুতিবাদ জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ! আমি পুনরায় স্বীকার করছি তুমি মহীয়ান-গরীয়ান, সকল শক্তির আধার! তুমি সর্বশক্তিমান!

উসূল হাদীস হলো হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি। হাদীসশাস্ত্রের গ্রামার বা ব্যাকরণ। হাদীসশাস্ত্রকে ক্রটিমুক্ত রাখতেই এ শাস্ত্রের জন্ম। কেননা, উসূল হাদীসের মাধ্যমেই কোন হাদীস নির্ভরযোগ্য, কোন হাদীস দুর্বল, কোন হাদীস বিশ্বুদ্ধ, কোন হাদীস বিশ্বুদ্ধ নয় তা জানা যায়। ইলমে হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করতে হলে উসূল হাদীসের জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এটি একটি অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র।

উসূল হাদীসের উপর কলম ধরে যে সকল মনীষী এ শাস্ত্রকে পরিমার্জিতরূপে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্ররূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) -এর নাম শীর্ষ কাতারে। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ইবনে হাজার (র.) উসূল হাদীসের উপর প্রথমত নুখবাতুল ফিকার অতঃপর শরহ নুখবাতিল ফিকার শীর্ষক একটি চমৎকার কিতাব জগদ্বাসীকে উপহার দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের অন্যতম। তিনি নিজেও কথ্যাটি স্বীকার করেছেন। সংক্ষিপ্ত কলেবরের এ গ্রন্থ এতটা সুন্দর, বিন্যস্ত ও বিষয়সমৃদ্ধ যে, লেখকের কলমের গর্ভ হতে জন্ম নিতে না নিতেই সারা জগৎ মহানন্দে তা কোলে তুলে নেয়। সেই যে লেখকের জীবদ্দশা হতেই কিতাবটি মানুষ হাতে তুলে নিয়েছে আর নামানোর নাম নেই। তখন ছিল ৮০০ শতাব্দী। এখন চলছে ১৫০০ শতাব্দী। এর মধ্যে কতদিকে কত পরিবর্তন হয়েছে, হয়েছে আমূল উত্থান-পতন। পুরাতনকে ছেড়ে মানুষ গ্রহণ করেছে নতুন নতুন উপহার। কিন্তু শরহ নুখবাতিল ফিকারই কেবল বাতিক্রম। এখানে নেই নতুনত্বের উপস্থিতি, পরিবর্তনের ঘনঘটা। সেই প্রথম সময়ের মতোই এই ৭০০ বছর পরেও শরহ নুখবাতিল ফিকারের একই কদর রয়ে গেছে। নিসাবে অনেক কিতাব এসেছে-চলে গেছে; কিন্তু শরহ নুখবাতিল ফিকার বহাল অবস্থিতে রয়ে গেছে। চলতি দৃশ্যপট বলে, বর্তমানে তো আছেই ভবিষ্যতেও কিতাবটি শির উঁচু করে নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শরহ নুখবাতিল ফিকার কিতাবটির যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে পঠন-পাঠন চলছে এবং প্রায় সারা বিশ্বে তা নিসাবভুক্ত, তাই যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম এই কিতাবের পঠন-পাঠনের সহজতার স্বার্থে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ কিতাবকে কেন্দ্র করে অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু হয়েছে বিদেশে আর কিছু হয়েছে এদেশেও। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলা শরহ নুখবাতিল ফিকার উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের শরাহ নয়; (এবং তা করার যোগ্যতাও এ অধম রাখ না। এ কিতাবকে সামনে রেখে হাদীসশাস্ত্রের শরাহ করছেন মারকাতুদাওয়া আল-ইসলামিয়া-এর অহীনুত তা'লীম হযরতুল আল্লাম আব্দুল মালেক সাহেব (দা. বা.)। এ কিতাবটি প্রকাশিত হলে ওস্তাদ-ছাত্র তথা সকল আলিমের পড়া উচিত।) বরং শরহ নুখবাতিল ফিকার নামীয় কিতাবের শরাহ-এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিতাবটি গ্রহণ করা চাই। জামিয়াতুস সুন্নাহ, শিবচর, মাদারীপুরে ওস্তাদ হিসেবে আসার দ্বিতীয় বছর (১৪২৩-২৪ হি.) কিতাবটি পড়ানোর দায়িত্ব অধমকে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই-তিন বছর পাঠদান হতে অধম অনুমান করে যে, শরহ নুখবাতিল ফিকার কিতাবটি প্রায় ৭০০ বছর পূর্বের রচিত হওয়ায় এর রচনায় আধুনিকতার ছাপ অনুপস্থিত। যার কারণে কিতাবটি পড়াতে সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের যেমন গলদঘর্ম হতে হয় তেমনি ছাত্ররাও কিতাবটিকে একপ্রকার দুর্বোধ্য মনে করে। অথচ ইবারতের অবিন্যস্ততা ও রচনার দুর্বোধ্যতার বিপরীতে বিষয়বস্তু ততটা কঠিন নয়; বরং একপ্রকার সুখপাঠ্যই বটে। তাই এ দুটি দিক বিবেচনায় অধমের মনে জাগ্রত হয় 'বাংলা শরহ নুখবাতিল ফিকার'-এর সুপ্ত ইচ্ছা। সেই সুপ্ত ইচ্ছার বাস্তবায়ন আপনার হাতের গ্রন্থটি। সময়ের স্বল্পতা এবং বিভিন্ন ব্যস্ততা সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে আমি একটি পরিমার্জিত রূপ দিতে যারপরনাই চেষ্টা করেছি। শরহ নুখবাতিল ফিকারে আলোচিত বিষয়বস্তুকে সহজ-সরলভাবে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করার জোর চেষ্টা করেছি। বাংলা এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে আমি অনেকের সাহায্য নিয়েছি। ইবারতের অনুবাদের ক্ষেত্রে মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেবের 'হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি- শরহে নুখবাতুল ফিকার' সামনে রেখেছি। শরাহ করতে প্রথমদিকে আমার ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের রচিতব্য পাণ্ডুলিপিসহ উর্দু-আরবিতে লিখিত শরাহগুলো পাশে রেখেছি। অবশ্য পরে তাশরীহের ক্ষেত্রে উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'রাওঘাতুল আছর' অবলম্বন করা হয়েছে। বলতে গেলে এই উর্দু শরাহটির সাজানো-গোছানো আলোচনাই আমাকে বাংলা করার প্রথম অনুপ্রেরণা যোগায় এবং স্বপ্ন দেখায়। অবশ্য বিভিন্ন স্থানে মাওলানা অসিউর রহমান সাহেব লিখিত প্রশ্নোত্তরে শরহ নুখবাতিল ফিকার মুতাল্লা'আ করেছি ও তা হতে সাহায্য নিয়েছি। এভাবে বিভিন্ন গ্রন্থ, আল্লাহর তৌফিক ও আমার মেহনতের ফল আপনার হাতের এই বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থটি।

বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থের কাজ শুরু করার পরে মার্খা-যন্ত্রণার শিকার হই। এক পর্যায়ে লেখার কাজ বন্ধ থাকে। জামিয়াতুস সুন্নাহর মিশকাত জামাতের শরহ নুখবাতিল ফিকারের ঘটায় একদিন ছাত্রদের সামনে আমার ইচ্ছা ও অসুস্থের কথা জানালে ছাত্ররা আমার সুস্থতা ও কিতাবটি দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার জন্য দোয়া করার অঙ্গীকার করে। আল্লাহই ভালো জানেন, আসলে ব্যাপারটি কি, কিন্তু এরপর থেকে শরীয়ে সুস্থতাবোধ করতে থাকি এবং আল্লাহর নামে আবার কলম ধরতে সক্ষম হই। এরপর আর আমাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একপ্রকার সুস্থভাবেই কিতাব শেষ করতে সক্ষম হই। আলহামদুলিল্লাহ!

লেখা শেষ না হতেই ইসলামিয়া কুতুবখানা কতৃপক্ষ কিতাবটি প্রকাশের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলে আল্লাহর নামে পাণ্ডুলিপি তাদের হাতে তুলে দিই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে কিতাবটি ছেপে এখন আপনার হাতের মুঠোয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যোগ্য প্রতিদান দান করুন।

যোগ্যতা অর্জনের জন্য মূল কিতাব (আরবি) অধ্যয়ন করা চাই। যোগ্যতার জন্য এর বিকল্প নেই। মূল কিতাব থেকে পাঠ হাসিলের পরে বাংলা দেখা যেতে পারে। বাংলার উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। তবে যারা মূল কিতাব পড়তে না পারার কারণে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে না তাদের জন্য এ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থটি নিশ্চয় ফায়দা দেবে। এ শ্রেণির ছাত্রই বাংলার প্রথম পাঠক।

এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আমি অক্ষরের উপর অক্ষর দিয়ে অতি যত্নে সাজিয়েছি এবং গড়ে তুলেছি। লেখার সময় বারবার দোয়া করেছি, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি শেষ হওয়ার আগে যেন মৃত্যু না হয়। নিয়তকে খালেস করার চেষ্টা করেছি যে, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি যেন মাওলার সন্তুষ্টি এবং আমার পরকালের নাজাতের অসিলা হয়। পাঠকবর্গের কাছেও শুধু এটুকু দোয়া চাই। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যখন আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন যেন এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব আমার আমলনামায় পৌছতে থাকে। পাঠকবর্গ বা আল্লাহর কাছে আর কোনো বিনিময় চাই না। যশ-খ্যাতি হতে মাফ চাই।

পরিশেষে জামিয়াতুস্ সুন্নাহ্-এর ১৪২৬-২৭ হিজরির মিশকাত জামাতের ছাত্রদের শুকরিয়া আদায় করছি, যাদের দোয়ার বরকত ও অসিলায় আল্লাহ তা'আলা সুস্থ থেকে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার তৌফিক দিয়েছেন। দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইহ-পরকালে কামিয়াব করুন। সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সাথে সাথে প্রিয় সহধর্মিণী মোছাম্মাত সুমাইয়া খাতুন (ইতি)-এর ত্যাগ ও কুরবানির কথা স্বীকার না করলেই নয়। কেননা, এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার একগ্রন্থতার জন্য তাকে দীর্ঘদিন আমার থেকে দূরে থাকতে হয়। তার দীর্ঘদিন কষ্ট ও ত্যাগ শিকারের বদৌলতেই কিতাবটি লেখা ধারণাভীত অল্প সময়ে শেষ হয়। আল্লাহ তাকে এর বদলা দান করুন। তার সুস্থতা ও নেক হায়াত বৃদ্ধি করুন। পাঠকবর্গের কাছে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণ এবং পিতামাতার নেক হায়াত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া চাই।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, তা হলো, কিতাবটি প্রণয়নে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। বারবার দোয়া করেছি, যেন সত্য-সঠিক কথাটি কলম থেকে বের হয়। ইচ্ছা করে ভুল রাখার প্রশ্নই উঠে না। জ্ঞানের স্বল্পতা এবং ব্যস্ততাহেতু কোনো ভুল যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত এ ভুলের জন্য আমিই দায়ী এবং এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। অনুগ্রহপূর্বক ভুলগুলো আমাদের জানালে কৃতার্থ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের মতো কবুল করে নিন এবং একে আমার নাজাতের অসিলা করুন।

বিনীত

আলমগীর

মনিরামপুর, যশোর

তাং ০১/ ০২/ ০৬ ইং

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত জরুরি জ্ঞাতব্য.....	৭	বিদআত.....	২১১
'শরহ নুখবাতিল ফিকার' সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা.....	১৮	স্মৃতিদুর্বলতা.....	২১৫
'শরহ নুখবাতিল ফিকার' এর প্রমুখকার.....	২৩	সনদের শেষপ্রান্ত বিচারে হাদীসের শ্রেণীবিভাগ.....	২১৮
মুসলিম ইবনে হাজার আসকলানী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী.....	২৭	মারফু'.....	২১৮
কিতাবের ভূমিকা.....	৪৭	মাওকুফ.....	২৩২
হাদীস ও খবর.....	৫৩	সাহাবী-এর সংজ্ঞা.....	২৩২
বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বিচারে খবরের প্রকরণ.....	৫৩	মাকতু'.....	২৩৯
মুতাওয়াতির.....	৭১	তাবেয়ী-এর সংজ্ঞা.....	২৩৯
মাশহুর.....	৭৪	মুসনাদ.....	২৪৪
আযীয.....	৭৭	সনদের প্রকারভেদ.....	২৪৭
গরীব.....	৭৯	মুওয়াফাকা.....	২৫২
খবরে ওয়াহিদদের প্রকরণ.....	৮১	বদল.....	২৫৩
খবরে আহাদদের হুকুম এবং ফায়দা.....	৮৭	মুসাওয়াত.....	২৫৪
ফরদে মুতলাক ও ফরদে নিসবী.....	৯১	মুসাফাহা.....	২৫৫
খবরে মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য খবরের প্রকারভেদ.....	৯১	বিবিধ পরিভাষা.....	২৫৬
সহীহ লিয়াতিহী.....	৯৫	রেওয়ায়েতুল আকরান.....	২৫৬
সহীহ হাদীসের বিভিন্ন স্তর.....	১০২	মুদাব্বাজ.....	২৫৬
বুখারী অগ্রগণ্য নাকি মুসলিম?.....	১১০	রেওয়ায়েতুল আকাবির আনিল আসাগির.....	২৫৮
হাসান লিয়াতিহী.....	১১০	সাবিক ও লাহিক.....	২৬০
হাসান লিগায়রিহী.....	১১৩	রাবী নির্ণয়ের পদ্ধতি.....	২৬২
একই হাদীসের দু' বিশ্লেষণ.....	১১৯	শায়খের অস্বীকার.....	২৬৪
'রাবীর বুদ্ধি'-এর মর্মার্থ ও তার পদ্ধতি.....	১২৪	মুসালসাল.....	২৬৭
রাবীর গড়মিলের বর্ণনা ও তার প্রকারভেদ.....	১২৪	হাদীস বর্ণনার শব্দ.....	২৬৯
মাহফূয ও শায.....	১২৭	মুশাফাহা.....	২৭৫
মা'রুফ ও মুনকার.....	১২৯	মুকাতাবা.....	২৭৫
মুতাবি'.....	১৩৩	মুনাওয়ালা.....	২৭৫
শাহিদ.....	১৩৫	ইজাযতে মু'আয়্যানা.....	২৭৫
ইতিবার.....	১৩৭	বিজাদা.....	২৭৮
মাকবুল হাদীসের দ্বিতীয় প্রকারভেদ.....	১৪৯	অসিয়্যত বিল কিতাব.....	২৭৮
মারদুদ হাদীসের প্রকারভেদ.....	১৪৯	ই'লাম.....	২৭৮
মু'আত্তাক.....	১৫৪	ইজাযতে আশ্বাহ.....	২৮০
মুরসাল.....	১৫৬	ইজাযতে মাজহুল.....	২৮০
মু'যাল.....	১৫৮	ইজাযতে মা'দুম.....	২৮০
سقط -এর সংজ্ঞা ও প্রকরণ.....	১৬৮	মুতাফিক ও মুফতারিক.....	২৮৩
اسباب طعن -এর সংখ্যা.....	১৭১	মু'তালিফ ও মুখতালিফ.....	২৮৫
মাওযু' হাদীস.....	১৭৯	মুতাশাবিহ.....	২৮৭
মাতরুক ও মুনকার.....	১৮১	উপসংহার.....	২৯৩
মু'আত্তাল.....	১৮৪	রাবীদের স্তরসমূহ.....	২৯৩
মুদরাজ.....	১৯০	রাবীদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ জানা.....	২৯৮
মাকবুল.....	১৯৩	রাবীদের দেশ ও বাসস্থান জানা.....	২৯৮
মুযতারিব.....	১৯৬	জরাহ ও তা'দীল.....	২৯৮
মুসাহাফ ও মুহাররাফ.....	১৯৯	জরাহ ও তা'দীলের স্তরসমূহ.....	৩০১
মতনে পরিবর্তন সাধন.....	২০৫	তা'দীল বা প্রত্যয়নের স্তরসমূহ.....	৩০২
রাবীর অপরিচিতি.....	২০৫	কার প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য.....	৩০৬
		জরাহ অগ্রগামী না তা'দীল?.....	৩০৮
		নাম-কুনিয়াত.....	৩০৮

উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত জরুরি জ্ঞাতব্য

উলূমের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের নাম উসূলুল হাদীস। হাদীসশাস্ত্রের ন্যায় এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। হাদীসের হেফাজতই এ শাস্ত্রের লক্ষ্য। রাবীদের অবস্থা যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় ও নিশ্চিত করা এ শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রটি পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ করতে যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন এবং এ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে এর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উসূলুল হাদীস মাদরাসা শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুগ-যুগ ধরে তা মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসভূক্ত। অতীত গুরুত্বের সাথে শাস্ত্রটির পঠন-পাঠন হয়। এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা ব্যতিরেকে কেউ পূর্ণ আলিম হতে পারে না। এ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক ও মাত্রা রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও অনেক পরিভাষা। এ সমস্ত পরিভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এ শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হয় এবং দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

উসূলুল হাদীসের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে, যা জানা প্রতিটি ছাত্র ও আলিমের জন্য অপরিহার্য। এ সমস্ত বিষয় জানার উপরে শাস্ত্রটি বুঝা ও তার হাকীকত-হুদয়ঙ্গম করা নির্ভরশীল। উসূলুল হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ও বুঝতে হলে তৎপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও মৌলিক বিষয়গুলো জানার বিকল্প নেই। কেননা, এতে শাস্ত্রটি নখদর্পণ এবং হাতের মুঠোয় চলে আসে। শাস্ত্রটির মতি-গতি, ধারা-প্রকৃতি সব সময় সামনে থাকে। সহজ কথায় শাস্ত্রটি অপরিচিত ও দুর্বোধ্য থাকে না; বরং চেনা-জানা ও সহজ-সুখপাঠ্য হয়ে যায়। নিম্নে উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত জরুরি কিছু মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হলো—

১. উসূলুল হাদীসের আভিধানিক অর্থ : শব্দটি আরবিতে মূলত **أُسُوْلُ الْحَدِيثِ**। এটি যৌগিক শব্দ। **أُسُوْل** শব্দটির সম্বন্ধ (ইযাফত) হয়েছে **الْحَدِيثِ** -এর দিকে। এদের প্রত্যেকটির দুটি করে অর্থ রয়েছে— আভিধানিক ও পারিভাষিক।

ক. **أُسُوْل** -এর আভিধানিক অর্থ : **أَصْل** শব্দটি **أَصْل** -এর বহুবচন। অভিধানে **أَصْل** -এর অর্থ **مَا أَصْل** অর্থাৎ যার উপরে অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

খ. **أُسُوْل** -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় **أَصْل** শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১. **فَاعِلٌ** (কর্তা) **الْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ أَصْلٌ مِنَ أُسُوْلِ التَّعْوِي** অর্থাৎ নামাজ ফরজ হওয়ার পেশবিশিষ্ট হওয়া নাহর একটি নীতি।

২. **الدَّلِيلُ** তথা প্রমাণ। যেমন—**أَقْبَمُوا الصَّلَاةَ أَصْلٌ لِيُجْزِيَ الصَّلَاةَ** অর্থাৎ নামাজ ফরজ হওয়ার প্রমাণ **أَقْبَمُوا الصَّلَاةَ** আয়াতাত্শটুকু।

৩. **كَتَابُ اللَّهِ أَصْلٌ بِالسَّنْبَةِ إِلَى السَّنَةِ** অর্থাৎ সুন্নতের তুলনায় কিতাবুল্লাহ অগ্রগণ্য।

৪. **طَهَارَةُ الْمَاءِ أَصْلٌ** অর্থাৎ পানি পবিত্র হওয়াই তার প্রকৃত অবস্থা।

৫. **الْحَدِيثُ** : **أَحَادِيثُ** শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো **أَحَادِيثُ**। **أَحَادِيثُ** শব্দটি **فُعِيل** -এর ওযনে সিফাতের সীগাহ। **حُدُوثٌ** শব্দ থেকে নিম্পন্ন। এট: **قَدِيمٌ** -এর বিপরীত। আরবি ভাষার ইমাম জাওহারী (র.) 'সিহাহে' হাদীসের অর্থ বর্ণনা করত গিয়ে উল্লেখ করেছেন— **الْحَدِيثُ الْكَلَامُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ** অর্থাৎ হাদীস মানে কথা বা বাণী, কম হোক বা বেশি।

এটা হলো হাদীসের আভিধানিক অর্থ। এর সারকথা হলো, আভিধানিকভাবে হাদীস সব ধরনের কথাকে বলা হয়।

তবে **الْحَدِيثُ** শব্দটি এছাড়া আরো কয়েকটি অর্থ দেয়। যথা-

১. **وَمَنْ أَصَدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا** - যেমন-
وَمَنْ أَكَلَامُ তথা বাণী।

অর্থাৎ আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্য কথা (বাণী) আর কার হবে?

[সূরা নিসা : ৮৭]

২. **هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ** অর্থাৎ আপনার কাছে
 সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পৌছেছে কি? ফেরাউন এবং ছামুদের?
 [সূরা বুরূজ : ১৭ - ১৮]

৩. **الْحَدِيثُ** তথা নতুন। যেমন বলা হয়-
هَذَا أَمْرٌ حَدِيثٌ অর্থাৎ এটা নতুন বিষয়।

৪. **أَلَيْسَ هَذَا حَدِيثٌ مُوسَى** অর্থাৎ হযরত মুসা (আ.)-এর কাহিনী কি,
 আপনার কাছে পৌছেন?
 [সূরা ত্বা-হা : ৯]

৫. **وَعَلَّمَتْنِي مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ** অর্থাৎ এবং আপনি আমাকে স্বপ্নের
 ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।
 -[সূরা ইউসুফ : ১০১]

৬. **الْحَدِيثُ** -এর পারিভাষিক অর্থ : হাদীসের পারিভাষিক অর্থ নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে
 মতভেদ হয়েছে। যথা-

১. জুমহর মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত : তাঁদের মতে হাদীসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

**الْحَدِيثُ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ وَكَذَلِكَ
 يَطْلُقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِمَا وَتَقْرِيرِهِمَا .**

অর্থাৎ হাদীস হলো এমন কথা, কাজ ও সমর্থন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।
 এমনভাবে হাদীস শব্দটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের উপর প্রযোজ্য হয়।

২. হাফিজ সাখাবী (র.)-এর অভিমত : প্রাজ্ঞ এ মুহাদ্দিস হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

**مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً حَتَّى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ
 فِي الْبَيِّنَةِ وَالْمَنَامِ .**

অর্থাৎ হাদীস হলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। চাই তাঁর উক্তি হোক বা কর্ম বা
 অনুমোদন অথবা গুণ এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় এবং জাগ্রত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতি।

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র.)-এর অভিমত : তিনি হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ-

الْحَدِيثُ هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ وَالصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ .

অর্থাৎ হাদীস ব্যাপকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ , সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের উক্তি, কাজ ও
 সমর্থনকে বলা হয়।

৪. মাওলানা আব্দুল মালেক (দা.বা.) -এর অভিমত : উল্মুল হাদীসের বিদগ্ধ গবেষক, প্রাজ্ঞ এ
 মুহাদ্দিস তাঁর **عِلْمُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ** গ্রন্থে হাদীসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা
 প্রদান করেছেন-

**هُوَ مَا نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلِيفَتِهِ أَوْ
 خَلِيفَتِهِ سَوَاءً كَانَ قَبْلَ الْيَعْنِيَةِ أَمْ بَعْدَهَا .**

অর্থাৎ হাদীস হলো, নবী করীম ﷺ -এর প্রতি যা সম্বন্ধযুক্ত। চাই তা তাঁর উক্তি, কর্ম, অনুমোদন,
 সৃষ্টিগত বা চারিত্রিক গুণ হোক এবং তা নবুয়তের পূর্ববর্তী হোক কিংবা পরবর্তী।

২. উসূলুল হাদীসের পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পারিভাষিক অর্থে আলিমদের বিভিন্ন রকমের বক্তব্য রয়েছে। যথা—

১. আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু শুদ্দাহ (র.) -এর অভিমত : হাদীসশাস্ত্রের প্রখ্যাত এ আলিমে দীন তাঁর **الْحَدِيثُ مِنْ تَارِيخِ الشَّيْخِ وَعُلُومِ الشَّيْخِ** গ্রন্থে উল্লমুল হাদীসকে ছয়টি বিষয়ের সমষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। তা হলো—

(১) **الْإِسْنَادُ** (৬) **وَيُنِيرُ مَتْنِ الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ**

(২) **وَتَارِيخُ الرُّوَاةِ وَوَقَائِهِمْ** (৫) **وَعِلْمُ الْحَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ**

(৩) **وَتَقْدِيرُ الرُّوَاةِ وَبَيَانُ حَالِهِمْ مِنْ تَرْكِيبِهِ أَوْ جَرْجِ** (৭) **وَعِلْمُ عِلَلِ الْحَدِيثِ**

২. মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.)-এর অভিমত : বিশিষ্ট এ মুহাদ্দিস তাঁর **مَعْرِفَةُ فَيْ مَعْرِفَةِ** তাঁর বিশিষ্ট এ মুহাদ্দিস তাঁর **مَعْرِفَةُ** গ্রন্থে উল্লমুল হাদীসকে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি বলেছেন। তা হলো—

(১) **أَصُولُ التَّنْقِيهِ أَعْنَى تَقْدِيرِ الرَّايِ وَالْمَرْيُ**

(২) **أَدَابُ التَّحْقِيلِ وَالْأَدَاءِ وَشُرُوطُ وَصْفَةِ الصَّبْطِ وَالصَّبَانَةِ**

(৩) **مُضْطَلَحَاتُ أَتَمَّةِ الْفَنِّ أَيْ مَعْرِفَةُ مُضْطَلَحَاتِ أَهْلِ الْحَدِيثِ**

৩. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর অভিমত : প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ইবনে হাজার (র.) দুভাবে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা—

এক. তাদরীবুর রাবীর ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজারের বরাতে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে

عَنْهُ **مَعْرِفَةُ الْقَوَائِدِ الْمَعْرِفَةِ بِحَالِ الرَّايِ وَالْمَرْيُ**

অর্থাৎ এ নিয়মাবলি জানা, যা হাদীসের বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে।

দুই. ইবনে হাজার (র.) -এর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি শরহ নুখবাতিল ফিকারের ভাষায় নিম্নরূপ—

هُوَ عِلْمٌ يُبَيِّنُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَصُعُوبِهِ يُعْمَلُ بِهِ أَوْ يُتْرَكُ مِنْ حَيْثُ صِفَاتِ الرِّجَالِ وَصِيغَةُ الْأَدَاءِ

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন ইলমকে বলা হয় যার মধ্যে রাবীদের সিফাত এবং হাদীস বর্ণনার শব্দের বিচারে হাদীসের সহীহ এবং যা 'ঈফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যাতে সহীহ হলে আমল করা যায় এবং যা 'ঈফ হলে পরিত্যাগ করা যায়।

৪. শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে জামাআহ-এর অভিমত : তিনি উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেন—

عِلْمٌ يَقْوَانِينَ يَعْرِفُ بِهَا أَحْوَالَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ

অর্থাৎ যে নিয়ম-কানুন জানলে তার দ্বারা সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়, তাকে উসূলুল হাদীস বলে।

৫. আল্লামা তাহির জাযায়েরী দিমাক্কী (র.)-এর অভিমত : প্রখ্যাত এ মুহাদ্দিস কতিপয় মুহাদ্দিস হতে উসূলুল হাদীসের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ—

عِلْمٌ يَقْوَانِينَ يَعْرِفُ بِهَا أَحْوَالَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ مِنْ صِحَّةٍ وَحَسَنِ وَصُعُوبَةٍ وَتَفْهِيمٍ وَوَقْفٍ وَقَطْعٍ وَعُلُوبٍ وَتَرْوُلٍ وَكَيْفِيَّةِ التَّحْقِيلِ وَالْأَدَاءِ وَصِفَاتِ الرِّجَالِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এ নিয়মাবলি জানার নাম, যার দ্বারা সহীহ, হাসান, যা 'ঈফ, মারফু', মাওকুফ, মাকতু', উচ্চসনদ, নিম্নসনদ-এর দিক দিয়ে সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায়, হাদীস শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রদানের অবস্থা জানা যায় এবং রাবীদের গুণাবলি ও এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

৬. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র.) -এর অভিমত : **أَوْجَزُ الْمَسَالِكِ** -এর মুকাদ্দিমায় হযরত যাকারিয়া (র.) উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ—

عِلْمٌ يُبْنَعُ فِيهِ عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةِ السَّنَدِ اتِّصَالًا وَإِنْقِطَاعًا وَغَيْرِ ذَلِكَ.

অর্থাৎ যে ইলমের মধ্যে মুত্তাসিল, মুনকাতি ইত্যাদি সনদের দিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে উসূলুল হাদীস বলে। -[আওজালুল মাসালিক ১ : ৬]

৭. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.)-এর অভিमत : তিনি দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে চমৎকারভাবে সংক্ষিপ্তরূপে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর

عِلْمُ الْحَدِيثِ دُو قَوَانِينُ تُعَدُّ * يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدٍ
فَذَانِكَ الْمَرْضُوعِ وَالْمَقْصُودِ * أَنْ يُعْرَفَ الْقَبُولُ وَالْمَرْدُودُ

অর্থাৎ ইলমুল হাদীস তথা উসূলুল হাদীস হলো, কিছু নিয়মাবলি, যার দ্বারা মতন এবং সনদের অবস্থা জানা যায়। আর এ সনদ ও মতনই হলো তার আলোচ্য বিষয়। আর উদ্দেশ্য হলো, কোন হাদীস মাকবুল এবং কোন হাদীস মারদূদ তা জানা।

৮. عِلْمُ الْمَنْجَعِ فِي عِلْمِ الْمُسْطَلَحِ -এছে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে এভাবে-
هُوَ عِلْمٌ بِأَصُولٍ وَقَوَاعِدٍ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম, যার দ্বারা হাদীসের সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায় যে, কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য।

৯. হায়াতুল মুসান্নিফীন এছে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে-

هُوَ عِلْمٌ بِأَصُولٍ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الصَّحَّةِ وَالضَّعْفِ وَالْقَبُولُ وَالرَّدُّ.

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের অবস্থা জানা যায় যে, কোনটি সহীহ, কোনটি যাঈফ এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি অগ্রহণযোগ্য।

১০. কেউ কেউ সংজ্ঞাটি সংক্ষেপে এভাবেও ব্যক্ত করেছেন যে-
هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ

অর্থাৎ এটা এমন বিদ্যা যার দ্বারা সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায়।

৩. উসূলুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় : সকলের মতে উসূলুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় হলো-

السَّنَدُ وَالْمَتْنُ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ.

অর্থাৎ গ্রহণ এবং বর্জনের দিক থেকে হাদীসের সনদ ও মতন নিয়ে আলোচনা করা।

৪. উসূলুল হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : উসূলুল হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। যথা-

১. আল্লামা ইযযুদ্দীন (র.) বলেন-
مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ

অর্থাৎ গায়ের সহীহ হাদীস থেকে সহীহ হাদীস জানা।

২. কেউ কেউ বলেন-
تَحْصِيلُ مَلَكَتِهِ تَنْبِيْهِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ مِنَ الْآحَادِيثِ

অর্থাৎ সহীহ ও গায়ের সহীহ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৩. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, উসূলুল হাদীসের উদ্দেশ্য হলো-
هُوَ الْفَرْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ

অর্থাৎ ইহ-পরকালের দৌভাগ্যের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা।

৪. কোনো কোনো কিতাব থেকে জানা যায় যে, উসূলুল হাদীসের লক্ষ্য দুটি। যথা-

১. সহীহ হাদীসকে যাঈফ হাদীস থেকে পৃথক করা।

২. হাদীসের পারস্পরিক স্তর জানা।

৫. **উসূলুল হাদীসের নামসমূহ :** উসূলুল হাদীসের কয়েকটি নাম রয়েছে। যথা—

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (১) عُلُومُ الْحَدِيثِ | (৬) عِلْمُ رَوَايَةِ الْحَدِيثِ |
| (২) عِلْمُ أُصُولِ الْحَدِيثِ | (৭) عِلْمُ رَوَايَةِ الْحَدِيثِ |

৬. **উসূলুল হাদীসশাস্ত্র প্রণয়নের প্রেক্ষাপট :** যখন থেকে হাদীসের সূচনা ঠিক তখন থেকেই উসূলুল হাদীসেরও সূচনা হয়। কিন্তু প্রথমদিকে উসূলুল হাদীস স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে পরিগত ও প্রণীত ছিল না; বরং ইসলামের গুরু দিকে মানুষ হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করত। হাদীস জাল করা দূরে থাক সহীহ হাদীস বর্ণনা করতেও তারা ভয় পেতেন। হযরত আবু বকর (রা.) সহ অনেক সাহাবী ... **مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا** এ হাদীসের আওতাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় হাদীস বর্ণনা করাই বাদ দিয়েছিলেন। সেজন্য প্রথম দিকে উসূলুল হাদীসশাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে কয়েকটি কারণ প্রকট হয়ে দেখা দিলে এ শাস্ত্র প্রণয়ন অনিবার্য হয়ে উঠে। নিম্নে কারণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

১. **বিভিন্ন ফেরকার অভ্যুদয় :** সাহাবায়ে কেরামের যুগের শেষের দিকে এসে বিভিন্ন ফেরকার জন্ম হয়। প্রত্যেক দল বাস্তবে গোমরাহ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে ইসলামের সবচেয়ে অনুসরণীয় দল বলে দাবি করতে থাকে এবং প্রত্যেক দল নিজেদের সত্যতা, বাস্তবতা ও দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরার স্বার্থে হাদীস তৈরি করে দলিল হিসেবে পেশ করার অপপ্রয়াস চালায়।

২. **ইসলামের শত্রুদের অপতৎপরতা :** ইসলামের শত্রুরা যখন দেখতে পায় যে, ইসলামের নামে বহু দল-উপদল সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রত্যেক দল নিজেদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে হাদীস জাল করছে, তখন ইসলামের শত্রুরাও ময়দানে নেমে আসে। তারা এটিকে ইসলামের মূলোৎপাটনের অপূর্ব সুযোগ মনে করে তা কাজে লাগানোর অপপ্রয়াসে মেতে ওঠে। তারাও হাদীস তৈরি করার দুঃসাহস দেখায়। তারা এমন এমন হাদীস তৈরি করে সমাজে ছড়িয়ে দেয়, যা ছিল ইসলামি ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত— ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী।

৩. **হাদীস রেওয়ায়েতের অপরিসীম গুরুত্ব :** হাদীস চর্চা ও হাদীস রেওয়ায়েতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মানুষ হাদীস রেওয়ায়েতকারীদের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। বেশি বেশি হাদীস রেওয়ায়েত করে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন ও অধিক সম্মানের অধিকারী হওয়ার নেশায় অনেকে খুব তৎপর হয়ে ওঠে। তারা হাদীস পেলেই তা রেওয়ায়েত করতে থাকে। সহীহ ও যাসীফ -এর বাছ-বিচার করে না। যার কাছ থেকে যেভাবে হোক হাদীস পেলেই হলো, তা যাচাই না করেই রেওয়ায়েত করার একটি প্রবণতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেকে আরও নিচে নেমে আসে। তারা নিজেদের হাদীস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে নিজেরাই হাদীস বানাতে শুরু করে।

উল্লেখযোগ্য এ তিনটি কারণ প্রকট হয়ে দেখা দিলে হাদীসশাস্ত্রের হেফাজতের বিষয়টি সমকালীন ওলামায়ে কেরামকে ভাবিয়ে তোলে। তারা ঐকমত্যে হাদীসশাস্ত্রকে সকল চক্রান্ত থেকে দূরে রাখার সংকল্প করেন। দুটি বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি হয় এবং জোরালো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথা—

১. সহীহ হাদীসকে গায়ের সহীহ হাদীস থেকে যে কোনো উপায়ে পৃথক করতে হবে এবং জাল হাদীস চিহ্নিত করতে হবে।

২. যে কোনো মূল্যে ইসলামের সত্য-সঠিক আকিদা-বিশ্বাস, চেতনা ও ইসলামি ভাবধারা রক্ষা করতে হবে। ইসলামবিরোধী যে কোনো আকিদাকে বাতিল বলে খণ্ডন করতে হবে।

এ দুই মহতী সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোনো চক্রান্ত রুখতে সর্বসম্মতভাবে স্থির হয় যে, এমন কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অশুদ্ধ, যাসীফ, মাওযু' ইত্যাদি রেওয়ায়েত সকলের সামনে স্পষ্ট করে দেবে। বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে এই নীতিমালাই **أُصُولُ الْحَدِيثِ** নামে পরিগণিত হয়।

৭. **উসূলুল হাদীসশাস্ত্র রচনার ইতিহাস :** উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের সূচনা হয় মূলত যখন থেকে রাবীকোষ রচনা এবং হাদীসগ্রন্থ লিখিত হতে থাকে। এর পূর্বে উসূলুল হাদীস লিখিতভাবে ছিল না; বরং মুহাদিসগণের হৃদয়ে সংরক্ষিত ছিল এবং মৌখিকভাবে তার আলোচনা চলত। যখন থেকে হাদীসের কিতাব লেখা হতে থাকে, তখন হাদীসের কিতাবের এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে উসূলুল হাদীস জন্ম নিতে থাকে। প্রথম দিকে উসূলুল হাদীসের উপরে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ ছিল না। উসূলুল হাদীস গ্রন্থাকারে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এর পূর্বে হাদীসের গ্রন্থে প্রয়োজনানুপাতে কোথাও কোথাও কিছু কিছু বিষয়ের আলোচনা হতো।

আল্লামা আব্দুল ফাতাহ আবু গুদাহ (র.) প্রণীত **تَارِيخُ السُّنَنِ وَعِلْمُ الْحَدِيثِ** গ্রন্থের আলোকে জানা যায় যে, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম উসূলুল হাদীসের উপর কলম ওঠে। উসূলুল হাদীসের কিছু বিষয়ে কয়েকটি অধ্যায়বিশিষ্ট এক ছোট পুস্তিকা সর্বপ্রথম উপহার দেন ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (র.)। তিনি ১৬১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ২৩৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

এরপরে ইমাম শাফেয়ী (র.) (জন্ম ১৫০ হি. - মৃত্যু ২০৪ হি.) উসূলুল হাদীসের কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি **الْمَسَائِلُ** নামক গ্রন্থে উসূলুল ফিকহ সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে **إِتْيَادِ حَكْمِ الْمُرْسَلِ**, **قَبُولِ حَدِيثِ الْمَدْلِسِ**, **الْوَأْيَةِ بِالْمَعْنَى**, **شَرْطُ حِفْظِ الرَّوِ** ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এরপরে উসূলুল হাদীসের উপর কলম ধরেন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সমকালীন আরেকজন প্রাজ্ঞ মুহাদিস ঈসা ইবনে আবান (র.) (জন্ম ১৫০ হি. - মৃত্যু ২২১ হি.) তিনি তাঁর কিতাব **الْمَجْلَةُ الصَّغِيرَةُ** গ্রন্থের মুকাদ্দিমায় উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

এরপরে তৃতীয় শতাব্দীতে এসে উসূলুল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করেন হযরত ইমাম দারেমী (র.) (জন্ম ১৮১ হি. - মৃত্যু ২৫৫ হি.)। তিনি তাঁর সুনানে দারেমীর মুকাদ্দিমায় উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন নীতি উল্লেখ করেছেন।

এরপরে এসে কলম ধরেন ইমাম মুসলিম (র.) (জন্ম ২০৪ হি. - মৃত্যু ২৬১ হি.)। তিনি সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় উসূলুল হাদীসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন।

উসূলুল হাদীস সম্পর্কে আরো আলোচনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (র.) (জন্ম ২০৯ - মৃত্যু ২৭৯ হি.)। তিনি তাঁর তিরমিযী শরীফের শেষের দিকে এসে একটি অংশে স্বতন্ত্রভাবে উসূলুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আরো! আলোচনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ (র.) মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত **رِسَالَتُهُ فِي وَصْفِ** নামক এক পুস্তিকায়।

অনুরূপ আলোচনা করেছেন আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনে আমর আল-বায়হার (র.) (মৃত্যু ২৯০ হি.)।

উসূলুল হাদীসের উপর আরো বলিষ্ঠ কলম ধরেছেন ইমাম ত্বাহবী (র.)। তিনি **الْتَّسْوِيَةُ بَيْنَ حَدَّثِنَا** নামক পুস্তিকায় উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এভাবে আরো অনেকে উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন উসূলুল ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেছেন। অনেকে এ আলোচনাকে অন্য গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

চতুর্থ শতাব্দীতে এসে উসূলুল হাদীসের প্রতি ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি দারুণভাবে পতিত হয়। এ যুগে এসে উসূলুল হাদীসের বেশি বেশি চর্চা হতে থাকে। নিয়ম-নীতি একস্থানে জমা করার ধারা শুরু হয়। ওলামায়ে কেরাম উসূলুল হাদীসকে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপ দেওয়ার জোর প্রয়াস চালান। বস্তুত এ যুগে এসেই

উসূলুল হাদীস স্বাতন্ত্র্য রূপ পায় এবং পৃথক শাস্ত্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এ শতাব্দীতে যিনি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে উসূলুল হাদীসের রূপদান করেন এবং এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে খাল্লাদ ফারেসী রামাহুরমুযী (র.)। তিনি ২৬৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৩৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত তাঁর রচিত কিতাবটির নাম **النَّحْوَةُ الرَّائِيَّةُ**। এ কিতাবটি তাঁর সমকালীন গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বব্যাপী। তবে তা এ বিষয়ের সবদিক ও বিভাগকে সন্নিবেশ করেনি। পরবর্তীতে আলিমগণ এ বিষয়টিকে আরো বিস্তৃতি দান করেন। সর্বপ্রথম যিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি হলেন হাকীম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.)। তিনি ৩২১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কিতাবটি উলূমুল হাদীসের পঞ্চাশ প্রকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে; কিন্তু সেটি সুবিন্যস্ত ও সুপরিপাটি ছিল না। উসূলুল হাদীস বিষয়ক তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম **مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ**। তাঁর এ বিষয়ে আরো একটি কিতাব আছে, যার নাম **التَّحْقِيقُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالسَّيِّئِ مِنَ الْأَخْبَارِ**।

হাকীম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আবু নুআইম ইস্পাহানী (র.)। তিনি ৩৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৩০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি নিশাপুরীর কিতাবের উপর একটি **مُسْتَعْرِجٌ** (পরিশিষ্ট) প্রণয়ন করেন।

এরপরে এসে উসূলুল হাদীসের উপর অনেক কিতাব লেখেন আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীবে বাগদাদী (র.)। তিনি ৩৯২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৬৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস বর্ণনার নীতিমালা সম্পর্কে **الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرَّوَايَةِ** এবং হাদীস বর্ণনার আদাব সম্পর্কে **الْتِمَامُ لِأَخْلَاقِ الرَّوَايَةِ وَأَدَابِ السَّمْعِ** নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীসের এমন কোনো বিষয় নেই, যার উপর খতীবে বাগদাদী (র.) কোনো কিতাব প্রণয়ন করেননি।

খতীবে বাগদাদীর পরে যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তিনি হলেন কাজি ইয়ায ইবনে মুসা যাহসূবী সাবতী মাগরেবী (র.)। তিনি ৪৭৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৫৪৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। উসূলুল হাদীসের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম **الْإِلْتِمَاعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَصُولِ الرَّوَايَةِ وَتَقْيِيدِ السَّمْعِ**।

এরপরে এসে উসূলুল হাদীসের উপর কিতাব লেখেছেন আবু হাফস ওমর ইবনে আব্দুল মাজীদ আল-মাইয়ানযী (র.)। তিনি ৪৭৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৫৪৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচিত কিতাবের নাম **مَا لَا يَسَعُ الْمَحَدِّثُ جَهْلَهُ**।

এদের সকলের পরে এসেছেন আবু আমর ওসমান ইবনে সালাহুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান ইবনে মুসা কারদারী শাহরযুরী মুসেলী শাফেয়ী (র.)। তিনি ৫৭৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৬৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি মাদরাসায় আশরাফিয়াতে হাদীসের দরস দানকালে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে উসূলুল হাদীসের উপর একটি কিতাব লেখেন। তাঁর রচিত কিতাবের নাম **مَعْرِفَةُ أَتْرَاقِ عِلْمِ الْحَدِيثِ**। কিন্তু পরবর্তীতে কিতাবটি **مُقَدِّمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেন এবং অনেকে এ কিতাবটির খেদমত করেছেন। কেউ এটিকে সুবিন্যস্ত করেছেন, কেউ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ সার-সংক্ষেপ লেখেছেন, কেউবা পরিশিষ্ট লেখেছেন ইত্যাদি।

মুতাআখখিরীনদের মধ্যে যারা উসূলুল হাদীসের খেদমত করে এ শাস্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের প্রয়াস পেয়েছেন তাদের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) অন্যতম। তিনি ৭৭৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৮৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর কতিপয় দীনি ভাইয়ের অনুরোধক্রমে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে সঞ্চিপ্ত আকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন। কিতাবটির নাম রাখেন **نُحْبَةُ الْفِكَرِ فِي مَضْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ**। এরপর তিনি নিজেই নিজ কিতাবের শরহ লেখেন

نَامَةً النَّظَرُ فِي تَوْضِيحِ نَعْبَةِ الْفِكَرِ নামে। তাঁর দুটি কিতাবই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। ওলামায়ে কেরাম এ দুকিতাবের ব্যাপক খেদমত করেছেন। অনেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে শরহ নুখবাতিল ফিকারের উপর বিভিন্ন ভাষায় অনেক খেদমত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

৮. **উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :** উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার সম্মানিত গুস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.) তাঁর **الْمَحَلُّ إِلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ** (দা. বা.) তাঁর **الْمَحَلُّ إِلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ** গ্রন্থের ১১ পৃ. থেকে নিয়ে ১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি এখানে উক্ত গ্রন্থ হতে কয়েকটি দিক উল্লেখ করলাম মাত্র।

হাদীস শরীফের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সহীহ সনদের উপর। যে হাদীসের সনদ দুর্বল সে হাদীসও দুর্বল। আর সনদের সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয় উসূলুল হাদীসের মধ্যে। তাই উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

উসূলুল হাদীস সম্পর্কে জানা অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি যুগেই এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের নাস্তিকতা, হাদীস অস্বীকার ইত্যাদি ফিতনার যুগে উসূলুল হাদীসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাযোজ্য। অতীতে উসূলুল হাদীসের যে প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন বর্তমান যুগে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। কারণ, শরিয়তে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। আমরা প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে ৫টি বিষয়ের মুখাপেক্ষী। যথা—

১. **تَصْنِيعُ اسْمِ السَّنَدِ** অর্থাৎ সনদে উল্লিখিত নামগুলোর সঠিক ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ।
২. **تَعْيِينُ أَحْوَالِ رِجَالِ السَّنَدِ** অর্থাৎ সনদে আগত রাবীদের অবস্থা ও জীবনী যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
৩. **تَصْنِيعُ أَلْفَاظِ الْمَتْنِ** অর্থাৎ মতন তথা হাদীসের শব্দগুলো সহীহ-শুদ্ধরূপে পাঠ করা।
৪. **مَعْرِفَةُ حُكْمِ الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ الصَّحَّةُ وَالْقُعُوبُ** অর্থাৎ সহীহ ও যাঈফের দিক দিয়ে হাদীসের হুকুম জানা। অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ না যাঈফ তা জানা।
৫. **فَهْمُ الْحَدِيثِ وَمَعْرِفَةُ مَا فِيهِ مِنْ أَحْكَامٍ وَفَوَائِدٍ وَأَدَبٍ** অর্থাৎ হাদীসের অন্তর্নিহিত তথ্য, আহকাম, জ্ঞানকণিকা ও আদব জানা।

এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম চারটির প্রত্যেকটি উসূলুল হাদীসের উপর নির্ভরশীল। কারণ, উসূলুল হাদীস হতে জানা যায়—

১. রাবীর নামটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ।
 ২. রাবীর জীবনী ও তার ব্যক্তিগত হাল-অবস্থা।
 ৩. হাদীসটির সহীহ-শুদ্ধ উচ্চারণ।
 ৪. হাদীসটির গুণগত হুকুম।
- আর পঞ্চম বিষয় যেটা সেটা হলো মূলত হাদীসের ফল। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, ফল পাওয়ার আগে গাছের অস্তিত্ব জরুরি।

মোটকথা, প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে যে পাঁচটি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তার মধ্যে চারটি প্রত্যক্ষভাবে এবং একটি পরোক্ষভাবে উসূলুল হাদীসের উপর নির্ভর এবং তার সাথেই জড়িত। অতএব, হাদীস সম্পর্কে অবহিত হতে হলে উসূলুল হাদীসের জ্ঞানার্জন পূর্বশর্ত।

আরো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা উসূলুল হাদীসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। তা হলো—

১. পার্থিব জীবনে যেমনিভাবে একজনের কথা বা উক্তি আরেকজনের কাছে বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে শরয়ী বিষয়ও একজন থেকে আরেকজনের কাছে বর্ণনা বা তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা এমন একটি বাস্তব বিষয়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আরহিতে এ বর্ণনা করাকে বলে 'রেওয়ায়েত'।

২. এটা সকলেই জানে যে, রেওয়ায়েত দুপ্রকার হয়। যথা- ১. সত্য তথা বাস্তব। ২. মিথ্যা তথা অবাস্তব।
৩. সত্য-মিথ্যা এক নয়। অনুরূপ বাস্তব-অবাস্তবও এক নয়।

৪. সূতরাং সত্য-মিথ্যা আর বাস্তব-অবাস্তব নির্ণয় জরুরি।

এ কয়টি বিষয় এমনই যা প্রত্যেক জ্ঞানী স্বীকার করতে বাধ্য, কারো পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। হাদীসে নববীও এক ধরনের খবর ও রেওয়ায়েত। সাধারণ রেওয়ায়েতের ন্যায় তার মধ্যেও সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনিভাবে কোনো একটি দুনিয়াবি খবরকে যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে যে কেউ 'রাসূল বলেছেন' বললে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। এটা বাস্তবতারও দাবি যে, কেউ রাসূলের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু বললেই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তার শুদ্ধা-গুচ্ছ যাচাই-বাছাইয়ের পরেই তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, পূর্বে এমন অনেক নজির রয়েছে যে, মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে কিংবা মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে সমাজে চালিয়ে দিয়েছে। উসূলুল হাদীস হলো, হাদীসের শুদ্ধা-গুচ্ছ যাচাইয়ের পাল্লা। কোনো হাদীস বিশুদ্ধ হতে হলে প্রথমে তাকে উসূলুল হাদীসের পাল্লায় উঠাতে হবে। এখানে যথাযথ প্রমাণিত হলে তবেই সেটা সহীহ বলে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য হবে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক দিক রয়েছে। এর জন্য তাদরীবুর রাবীর মুকাদ্দিমা অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

৯. ইলমে হাদীসের প্রকারভেদ : আল্লামা ইবনুল আকফানী (র.) 'ইরশাদুল কাসিদ'-এ লেখেছেন যে, হাদীসশাস্ত্রের প্রথমত দুটি প্রকার রয়েছে। যথা- ১. عِلْمُ رَوَايَةِ الْحَدِيثِ ২. عِلْمُ دَرَايَةِ الْحَدِيثِ, নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

১. عِلْمُ رَوَايَةِ الْحَدِيثِ -এর সংজ্ঞা : এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ عِلْمٌ يَنْقُلُ اقْوَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْوَالَ أَهْلِهِ وَأَخْوَالِهِ بِالسِّيَاقِ الْمَتَّصِلِ وَحُظْمِهَا وَتَغْيِيرِهَا .

অর্থাৎ عِلْمُ رَوَايَةِ الْحَدِيثِ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কাজ ও অবস্থা অবিশ্লিষ্ট সূত্রে শুনে এবং লেখে ও মুখস্থ করে বর্ণনা করা সংক্রান্ত বিদ্যা।

২. عِلْمُ دَرَايَةِ الْحَدِيثِ -এর সংজ্ঞা : এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ عِلْمٌ يَتَعَرَّفُ بِهِ أَنْوَاعُ الرِّوَايَةِ وَأَحْكَامُهَا وَشُرُوطُ الرِّوَاةِ وَأَصْنَافُ الْمَرْوِيَّاتِ وَاسْتِخْرَاجُ مَعَانِيهَا .

এরূপ শাস্ত্র যার দ্বারা রেওয়ায়েতের প্রকার, আহকাম ও রাবীদের শর্ত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রকার ও অর্থ উৎসারণ সম্পর্কে জানা যায়।

অতএব, কোনো হাদীস সম্পর্কে এটা জানা যে, এটি অমুক গ্রন্থে অমুক সনদে অমুক শব্দে বর্ণিত হয়েছে- এটা হলো ইলমে রেওয়ায়েতুল হাদীস। আর এ হাদীস সম্পর্কে এ কথা জানা যে, এটি খবরে ওয়াহিদ না মাশহুর, সহীহ না দুর্বল, মুতাসিল না 'মুনকাতি', এরূপভাবে এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য না অনির্ভরযোগ্য, তাছাড়া এ হাদীস থেকে কি কি বিধান উৎসারিত হয় এবং কোনো বৈপরীত্য আছে কি না? থাকলে কিভাবে তার অবসান করা যায়- এসব বিষয় ইলমে দিরায়াতুল হাদীস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

১০. তিনটি পরিভাষার ব্যাখ্যা ও হাকীকত : اَلْعَايِطُ , اَلْعَجَّةُ , اَلْعَاكِمُ এ তিনটি মশহুর পরিভাষা। সলফ-খলফসহ সর্বযুগের মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ পরিভাষাত্রয় ব্যবহার করেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) اَلْعَجَّةُ : شَرَحَ شَرَحَ غَرَسَهُ এ পরিভাষাগুলোর নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

اَلْعَايِطُ : هُوَ مَنْ أَحَاطَ عَلَيْهِ بِمِائَةِ أَلْفٍ حَدِيثٍ .
وَالْعَجَّةُ : وَهُوَ مَنْ أَحَاطَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةِ مِائَةِ أَلْفٍ حَدِيثٍ .
وَالْعَاكِمُ : وَهُوَ الَّذِي أَحَاطَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ مَعْنًا وَلِسَانًا وَجَرَحًا وَتَعْدِيلًا وَتَارِيخًا .

অর্থাৎ 'হাফিজ' বলা হয় যার এক লাখ হাদীস মুখস্থ থাকে।

'হুজ্জাত' বলা হয় যার তিন লাখ হাদীস মুখস্থ থাকে।

'হাকিম' বলা হয় যার সমস্ত হাদীস সনদ, মতন, জরাহ, তা'দীল, ইতিহাসসহ মুখস্থ থাকে।

পরবর্তীতে শায়খ আব্দুল্লাহ টুংকী (র.) সহ অনেক ব্যাখ্যাতা মোল্লা আলী কারী (র.) -এর অনুসরণে উল্লিখিত পরিভাষাসমূহের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করেছেন।

কিন্তু বাস্তব কথা হলো, উক্ত পরিভাষাসমূহের যে ব্যাখ্যা মোল্লা আলী কারী (র.) সহ অনেকের কলমে উল্লিখিত হয়েছে তা ভুল ও অবাস্তব। বিশেষ করে হাকিমের যে সংজ্ঞা উল্লিখিত তার বাস্তবতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, এ পরিভাষাট্রয় অনেক পূর্ব হতে প্রচলিত। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) -এর পূর্বে কোনো আলিম থেকে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়নি। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁর বিভিন্ন কিতাবে **الْحَافِظُ** -এর অর্থ ও মতলব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি **زَعَمَ الْأَلْبَابُ فِي الْأَلْفَابِ** গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৮ পৃষ্ঠায় **الْحَافِظُ** শব্দের হাকীকত সম্পর্কে বলেন-

لَقَبَ مَنْ مَهَرَ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ .

অর্থাৎ হাফিজ হলো হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপাধি।

ইবনে হাজার (র.) **الْتَّكْتُ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ** গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আরো লেখেন-

الْحَافِظُ فِي عَرَبِ الْمُحَدِّثِينَ شُرُوطٌ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الرَّائِي سَعُوهُ حَافِظًا ، وَفَوَ الشُّهُرَةِ بِالطَّلِبِ وَالْأَخِذِ مِنْ أَقْوَاهِ الرِّجَالِ لَا مِنْ الصَّعْفِ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِطَبَقَاتِ الرُّوَاةِ وَمَرَاتِبِهِمْ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِالتَّجَرُّعِ وَالتَّغْيِيلِ ، وَتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّيْفِ ، حَتَّى يَكُونَ مَا اسْتَحْضَرَهُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِمَّا لَا يَسْتَحْضَرُهُ مَعَ اسْتِحْضَارِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمُتَوْنِ ، فَهَذِهِ الشُّرُوطُ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الرَّائِي سَعُوهُ حَافِظًا .

মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় 'হাফিজ' -এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যে রাবীর মধ্যে ঐ শর্তগুলো থাকে তাকে মুহাদ্দিসগণ 'হাফিজ' বলেন। সে শর্ত হলো, রাবী হাদীস অর্জন এবং মুহাদ্দিসগণের সরাসরি মুখ থেকে তা গ্রহণে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হবেন, কিতাবাদি হতে তিনি হাদীস সংগ্রহ করবেন না। রাবীদের তবকা ও স্তর জানবেন। তাজরীহ ও তা'দীল সম্পর্কে অবহিত হবেন। সহীহ হাদীসকে দুর্বল হাদীস থেকে পৃথক করতে পারবেন। এমনকি এসব বিষয় তার অধিকহারে মুখস্থ থাকবে। হাদীসের মতনও অনেক মুখস্থ থাকবে। এ সমস্ত শর্ত যে রাবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাকে 'হাফিজ' বলে অভিহিত করেন।

এ প্রসঙ্গে কেবল ইবনে হাজার (র.) নয়, শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (র.) **لَوَائِحُ الْأَنْوَارِ** গ্রন্থে, সাইয়েদ আব্দুল হাই কান্তানী (র.) **فَهْرَسُ الْفَهْرَسِ** গ্রন্থে, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু ওন্দা (র.) **الْوَجِيزُ** (দা. বা.) **الْوَجِيزُ** গ্রন্থে এবং আমার ওস্তাদ শায়খ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.) **الْوَجِيزُ** গ্রন্থে **الْحَافِظُ** শব্দের অর্থ মোল্লা আলী কারী (র.) যা উল্লেখ করেছেন তা যে সঠিক নয় তার প্রথম কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পারিভাষিক শব্দটি পূর্বেও ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু কেউ তার অর্থ মোল্লা আলী কারী (র.) -এর মতো করেননি; বরং ইবনে হাজার (র.) সহ অনেক ওলামায়ে কেরাম **الْحَافِظُ** শব্দটিকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের একটি লকব বিশেষ বলে অভিহিত করেছেন, যা কারো ব্যাপারে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য হয়; সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করার সাথে এ শব্দের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই।

النَّعَاطُ শব্দটির অর্থ মোল্লা আলী কারী (র.) যা উল্লেখ করেছেন এবং তার যে সংজ্ঞাটি ব্যাপক প্রচার-প্রসার পেয়েছে, তা সঠিক না হওয়ার দ্বিতীয় জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, যুগে-যুগে যারা 'হাফিজে হাদীস' লকবে ভূষিত হয়েছেন হাফিজ যাহাবী (র.) تَذْكِرَةُ النُّعَاطِ নামক গ্রন্থে এবং হাফিজ সুয়ূতী (র.) طَبَقَاتُ النُّعَاطِ নামক গ্রন্থে তাঁদের জীবনী সংকলন করেছেন। তাঁরা এসব গ্রন্থে এমন অনেক হাফিজে হাদীসের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক লাখ তো দূরের কথা দশ হাজারও নয়। অনেক নাম তো এমন আছে যাদের রেওয়ায়েতের সংখ্যাই উল্লিখিত হয়নি, আবার যাদের উল্লেখ হয়েছে তাদের রেওয়ায়েত সংখ্যা দশ হাজারেরও অনেক কম। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'হাফিজ' হওয়ার জন্য এক লাখ হাদীস মুখস্থ থাকা জরুরি নয়। যদি তা-ই হতো, তাহলে হুফফাজদের কাতারে তারা शामिल হতে পারতেন না; বরং আসল কথা হলো, 'হাফিজ'-এর সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করার সাথে নয়; বরং 'হাফিজ' হলো লকববিশেষ, কতিপয় শর্তসাপেক্ষে কোনো রাবী বা মুহাদ্দিস ঐ লকবে ভূষিত হন।

আর النُّعَاطُ শব্দটি মুহাদ্দিসগণের কোনো লকব নয়; বরং তা বিচারকার্য পরিচালনাকারীর উপাধি। এ সম্পর্কে ড. হাসান পাশা তাঁর اِلْتِقَابُ اِلْسَلَابِیَّةٍ গ্রন্থে লেখেন-

النُّعَاطُ ، فَاعِلٌ مِنَ الْحَكَمِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ ، وَهُوَ مِنَ الْقَابِ الْقَضَاءِ .

অর্থাৎ হাকিম হলেন তিনি, যিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেন তথা বিচারক। 'হাকিম' এটা বিচারকদের লকব। এ প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.) তাঁর التَّوَجِيزُ فِي مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عِلْمٍ গ্রন্থে বলেন-

وَأَمَّا لَفْظُ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ هُوَ يَلْقَبُ مِنَ الْقَابِ رَبِّبِ الْمُعَدِّينَ ، بَلْ هُوَ وَصْفٌ لِمَنْ وَلَّى الْقَضَاءَ ، وَلَا دَخَلَ لَهُ فِي حِفْظِ الْحَدِيثِ وَرَوَايَتِهِ .

অর্থাৎ 'হাকিম' শব্দটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্তরগত কোনো লকব নয়; বরং তা বিচারকের পদে আসীন ব্যক্তিবর্গের পদের নাম। এ নামের সাথে হাদীস মুখস্থ ও বর্ণনা করার দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, হাকিম -এর যে মশহুর সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে, যার সমস্ত হাদীস মুখস্থ সেই হাকিম- এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ভুল।

আর الْعُجَّةُ শব্দটিও মূলত মুহাদ্দিসীনে কেরামের একক কোনো লকব নয়; বরং তা অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে التَّوَجِيزُ فِي مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ গ্রন্থে আমার সম্মানিত ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.)-এর তাহকীকী মন্তব্য হলো-

وَأَمَّا لَفْظُ الْعُجَّةِ فَكَثِيرٌ مَا يَسْتَعْمَلُ فِي مَجَالِ التَّوْبِيحِ وَالتَّعْدِيلِ ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى : الْعُجَّةُ فِي الرِّوَايَةِ ، أَيْ الَّذِي يَحْتَجُّ بِرَوَايَتِهِ ، وَيَسْتَعْمَلُ بِكَثْرَةٍ أَيْضًا كَلَقَبٍ مِنَ اِلْتِقَابِ ، فَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ ، حُجَّةً فِي التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ وَالتَّجَرُّجِ وَالتَّعْدِيلِ .

অর্থাৎ 'হুজ্জত' শব্দটি বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয় সমর্থন ও প্রত্যয়ন -এর স্থলে। সুতরাং 'হুজ্জত ফিররেওয়ায়েত' (الْعُجَّةُ فِي الرِّوَايَةِ) -এর অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি যার রেওয়ায়েত দ্বারা হুজ্জত তথা প্রমাণ পেশ করা হয়। 'الْعُجَّةُ' শব্দটি আবার অন্যান্য লকবের মতো একটি লকব হিসেবেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আর এটা লকব হয় ঐ ব্যক্তির, যিনি তাসহীহ-তায় সঈফ ও জরাহ-তাদীলের ব্যাপারে হুজ্জত তথা প্রমাণস্বরূপ হন।

‘শরহ নুখবাতিল ফিকার’ সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা

বক্ষ্যমাণ পর্বে নুখবা এবং শরহে নুখবার রচনার প্রেক্ষাপট, শরহে নুখবার বৈশিষ্ট্য, নুখবাতুল ফিকার-এর অর্থ, শরহে নুখবা তথা নুযহাতুন নয়র -এর অর্থ, উভয় কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং সর্বশেষে লেখকের জীবনী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা হবে। নিম্নে এ বিষয়গুলো পৃথক ও স্বতন্ত্র শিরোনামে পেশ করা হলো।

কুরআনের পর হাদীস ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উৎস। কুরআন শরীফ নির্দেশনা ও জ্ঞানের এক সুবিশাল প্রদীপ। আর হাদীস তা থেকেই বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। হাদীস ছাড়া ইসলামী শরিয়তের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আর হাদীসের সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস গ্রহণ, বর্জন ও বর্ণনার ক্ষেত্রে যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তার পূর্ণ জ্ঞান অতি জরুরি। ইমামুল মুহাদ্দিসীন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) রচিত শরহ নুখবাতিল ফিকার এ বিষয়ের একটি অনন্য গ্রন্থ। কিতাবটি উসূলুল হাদীসের একটি বুনিয়াদি কিতাব। বিষয়বস্তুর সারবত্তা এবং লেখকের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। ইবনে হাজার (র.)-এর অনবদ্য রচনার মধ্যে শরহ নুখবাতিল ফিকার একটি। তিনি নিজেই এ কিতাবের ভূমিকা প্রশংসা করেছেন।

‘নুখবাতুল ফিকার’ রচনার পটভূমি : উসূলুল হাদীসের উপর নুখবাতুল ফিকার সর্বপ্রথম কিতাব নয়। এর পূর্বে অনেকে এ শাস্ত্রের উপর কিতাব লেখেছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত না হওয়ায় এক পর্যায়ে তিনি নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থ রচনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেপথ্য কারণ কি ছিল এবং কোন প্রেক্ষাপটে তিনি কিতাব রচনার সিদ্ধান্ত নেন, তা তিনি নিজেই গ্রন্থটির শুরুতে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন-

হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের মনীষীদের প্রচুর রচনা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম দিকের অন্যতম লেখক কাজি আবু মুহাম্মদ রামাহুরমুখী (র.) **‘الْمُعَدِّتُ الْفَائِلُ’** নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তিনি তাতে এ সংক্রান্ত সকল বিষয় সন্নিবেশিত করেননি। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) ও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ যেমন পরিমার্জিত ছিল না, তেমনি ছিল অবিন্যস্ত। অতঃপর এলেন আবু নুআইম ইস্পাহানী (র.)। হাকিম (র.) -এর গ্রন্থ থেকে যে বিষয়গুলো বাদ পড়ে গিয়েছিল, তিনি সেগুলোর জন্য ভিন্ন সংকলন প্রস্তুত করেন। তথাপি আরো কিছু বিষয় থেকে যায় যা পরবর্তীকালের গ্রন্থকারগণ সংকলন করেন।

অতঃপর এলেন খতীব আবু বকর বাগদাদী (র.)। তিনি হাদীস বর্ণনার নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম **‘الْكِنَايَةُ’**। হাদীস বর্ণনাকারী ও তা শ্রবণকারী অর্থাৎ হাদীসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম **‘الْبَيِّنَاتُ لِأَدَبِ السَّامِعِ وَالسَّامِعِ’**। হাদীসতত্ত্বের বিষয়সমূহের মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি।

খতাবে বাগদাদীর পরে আরো কতিপয় মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা এ বিষয়ে অনেকটাই আয়ত্ত করেছেন। অতঃপর কাজি ইয়ায (র.) একটি সংক্ষিপ্ত চমৎকার পুস্তক সংকলন করেন, তিনি যার নাম দিয়েছেন **‘الْأَنسَاءُ’**। আবু হাফস মাইয়ানিযীও একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এর নাম **‘مَالَا يَسَعُ الْمَعْدَتُ مَهْلًا’**।

এ ধরনের আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি বিস্তারিতভাবে সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ আবার কোনোটি সংক্ষিপ্তাকারে সহজবোধ্য ভঙ্গিতে প্রণীত। এক্ষেত্রে সর্বশেষে আবির্ভূত হলেন হাফিজ ফকীহ তকীউদ্দীন আবু আমর ইবনে সালাহ আব্দুর রহমান (র.)। তিনি যখন দামেস্কের মাদরাসায় আশরাফিয়াতে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হলেন, তখন রচনা করলেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **مُعْتَمِدُ الْإِسْلَامِ**। তিনি এতে সমস্ত বিষয় খুব পরিমার্জনার সাথে সংকলন করেন। তবে গ্রন্থটি তিনি অল্প অল্প করে অনেকদিন ধরে রচনা করায় এর বিন্যাস যথোপযুক্ত আঙ্গিকে হয়নি। তিনি প্রধানত খতীবে বাগদাদীর বিভিন্ন রচনার উপর নির্ভর করেন। সেসব রচনার বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ তিনি একত্রিত করেন এবং তার সাথে সংযোজন করেন অন্যান্য গ্রন্থ থেকে বাছাইকৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে তার গ্রন্থখানা হয়ে ওঠে অনেকগুলো গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা বিষয়াবলির সমাহার। তাই মানুষ এর প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং তা আয়ত্ত ও সহজ করার প্রয়াস পেল।

আমার কতিপয় দীনি ভাই ও বন্ধু একবার আমাকে অনুরোধ করেন উসূলুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করার জন্য। তাদের অনুরোধে সাড়া দিতে আমি কয়েক পৃষ্ঠায় উসূলুল হাদীসের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করি এবং তার নাম দেই **نُجْبَةُ الْفِكَرِ فِي مُفْطَلَحِ أَمَلِ الْآتِرِ**।

‘শরহ নুখবাতিল ফিকার’ রচনার প্রেক্ষাপট : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নিজেই পরবর্তীতে নুখবাতুল ফিকার-এর শরহ লেখেন। কতিপয় দীনি ভাইয়ের অনুরোধে লিখিত নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থটি অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ায় তা যেমনি পুস্তিকাকরূপ পায় না, তেমনি তা হতে ফায়দা গ্রহণ পাঠকের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ উভয়বিধ বাস্তবতাকে সামনে রেখে তাঁকে আবার কলম ধরতে হয়। রচনা করতে হয় একটি শরহ-গ্রন্থ। এ শরহ-গ্রন্থ রচনার পটভূমি ইবনে হাজার (র.)-এর ভাষায় নিম্নরূপ-

অতঃপর বন্ধুরা পুনরায় আমার নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন এর এমন একটি শরহ রচনা করে দেওয়ার জন্য, যাতে এর প্রতিটি ইঙ্গিতপূর্ণ তত্ত্ব উন্মোচিত হবে, তথ্যভাণ্ডার মুক্ত হবে এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর পক্ষে যা অস্পষ্ট থাকতে পারে তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে। আমি সে আহ্বানে সাড়া দিলাম লেখকদের কাঁতারে शामिल হওয়ার ইচ্ছায়। আমি এর শরহ রচনায় খুব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি এবং এর কোণায় কোণায় লুকিয়ে থাকা বিষয়সমূহ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছি। কেননা, ঘরের মালিকই এর অভ্যন্তরের বস্তুসমূহ সম্পর্কে অধিক অবগত থাকেন। আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, এটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং সূত্রগুলোকে বিশ্লেষণের সাথে একীভূত করে দেওয়া অধিক সমীচীন। তাই আমি এক অভিনব পন্থায় শরহ রচনায় মনোনিবেশ করি এবং তার নাম দেই **نُزْمَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نَجْوَةِ الْفِكَرِ**।

‘নুখবাতুল ফিকার’ রচনার উদ্দেশ্য : যে কোনো গ্রন্থ রচনার পিছনে গ্রন্থকারের বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ‘নুখবাতুল ফিকার’ গ্রন্থ রচনার পিছনেও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর কতিপয় উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তা হলো-

১. উসূলুল হাদীস সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা, যাতে তারা হাদীসশাস্ত্রের ভুলত্রুটি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং সহীহ হাদীসগুলো গ্রহণ করতে পারে।
২. আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, যাতে মানুষ সহজে সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে।

৩. পূর্ববর্তী আলিমগণ উসূলুল হাদীসের যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট নয়। তাই তিনি শাস্ত্রে পূর্ণাস্বরূপ দান করতে সংক্ষেপে যাবতীয় বিধানাবলি সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করার মনস্থ করে নুখবাতুল ফিকার রচনা করেন।

‘শরহ নুখবাতিল ফিকার’-এর বৈশিষ্ট্য : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) জীবনে অনেক কিতাব লেখেছেন। তবে যে ক’টি কিতাব লেখে তিনি গর্ববোধ করেছেন, তার মধ্যে শরহ নুখবাতিল ফিকার অন্যতম। এ কিতাবটি বিষয়ের মানদণ্ডে অত্যন্ত সুন্দর ও এর সুযোগ্য গ্রন্থকারের চিরন্তন সুখ্যাতির সমান্তরালে সমাদৃত। এ কিতাবের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. উসূলুল হাদীসের গ্রহণযোগ্য মতন সংশ্লিষ্ট।

২. কলেবর ছোট হলেও উপকারী বেশি।

৩. পৃষ্ঠায় কম হলেও বিষয়বস্তুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

৪. কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেও অনেক ও বিস্তারিত তথ্য সংযোজিত।

৫. ভাষাও অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ।

৬. সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি ও নয়া আঙ্গিকে রচিত।

৭. উসূলুল হাদীসের এমন কোনো বিষয় ও দিক নেই, যা এ কিতাবে উল্লিখিত হয়নি।

৮. উসূলুল হাদীসের বাইরের কোনো বিষয় এতে নেই। এমনকি যাদের রচনায় বাইরের বিষয় এসে গেছে তা তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

৯. উসূলুল হাদীসের ৬৬ বা ১০০-এরও বেশি বিষয় রয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ে যে কিতাবাদি রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশের দিকে এ কিতাবে ইশারা করা হয়েছে।

১০. এ সকল কিতাবের মধ্যে কোনটি আগের, কোনটি পরের এবং কোন কিতাবের বিন্যাস ভালো, কোন কিতাবের বিন্যাস ভালো নয়, কোন কিতাবটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে যথেষ্ট, কোনটি যথেষ্ট নয় ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধিত লেখক এ কিতারে উল্লেখ করেছেন।

نُغْبَةُ الْفِكْرِ -এর অর্থ : কিতাবটির নাম نُغْبَةُ الْفِكْرِ লোকমুখে প্রসিদ্ধ হলেও এটা তার পূর্ণ নাম নয়। পূর্ণ নাম হলো- نُغْبَةُ الْفِكْرِ فِي مَصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ এ নামটিকেই সংক্ষেপে নুখবাতুল ফিকার বলা হয়।

نُغْبَةُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো نَغَبٌ অর্থ مُنْتَعَبٌ তথা বাছাইকৃত, চয়নকৃত, নির্বাচিত ইত্যাদি। আর الْفِكْرُ (ফা-বর্ণে যের, কাফ-বর্ণে যবর) শব্দটি বহুবচন-এর; একবচন হলো فِكْرَةٌ অর্থ- চিন্তাসমূহ, ভাবনাসমূহ। সুতরাং একত্রে نُغْبَةُ الْفِكْرِ -এর অর্থ হলো- ‘নির্বাচিত চিন্তামালা’। যেহেতু শব্দদ্বয় الْمَوْصُوفِ إِلَى السَّيْفَةِ হয়েছে অর্থাৎ মূলত ছিল النُّغْبَةُ التَّعَبُّبِ، তাই এ অনুবাদ করা হয়েছে।

مَصْطَلَح শব্দটি اصْطِلَاح তথা পরিভাষার অর্থে এসেছে। عِدَّتِ দ্বারা উদ্দেশ্য অহল; অতএব, أَهْلُ الْأَثَرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أَهْلُ الْعِدَّةِ, আর أَهْلُ الْعِدَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাদ্দিসীনে কেরাম। সুতরাং مَصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ -এর অর্থ হলো- মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা। আর فِي অর্থ- মধ্যে, সংক্রান্ত। অতএব মোট মিলে أَهْلُ الْأَثَرِ فِي مَصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ -এর সরল অর্থ হবে, ‘মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা সংক্রান্ত নির্বাচিত চিন্তামালা’।

প্রকাশ থাকে যে, মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা- সেটাই হলো উসূলুল হাদীসশাস্ত্র। সুতরাং নামের অর্থ এভাবেও হতে পারে যে, 'উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের নির্বাচিত চিন্তামালা'।

নামকরণের কারণ : সম্মানিত লেখক উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত কিতাব রচনা করে তার নাম রেখেছেন নুখবাতুল ফিকার। এ নামকরণের কারণ হলো, যেহেতু লেখক এ কিতাবে উসূলুল হাদীসের চিন্তাধার বিভিন্ন বিষয় বাছাই ও নির্বাচন করে করে জমা করেছেন এবং এ কারণে তাঁর কিতাবটি নির্বাচিত চিন্তামালার সমষ্টি হয়েছে, তাই তিনি তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন নুখবাতুল ফিকার।

নুখবাতুল ফিকার -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রচিত 'নুখবাতুল ফিকার' উসূলুল হাদীসশাস্ত্রে এক অতুলনীয় গ্রন্থ। কিতাবটি প্রণীত হতেই বিস্ময়করভাবে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ দরসের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম এ কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। নুখবাতুল ফিকারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ অনেক। নিম্নে নমুনারূপ কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো-

১. **نُزْمَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُغْبَةِ الْفِكْرِ**। এর রচয়িতা হলেন হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নিজে। যা তিনি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধক্রমে করেন।
২. **نَيْبَةُ النَّظَرِ فِي شَرْحِ نُغْبَةِ الْفِكْرِ**। এর রচয়িতা হলেন হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর পুত্র কামালুদ্দীন (র.)।
৩. **إِمْعَانُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُغْبَةِ الْفِكْرِ**। এটি মাওলানা মুহাম্মদ শ্বাকরাম ইবনে আব্দুর রহমান মাকী -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৪. **حَاشِيَةُ نُغْبَةِ الْفِكْرِ**। এর রচয়িতা হলেন শায়খ ইবরাহীম আল-লুকানী (র.)। তিনি ১০৪০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
৫. **تَغْلِيْقُ نُغْبَةِ الْفِكْرِ**। এর রচয়িতা হলেন হানাফী মায়হাবের বড় আলিম আল্লামা যয়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কতলুবাগা (র.)। তিনি ৮৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
৬. **عَقْدُ الدَّرَرِ شَرْحُ نُغْبَةِ الْفِكْرِ** -এর রচয়িতা হলেন দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম মুহাদ্দিস, আমার সম্মানিত গুস্তাদ হযরতুল আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.)।

নুখবাতুল ফিকার -এর ব্যাখ্যা অনেকে কাব্যাকারেও করেছেন। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়।

نُزْمَةُ النَّظَرِ -এর অর্থ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নুখবাতুল ফিকার রচনার পর তা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বন্ধুদের পরামর্শে নিজেই তাঁর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম রাখেন **نُزْمَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُغْبَةِ الْفِكْرِ** যা সংক্ষেপে শরহ নুখবাতিল ফিকার নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

نُزْمَةُ অর্থ- ঘুরাফিরা, ভ্রমণ ইত্যাদি। আর **النَّظَرُ** অর্থ- দৃষ্টি। সুতরাং পুরো নামের অর্থ হলো- 'নুখবাতুল ফিকার-এর ব্যাখ্যায় দৃষ্টির পরিভ্রমণ'।

নামকরণের কারণ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নুখবাতুল ফিকার-এর শরহ লিখে তার নাম রাখেন **نُزْمَةُ النَّظَرِ**। এ নাম রাখার কারণ হলো, যেহেতু মতন তথা নুখবা এবং শরহ তথা নুযহা- দুই কিতাব মিলে এক কিতাবে পরিণত হয়েছে এবং নুখবাতুল ফিকার -এর ব্যাখ্যা পড়তে **نُزْمَةُ النَّظَرِ** হয়

তথা দৃষ্টির দ্বারা পরিভ্রমণ হয় (একবার মতনের প্রতি আর আরেকবার শরাহ -এর প্রতি), তাই লেখক **نُزْمَةُ النَّظَرِ** করে শরাহ -এর নাম রেখেছেন।

نُزْمَةُ النَّظَرِ -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রচিত শরাহ **نُزْمَةُ النَّظَرِ** নুখবাতুল ফিকার -এর গ্রন্থযোগ্যতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়। শরাহটি সকল মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। উসূলুল হাদীসের ক্ষেত্রে মানুষ এ কিতাবের প্রতি অপরিসীম ঝুঁকে পড়ে। যার ফলে কিতাবটি আরো সহজবোধ্য ও হৃদয়ঙ্গম করতে যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম এই শরাহ -এর শরাহ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। নিম্নে **نُزْمَةُ النَّظَرِ** -এর কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম তাদের লেখকসহ উল্লেখ করা হলো-

১. **مُصْطَلَحَاتُ أَهْلِ الْأَثَرِ عَلَى شَرْحِ نَعْبَةِ الْفِكْرِ**। এটি মোল্লা আলী কারী (র.) -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। গ্রন্থটি বড়ই চমৎকার।
২. **عَقْدُ الْكُرَى فِي جِنْدِ نَزْمَةِ النَّظَرِ**। এর রচয়িতা হলেন শামসুল ওলামা আব্দুল্লাহ টুংকী (র.)। এটিও একটি চমৎকার গ্রন্থ।
৩. **شَرْحُ شَرْحِ نَعْبَةِ الْفِكْرِ** -এর রচয়িতা হলেন আব্দামা ওযীহুদ্দীন ইবনে নাসরুদ্দাহ গুজরাটী (র.)। (মৃত্যু ৯৯৮ হিজরি)
৪. **شَرْحُ شَرْحِ نَعْبَةِ الْفِكْرِ**। এর রচয়িতা হলেন আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে সাদিক ইবনে আব্দুল হাদী সিরী হানাকী (র.)। (মৃত্যু ১১৩৮ হিজরি)
৫. **آلِیَاقِبَتِ وَالْأَثَرِ عَلَى شَرْحِ نَعْبَةِ الْفِكْرِ**। এটি রচনা করেছেন শায়খ আব্দুর রউফ আল-মুনাদী আল-হান্দাদী (র.)। (মৃত্যু ১০৩১ হিজরি)
৬. **سِلْمَةُ الْقَرْنِ فِي تَوْضِیحِ شَرْحِ النَّعْبَةِ**। এটি মোলভী আব্দুল হাই (র.)-এর শরাহ।
৭. **كَشْفُ الْغُمَّةِ عَلَى شَرْحِ النَّعْبَةِ**। এটি হযরত মাওলানা মুজিবুর রহমান সাহেবের উর্দু শরাহ।
৮. **رَوْضَةُ الْأَثَرِ فِي تَوْضِیحِ شَرْحِ نَعْبَةِ الْفِكْرِ**। এটি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রিয়াযুদ্দীন সাহেবের উর্দু শরাহ। শরাহটি সুন্দর সাজানো-গোছানো।
৯. 'বাংলা শরহ নুখবাতিল ফিকার'। এটি মাওলানা আলমগীর হুসাইন বিরচিত একটি বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। বাংলা শরাহ হিসেবে এটিই সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ।

কিতাবের বর্তমান অবস্থা : নুখবা এবং নুযহা পৃথক পৃথকভাবে রচিত হলেও এখন শরহ নুখবাতিল ফিকার কিতাবটি দুটি কিতাবের সমষ্টি। অর্থাৎ শরহ নুখবাতিল ফিকার-এর মধ্যে দুটি কিতাব আছে। যথা- ১. নুখবাতুল ফিকার, ২. নুযহাতুন নয়র। প্রথমটি মতন আর দ্বিতীয়টি শরাহ। কিন্তু কিতাবদ্বয় একটি অপরটির মধ্যে এমনভাবে একীভূত ও মিশে গেছে যে, দু কিতাব মিলে এক কিতাবে পরিণত হয়েছে। এখন একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করা রীতিমত অসম্ভব। এমনকি কোথাও কোথাও মতন ও শরাহ এমনভাবে মিলে গেছে যে, তাদেরকে পৃথক করা হলে অর্থ পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং তারকীবও অশুদ্ধ হবে।

নুখবা এবং শরহে নুখবা পৃথক দুটি নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন দুটি কিতাব হলেও এক নাম অপর নামের স্থলে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শরহে নুখবা দ্বারা যেমনিভাবে **نُزْمَةُ النَّظَرِ** উদ্দেশ্য তেমনিভাবে নুখবা বললেও তার দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয় **نُزْمَةُ النَّظَرِ** -ই।

‘শরহ নুখবাতিল ফিকার’-এর গ্রন্থকার

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সূচনা : পৃথিবীতে যে সকল ওলামায়ে কেরাম হাদীস ও উসুল হাদীসের উল্লেখযোগ্য খেদমত করতঃ বিরল যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ইতিহাসের পাতায় বরণ্য ও ইলমী জগতের উজ্জ্বল তারকা হয়ে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাজ্ঞ আলিমে দীন, ভূবনখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা, বিদগ্ধ গবেষক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) শীর্ষস্থানীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর দীপ্তিময় পদাচরণ। তিনি ব্যক্তিজীবনে অনন্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা হলো।

১. **নাম ও পরিচয় :** নাম আহমদ। উপনাম আবুল ফযল। উপাধি শিহাবুদ্দীন, শিহাবুল মিল্লাত, কাযীউল কুযাত, খাতামু হুফাজিল হাদীস। পিতার নাম আলী। মাতার নাম তুজ্জার। তাঁর বংশের পঞ্চম পুরুষের নাম ছিল হাজার। এদিকে নিসবত করে তাঁকে ‘ইবনে হাজার’ বলা হয়। তিনি মিসরের আসকালান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে ‘আসকালানী’ বলা হয়। মিসর তাঁর জন্মস্থান, বসবাস স্থান এবং মৃত্যুবরণ স্থান হওয়ায় তাঁকে মিসরী ও বলা হয়।
২. **বংশ পরিচিতি :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর পুরো নাম ও বংশধারা হলো, কাযীউল কুযাত হাফিজুল হাদীস আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজার কিনানী আসকালানী মিসরী শাফেয়ী (র.)।
৩. **পূর্বপুরুষ ও তাদের আদিবাস :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর দাদা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার একজন বস্ত্র উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী। পিতা ছিলেন প্রখ্যাত ফকীহ ও আইনজ্ঞ। তিনি কিছুকাল বিচার বিভাগে চাকরি করেন। তা ছাড়া তিনি একজন কবি ও সাহিত্যিকও ছিলেন। ইবনে হাজারের পূর্বপুরুষগণ সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা ‘আসকালান’-এ বসবাস করতেন। গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (র.)-এর হাতে উক্ত এলাকা পদনত হলে তাঁরা এ স্থান ছেড়ে প্রথমে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং পরে কায়রোয় এসে বসতি স্থাপন করেন।
৪. **জন্ম ও জন্মস্থান :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) ৭৭৩ হিজরির ২৩ শে শাবান মোতাবেক ১৩৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি মিসরের ‘আতিকা’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
৫. **বাল্যকাল :** তাঁর বাল্যকাল এতিম অবস্থায় অতিবাহিত হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার বয়স চার বছর পূর্তি না হতেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। ৭৭৭ হিজরির ১৫ ই রজব মোতাবেক ১৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর তাঁর পিতা আলী ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাতা তুজ্জার আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন ধনাঢ্য মহিলা। ইন্তেকালের সময় তিনি অনেক সম্পদ রেখে যান। তাই তিনি এতিম হলেও দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে দূরে থাকেন।
৬. **যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক :** তাঁর পিতা ইন্তেকালের সময় শিশুপুত্রকে যকীউদ্দিন নামক এক মহৎপ্রাণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রেখে যান। যকীউদ্দিন ছিলেন তাঁর যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক। তিনি ইবনে হাজারকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান এবং দীন-দুনিয়ার নানা বিষয় পূরণে পিতার ভূমিকা রাখেন।
৭. **শিক্ষার সূচনা :** মিসরেই তাঁর শিক্ষার সূচনা হয়। মুখতাসারুত তিবরীয় -এর ব্যাখ্যাকার শায়খ সদরুস সাফাতীর নিকট তিনি সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি হাফেজ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। কুরআন মাজীদ হিফজ করার সাথে সাথে তিনি **اَلْمُتَمَسِّرُ** **لَا يَنْ حَاجِبَ ، اَلْعَاوِي الصَّفِيْرُ ، اَلْنَبِيْة الْعِدِيْثُ ، اَلْمَعْدَةُ** প্রভৃতি গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন।
৮. **বিভিন্ন দেশে গমন :** প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে যখন তাঁর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয় বিশেষত ইলমে হাদীস তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, তখন তিনি জ্ঞান-পিপাসা

নিবারণ ও ইলমে হাদীস সম্পর্কে আরো অবগত হতে জ্ঞানার্জনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ আরবের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি ইরাক, সিরিয়া, মক্কা, মদীনা, হিজাজ, ইয়েমেন, নাবলুস, রামাদা, গাজা, সাইপ্রাস হালাব প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং এসব দেশের প্রখ্যাত আলিমদের থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন।

৯. **ওস্তাদগণ :** তাঁর অনেক সুযোগ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ-
 ১. হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী (র.)। তাঁর কাছে তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন।
 ২. আবুল ফযল আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান।
 ৩. শায়খ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আরসালান বালকিনী।
 ৪. হাফিজ ইবনে মালাকান।
 ৫. শায়খ বুরহানুদ্দীন আনবারী।
 ৬. হাফিজ আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে যাহীরাহ।
 ৭. শায়খ জামাল ইবনে যাহীরাহ।
 ৮. শায়খ নুরুদ্দীন হায়ছামী।
 ৯. হাফিজ বদরুদ্দীন আইনী।
 ১০. শায়খ আফীফুদ্দীন প্রমুখ।
১০. **পবিত্র হজ পালন :** তিনি ৭৮৪ হিজরিতে পিতার নিযুক্ত অভিভাবক যকীউদ্দিন-এর তত্ত্বাবধানে পবিত্র হজ পালন করেন। হজে আগত বিভিন্ন দেশের বড় বড় আলিম ও মুহাদ্দিসের দরসে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে শায়খ আফীফুদ্দীন-এর নিকট তিনি বুখারী শরীফ পড়েন। তা ছাড়া হাফিজ আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে যাহীরাহ ও শায়খ জামাল ইবনে যাহীরার দরসেও অংশগ্রহণ করেন।
১১. **যোগ্যতার স্বীকৃতি ও হাদীস পড়ানোর অনুমতি লাভ :** ৭৯৬ হিজরিতে তিনি কায়রোয় হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী (র.) -এর নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন। এ পর্যায়ে তিনি ইলমে হাদীসে গভীর ব্যুৎপত্তি ও এত যোগ্যতা অর্জন করেন যে, শায়খ তাকে হাদীস পড়ানোর অনুমতি প্রদান করেন। শায়খের ইন্তেকালের সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে যে, আপনার পক্ষে আপনার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কে হাদীসের দরস দান করবে? জবাবে তিনি বলেন, ইবনে হাজার, এরপর জুর'আ, এরপর হায়ছামী।
১২. **শিক্ষাদান :** শিক্ষাজীবন শেষে তিনি দরস-তাদরীস শুরু করেন। তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করে। বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। তাঁর পাঠদানের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে প্রত্যেক অঞ্চল ও দূর-দূরান্ত হতে ছাত্ররা তাঁর দরসে ভিড় জমায়। তিনি সবাইকে অকাতরে ইলমী সুধা পান করিয়ে ধন্য করেন।
১৩. **ছাত্রগণ :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর দরসে পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত। তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের নাম নিম্নরূপ-
 ১. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আসসাখাবী। (মৃত্যু ৯০২ হিজরি)
 ২. বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে ওমর বুকায়ী। (মৃত্যু ৮৮৫ হিজরি)
 ৩. হাফিজ ওমর ইবনে ফাহদ মাক্কী (র.)।
 ৪. কাজি যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনসারী। (মৃত্যু ৯২৬ হিজরি)
১৪. **বর্ণাঢ্য কর্মজীবন :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর কর্মজীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও দীপ্তিময়। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন কেটেছে মূলত তিন কাজে। যথা- ১. গ্রন্থ অধ্যয়ন। ২. রচনা-সংকলন। ৩. ইবাদত-বন্দেগি। তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল হাদীসশাস্ত্রের অনুশীলন, হাদীসের পঠন-পাঠন, হাদীসগ্রন্থের সংকলন, প্রচার-প্রকাশ ও ফতোয়া প্রদান। তিনি শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন বিধায় তাঁর প্রদত্ত মাসআলা ও ফতোয়া হতো শাফেয়ী মাযহাবকে সামনে রেখে। তিনি কর্মজীবনে বিভিন্ন মাদরাসায় হাদীসের দরস দিয়েছেন। এর মধ্যে হুসাইনিয়াহ, মানসুরিয়াহ, বাইবারসিয়াহ, জামালিয়াহ, সোনিয়াহ, যায়নাবিয়াহ, শাইখুনিয়াহ, জামে তুলুন ও কুন্সার মানসুরিয়াহ অন্যতম। তিনি খারকবিয়াহ, নাযেমিয়াহ, সালাহিয়াহ এবং

মুয়াইয়েদিয়াহ-তে ফিকহ শিক্ষা দিতেন। তিনি বাইবারসিয়াহ-এর মুহতামিম এবং শায়খও ছিলেন। 'দারুল আদল'-এ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি জামে আযহর এবং পরে জামে আমর ইবনে আস (রা.)-এর খতীব ছিলেন। তা ছাড়া তিনি মাহমুদিয়াহ-তে কুতুবখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পালন করেন।

১৫. **বিচারকের পদে আসীন :** তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন প্রশাসন তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করতে বারবার অনুরোধ জানায়, কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত জানান। অবশেষে তাঁর বন্ধু প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন আল-বুলাকীনের অনুরোধে তাঁর সহকারী হতে সম্মত হন। ৮২৭ হিজিরির মহররম মাসে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং প্রায় ২১ বছর এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বহাল থাকেন। যদিও এ দীর্ঘ সময়ে তিনি একাধিকবার পদচ্যুত ও পুনর্বহাল হন।
১৬. **সমাজসেবা :** তিনি ব্যক্তিগত জীবনে রচনা-সংকলনে লিপ্ত থাকলেও সময়ে সময়ে যথেষ্ট জনসেবা ও সমাজসেবা করেছেন। তিনি তাবলীগ তথা জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মাদরাসা, খানকা, এতিমখানা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।
১৭. **আকৃতি ও গঠন :** তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সুদর্শন। তিনি বেঁটে, সাদা দাড়িওয়ালা, হালকা-পাতলা গড়নের, বিস্ময়জনক এবং মর্মস্পর্শী বক্তা ছিলেন।
১৮. **স্বভাব-চরিত্র :** তিনি অত্যধিক নামাজ ও রোজায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বিনয়ী, ধীরস্থির এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদা হাস্য ও অদ্ভুতর সাথে কথোপকথন করতেন।
১৯. **সুন্নত অনুসরণ :** তিনি ছিলেন সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী। এ প্রসঙ্গে ইবনুল ইমাদ হাফসী (র.) বলেন, ইবনে হাজারের জীবনে সুন্নতের নিদর্শন এমনই ছিল যে, মানুষ তাঁর খাওয়া-পরা ও চলাফেরা দেখে সুন্নতী আমল শিখত। একদা তিনি অজ্ঞাতে সন্দেহযুক্ত খাবার খান। পরে এ বিষয়ে অবগত হলে তিনি একটি বড় থালা বা বাসন চান এবং বলেন, 'হযরত আবু বকর (রা.) যা করেছিলেন আমিও তা-ই করবো।' এ কথা বলে পেটস্থ সমস্ত খাদ্য বমি করে বের করে দেন।
২০. **অনন্য স্মৃতিশক্তি :** তাঁর অনন্য স্মৃতিশক্তির কথা সর্বজনবিদিত। কাছের-দূরের, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁর প্রখর বীশক্তির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের অভিমত, মেধা ও স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে তিনি আল্লামা যাহাবীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।*
২১. **বিরল প্রতিভার অধিকারী :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বহুমুখী বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহসহ আরো অনেক শাস্ত্রের তিনি সুযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। কাব্য রচনাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতা ছিল। মিসরের বড় বড় সাত কবি যাদেরকে 'শিহাব' উপাধিতে ভূষিত করা হতো- তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।
২২. **ওলীর দোয়ার ফসল :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) ছিলেন আল্লাহর এক ওলীর দোয়ার ফসল। তাঁর জীবনীতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে হাজার (র.)-এর পিতার কোনো সন্তান হয়ে জীবিত থাকত না। এতে তাঁর পিতা ভীষণ চিন্তিত হন। একদিন তিনি তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ শায়খ ছনাকবরী (র.)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হন এবং নিজের দুঃখের কথা খুলে বলেন। শায়খ তার বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে দোয়া করেন এবং তাঁর পিতাকে বলেন, 'তোমার ঔরস হতে এমন এক পুত্র জন্ম নেবে, যে সারা দুনিয়াকে ইলম-এর দৌলত দ্বারা ভরপুর করে দেবে।' উক্ত বুজুর্গের এ দোয়ার পরে ইবনে হাজারের জন্ম হয় এবং তিনি জীবিত থাকেন। তাঁর জীবিত থাকা এবং তাঁর রচনাবলি ব্যাপকভাবে কবুল ও প্রসিদ্ধ হওয়া মূলত উক্ত বুজুর্গের দোয়ার বরকতের ফল।

কথিত আছে, একবার তিনি জমজন্মের পানি এ উদ্দেশ্যে পান করেন যেন তাঁর মেধা হাফিজ যাহাবীর মতো প্রখর হয়। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। যার ফলে তিনি হাফিজ যাহাবীর চেয়েও প্রখর মেধার অধিকারী হয়েছিলেন।

২৩. রচনাবলি : শাহ আব্দুল আযীয মুহাম্মদিসে দেহলবী (র.) বলেন, হাফিজ ইবনে হাজারের রচনাবলি দেড় শতাধিক। হাফিজ সাখারীও অনুরূপ বলেছেন।

হাফিজ সুযুতির মতে ১৮৩। ইবনুল ইমাদ হাফলী তাঁর ৭২টি কিতাবের নাম লেখেছেন। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. اَعْلَى السَّعْيِ এটিই তাঁর প্রথম রচিত কিতাব। এটি একটি চমৎকার কিতাব।
 ২. فَتَحَ الْبَارِئِ فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبَغَارِ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাদ্দুহী (র.) বলেন, 'এ অতুলনীয় কিতাবই হাফিজ ইবনে হাজারকে হাদীসশাস্ত্রে জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে'। মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফাতহুল বারী তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব'।
- হাফিজ ইবনে হাজার নিজেও ফাতহুল বারী, তা'লীকুত তা'লীক ও নুখবাতুল ফিকার -এর প্রশংসা করেছেন।

৩. تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ। (রাবীদের জীবনীকোষ।)
৪. لِسَانُ الْمِيزَانِ। (দুর্বল রাবীদের জীবনীকোষ।)
৫. الْأَصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ। (সাহাবীদের জীবনচরিত।)
৬. الذَّرُّ الْكَامِنَةُ فِي أَعْيَانِ الْمَنَاءِ السَّامِنَةِ
৭. إنبَاءُ الْغُمُورِ بِأَيِّنَاءِ الْأُمُورِ
৮. الْكَلْبَابُ فِي شَرْحِ قَوْلِ التَّيْمِيزِيِّ فِي الْبَابِ
৯. الْإِدْرَايَةُ فِي مُتَنَحَبِ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ
১০. بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدْلَةِ الْأَحْكَامِ
১১. هَدَايَةُ الرُّؤْيَا فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمَصَابِيحِ وَالْمَشْكَاةِ
১২. تَنْفِيهِدُ الْقَوَاسِ فِي أَطْرَافِ مُسَانَدِ الْفِرْدَوْسِ
১৩. الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ فِي تَغْرِيفِ الْكَبِيرَةِ
১৪. نَزْمَةُ الْأَلْبَابِ فِي الْأَلْقَابِ
১৫. تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ
১৬. نَخْبَةُ الْفِكْرِ فِي مَصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ
১৭. نَزْمَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نَخْبَةِ الْفِكْرِ

২৪. ইস্তেকাল : ইস্তেকালের মধ্য দিয়ে হাফিজ ইবনে হাজারের কর্মমুখর জীবনের চির অবসান হয়। সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবন শেষে ২৮ শে জিলহজ ৮৫২ হিজরি মোতাবেক ২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দ শনিবার মাগরিবের পরে তিনি ইস্তেকাল করেন।

২৫. জানাজা ও দাফন : তাঁর জানাজায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। স্বয়ং বাদশাহ প্রথমে তাঁর জানাজা কাঁধে বহন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা একের পর এক বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যান। মিসরের "قِرَافَةُ الصَّغْرَى" নামক প্রসিদ্ধ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَامِلُ الْحَافِظُ رَجِيدُ دَهْرِهِ وَأَوَانِهِ وَقَرِيدُ
عَصْرِهِ وَزَمَانِهِ شَهَابُ الْمِلَّةِ وَالِدَيْنِ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
النَّسْفَلَاتِيُّ الشَّهِيرُ بِابْنِ حَجَرٍ آثَابُهُ الْجَنَّةُ بِفَضْلِهِ وَكَرَّمَهُ :

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

অনুবাদ : শায়খুল ইসলাম, মহান নেতা, আলিমে দীন, আমিলে শরিয়ত, হাফিজে কুরআন এবং (হাদীস, জ্ঞান ও বিচক্ষণতায়) তৎকালীন যুগের অধিতীয় অনন্য ব্যক্তিত্ব, মুসলিম উম্মাহ ও দীন ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী আল-আসকালানী, যিনি ইবনে হাজার আসকালানী নামে অধিক পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় প্রতিদান হিসেবে তাঁকে জান্নাত দান করুন। তিনি বলেন—

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الشَّيْخُ الْإِمَامُ থেকে শহাবُ الْمِلَّةِ وَالِدَيْنِ পর্যন্ত প্রশংসাসূচক বাক্যগুলো লেখক ইবনে হাজার (র.)-এর লিখিত নয়। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর কোনো ছাত্র হয়তো বা এ অংশটুকু সম্মানিত লেখকের অনুপম ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করতে সংযোজন করে দিয়েছেন।

الشَّيْخُ -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : شَيْخُ অর্থ- প্রবীণ, বৃদ্ধ। শাস্ত্রবিদকেও শায়খ বলা হয়, যদিও তিনি বয়সে যুবক হন। আলোচ্য স্থলে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য। ওস্তাদ, পীর-মুর্শিদকেও শায়খ বলা হয়। হাদীস ও উসুলুল হাদীসের কিতাবাদিতে শায়খ শব্দটি সাধারণত ওস্তাদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

الْحَافِظُ -এর অর্থ : এ শব্দটি একটি বহুমাত্রিক পারিভাষিক শব্দ। স্থানভেদে এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন হয়। হাদীসের জগতে মূলত এ শব্দটি লকববিশেষ। যিনি হাদীস চর্চায় বিশেষভাবে নিবেদিত থাকেন, তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। الْعَجَمَةُ এবং الْعَامِلُ শব্দ দুটিও এমন সম্মানবাচক উপাধি। এ শব্দগুলোর সম্পর্ক হাদীস চর্চার সাথে; হাদীস মুখস্থের সাথে নয়। অতএব, বিভিন্ন গ্রন্থে হাফিজ, হুজ্জত ও হাকিম -এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে—

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনসহ কমপক্ষে এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেন। হুজ্জত : যিনি সনদ ও মতনসহ কমপক্ষে তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেন। হাকিম : যিনি সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেন।

—মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম একে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য মুকাদ্দিমা অংশ দ্রষ্টব্য।

قَرِيدُ অর্থ অনন্য। رَجِيدُ অর্থ অধিতীয় আর وَجِيدُ قَرِيدُ

أَبُو الْفَضْلِ -এর ব্যাখ্যা : এটি সম্মানিত লেখকের কুনিয়াত বা উপনাম তাঁর এ উপনামের সম্ভাব্য কারণ দুটি। যথা—

১. হয়তো তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল ফযল, তাই তার উপনাম হয়ে যায় আবুল ফযল অর্থাৎ ফযলের পিতা।
 ২. অথবা, এখানে صَاحِبُ শব্দটি صَاحِبُ الْفَضْلِ -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ صَاحِبُ الْفَضْلِ মানে الْفَضْلِ -এর স্রষ্টা।
- صَاحِبُ শব্দটি صَاحِبُ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অনেক নজির রয়েছে। যেমন বলা হয়— আবু যর, আবু তুরাব ইত্যাদি। এ অর্থে লেখকের এ উপনামের কারণ হলো, তিনি যেমনি প্রচুর ইলমের অধিকারী ছিলেন তেমনি ধন-দৌলতও তাঁর অনেক ছিল।

ابْنُ حَجَرٍ বলার কারণ : লেখকের লকব বা উপাধি হচ্ছে ابْنُ حَجَرٍ। তাঁর এ লকবের কারণ কয়েকটি হতে পারে। যথা— ১. হয়তো তিনি প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক ছিলেন। ২. তাঁর কাছে মণি-মুক্তা, জওহার অনেক ছিল। ৩. তাঁর রায় বা ফিদ্ধাত হতো পাথরের মতো মজবুত। ৪. তাঁর বংশের পঞ্চম পুরুষের নাম ছিল হাজার, তাই তাঁকে তাঁর দিকে নিসবত দিয়ে ابْنُ حَجَرٍ বলা হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِمًا قَدِيرًا حَبِيبًا
قَبُولًا سَمِيعًا بَصِيرًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَكْبِرُهُ
تَكْبِيرًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَاثَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا .

অনুবাদ : পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সর্বদা মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান চিরজীব চিরস্থায়ী মহাশ্রোতা মহাদ্রষ্টা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক; তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমি তাঁর পূর্ণ মহানত্ব ঘোষণা করছি। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি, যাকে তিনি গোটা মানব জাতির নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপরও রহমত বর্ষণ করুন আর তিনি মুহুম্মুহ ব্যাপক শান্তিও বর্ষণ করুন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِسْمِ اللَّهِ দ্বারা কিতাব শুরু করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রাবলি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকে জানা যায় যে, তিনি নিজ জীবদ্দশায় দূরে-নিকটে, দেশে-বিদেশে দাওয়াত-তা'লীম ও রাষ্ট্রীয় ফরমান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে যত পত্র লেখেছেন এবং প্রেরণ করেছেন প্রত্যেকটা তিনি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। কয়েকটি পত্রে বিসমিল্লাহ-এর পরে হামদ এবং একটি কি দুটি পত্রে শাহাদতেরও উল্লেখ রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সালাফে সালাহীন তথা পূর্ববর্তী মনীষীদের সকলের নিয়ম ছিল, তারা গ্রন্থ রচনাকালে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতেন। অনুরূপ বিসমিল্লাহ-এর পরে হামদ, শাহাদাত, সালাত ও সালাম উল্লেখ করাও তাঁদের নিয়ম ছিল। তাই শরহ নুখবাতিল ফিকার গ্রন্থকার হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত অনুসরণ এবং ওলামায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তাঁর এই কিতাবও প্রথমে বিসমিল্লাহ পরে হামদ, শাহাদাত, নবীজির প্রতি সালাত, সালাম দ্বারা শুরু করেছেন। বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার দলিল হিসেবে হাদীসটি পেশ করা ঠিক নয়। কারণ, এ হাদীসটি বর্ণিত শব্দে সহীহ নয়। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) সহ অনেকে এ হাদীসের সনদকে মা'লুল ও ওয়াহী তথা অনির্ভরযোগ্য বলেছেন, যা হকুমের দিক থেকে মাওযু' ও জাল হাদীসের মতো। ইবনে হাজার (র.)-এর ভাষ্য নিম্নরূপ-

الرَّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظٍ : حَمِدَ اللَّهُ ، وَمَاعَدَا ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَرَدَتْ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ .

সূচনা সংক্রান্ত সহীহ ও মশহূর হাদীস হলো- হামদাল্লাহ শব্দের হাদীসটি । এ ছাড়া অন্যান্য শব্দের বর্ণনাগুলো 'ওয়াহী' সনদে বর্ণিত ।

-[ফাতহুল বারী ৮ : ২২০]

আর যে হাদীস মা'লুল বা ওয়াহী সনদে বর্ণিত হয় তা যে হকুমের দিক থেকে মাওযু' বা জাল হাদীসের মতো তা মুহাদ্দিস আহমদ ওমারী সাহেব الْحَدِيثُ الْبَسْمَلِيُّ مِنْ صَحَّحِ حَدِيثِ الْبَسْمَلِيِّ গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখ করেছেন-

إِنَّ الْمَوْضُوعَ وَالْوَاهِي فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْإِحْتِجَاجِ بِكُلِّ مَوْضِعٍ فِي قَضَائِلِ الْأَعْمَالِ ، كَمَا قُرِئَ .

দলিলের যোগ্য না হওয়ার দিক থেকে 'মাওযু' ও ওয়াহী হাদীস এক বরাবর! এমনকি ফাযায়েলে আমলের ব্যাপারেও এমন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

হামদ -এর দ্বারা সূচনা-সংক্রান্ত সবচেয়ে সহীহ ও আসল হাদীস হলো-

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَدِيثِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ.

আল্লাহর প্রশংসা না করে কোনো কাজ করলে তা বরকতশূন্য হবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান ১ : ১৭৩)

এ হাদীসটিই আবু দাউদ শরীফে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে-
كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَدِيثِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ

সূচনার ব্যাপারে কোনো হাদীসে 'বিসমিল্লাহ', আর কোনো হাদীসে 'হামদাল্লাহ', কোনো হাদীসে 'যিকরুল্লাহ' -এর উল্লেখ থাকলেও হাদীস মূলত একটিই। শব্দ বিভিন্ন মাত্র। শব্দের বিভিন্নতা দেখে তিনটি স্বতন্ত্র ও পৃথক হুকুম নির্দেশক হাদীস মনে করে তার উপর আমল করতে গিয়ে 'সূচনা তিন প্রকার, উদ্ভাবন করাটা উদ্ভট ও হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এক হাদীসকে তিন হাদীস মনে করা থেকেই এ ভুলের উৎপত্তি। হয়রত মাওলানা ইউসুফ বিনৌরী (র.) এ প্রসঙ্গে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) -এর সূত্রে বলেন-

حَدِيثُ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ ... اضْطَرَبَ لَفْظُهُ ، فَفِي لَفْظٍ بِحَدِيثِ اللَّهِ ، وَفِي لَفْظٍ بِبِسْمِ اللَّهِ ، وَفِي لَفْظٍ بِذِكْرِ اللَّهِ ...

وَالْجُمْلَةُ فَالْحَدِيثُ وَاحِدٌ ، وَلَفْظُهُ مُتَعَدَّدٌ ، وَتَوَهُمُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ تَعَدُّدَ الْحَدِيثِ لِاخْتِلَافِ لَفْظِهِ ، فَاضْطَرُّوا فِي جَمِيعِ الْعَمَلِ بِهِمَا ، فَاخْتَرَعُوا لِلْيَبْدَاءِ أَنْسَاءً مِنَ الْحَقِيقَتِي وَالْعَرَفِي وَالْإِضَافِي ، فَحَمَلُوا بَعْضَ الْأَلْفَاظِ عَلَى الْحَقِيقَتِي ، وَابْتَعْضَ عَلَى الْإِضَافِي ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَكُلُّ ذَلِكَ تَكَلُّفٌ وَتَنْطَعٌ وَغَفْلَةٌ عَنِ الْفَنِّ وَقَوَائِدِهِ ، وَمَذَارُ تَحْقِيقِهِمْ وَعَنَائِهِمْ عَلَى ظَنِّهِمْ تَعَدُّدُ الْأَحَادِيثِ ، وَلَمْ يَذَرُوا أَنَّ الْحَدِيثَ وَاحِدٌ ، وَأَنَّ الْإِخْتِلَافَ فِي اللَّفْظِ ، أَفَادَهُ تَبَيُّعُنَا إِمَامَ الْعَصْرِ أَنْتَوَزَ شَاءَ الْكَثْمِيرِيُّ .

... হাদীসের শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।।-যেমন- হামদুল্লাহ, বিসমিল্লাহ, যিকরুল্লাহ।

তবে সারকথা হলো, হাদীস একটিই- শব্দ বিভিন্ন। অনেক লেখক শব্দের বিভিন্নতা দেখে একাধিক হাদীস বলে মনে করেছেন। যার ফলে তারা আমলী ক্ষেত্রে এসে চরম বিপাকে পড়েছেন। এ বিপাক থেকে উদ্ধার পেতে 'তিন প্রকার গুরু' উদ্ভাবন করেছেন। হাকীকী, উরফী ও ইযাফী। অতঃপর কোনো শব্দকে প্রয়োগ করেছেন হাকীকী হিসেবে, কোনোটি ইযাফী হিসেবে।

এসব কিছুই বানোয়াট, কৃত্রিমতা এবং উসূলুল হাদীস সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচায়ক ও ফল। একাধিক হাদীস মনে করার কারণেই তাদের এ অবস্থা হয়েছে। তারা জানে না যে, হাদীস মূলত একটিই- শব্দের বিভিন্নতা মাত্র। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) এমনই বলেছেন। -[মা'আরিফুস সুন্না ১ : ২-৩]

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ فِيهِ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

হাদীসের উপর আমল বলাটা ভুল। কেননা, এখানে খুতবা দ্বারা উদ্দেশ্য মৌখিক খুতবা, যা খতীব সাহেব জুমা, ঈদ প্রভৃতি দিনে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে দান করেন। এ খুতবার দ্বারা কিতাবের খুতবা উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য শায়খ আব্দুল ফাতাহ আবু শুদাহ (র.) লিখিত خُطْبَةُ الْعَاجَةِ لَيْسَتْ سُنَّةٌ فِي مُسْتَهْلِكِ الْكُتُبِ وَالْمَوْثِقَاتِ গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

بِسْمِ اللَّهِ পুনর্বীর উল্লেখ প্রসঙ্গ : এ কিতাবের কয়েকটি প্রতিলিপি (নোসখা) আছে। কিছু প্রতিলিপিতে بِسْمِ اللَّهِ দুবার লিখিত আছে আর কিছু প্রতিলিপিতে একবার আছে। যেসব প্রতিলিপিতে بِسْمِ اللَّهِ দুবার আছে তার প্রথমটি হলো -এর বিসমিল্লাহ আর দ্বিতীয়টি مَتَنٌ তথা نَجْمَةٌ -এর বিসমিল্লাহ। এর বিপরীত যেসব প্রতিলিপিতে মাত্র একবার বিসমিল্লাহ আছে তা কেবল مَتَنٌ -এর বিসমিল্লাহ। তবে এ মতনের বিসমিল্লাহটি কোনো কোনো প্রতিলিপিতে لِلَّهِ -এর

পূর্বে আছে আর কোনো কোনো প্রতিলিপিতে ... قَالَ أَبُو الْفَضْلِ -এর পূর্বে আছে। যেহেতু مَتْنٌ ও شَرْحٌ মিলে দু' গ্রন্থ এক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে, তাই দ্বিতীয়বার بِسْمِ اللَّهِ উল্লেখ করা হয়নি। ঠিক এই একই কারণে কেবলমাত্র مَتْنٌ -এর শুরুতে হামদ, শাহাদাত, সালাত, সালাম উল্লিখিত হয়েছে; শَرْح -এর শুরুতে এসব উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, مَتْنٌ ও شَرْح -এর লেখক একজনই। তাই লেখক দু' কিতাবকে এক কিতাব মনে করে শَرْح লেখার সময় পুনর্বার হামদ, শাহাদাত ইত্যাদি উল্লেখ না করে কেবল বিসমিল্লাহ দ্বারা শরাহ লেখা শুরু করেছেন।

আল্লাহর সিফাতে কামালিয়া : আল্লাহর সিফাতে কামালিয়া ৭ টি। মুসান্নিফ (র.) এখানে আল্লাহর প্রশংসায় ৫ টি সিফাত উল্লেখ করেছেন। الْمُرِيدُ এবং الْمَتَكَلِّمُ উল্লেখ করেননি। কেননা, আল্লাহর সিফাত তাওকীফী হয় অর্থাৎ কেবল নসের মাধ্যমে তা জানা যায়। যেহেতু الْمُرِيدُ ও الْمَتَكَلِّمُ সিফাত দুটি আল্লাহর সিফাতে কামালিয়া হওয়ার উপর নস মিলে না, তাই লেখক এ দুটি উল্লেখ করেননি। সিফাতে কামালিয়াগুলো হলো- ১. عَلِيمٌ ২. قَدِيرٌ ৩. سَمِيعٌ ৪. مَبْصِرٌ ৫. مُزِيدٌ ৬. مُنْكَكِمٌ ৭. مُتَكَلِّمٌ।

كَأَنَّهُ -এর উদ্দেশ্য ও তারকীব : كَأَنَّهُ শব্দটির তারকীব তিন ধরনের হতে পারে। যথা-

১. النَّاسُ শব্দের হাল। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ যাকে গোটা মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন।
২. أَرْسَلَهُ جَامِعًا لَهُمْ فِي যমীর থেকে হাল। তখন অর্থ হবে- أَرْسَلَهُ جَامِعًا لَهُمْ فِي অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে মানব জাতির প্রতি সর্বোচ্চ প্রচারক-প্রসারক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অবশ্য এ সময় كَأَنَّهُ -এর; বর্ণটি مَبْلَغٌ -এর জন্য হবে।
৩. أَرْسَلَهُ إِلَى مَفْعُولٍ مَطْلُوقٍ -এর সিফাত হবে। তখন মূল ইবারত হবে এমন إِلَى النَّاسِ أَرْسَالَ كَأَنَّهُ أَيْ عَامَّةً لَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে মানব জাতির প্রতি ব্যাপকভাবে প্রেরণ করেছেন। এ স্থলে كَأَنَّهُ শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং প্রকাশ্য।

أَلٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : أَلٍ অর্থ পরিবার-পরিজন। তবে এখানে أَلٍ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে ৫ টি মায়হাব রয়েছে। যথা-

১. أَلٍ দ্বারা শুধু বনু হাশেম উদ্দেশ্য। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত।
২. أَلٍ দ্বারা বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিব উদ্দেশ্য। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত।
৩. أَلٍ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল অনুসারী উদ্দেশ্য। যেমন, এক হাদীসে এসেছে- أَلِ الْمُعْتَدِ كُلِّ -প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তিই মুহাম্মদের পরিজনভূক্ত"।

৪. أَلٍ -এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্তান, স্ত্রী এবং জামাতা উদ্দেশ্য। তবে কেউ কেউ তাঁর খাদেমদেরও এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন।

৫. أَلٍ দ্বারা أَمَلٌ بَيْنَتْ তথা হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.) উদ্দেশ্য।

سَلَّمَ -এর অর্থ : سَلَّمَ শব্দটি যদি مِنَ الْآفَةِ থেকে উৎসারিত হয়, যার অর্থ হলো, বিপদ থেকে মুক্ত থাকা, তখন ভাষাটির অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাবতীয় অকল্যাণ ও বিপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। আর যদি سَلَّمَ بِأَلَمٍ থেকে উৎসারিত হয়, যার শাব্দিক অর্থ- সন্তুষ্ট হওয়া, তখন ভাষ্যের অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ও রাজি হন।

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي إِصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ لِلْإِكْمَةِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ الْفَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّامُزْمُذِيُّ كِتَابَهُ الْمَحَدَّثُ الْفَاصِلُ لِكَيْتَهُ لَمْ يَسْتَوْعِبِ وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّيْسَابُورِيُّ لِكَيْتَهُ لَمْ يَهْدَبْ وَلَمْ يَرْتَبْ وَتَلَاهُ أَبُو نَعِيمٍ الْإِصْفَهَانِيُّ فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ مُسْتَخَرَجًا وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ .

অনুবাদ : হামদ ও সালাতের পর- হাদীসশাস্ত্রবিদদের পরিভাষা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসীনে কেরামের প্রচুর রচনা রয়েছে। এ বিষয়ে (হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষা সম্পর্কে) সর্বপ্রথম রচনাকারীদের একজন কাজি আবু মুহাম্মদ রামাহুরমুযী (র.)। 'আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল' নামে তিনি তার কিতাবটি রচনা করেছেন, তবে কিতাবটি (এ শাস্ত্রের সকল বিষয়) শামিল করেনি। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.)-ও (এ বিষয়ে) গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থটি পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত করেননি। এরপর আবু নুআইম ইস্পাহানী (র.) (এ শাস্ত্র রচনায়) হাকিমের অনুসরণ করেছেন। তিনি হাকিমের কিতাবের উপর (শেষে) (হাকিমের ছুটে যাওয়া বিষয় নিয়ে) একটি পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। তারপরেও তিনি পরবর্তীদের (লেখার) জন্য কিছু আলোচনা ও বিষয় রেখে গেছেন। (অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্র পূর্ণরূপে লেখে যেতে পারেননি।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِصْطِلَاحُ أَهْلِ الْحَدِيثِ : আহলে হাদীস দ্বারা কোনো সুনির্দিষ্ট ফিক্‌হী মাসলাক ও আকিদার অনুসারীগণ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাদ্দিসীনে কেরাম, যারা হাদীস চর্চা, মুখস্থ, সংরক্ষণ, সংকলন-রচনা, রাবীদের অবস্থা যাচাই ইত্যাদি হাদীস-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিপ্ত ও নিয়োজিত থাকেন। আর তাঁদের পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীস-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিভাষা। অতএব, **أَهْلُ حَدِيثٍ** -এর পরিভাষা মানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা। আর বলা বাহুল্য যে, সেটাই হলো উসুলুল হাদীস। অতএব, **إِنَّ التَّصَانِيفَ فِي إِصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ** -এর অর্থ করা যায়- উসুলুল হাদীস সংক্রান্ত রচনাবলি।

فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ : প্রথম দিকের রচয়িতা বলতে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কাজি আবু মুহাম্মদ রামাহুরমুযী (র.) উসুলুল হাদীসশাস্ত্রের সর্বপ্রথম জন্মদাতা; বরং আসল কথা হলো, উসুলুল হাদীসশাস্ত্রের জন্ম বহু আগেই হয়েছিল এবং বিক্ষিপ্তভাবে হাদীসগ্রন্থের শুরু বা শেষে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর আইম্যয়ে কেরাম তার আলোচনাও করে গেছেন। যেমন- ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম তিরমিযী (র.) প্রমুখ। তবে এটা ঠিক যে, স্বতন্ত্র শাস্ত্র এবং এ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে আবু মুহাম্মদ রামাহুরমুযী (রহ.) -এর কিতাব অবশ্যই প্রথম দিকের কিতাব।

الْفَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّامُزْمُذِيُّ : ইনি উসুলুল হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর মতে তিনি সর্বপ্রথম এ শাস্ত্র রচয়িতাদের একজন। শ্রদ্ধেয় এ মুহাদ্দিস সাহেবের পূর্ণ নাম- হাসান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে খান্নাদ (র.)। তাঁর কুনিয়াত আবু মুহাম্মদ। রামাহুরমুযী তাঁর স্থানবাচক নাম। ইরানের খুযিস্তান প্রদেশবর্তী একটি শহরের নাম রামাহুরমুয। তিনি ২৬৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৩৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ الْمَحَدَّثُ الْفَاصِلُ : -এর **مُفْعُولٌ** হওয়ায় মানস্ব বা যবরযুক্ত। এ বাক্যটি মূলত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো, কাজি সাহেব কোন কিতাব রচনা করেছেন? তার জবাবস্বরূপ মুসান্নিফ (র.) বলেছেন- **صَنَّفَ كِتَابَهُ الْمَحَدَّثُ الْفَاصِلُ**। এটা কাজি সাহেবের লিখিত কিতাবের নাম। তবে এ নামটি পূর্ণ নয়। পূর্ণ নাম হলো- **الْمَحَدَّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّأْيِ وَالْوَأْيِ**

لِكَيْتَ تَمَّ يَسْتَوْفٍ : এটি কাজি সাহেবের কিতাব সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য ও মতামত। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, যদিও কাজি সাহেবের গ্রন্থটি প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, কিন্তু তারপরেও গ্রন্থটি অপূর্ণ; এতে উসূল হাদীসের সমস্ত দিক ও বিষয় আলোচিত হয়নি।

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّيْسَابُرِيُّ : তিনি হাফিজে হাদীস এবং তৎকালীন যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ। তিনি ৩২১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'মুস্তাদরাকে হাকিম' হাদীসগ্রন্থটি। তিনি উসূল হাদীসের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে এখানে বলা হয়েছে তার নাম হলো مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ । এ কিতাবে তিনি উসূল হাদীসের ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

التَّيْسَابُرِيُّ : শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আন-নায়সাবুরী। এটি একটি স্থানের নাম, যা বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত। এটি হাকিম সাহেবের স্থানবাচক নাম। বাংলায় এ স্থানটি 'নিশাপুর' নামে পরিচিত।

لَمْ يَهَيِّبْ وَلَمْ يَرْتَبْ : এটি হাকিম সাহেবের রচিত কিতাব সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর মন্তব্য ও মূল্যায়ন। তিনি এখানে বলেছেন, হাকিমের কিতাবটি অবিন্যস্ত, যথাযথভাবে সাজানো নয়।

وَتَلَا : এখানে, যমীরটি مَضِيْر مَنْصُوب -এর مَرْجِع হলো হাকিম আবু আব্দুল্লাহ (র)।

تَلَا -এর অর্থ হলো تَبَعَ বা অনুসরণ-অনুগমন করা।

أَبُو نَعِيمٍ الْأَصْهَانِيُّ : তাঁর পূর্ণ নাম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ। কুনিয়াত আবু নুআইম। তিনি ৩৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৩০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। অনেক কিতাব তিনি রচনা করেছেন। উসূল হাদীস সম্পর্কে লিখিত তাঁর কিতাবটির নাম مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ ।

الْأَصْهَانِيُّ : শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আল-আসফাহানী। এটি ইরানের একটি প্রসিদ্ধ ও বড় শহর। বাংলায় শব্দটি 'ইস্পাহানী' পড়া হয়।

تَفْصِيلِيَّةٌ : এখানে تِلَا টি فَاءُ লেখক এখান থেকে -এর বিবরণ দিচ্ছেন। এটা উহা প্রশ্নের উত্তরও হতে পারে। প্রশ্ন হলো, আবু নুআইম কিতাবে হাকিম সাহেবের অনুসরণ করলেন? লেখক فَعَمِلَ বলে তার জবাব দিচ্ছেন যে, আবু নুআইম হাকিম সাহেবের কিতাবের উপরে রচনা করেছেন একটি পরিশিষ্ট।

عَمِلَ : শব্দটি এখানে صَنَفَ -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ- রচনা করা।

مُسْتَفْرَجًا : শব্দটি مَفْعُول -এর সীগাহ হতে পারে আবার فَاعِل -এর সীগাহও হতে পারে। صَنَفَ مُسْتَفْرَجًا عَلَى كِتَابِهِ أَنَّى مُسْتَدْرِكًا -অর্থাৎ আবু নুআইম তাঁর কিতাবের উপর (শেষে) একটি পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। আর فَعَمِلَ হলে তখন ইবারত হবে- صَنَفَ كِتَابًا زَائِدًا عَلَى كِتَابِ الْحَاكِمِ مَا فَاتَهُ তিনি হাকিমের কিতাবের উপর তাঁর ছুটে যাওয়া বিষয়কে নিয়ে একটি অতিরিক্ত গ্রন্থ রচনা (সংযোজন) করেছেন।

إِسْتِغْنَاءٌ : থেকে ব্যবহৃত। ইস্তিগ্না' বলা হয়- কোনো গ্রন্থে এমন বিষয় বৃদ্ধি করে সংযোজন করা যা সে গ্রন্থ হতে বাদ পড়েছে কিংবা নেই।

وَأَيْقَى أَشْبَاءَ : আবু নুআইমের পরিশিষ্ট সম্পর্কে এটা লেখকের মতামত। লেখক এখানে বলেছেন, مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ -এ যা কিছু বাদ গিয়েছিল এখানে তা সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও কিছু বিষয় পরবর্তীদের জন্য বাকি থেকে গিয়েছে।

الْمُتَخَلِّفُ : শব্দটি مَفْعُول -এর সীগাহ। অর্থ-মুতখলিফ বা পরবর্তী।

ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ فَصَنَّفَ فِي قَوَائِنِ الرِّوَايَةِ كِتَابًا سَمَّاهُ الْكِفَايَةَ وَفِي آدَابِهَا كِتَابًا سَمَّاهُ الْجَامِعُ لِآدَابِ الشَّيْخِ وَالسَّامِعِ وَقُلَّ فَنَّ مِنْ فُنُونِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا مُفْرَدًا وَكَانَ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نُقْطَةَ كُلِّ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمْ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنِ الْخَطِيبِ فَأَخَذَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ بِنَصِيبٍ فَجَمَعَ الْقَاضِي عِيَّاصُ كِتَابًا لَطِيفًا سَمَّاهُ الْإِتْمَاعُ وَأَبُو حَفْصٍ الْمَبَانِجِيُّ جُزْءًا سَمَّاهُ مَا لَا يَسْعُ الْمُحَدِّثُ جَهْلَهُ.

অনুবাদ : অতঃপর তাঁদের পরে এলেন খতীব আবু বকর, বাগদাদী (র.)। (অর্থাৎ তাঁর যুগ এল।) তিনি হাদীস বর্ণনার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটির নাম রাখেন ‘আল-কিফায়া’। আর হাদীস বর্ণনার আদব ও শিষ্টাচার সম্পর্কে রচনা করেন আরেকটি গ্রন্থ। তিনি তার নাম রাখেন ‘আল-জামিউ লি-আদাবিশ শায়খ ওয়াস সামে’। হাদীসশাস্ত্রের প্রায় সকল বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফিজ আবু বকর ইবনে নুকতা (র.) (তাঁর সম্পর্কে) যথার্থই বলেছেন, নিরপেক্ষভাবে যে-ই বিচার করবে সে জানবে যে, খতীবের পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণ তাঁর কিতাবাদির পরিজন (পোষা)। উল্লিখিত মনীষীগণের পরে খতীবে বাগদাদীর পরবর্তী কতিপয় ওলামায়ে কেলাম এসেছেন এবং এ শাস্ত্রের (উলুমুল হাদীসের) এক একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন। (অর্থাৎ তাঁরাও এ শাস্ত্রের খিদমত করেছেন।) কাজি ইয়ায (এ প্রসঙ্গে) একটি চমৎকার স্পষ্টীকৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার নাম রাখেন ‘আল-ইলম’। আবু হাফস মাইয়ানিজী (র.) একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন—‘مَا لَا يَسْعُ الْمُحَدِّثُ جَهْلَهُ’।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ : তাঁর নাম আহমাদ ইবনে আলী। কুনিয়াত আবু বকর। লকব খতীব। স্থানবাচক নাম বাগদাদী। তিনি খতীবে বাগদাদী নামে অধিক পরিচিত। তাঁর দ্বারা যেমনি ওলামায়ে মুতাআখখিরীনের যুগ শেষ হয়েছে তেমনি ওলামায়ে মুতাকদ্বিমীনের যুগের সূচনা হয়েছে। তিনি যুগান্তকারী অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তারীখে বাগদাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি ৩৯২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৬৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

الْكِفَايَةُ : হাদীস রেওয়াজেত্তের বিধান-সংক্রান্ত এটি খতীবে বাগদাদীর একটি কিতাব। তবে এটি পূর্ণ নাম নয়। পূর্ণ নাম হলো—الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ অথবা الرِّوَايَةِ الْقَوَائِنُ। এটি এক খণ্ডবিশিষ্ট একটি চমৎকার কিতাব।

الْجَامِعُ لِآدَابِ : এটি খতীবে বাগদাদী (র.)-এর আরেকটি কিতাবের নাম। তবে পূর্ণ নাম এরূপ—الْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ। এটি দু খণ্ডবিশিষ্ট। এ গ্রন্থে ওস্তাদের হাদীস বর্ণনার আদব এবং ছাত্রের হাদীস গ্রহণের আদব বিবৃত হয়েছে।

التَّذَرُّؤُ ۱- : এখানে قُل শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা— ১- وَقُلَّ فَنَّ مِنْ فُنُونِ كِتَابًا مُفْرَدًا -এর অর্থ হবে— হাদীসে দুর্বল। ২- وَقُلَّ فَنَّ مِنْ فُنُونِ الْحَدِيثِ -এর অর্থ নেই। তখন الْغَفَى وَالْعَدَمُ ২- : অর্থ নেই...। আর ১। ইস্তিছনাটা হবে এই পূর্বোক্ত অর্থ হতে। তখন পূর্ব বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে—

أَيُّ لَا يُوجَدُ قُرْآنٌ مِّنْ قُرْآنٍ الْحَدِيثِ بِوَصْفٍ مِّنَ الْأَوْصَابِ إِلَّا حَالٌ كَوْنِهِ مُتَّصِفًا بِهَذَا الصِّفَةِ أَيْ بِأَنَّ
صَنَّفَ هُوَ يَنْوِي.

অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্রের এমন কোনো দিক নেই, যে দিক নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেননি অর্থাৎ হাদীসের সমস্ত বিষয়ে তিনি পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

تَابِرُ الْبُحْرَانِ: তাঁর পূর্ণ নাম- হাফিজ মুহাম্মদ আব্দুল গনী ইবনে শুজা আবু বকর ইবনে নুকতা। তিনি ৫৭৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৬২৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থের নাম-

التَّحْقِيقُ لِمَعْرِفَةِ رَوَاةِ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ

.....: ইবনে নুকতা (র.)-এর এ উক্তিটি আছে তাঁর পূর্ব বর্ণিত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠায়।

عَبَّالٌ عَلَى كُتُبِهِ: এ উক্তির মাধ্যমে ইবনে নুকতা (র.) উসূলুল হাদীসের উপরে খতীবে বাগদাদীর ব্যাপক খিদমতের চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। কেউ কারো ভরণ-পোষণের জিম্মাদারি পালন করলে যার জিম্মাদারি নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় ঐ ব্যক্তির عَبَّالٌ বা পোষ্য-পরিজন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাদ্য-পানীয়, খরচা পেয়ে উপকৃত হয় এবং এসব বিষয়ে আরেক জনের উপর নির্ভরশীল হয় সেই হলো عَبَّالٌ। যেহেতু খতীবে বাগদাদীর পরবর্তী মুহাদ্দিসীনে কেরাম উলমূল হাদীসের ব্যাপারে খতীবে বাগদাদীর রচিত কিতাবাদির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন এবং তারা খতীবের কিতাব হতে বিরাট অংশ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, তাই তাঁরা কেমন যেন খতীবে বাগদাদীর কিতাবসমূহের পোষ্য ও পরিজনভুক্ত হয়েছেন।

عَبَّاسُ: তাঁর পূর্ণ নাম- আল-ইমাম হাফিজ হুজ্জত ইয়ায ইবনে মূসা আল-ইয়াহুছুবী আস-সাবতী আল-মাগরিবী (র.)। তিনি সাবতা শহরে ৪৭৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৫৪৪ হিজরিতে মাররাফুশে ইন্তেকাল করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- مَسَارِقُ الْأَثَارِ عَلَى صَحَاحِ الْأَثَارِ

الْإِسْلَامُ: উসূলুল হাদীসের উপর লিখিত কাজি ইয়ায (র.)-এর কিতাবের নাম। তবে এটা অপূর্ণ নাম। পূর্ণ নাম হলো- الْإِسْلَامُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَصُولِ الرِّوَايَةِ وَتَقْيِيدِ السَّيَاحِ

أَبُو حَنْصَلٍ الْمَبَانِجِي: তাঁর নাম- ওমর ইবনে আব্দুল মাজীদ ইবনে হাসান (র.)। কুনিয়াত আবু হাফস। তিনি ৫৮১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

الْمَبَانِجِي: এর সঠিক শব্দ হলো الْمَبَانِجِي (আল-মাইয়ানিশী) مَبَانِش হলো আফ্রিকার একটি এলাকার নাম। তবে অনেক সময় শ অক্ষরকে ج দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, এখানেও এমনটি ঘটেছে। তবে সর্বাবস্থায় মীম অক্ষরের পরবর্তী ইয়া-বর্ণটি তাশদীদযুক্ত এবং নূন-বর্ণে যের হবে। প্রথম অক্ষর মীম যবরবিশিষ্ট হবে।

يَسَعُ الْبُحْرَانُ: এটি আবু হাফস মাইয়ানিশী (র.) লিখিত উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এখানে الْمَحَدَّثُ শব্দটি مَفْعُول হওয়ায় যবরবিশিষ্ট হবে আর جَهْلُهُ শব্দটি يَسَعُ -এর অর্থ- হওয়ায় পেশবিশিষ্ট হবে। يَسَعُ শব্দটি يَسَعُ বাবে يَسَعُ হতে ব্যবহৃত। এর অর্থ- প্রশস্ত হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া। তবে শব্দটির শুরুতে خَزَفَ দাখিল হলে তখন অর্থ দেয়- বৈধ নয়, সামর্থ্যের মধ্যে নয় ইত্যাদি। যেমন বলা হয়- لَا يَسَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا অর্থাৎ এটা করা তোমার জন্য বৈধ নয় বা সামর্থ্যের মধ্যে নয়। এ অর্থ হিসেবে يَسَعُ الْمَحَدَّثُ جَهْلُهُ -এর অর্থ হবে, যে বিষয়ের অজ্ঞতা একজন মুহাদ্দিসের জন্য বৈধ নয় বা শোভনীয় নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মুহাদ্দিসের জন্য যা জানা আবশ্যিক।

وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ التَّصَانِيفِ الَّتِي اِسْتَهْرَتْ وَبَسِطَتْ لِبَتَوَقُّرِ عِلْمِهَا
وَاخْتَصَرَتْ لِيَتَجَسَّرَ فَهْمُهَا، إِلَى أَنْ جَاءَ الْحَافِظُ الْفَقِيهَ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو
عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشَّهْرَزُورِيُّ نَزَلَ دِمَشْقَ، فَجَمَعَ
لَمَّا وَلَّى تَدْرِيسَ الْحَدِيثِ بِالْمَدْرَسَةِ الْأَشْرَفِيَّةِ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ، فَهَذَّبَهُ
فُنُونَهُ وَأَمْلَأَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، فَلِذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيبُهُ عَلَى الرُّضْعِ
الْمُنَاسِبِ، وَاعْتَنَى بِتَّصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُتَفَرِّقَةِ، فَجَمَعَ شَتَّى
مَقَاصِدِهَا، وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا تُحِبُّ فَوَائِدَهَا فَاجْتَمَعَ فِي كِتَابِهِ مَا
تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ، فَلِذَا عَكَّفَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَارُوا لِيُسْرِهِ، فَلَا يُحْصَى
كَمَ نَاطِمٍ لَهُ وَمُخْتَصِرٍ وَمُسْتَدْرِكٍ عَلَيْهِ وَمُقْتَصِرٍ وَمُعَارِضٍ لَهُ وَمُنْتَصِرٍ.

অনুবাদ : এ জাতীয় প্রসিদ্ধ রচনাবলির সংখ্যা অনেক। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির জন্য কিছু গ্রন্থ বিশদভাবে আর তা বুঝতে সহজের জন্য কিছু গ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে রচিত। বিশদ ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনার এ ধারা অব্যাহত থাকা অবস্থায় আগমন হয় হাফিজ ফকীহ তকীউদ্দীন আবু আমর ওসমান ইবনুস সালাহ আব্দুর রহমান শাহরযুরী দেমাকী (র.) -এর। মাদরাসায় আশরাফিয়াতে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হয়ে তিনি সংকলন করেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (মুকাদ্দামায় ইবনুস সালাহ)। তিনি এর বিষয়বস্তু পরিমার্জিত করলেও (দীর্ঘদিন ধরে) অল্প অল্প করে লেখানোর কারণে গ্রন্থটির বিন্যাস যথার্থরূপ লাভ করেনি। এতদ্ব্যতীত তিনি খতাবে বাগদাদীর বিক্ষিপ্ত রচনাবলি সামনে রেখে তার মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো সার-নির্যাস ও মৌলিক বিষয় জমা করেছেন এবং তার সাথে সংযোজন করেছেন অন্যান্য গ্রন্থ হতে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার ফলে অন্যান্য গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত আলোচনা তাঁর গ্রন্থে এক জায়গায় এসে গেছে। তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ গ্রন্থের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তা সহজ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর হিসাব নেই যে, কতজন তাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন, কতজন সারসংক্ষেপ লেখেছেন, কতজন সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন, কতজন সমালোচনামূলক গ্রন্থ লেখেছেন, কতজন তার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِسْتَهْرَتْ ذَلِكَ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ : এ বাক্যের عَطَف কার উপর হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে পূর্ববর্তী বাক্য "قَالَ التَّصَانِيفُ فِي إِصْلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَثُرَتْ" -এর অর্থের উপর عَطَف হয়েছে। তখন অর্থ হবে, اَلتَّصَانِيفُ الْكَثِيرَةُ مَا ذُكِرَ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ, অর্থাৎ উসুল হাদীস সংক্রান্ত অধিক রচনাবলি হলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ জাতীয় আরো যেসব গ্রন্থ আছে। আবার কারো মতে- اِسْتَهْرَتْ ... وَأَمْثَالُ ذَلِكَ বাক্যটি مَبْتَدَأ আর এর وَخَبَر উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اِسْتَهْرَتْ. তখন অর্থ হবে, এ জাতীয় প্রসিদ্ধ রচনাবলির সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ বলেছেন, এ ব্যাখ্যাটি যেমনি স্বচ্ছ তেমনি অধিক স্পষ্টও বটে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উল্লিখিত বাক্য مَعْفُوف -কে ফেলে দিয়ে عَطَف করা হয়েছে। যেমনটি ঘটেছে اَعْلَنَتْ نَبَأًا وَمَا بَارَدًا বাক্যের ক্ষেত্রে। তখন পূর্ণ বাক্যের অর্থ হবে- وَجَمَعَ أَمْثَالَهَا أَمْثَالُ ذَلِكَ - অর্থাৎ উসুল হাদীসের উপর রচিত কিতাবাদির সবই

পূর্বাঙ্ক কিতাবাদির মতো। মোটকথা হলো, উসূলুল হাদীসের উপর রচিত বহু গ্রন্থের কয়েকটির বিষয়গণ এখানে পেশ করা হলো। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত কিতাব এগুলোই; বরং এ ছাড়াও এ জাতীয় আরো অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে।

بَسَطَ : **بَسَطَ** শব্দটি মতনের শব্দ, যা আতফ হয়েছে পূর্ববর্তী মতনের শব্দ **قَدْ** **الْتَصَانِفُ** ফিরেছে **زَيْنَر** -এর উপর। **بَسَطَ** এটা **مَجْهُول** -এর সীগাহ। এর কারণ **بَسَطَ** বাক্যে বিবৃত হয়েছে যে, উসূলুল হাদীসের বিষয়বস্তু ও আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করতে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। কেননা, সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণ আলোচনায় যেমনি বিষয়বস্তু অস্পষ্ট থেকে যায় তেমনি সকল শ্রেণীর পক্ষে তা বুঝাও সম্ভব হয় না।

وَأَخْتَصَرَتْ : **وَأَخْتَصَرَتْ** শব্দটিও মতনের শব্দ। এটি **عَطَفَ** হয়েছে **بَسَطَ** -এর উপর। এটিও **مَجْهُول** -এর সীগাহ। অর্থ হলো, (কিছু গ্রন্থ) সংক্ষিপ্তাকারে রচিত। এর কারণ **بَسَطَ** বাক্যে বিবৃত হয়েছে যে, অল্প বাক্যে শাস্ত্র বুঝতে যেমনি সহজ, তেমনি আয়ত্ত করতেও বেগ পেতে হয় না। কেননা, আলোচনা দীর্ঘ হলে যেমন তাতে মন বসে না তেমনি সারকথাও অনেক সময় বের করে সংরক্ষণ করা যায় না।

بَقِيَ -এর সাথে। আসল ইবারত এরূপ- **إِلَى أَنْ جَاءَ** : **إِلَى أَنْ جَاءَ** অর্থঃ উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত বিশদ ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত থাকা অবস্থায় তিনি আসেন।

تَمَيَّزَ الدِّينَ أَبُو عَمْرٍو عَنْمَانَ بْنِ الصَّلَاحِ : ইবনুস সালাহ (র.) -এর পূর্ণ নাম হলো, শাইখুল ইসলাম উসমান ইবনু সালাহুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান আন-নাসরী আল-কুদী। বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত মুসেল এবং হামদান শহরের মধ্যবর্তী শহর শাহরযুরী-তে তিনি জনগ্রহণ করায় তাঁকে শাহরযুরীও বলা হয়। তবে ইবনুস সালাহ নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি শাফেয়ী মায়হাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ৫৭ হিজরিতে জনগ্রহণ এবং ৬৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তৎকালীন যুগের অন্যতম আলিম ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং রাবীচরিত-এর উপর তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও রচনা।

الشَّهْرُورِيُّ نَزَلَ دِمَشْقَ : এ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ শাহরযুরী। এটা **عَنْكَبُوت** (আনকাবূত) -এর ওয়ানে এসেছে। এটি একটি শহরের নাম, যা বর্তমান ইরাকে অবস্থিত।

نَزَلَ دِمَشْقَ -এর অর্থ দামেস্কে অবস্থানকারী। ইবনুস সালাহ (র.) -এর জনস্থান শাহরযুরী হলেও পরবর্তীতে তিনি বসবাস করেন দামেস্কে এসে। এজন্য তাঁকে নাযীলে দিমাক বা দামেস্কে অবস্থানকারী বলা হয়। **دِمَشْقَ** শব্দটির আরবি উচ্চারণ দিমাক। 'দাল' বর্ণে যেরযোগে। তবে বাংলায় তার রূপান্তর ঘটেছে দামেস্ক হিসেবে।

لَمَّا وَلَّى تَدْرِيْسَ الْحَدِيثِ بِالدَّرْسَةِ الْأَشْرَفِيَّةِ : মাদরাসায়ে আশরাফিয়া দামেস্কে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাতার নামে এ মাদরাসার নামকরণ হয়। এখানে হাদীসের পঠন-পাঠন হতো। মাদরাসাটি প্রথমে আমীর সারিমুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির বাড়ি ছিল। মালিকুল আশরাফ মুজাফফর উদ্দীন মুসা ইবনুল আদিল এ বাড়িটি ক্রয় করে তাকে দারুল হাদীস বানান এবং বাড়িটি মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দেন। তিনি ইমাম ইবনুস সালাহ (র.) -কে এ দারুল হাদীসের 'শাইখুল হাদীস' পদে নিয়োগ দেন। তিনিই হন এ মাদরাসার সর্বপ্রথম শাইখুল হাদীস। মাদরাসাটির গোড়াপত্তন হয় ৬৩০ হিজরির ১৪ ই শাবান দিবাগত রাতে।

بَابُ اِتِّحَادٍ এটা থেকে আগত। এর অর্থ- শ্রুত বিষয় লেখা। ওস্তাদ ক্লাসে কোনো আলোচনা ছাত্রদের যদি লিখিয়ে দেন, তাহলে এটাকে বলে اِتِّحَادٌ বা শ্রুতিলিখন। আর এ পদ্ধতিতে যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাকে বলে اِمَالِي তথা শ্রুতলিখনের দ্বারা লিপিবদ্ধ বিষয়াদি।

ইমাম ইবনুস সালাহ (র.) মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে হাদীসের দরস দানকালে তাঁর ছাত্রদেরকে এই اِتِّحَادٌ করান। এ শ্রুতলিখন প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকে। ৬৩০ হিজরির রমজান মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার এই اِتِّحَادٌ শুরু হয় এবং তা সম্পন্ন হয় ৬৩৪ হিজরির মহররাম মাসের শেষ শুক্রবারে। মোট ৩ বছর ৪ মাস ১৩ দিন এ কাজে ব্যয় হয়। তবে اِتِّحَادٌ -এর কাজেই কেবল এই দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়নি; বরং اِتِّحَادٌ -এর কাজটি চলে হাদীসের দরস দানের মাঝে মাঝে প্রয়োজন অনুপাতে। ইবনুস সালাহ (র.) মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে 'আস সুনানুল কুবরা' হাদীস শরীফের দরস দিতেন। এই দরস দিতে গিয়ে হাদীস ও উলূমুল হাদীসশাস্ত্রের প্রয়োজনে তিনি হাদীসের দরস দানের পাশাপাশি অল্প অল্প করে ছাত্রদেরকে উলূমুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি লিখিয়ে দিতেন। এভাবে ধীরে ধীরে যে গ্রন্থটি সংকলিত হয়, তা পরবর্তীতে 'মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

كَمْ يَخْصُلُ تَرْبِيَّتُهُ عَلَى الرُّوْضِ الْمُنَاسِبِ : একে তো দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প করে লেখানো তদুপরি একজন লেখক লেখা শুরু করার প্রাক্কালে নির্বাচিত বিষয় ও তার বিন্যাস নিয়ে যেমনিভাবে চিন্তা করেন, পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সেভাবে পূর্বপরিকল্পনা এবং স্থির চিন্তার সমন্বয় না ঘটায় বিষয়বস্তুর সমূহ স্ব-স্ব স্থানে পূর্ণাঙ্গ ও পরিমার্জিত হলেও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিক বিচারে গ্রন্থবিন্যাস যেভাবে হওয়ার দাবি রাখে তেমনটি হয়নি।

'هَآ' -فَوَائِدِهَآ- নির্বাচিত, চয়িত। 'نُعَبِّ' -نُعَبِّ- শব্দটি 'نُعَبِّ' -এর বহুবচন। অর্থ- নির্বাচিত, চয়িত। 'هَآ' -فَوَائِدِهَآ- যমীরটি কোন দিকে ফিরেছে তা নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। যথা-

১. পূর্ববর্তী غَيْر শব্দের দিকে। অবশ্য তখন জীবচাক সর্বনাম উল্লেখের ব্যাখ্যা এই হবে যে, এর (غَيْر) দ্বারা উদ্দেশ্য اَلتَّحْصِيْنُ اَلْبَاقِيَةُ অর্থাৎ অন্যান্য রচনাবলি। আর যেহেতু এটা বহুবচন যা مُؤَنَّثٌ -এর হুকুমের তাই জীবচাক সর্বনাম আনা হয়েছে।

২. অথবা, সর্বনামটি জীবচাক আনা হয়েছে غَيْر -এর مُضَافِ اِلَيْهِ -এর দিকে লক্ষ্য করে। আর এভাবে مُضَافِ اِلَيْهِ -এর اِغْتِبَازُ করে জীবচাক শব্দের ব্যবহার করার নজিরও রয়েছে। যেমন জনৈক কবির উক্তি- وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي অর্থাৎ "বস্তুত দেয়ালের মোহ আমার অন্তরকে বিগলিত ও বিচলিত করেনি।" এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, شَغَفَنَ ফেলটি জীবচাক। অথচ নিয়ম অনুযায়ী তার فَاعِلُ যেহেতু حُبُّ শব্দ, তাই পুরুষবাচক হওয়ায় জীবচাক فِعْلُ -এর পরিবর্তে পুরুষবাচক সীগাহ ব্যবহৃত হতে হতো; কিন্তু এখানে فِعْلُ টি مُؤَنَّثٌ হয়েছে কেবল مُضَافِ اِلَيْهِ -এর দিকে লক্ষ্য করে। আর তা হলো الدِّيَارُ ঠিক এমনিভাবে فَوَائِدِهَآ -এর ضَمِيرِ টি غَيْر -এর দিকে ফিরলেও غَيْر -এর مُضَافِ اِلَيْهِ "هَآ" জীবচাক হওয়ায় এখানে ضَمِيرِ জীবচাক আনা হয়েছে।

৩. অথবা, ضَمِيرِ টি ফিরেছে فُتُوْنُ الْحَدِيثِ -এর দিকে। আর এ শব্দটি পূর্বে শাস্ত্রিকভাবে উল্লেখ না থাকলেও আলোচনা হাদীসকেন্দ্রিক হওয়ায় তা হুকুমীভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর ضَمِيرِ -এর مُرْجِع -এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

৪. এ দূরবর্তী সম্ভাবনাও রয়েছে যে, **تَصَانِيفُ الْغَطِيبِ** টি ফিরেছে **تَصَانِيفُ الْغَطِيبِ**-এর দিকে। অবশ্য তখন **فَوَائِدُهَا**-এর অর্থ দাঁড়াবে-**الْمَتَعَلِّقَةُ بِتَصَانِيفِ الْغَطِيبِ** অর্থাৎ খতীবে বাগদাদীর রচনাবলি সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত ফায়েরদাসমূহ।

وَسَارُوا الْبِسْرَ : **سَارُوا**-এর অর্থ **سَلَكُوا** অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনে কেরাম চলেছেন। অধিকাংশ কপিতে **سِير** থাকলেও কোনো কোনো কপিতে শব্দটি **سِير**ও আছে। **سِير**-এর অর্থ **مَسَلَك** তথা পথ। অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইবনুস সালাহ (র.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পথ ধরে চলেছেন। আর **يُسِرُّ**-এর অর্থ **سَهْل** বা সহজ। তখন অর্থ হবে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম গ্রন্থটি সহজ থেকে সহজ করতে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

فَلَا يُعْصَى : মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ-এর প্রতি মুহাদ্দিসীনে কেরামের খুঁকা এবং এ কিতাবের খিদমতে ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আলোচ্য অংশে।

كَمْ نَاطِمٍ لَهُ : কেউ কেউ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে কাব্যিকরূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ কবিতার মতো ছন্দবদ্ধ বাক্যে উপস্থাপন করেছেন। এ পর্যায়ে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল সনআনী (র.) (মৃত্যু ১১৮২ হি.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি **قَصَبُ السَّكْرِ فِي نَظْمِ تَجْبَةِ الْفِكْرِ** নামে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ-এর কাব্যিকরূপ দান করেন।

وَمُخْتَصَرٌ বা সংক্ষেপ বলা হয় অল্প শব্দে পুরো উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ব্যক্ত করা। এ পর্যায়ে ইমাম নববী (র.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি **إِرْشَادُ طُلَّابِ الْحَقَائِقِ إِلَى مَعْرِفَةِ سُنَنِ خَبَرٍ** নামে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ-এর বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করেন।

وَمُسْتَذْرَكٌ বলা হয় পরিশিষ্ট রচনা করা, ছুটে যাওয়া আলোচনা সংযুক্ত করা। অনেক মুহাদ্দিস মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ-এর উপর এ জাতীয় খিদমত আঞ্জাম দেন। **النَّكَتُ عَلَى كِتَابِ** **إِنَّ الصَّلَاحَ** এ ধরনেরই একটি কিতাব।

وَمُفْتَصِّرٌ অর্থ- ছেটে ফেলা, বাদ দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য হলো, মূল বিষয় বাকি রেখে অগ্রাসঙ্গিক আলোচনা বাদ দেওয়া। অনেকে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ-এর উপর এ সংস্কারমুখী পদক্ষেপও নিয়েছেন।

وَمُعَارِضٌ : এর অর্থ হলো- মোকাবিলায় নামা। আর এটা দুভাবে হয়েছে। যথা- ১. এ ধরনের কিতাব রচনা করে। ২. এ কিতাবের শব্দ, অর্থ এবং অধ্যায়ের বিন্যাসের ব্যাপারে সমালোচনা করে, অভিযোগ আরোপ করে।

وَمُنْتَصِرٌ অর্থ- সাহায্য করা। অনেক মুহাদ্দিস মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ-এর সাহায্যে কলম ধরেছেন। তারা এ পর্যায়ে এ কিতাবের উপর আগত অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। কিতাবের দুর্বোধাতা, অস্পষ্টতা দূরীভূত করেছেন। কিতাবটি অধ্যায় আকারে সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে হাফিজ আল্লামা আলাউদ্দিন মোগলতাই হানাতী (মৃত্যু ৭৬২ হি.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি **إِصْلَاحُ كِتَابِ إِبْنِ الصَّلَاحِ** নামে এ জাতীয় একটি কিতাব রচনা করেন। তবে তিনি গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে পারেননি।

فَسَأَلْنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أَلْخِصَ لَهُ الْمِثْمَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَخَّصْتُهُ فِي
أَوْرَاقٍ لَطِيفَةٍ سَمَّيْتُهَا نُحْبَةُ الْفِكْرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ عَلَى تَرْتِيبٍ
إِسْتَكْرَرْتُهُ وَسَبِيلٍ أَنْتَهَجْتُهُ مَعَ مَا صَنَمْتُ إِلَيْهِ مِنْ ثَوَارِدِ الْفَرَائِدِ وَ
زَوَائِدِ الْفَوَائِدِ .

অনুবাদ : এ কারণে এক ভাই আমাকে উসূল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো
সংক্ষেপে লেখার অনুরোধ করেন। আমি কয়েক পৃষ্ঠায় নয়া আসিকি এবং অভিনব পন্থায় সারসংক্ষেপ
লেখে তার নাম দেই 'নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহি আহলিল আছার'। তবে এর সাথে ছুটে যাওয়া
মোতিতুল্য অনেক তত্ত্ব ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি সংযোজন করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَيُسْطُتُ ... وَاخْتَصِرْتُ -এর সাথে। এখানে
فَسَأَلْنِي বা কারণ দর্শানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর জৈনেক
বন্ধু তাকে 'সারকথা' লেখার জন্য আবেদন করার কারণ হলো, যেহেতু উসূল হাদীস সংক্রান্ত
গ্রন্থাবলি কোনোটি বিস্তারিত আর কোনোটি সংক্ষিপ্ত এবং তার মধ্যে মধ্যম ধরনের ও 'সারকথা'
জাতীয় কোনো গ্রন্থ ছিল না, তাই এক সুহদ বন্ধু তাকে এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করেন।
ইমাম সাখাবী (র.) বলেন, এখানে ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে
মুহাম্মদ আয-যারকাশী (র.)। তিনি ৮১৩ হিজরিতে ইস্তেকাল করেন।

(الْمُصَوِّرُ اللَّامِعُ لِأَعْيَانِ الْقُرْنِ النَّاسِ ٩ : ٢٠٩)

তবে কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ভাই বলতে উদ্দেশ্য হলো হযরত ইয়যুদ্দীন ইবনে জামাআহ (র.)।

أَنْ أَلْخِصَ لَهُمُ الْكِتَابَ : কয়েকটি প্রতিলিপিতে : لَهُ الْمِثْمَ مِنْ ذَلِكَ : থাকলেও সহীহ বা সঠিক ইবারত হলো أَنْ
بَعْضُ الْإِخْوَانِ : এর প্রমাণ ১. দ্বারা উদ্দেশ্য এক ব্যক্তি অর্থাৎ শায়খ যারকাশী (র.)। ২.
পরবর্তী মতনে রয়েছে إِلَى سَوَالِهِ : আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উভয় স্থানে (হা)
যমীর দ্বারা উদ্দেশ্য অনুরোধকারী ভাই অর্থাৎ শায়খ যারকাশী (র.)।

إِسْمُ نَاعِلٍ الْمِثْمِ -এর সীগাহ। এর অর্থ- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে বলতে উদ্দেশ্য এ
সকল বিষয় যা একজন মানুষকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করে।

مُسَارَاتِلَتِهِ : এখানে ذَلِكَ : এর অর্থ- মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ' গ্রন্থটি নিরূপণ করা ভুল; বরং এর
التَّصَانِيفُ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْعِدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ وَ : হলো মতনের প্রথম ইবারত :
مُسَارَاتِلَتِهِ : সংক্ষেপে বলা যায়, উসূল হাদীসের مُصْطَلَحِ বা পরিভাষাগুলো।

تَلَخَّصْتُ : فَلَخَّصْتُ فِي أَوْرَاقٍ لَطِيفَةٍ -এর অর্থ- খোলাসা বা সারকথা বের করা। আর
مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْعِدِيثِ হলো তথ্য এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী রচিত কিতাবাদি।

وَرَدَّ -এর অর্থ হলো أَوْرَأَى। এর অর্থ- পৃষ্ঠা। لَطِيفَةٌ -এর অর্থ- সূক্ষ্ম কথা, নরম কথা ইত্যাদি। তবে এখানে শব্দটি 'কম' অর্থে প্রযোজ্য। অতএব, أَوْرَأَى لَطِيفَةً -এর অর্থ হবে- কম পৃষ্ঠায় বা কয়েক পৃষ্ঠায়। لَطِيفَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো لَطَائِفٌ।

نُعْبَهُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে نَعْبَهُ, এর অর্থ- ১. নির্বাচিত, ২. চয়িত, ৩. বাছাইকৃত। فَيَكْرَهُ শব্দটি ফَيَكْرَهُ -এর বহুবচন। অর্থ- চিন্তা, গবেষণা, ভাবা ইত্যাদি।

إِصَافَةُ الْحَقِّ إِلَى تَرْكِيبِ إِصَافٍ হলোও মূলত এখানে نُعْبَهُ الْفَيْكْرُ শব্দদ্বয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে مُرَصَّنُونَ হয়েছে। অর্থাৎ সিকাতের ইখাফত হয়েছে তার مُرَصَّنُونَ -এর দিকে। আসল ইবায়ত হলো একপ- الْفَيْكْرُ التَّغْنِيَةُ অর্থাৎ নির্বাচিত গবেষণা তথা গবেষণালব্ধ নির্বাচিত বিষয়, নির্বাচিত চিন্তামালা। सम्पर्के আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত পরিভাষা।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উসূলুল হাদীসের উপর কিতাব লেখে তার নামকরণ করেছেন এটা। উপরের ব্যাখ্যা মতে কিতাবটির অর্থ দাঁড়াবে- 'উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ নির্বাচিত বিষয়' বা নির্বাচিত চিন্তামালা।

إِنْتَعَالُ শব্দটির অর্থ কোনো কিছুর গুরুত্ব অংশ করায়ত্ত করা। এখানে تَرْكِيبُ إِنْتَعَالُ অর্থ হলো, এমন বিন্যাস ও আঙ্গিক যা নতুন করে আমিই সূচনা করেছি অর্থাৎ নয়া আঙ্গিকে।

سَبِيلُ إِنْتَعَالُ -এর অর্থ থেকে ব্যবহৃত এ শব্দটির অর্থ হলো- পথ চলা। إِنْتَعَالُ হলো, এমন পথ যে পথে আমি একাই চলেছি অর্থাৎ অভিনব পন্থায়।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) যে নয়া আঙ্গিক ও অভিনব পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অতীতে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা নিয়ে যারা রচনা করে গেছেন তারা গতানুগতিক ও ঢালাওভাবে একের পর এক পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি এই গতানুগতিকতা এড়িয়ে একটি নতুন পদ্ধতিতে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। আর তা হলো, তিনি হাদীসের সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো একস্থানে, সনদ সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো আরেক স্থানে এবং মতন ও সনদ উভয় সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো পৃথক পৃথক স্থানে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছেন। সনদ সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলোকে আবার এভাবে বিন্যাস করেছেন যে, প্রথমে রাবীর পতনহেতু مُرَدُّد প্রকারগুলো উল্লেখ করেছেন এবং এরপরে গিয়ে রাবীর অভ্যুত্থি হেতু مُرَدُّদ প্রকারগুলো আলোচনা করেছেন ইত্যাদি।

عَلَى هَذَا مَعَ مَا صَنَعْتُ الْبُ - এ অংশটি পূর্বোক্ত لَعَضْتُ ফেলের, যমীরে مَفْعُول থেকে হয়েছে। মূল ইবারত এরূপ-

لَعَضْتُ ذَلِكَ الْمِثْمَ مَقْرُونًا ذَلِكَ الْمِثْمَ الْمَلِخَصَ مَعَ أَمْرِ صَنَعْتُهَا إِلَيْهِ وَزِدْتُهَا عَلَيْهِ.

উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারসংক্ষেপ লেখে তার সাথে অতিরিক্ত কিছু বিষয় সংযোজন করেছি এবং তার উপরে কিছু কথা বৃদ্ধি করেছি।

مِنْ شَوَارِدِ الْفَرَائِدِ : এটা বর্ণিত বা সংযোজিত অংশের বর্ণনা ।

شَوَارِدُ শব্দটি شَارِدٌ-এর বহুবচন । এ শব্দটির উৎসমূল হলো شَرَدَ الْبَعِيرُ এটা তখন বলা হয়, যখন কোনো উট ভেগে যায়, পালিয়ে যায় ।

أَلْدَرَةُ الْكَبِيرَةُ-এর বহুবচন । অর্থ- বড় মোতি ।

شَوَارِدُ الْفَرَائِدِ বাক্যটি تَرْكِيبِ إِصَافِي হলেও মূলত তা مَوْصُوفٍ হয়েছ। অর্থাৎ সিফাতের সম্বন্ধ হয়েছে মَوْصُوفٍ-এর দিকে । আসল ইবারত হলো الشَّوَارِدُ الْفَرَائِدُ অর্থাৎ ভেগে যাওয়া বা ছুটে যাওয়া মুক্তা-মাণিক্য ।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে লেখতে গিয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের অপেক্ষা যে আলোচনা অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন তা الْفَرَائِدُ الشَّوَارِدُ তথা 'ছুটে যাওয়া মুক্তা' দ্বারা ব্যক্ত করেছেন । কারণ হলো, এ কথাগুলো খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ।

বস্তুত এদিকে ইঙ্গিত করতে তিনি الْفَرَائِدُ শব্দ ব্যবহার করেছেন । আর এ বিষয়গুলো সূক্ষ্ম ও কষ্টকর হওয়ায় তা পূর্ববর্তীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে এবং তারা এর নাগাল পাননি; তাই তিনি এদিকে ইঙ্গিত করতে الشَّوَارِدُ (তথা পলায়নপর ও ছুটে যাওয়া) শব্দ ব্যবহার করেছেন ।

زَوَائِدُ الْفَوَائِدِ-এর বহুবচন زَائِدٌ তথা مَا صَمَّنَتْ তথা অতিরিক্ত সংযোজনের বর্ণনা । অর্থ- অতিরিক্ত । আর الْفَوَائِدُ শব্দটি فَائِدٌ-এর বহুবচন । অর্থ- ফায়দা, উপকারিতা ।

زَوَائِدُ الْفَوَائِدِ বাক্যটিও مَوْصُوفٍ إِلَى الْوَصْفِ হয়েছ। আসল ইবারত হলো, الْفَوَائِدُ الزَّوَائِدُ অর্থাৎ বিষয়টি উপকারী হলেও তা অতিরিক্ত পর্যায়ের ।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) যে সকল পরিভাষা নিজে উদ্ভাবন করেছেন তা زَوَائِدُ الْفَوَائِدُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন ।

উসূলুল হাদীসের পরিভাষার দিক বিবেচনায় তাঁর উদ্ভাবিত পরিভাষাগুলো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইবনে হাজার (র.) নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে তা زوائد (অতিরিক্ত)-এর মতো কম গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন । নতুবা বাস্তবতার বিচারে তা কম গুরুত্বের নয়; বরং অনেক মূল্যবান ।

فُرْعَبَ إِلَى ثَانِيَا أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحًا بِعِلِّ رَمُوزِهَا وَتَفْتَحَ كُنُوزَهَا
وَيُوضِحَ مَا خَفِيَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ مِنْ ذَلِكَ ، فَاجْتَبَتْهُ إِلَى سُؤَالِهِ رَجَاءً
الْإِنْدِرَاجِ فِي تِلْكَ التَّمَسَّالِكِ ، فَبَالَغَتْ فِي شَرْحِهَا فِي الْإِبْطَاحِ
وَالْتَوَجُّهِ وَتَبَهَّتْ عَلَى خَبَايَا زَوَايَاهَا ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِيهِ ،
فَظَهَرَ لِي أَنَّ إِرَادَهُ عَلَى صُورَةِ الْبَسْطِ الْبَيِّنِ ، وَدَمَجِهَا ضَمْنِ
تَوْضِيحِهَا أَوْفَقُ ، فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ الْقَلِيلَةَ السَّالِكَ ، فَأَقُولُ
طَالِبًا مِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقَ فِيمَا هُنَالِكَ .

অনুবাদ : দ্বিতীয়বারের মতো আবার আমার কাছে আবেদন করা হলো (নুখবা) এর এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করার জন্য, যা তার ইঙ্গিতপূর্ণ তত্ত্ব উন্মোচিত করবে, খুলে দেবে তার তথ্যভাণ্ডার এবং এ শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থীর কাছে যা অস্পষ্ট থাকতে পারে, তা স্পষ্ট করে তুলে ধরবে। আমি ঐ পথে (লেখকদের কাতারে) शामिल হতে এ (ব্যাখ্যা লেখার) আহ্বানে সাড়া দেবার ইচ্ছা করলাম। আমি চাইলাম, মতলব সাফ ও ইবারত হল করতে নুখবার খুব ব্যাখ্যা করবো এবং তার কোণায় কোণায় লুকিয়ে থাকা বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক করারও ইচ্ছা করলাম। কারণ, ঘরের মালিকই অধিক জানে ঘরে কি আছে। অতঃপর যখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি (উসুলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করাই অধিক উপযোগী এবং নুখবাকে তার ব্যাখ্যার অধীনে দাখিল তথা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়াই বেশি সমীচীন, তখন আমি যে পথের পথিক কম- সে পথে চললাম অর্থাৎ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলাম। সুতরাং আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার তৌফিক ও সাহায্য কামনা করে বলছি-

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَعْضُ الْأَخْوَانِ : এটা **مَنْهُول** হিসেবে ব্যবহৃত। এই আবেদনকারী হলো পূর্বোক্ত **ثَانِيَا** অর্থাৎ এক দীনি ভাই।

ثَانِيَا : এটা ছিল তার দ্বিতীয় আবেদন। প্রথম আবেদন ছিল সংক্ষিপ্ত মতন রচনার জন্য, যা লেখক অতি চমৎকারভাবে পেশ করেছিলেন।

أَنَّ أَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحًا : এটা হলো দ্বিতীয় আবেদনের বর্ণনা। অর্থাৎ ঐ দীনি ভাইয়ের দ্বিতীয় আবেদন ছিল পূর্বোক্ত মতনের (নুখবার) ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার জন্য। **عَلَيْهَا** -এর যমীরটি ফিরেছে **نُغْبَةً** -এর দিকে, যা লেখক পূর্বে মতন হিসেবে লিখেছিলেন।

بِعِلِّ رَمُوزِهَا : এ বাক্যটি তারকীবে **شَرْحًا** -এর **صِفَتْ** হয়েছে। অতএব, **بِعِلِّ** -এর যমীর ফিরেছে **رَمُوزُ** - **رَمُوزُ التَّخْبِيَةِ** -এর অর্থ **مَنْهُول** ফেলের **بِعِلِّ** হলো **رَمُوزُهَا** -এর দিকে। আর **رَمُوزُهَا** হলো **رَمُوزُ** -এর শাব্দিক অর্থ- ইশারা, ইঙ্গিত, সংকেত ইত্যাদি। এটা **رَمُوزُ** বা **رَمُزٌ** -এর বহুবচন। তবে এখানে **رَمُوزُهَا** -এর অর্থ হলো, নুখবা -এর অর্থের মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয়।

وَتَفْتَحَ كُنُوزَهَا : এটি **ثَانِيَا مَعْرَدٌ** থেকে ব্যবহৃত। **كُنُزٌ** শব্দটি **كُنُزٌ** -এর বহুবচন। অর্থ- ভাণ্ডার, সিন্দুক ইত্যাদি। এখানে **كُنُوزُهَا** -এর অর্থ হলো, মতনের অর্থ- সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি।

عَلَى الْمُبْتَدِئِ : এখানে مُبْتَدِئٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-শিক্ষার্থী। যারা এ শাস্ত্র সম্পর্কে কোনো পূর্বজ্ঞান রাখে না এবং নতুন করে জানতে ও শিখতে চায়। এখানে লেখক اَلْمُبْتَدِئِ -এর উল্লেখ এজন্য করেছেন যে, যারা اَلْمُنْتَهَى তথা এ শাস্ত্রে পারদর্শী তাদের জন্য نَغْبَةُ-ই যথেষ্ট। শরাহ -এর প্রয়োজন নেই তাদের। অবশ্য যারা مُبْتَدِئٍ তাদের বুঝার জন্য শরাহ জরুরি।

مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مِنَ الرُّمُوزِ -এর বয়ান। আসল ইবারত হলো- وَمِمَّا خَفِيَ مِنْ ذَلِكَ : অর্থাৎ মতনে যে সমস্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয় ও তথ্যভাণ্ডার গুপ্ত রয়েছে। অতএব, ذَلِكَ -এর كُنُوزٌ হলো পূর্বোক্ত رُمُوز এবং مُشَارَالِئِهِ।

أَجَابَ : يُجِيبُ : فَاجِبُهُ : অর্থ- জবাব দেওয়া। তবে এখানে আস্থানে সাড়া দেওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, এটাও এক ধরনের জবাব দান।

بَعْضُ الْأَخْوَانِ : " : سُؤَالُهُ " যমীর ফিরেছে بَعْضُ الْأَخْوَانِ তথা ঐ দীনি ভাইয়ের দিকে যিনি লেখককে প্রথমে মতন ও পরে শরাহ লেখার আবেদন করেন। অনুরূপ أَجَبْتُهُ -এর مَرَجِعُهُ।

رَجَاءٌ : رَجَاءٌ : অর্থ- আশা, ইচ্ছা ইত্যাদি।

الْمَسَالِكِ : অর্থ- পথ, দাখিল হওয়া, প্রবেশ করা, অন্তর্ভুক্ত করা, शामिल করা ইত্যাদি। اَلْإِنْدِرَاجُ : অর্থ- রাস্তা ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বাক্যের উদ্দেশ্য তিনটি হতে পারে। যথা-

১. اِنْدِرَاجُ -এর فَاعِلٌ হবেন লেখক ইবনে হাজার (র.) আর اَلْمَسَالِكُ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে مَسَالِكُ لِرَجَاءِ اِنْدِرَاجِي وَدَخُولِي فِي مَسَالِكِ الْمَصْتَفِينَ لِاصْرُلَ الْعِدِيثِ لِتَحْصِيلِ الثَّنَاءِ فِي الذَّنْبِ وَالْجَزَاءِ فِي الْعُقْبَى -এর فَاعِلٌ হবেন লেখক ইবনে হাজার (র.) আর اَلْمَسَالِكُ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ-
لِرَجَاءِ اِنْدِرَاجِي وَدَخُولِي فِي مَسَالِكِ الْمَصْتَفِينَ لِاصْرُلَ الْعِدِيثِ لِتَحْصِيلِ الثَّنَاءِ فِي الذَّنْبِ وَالْجَزَاءِ فِي الْعُقْبَى -

দুনিয়ায় প্রশংসা এবং আখিরাতে ছওয়াব পেতে উসূলুল হাদীসের লেখকদের কাতারে নিজেকে शामिल করার অভিলাষে আমি দীনি ভাইয়ের দ্বিতীয় আস্থানেও সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলাম।

২. اِنْدِرَاجُ -এর فَاعِلٌ হবে নুখবার ছাত্র-শিক্ষার্থীরা আর اَلْمَسَالِكُ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা জানার রাস্তা। তখন পুরো বাক্য ও তার অর্থ হবে নিম্নরূপ-
لِرَجَاءِ اِنْدِرَاجِ الطَّالِبِينَ لِيَذَلِكَ الْمَلْحَصُ فِي مَسَالِكِ مَعْرِفَةِ اِصْطِلَاحَاتِ الْمُعْدِّثِينَ -

মুহাদ্দিসীনে কেরামের (উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত) পরিভাষাসমূহ জানার পথে নুখবার ছাত্র-শিক্ষার্থী যাতে চুকতে পারে সেই আশা নিয়ে আমি দীনি ভাইয়ের আবেদনে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলাম।

৩. اِنْدِرَاجُ -এর فَاعِلٌ হবে লেখকের বক্ষ্যমাণ কিতাব আর اَلْمَسَالِكُ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের লিখিত কিতাবাদির সিরিয়াল। তখন পুরো বাক্য ও তার অর্থ হবে নিম্নরূপ-

لِرَجَاءِ اِنْدِرَاجِ هَذَا الْكِتَابِ فِي مَسَالِكِ كُتُبِ الْاَلَمِيَةِ بَانَ يَتَفَعَّ بِهِ كَمَا تَفَعَّ بِهَذَا الْكُتُبِ -

আইখ্যানে হাদীস (মুহাদ্দিসীনে কেরাম)-এর উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত কিতাবাদির সিরিয়ালে যাতে এ কিতাবটিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সেই আশায় আমি দীনি ভাইয়ের আস্থানে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলাম। যাতে তাদের কিতাব থেকে যেভাবে উপকার গ্রহণ করা হয় তেমনি এ কিতাব থেকেও উপকৃত হতে পারে।

فَبَالَغْتُ فِي شَرِّهَا : এ বাক্যের মতলবী অর্থ হলো-.

فَارَدْتُ الْمُبَالَغَةَ بِعَدِّ الْقُرْآنِ مِنَ التَّحْنِ فِي شَرْحِ التَّحْبَةِ অর্থাৎ মতন লেখা শেষ করার পর সে মতন তথা নুখবার খুব শরাহ করার ইচ্ছা করলাম।

التَّوَجُّبُ وَالْإِنْضَاحُ : এটা مُتَعَلِّقُ হয়েছে মাসদারের সাথে। এখানে الْإِنْضَاحُ এবং التَّوَجُّبُ মূলত পূর্বোক্ত شَرْح -এর বয়ান। অর্থাৎ শরাহ বলতে উদ্দেশ্য إِنْضَاحُ এবং تَوْجِبُهُ। তখন অর্থ হবে এমন, আমি শরাহ -এর ক্ষেত্রে মুবালাগার ইচ্ছা করেছি মানে إِنْضَاحُ এবং تَوْجِبُهُ -এর ক্ষেত্রে মুবালাগার ইচ্ছা করেছি।

إِنْضَاحُ لَفْظٍ : এ-এর গুরুত্রে আগত تِي الْإِنْ لَمْ عَرِضَ مُضَافٍ إِلَيْهِ অর্থাৎ এটা আসলে ছিল إِنْضَاحُ لَفْظٍ। অর্থাৎ নুখবার সংক্ষিপ্ত শব্দকে বিস্তারিতভাবে পেশ করা।

التَّوَجُّبُ : এ-এর مُضَافٍ إِلَيْهِ تِي الْإِنْ لَمْ عَرِضَ مُضَافٍ إِلَيْهِ অর্থাৎ আসলে ছিল التَّوَجُّبُ التَّحْبَةِ। অর্থাৎ নুখবার অন্তর্নিহিত অর্থকে ব্যাখ্যা করে পেশ করা।

وَنَبَّهْتُ عَلَى خَبَايَا : وَنَبَّهْتُ কে-বাটি تَفْعِيلُ থেকে এসেছে। এর অর্থ- অবগত করা, সতর্ক করা, সচেতন করা। خَبَايَا শব্দটি خَبِيئَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- লুকানো, লুকায়িত, গোপনকৃত, গুপ্ত। خَبَايَا শব্দটি زَوَايَا -এর দিকে إِضَافَةٌ হয়েছে।

الزَّوَايَا : এর الزَّوَايَا শব্দটি زَوَايَا -এর বহুবচন। অর্থ- কোণ। এখানে زَوَايَا বলতে উদ্দেশ্য হলো زَوَايَا। অর্থাৎ নুখবার শব্দের কোণায় কোণায়।

فَارَدْتُ الْإِطْلَاقَ عَلَى فُكَاكٍ مُغَيَّبَةٍ : এ-এর পুরো ইবারত ও অর্থ হলো- وَنَبَّهْتُ عَلَى خَبَايَا زَوَايَا। অর্থাৎ নুখবার শব্দের কোণায় কোণায় লুকানো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত করানোর ইচ্ছা করলাম।

صَاحِبُ النَّبْتِ : এটা هَلْ বা কারণ বর্ণনা। عِلَّةٌ -এর فَبَالَغْتُ : এটা هَلْ বা কারণ বর্ণনা। لَإِنَّ صَاحِبَ النَّبْتِ أَذْرَى بِمَا فِجِهَ : এটা একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য। কোনো বিষয়ে কারো পূর্ণ অবগতি এবং তার রহস্য কেবল সেই জানলে সাধারণত সেক্ষেত্রে এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) প্রবাদ বাক্যটি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, এর দ্বারা তিনি ইশারা করেছেন আল্লামা কামালুদ্দীন শুমুরী (র.) -এর দিকে। কারণ, ইবনে হাজার (র.) نُحْبَةُ -এর শরাহ লেখার পূর্বেই আল্লামা কামালুদ্দীন (র.) ৮১৭ হিজরিতে تَتَبَعْتُ النَّظْرَيْنِ نُحْبَةَ الْفِكَرِ নামে নুখবার একটি শর'হ লেখেন। তাঁর এ শরাহটি ইবনে হাজারের শরাহ অপেক্ষা অনেক বড়। ইবনে হাজার (র.) فَإِنَّ صَاحِبَ বলে এ কথা বুঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, কামালুদ্দীন আমার পূর্বে শরাহ করলেও যেহেতু نُحْبَةُ -এর রচয়িতা আমি, তাই সঙ্গত কারণেই আমার বেশি ও ভালো করে জানা আছে-যে, نُحْبَةُ -এর শব্দরাজিও অর্থের মধ্যে কোন কোন সূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্ব লুকানো রয়েছে। অতএব, আমি যেভাবে ঐ তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে পারবো তেমনি বাইরের কেউ সেভাবে পারবে না। তাই কামালুদ্দীন আমার পূর্বে শরাহ লেখলেও তার শরাহ -এর তুলনায় আমার শরাহটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গতার দাবি রাখে।

فَطَهَّرْتُ : 'অতঃপর' বা 'তখন গিয়ে' -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,

অর্থাৎ নুখবার ভালো করে একটি শরাহ লেখার মনে মনে ইচ্ছা করার পর যখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল ।

إِنْ إِيْرَادُ : এখানে ' ' যমীর করেছে কল্পিত শরাহ -এর দিকে। আর إِيْرَادُ অর্থ- উপস্থাপন করা, পেশ করা ইত্যাদি। এ বাক্যটি ظَهَرَ -এর فاعِل হওয়ায় حَالَتْ رَتْعُنِي -তে পতিত হয়েছে।

অর্থ- **صُورَةُ النَّسِيطِ** : এটা **مُتَمَلِّكُنْ** হয়েছে মাসদারের সাথে। **صُورَةُ النَّسِيطِ** বিস্তারিতভাবে। এখানে বিস্তরণ এভাবে ঘটেছে যে, হাফিজ ইবনে হাজার (র.) মতনকে শরাহ -এর সাথে এমনভাবে মিলিয়েছেন যে, এখন দুকিতাব মিলে এক কিতাবে পরিণত হয়েছে। ফলে সঙ্গত কারণেই কিতাবের পরিসর লম্বা ও দীর্ঘ হয়েছে। লেখক এ দীর্ঘ পরিসরকেই **صُورَةُ النَّسِيطِ** শব্দে ব্যক্ত করেছেন। আর এটাকে তিনি **عَلَى النَّسِيطِ** বা অধিক উপযোগী এ কারণে বলেছেন যে, শুধু মতন মাত্র কায়েক পৃষ্ঠায় হওয়ায় তা গ্রন্থরূপ লাভে সমর্থ ছিল না। আবার তা অধিক সংক্ষেপ হেতু তার থেকে উপকৃত হওয়ারও সম্ভাবনা ক্ষীণ ছিল। এর বিপরীতে মতনের সাথে শরাহ যুক্ত হওয়ায় যেমনি তা গ্রন্থরূপ পেয়েছে তেমনি তা থেকে উপকার গ্রহণও সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছে।

তথা দাখিল করা, دَخَلَ, তথা মেশানো, مَزَجَ -এর অর্থ, دَمِجَ : وَ دَمَجَهَا ضَمْنَ تَوْضِيْعِهَا أَفْهَقَ -এর অর্থ, تَوْضِيْعِهَا -এর অর্থ, অধীনে, অভ্যন্তরে। ضَمْنَ -এর অর্থ, যমীর ফিরেছে -এর অর্থ, نَخَبَ : وَ دَمَجَهَا ضَمْنَ تَوْضِيْعِهَا أَفْهَقَ -এর অর্থ- নুখবার ব্যাখ্যা।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নুখবাক্কে তার শরাহ -এর অধীনে এমনভাবে ঢুকিয়েছেন তথা মতনকে শরাহ -এর সাথে এমনভাবে গুলিয়ে দিয়েছেন যে, এখন কোনো একটি শব্দে শুধু মতনের দিকে খেয়াল করলে এক ধরনের اِسْرَابٌ হয় আর শরাহ-এর সাথে মিলিয়ে পড়লে আরেক রকেমের اِسْرَابٌ হয়। শুধুমাত্র মতনের দিকে তাকালে ضَمِيرٌ ফিরে এক দিকে, আর শরাহ -এর সাথে মিলিয়ে খেয়াল করলে ضَمِيرٌ ফিরে আরেক দিকে। এ ধরনের নজির বহু রয়েছে।

ইবনে হাজার (র.) **نُفِخَ** -কে তার শরাহ এর অধীন চলে যাওয়াকে **أَوْفُقُ** বা অধিক সমীচীন এ জন্য বলেছেন যে, এতে কিতাবের দুর্বোধ্যতা হ্রাস পেয়েছে এবং কিতাবের অর্থ একটি স্বাভাবিক গতি পেয়েছে, যা এর পূর্বে অবর্তমান ছিল। **وَمِنْهَا** -এর **عَطَفَ** হয়েছে **إِنْرَادَ** -এর উপর।

سَلِّكَ سَلَكٌ অর্থ চলা, পথ ধরা। তবে এখানে অর্থ
অবলম্বন করা। هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الْقَبِيلَةُ السَّالِكُ
স্বিগ্গে صَفَتْ-এর অর্থ-কম। سَلِّكَ অর্থ-পথিক।

শালোচ্য অংশটুকুর তারকীব দ্বাৰে হুত পাৰে । যথা—

مُضَانٌ أَقْلِيلَةٌ | مَرْصُونٌ الطَّرِيقَةُ | اِسْمٌ اِشَارَةٌ | فَعِلٌ - فَاعِلٌ | سَلَكْتُ ১.
 اِمْسَارُ الْيَدِ - اِسْمٌ اِشَارَةٌ | مُضَانٌ اِلَيْهِ | مُضَانٌ | اِسْمٌ اِشَارَةٌ | اِسْمٌ اِشَارَةٌ |
 اِسْمٌ اِشَارَةٌ | اِسْمٌ اِشَارَةٌ | اِسْمٌ اِشَارَةٌ | اِسْمٌ اِشَارَةٌ |

অবশ্য এ সময় একটি মৃদু প্রশ্ন-হতে পারে যে, এ তারকীবে **الْقَلِيلُ** শব্দকে **مُضَف** বলা হয়েছে অথচ **مُضَف** -এর শুরুতে **الِ** হয় না। এর উত্তর হলো, **مُضَف** -এর শুরুতে **الِ** হওয়া নিষিদ্ধ হলো **اَضَافَتْ مَعْتَرِي** -এর মধ্যে- **اَضَافَتْ لِفَتْحَةٍ** -এর মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। যেমন বলা হয়- **الْحَسَنُ**

الرَّجُلِ : যেহেতু الْقَلِيلَةَ শব্দটি صَفَتْ مُنْتَبِهٌ হওয়ায় صَفَتْ হয়েছে আর السَّالِكُ হলো তার مَعْمُول, তাই এটা إِصَانَتْ হয়েছে।

২. এ সূরতে পার্থক্য শুধু এক স্থানে। তা হলো, الْقَلِيلَةَ হবে صَفَتْ আর السَّالِكُ হবে তার فاعِلٌ ও তার فاعِلٌ মিলে جُنَّةٌ হয়ে الظَّرِيفَةَ -এর صَفَتْ হবে। অবশ্য এ সূরতে একটি জোরদার প্রশ্ন হয় যে, এখানে فاعِلٌ ও فاعِلٌ -এর মধ্যে تَطَائُنٌ নেই অর্থাৎ فاعِلٌ টি فاعِلٌ আর فاعِلٌ হলো مُدَكَّرٌ। এজন্য এ দ্বিতীয় সূরত হতে প্রথম সূরতটিই বেশি উত্তম। কেননা, প্রথম সূরতে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হয় না। তবে স্মরণযোগ্য যে, السَّالِكُ শব্দের এ বর্ণে فاعِلٌ হিসেবে পেশ হোক কিংবা مُضَانِ الْيَدِ হিসেবে যের হোক উভয় সূরতে অর্থ একই হবে। আর তা হলো, আমি সে পথ অবলম্বন করলাম যার পথিক কম। هَذِهِ الظَّرِيفَةُ তথা সে পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো دَمَجَهَا مَعَ تَوْضِيحِهَا অর্থাৎ নুখবার শারাহ -এর মধ্যে নুখবাকে মিলিয়ে দেওয়া। আর এ পথের পথিক কম এ হিসেবে যে, সাধারণত কোনো কিছুর শরাহ করা হয় মতনকে ভিন্ন রেখে। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার (র.) হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি মতনকে শরাহ-এর মধ্যে একীভূত করে দিয়ে শরাহ করেছেন। আর এ কম হওয়াটা مُطْلَقٌ ভাবেও হতে পারে, অথবা তার এলাকার বিচারেও হতে পারে অথবা মুহাম্মাদীনে কেরামের রচনার বিচারেও হতে পারে।

إِذَا : এটা عَرُطٌ -এর جَزَاءٌ। এজন্য শুরুতে كَأْ বর্ণ এসেছে। আসল ইবারত হলো এরূপ- إِذَا : فَأَقُولُ : অর্থাৎ বিষয়টি যখন এরূপ তখন আমি বলছি ...।

طَائِبًا مِنْ اللَّهِ : এটা طَائِبًا শব্দটি حَالٌ হয়েছে। أَقُولُ -এর যমীর থেকে। التَّوْفِيقُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হতে পারে আবার التَّوْفِيقُ -এর সাথেও مُتَعَلِّقٌ হতে পারে। তবে التَّوْفِيقُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ মেনে নেওয়াটা উত্তম। কেননা, এ সূরতে حَصْرٌ -এর ফায়দা মিলে। অর্থাৎ আশ্রাহর থেকেই তৌফিক চেয়ে।

نَيْمًا مُنَالِكَ - مُتَعَلِّقٌ দ্বিতীয় : এটা التَّوْفِيقُ হয়েছে। এ-এর সাথে। তবে এটা দ্বিতীয় مُتَعَلِّقٌ : فَنَيْمًا مُنَالِكَ -এর অর্থ হলো- فَنَيْمًا مُنَالِكَ মতনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে।

إِسْمُ إِشَارَةِ بَعِيدٍ : এটা إِشَارَةُ بَعِيدٍ নামটি অভিমত রয়েছে।

১. نُغْبِيَةُ : অবশ্য এ সময় প্রশ্ন হয় যে, যদি مُنَالِكَ -এর مُنَالِكَ টা মতন হয়, তাহলে তা তো নিকটবর্তী দূরবর্তী নয়, তবে إِشَارَةُ بَعِيدٍ ব্যবহার করা হলো কেন ? এর উত্তর তিনটি হতে পারে। যথা-

ক. তথা لِإِعَايَةِ السَّجْعِ : তথা গদ্যের পূর্বাপরের সাথে মিল ও শ্রুতিমাধুর্যের স্বার্থে।

খ. এদিকে ইঙ্গিত করতে যে, শরাহ -এর রচনাকাল মতনের রচনাকাল থেকে অনেক পরে।

গ. অথবা, এটা বুঝাতে যে, মতনের মানমর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ও উচ্চতর।

২. مُنَالِكَ -এর مُنَالِكَ -হবে মতন এবং শরাহ-এর সমষ্টি। যেহেতু ইবনে হাজার (র.) মতনকে শরাহ -এর মাঝে একীভূত করে দিয়েছেন এবং দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে পৃথক করার উপায় নেই, তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন বলে মনে হয়।

الْخَبَرُ عِنْدَ عُلَمَاءٍ هَذَا الْفَنِّ مُرَادٌ لِلْحَدِيثِ ، وَقِيلَ الْحَدِيثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، وَالْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ وَمَا شَاغَلَهَا الْأَخْبَارُ ، وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدَّثِ ، وَقِيلَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقًا ، فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ ، وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ لِيَكُونَ أَشْمَلُ .

অনুবাদ : এ (উসূলুল হাদীস) শাস্ত্রের ওলামায়ে কেরামের মতে 'খবর' হলো হাদীসের সমার্থবোধক । কারো মতে 'হাদীস' হলো, যা নবী করীম ﷺ থেকে এসেছে অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কিত বিষয় আর 'খবর' হলো, যা অন্যদের থেকে এসেছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্যদের সাথে সম্পর্কিত বিষয় । রসূল ত এ কারণে ইতিহাস ও এ জাতীয় বিষয় চর্চাকারীকে 'আখবারী' (ঐতিহাসিক) আর সুন্নতে নববী তথা হাদীস চর্চাকারীকে বলা হয় 'মুহাদ্দিস' ।

আবার কারো মতে হাদীস ও খবরের মধ্যে عُمُومٌ خُصُوصٌ مُطْلَقٌ তথা 'সাধারণ বিশেষ' সম্পর্ক রয়েছে । সুতরাং প্রত্যেকটি হাদীস খবর, কিন্তু এর বিপরীত নয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি খবর হাদীস নয় । 'হাদীস' শব্দ অপেক্ষা 'খবর' যেহেতু অধিক সমন্বয়কারী, সেহেতু মতনে 'খবর' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নুখবা- শরহে নুখবা-এর পটভূমি তুলে ধরার পর সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার (র.) ঈঙ্গিত শাস্ত্রীয় আলোচনার অবতারণা করেছেন । এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হলো, খবরে ওয়াহেদ মাকবুল, খবরে ওয়াহেদ মারদূদ এবং এতদুভয় সংশ্লিষ্ট মূলনীতি ও পরিভাষা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বস্তুনীতি আলোচনা উপহার দেওয়া । গ্রন্থটির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ঈঙ্গিত বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক আলোচনা । তবে প্রয়োজনের বিচারে মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ।

الْحَدِيثُ ... وَالْخَبَرُ : বিজ্ঞ লেখক খবরকে হাদীসের সমার্থবোধক বলেছেন । অথচ ইতঃপূর্বে তিনি হাদীসের পরিচয় তুলে ধরেননি । লেখকের পক্ষ হতে কেউ কেউ এর কারণ এটা উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসের অর্থ ও পরিচয় সুবিদিত ও প্রকাশ্য জ্ঞান করায় লেখক এমনটি করেছেন ।

الْخَبَرُ -এর সংজ্ঞা ও পরিচয় : الْخَبَرُ শব্দটির আরবি সঠিক উচ্চারণ খাবার । অর্থাৎ 'বা' অক্ষরে যবর হবে । কেননা, 'বা' অক্ষরে সাকিন দিলে (الْخَبَرُ) তখন তার অর্থ হয় বড় পাত্র, পাহাড়ে পানি জমা হওয়ার স্থান ইত্যাদি ।

الْخَبَرُ শব্দটি اسم এবং একবচন । বহুবচন হলো إِخْبَارٌ ; এর আভিধানিক অর্থ- সংবাদ, খবর, বার্তা, তত্ত্ব, সন্ধান ইত্যাদি । পরিভাষায় 'খবার' কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় । যথা-

(١) الْخَبَرُ : مَا يَنْقُلُ وَيُحَدِّثُ بِهِ قَوْلًا أَوْ كِتَابَةً .

১. মৌখিক বা লিখিতভাবে যা বর্ণিত ও প্রকাশিত হয় ।

(٢) الْخَبَرُ : قَوْلٌ بِغَيْرِ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ لِذَاتِهِ .

২. সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনাময় উক্তি ।

(٣) وَالْخَبَرُ : مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৩. নবী করীম ﷺ ব্যতিরেকে অন্যদের সম্পর্কিত তথ্য ও বর্ণনা।

الْخَبَرُ -এর প্রকারভেদ ও হুকুম : খবর মোট তিন প্রকার। যথা-

১. যার সত্যতা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত। যেমন- দুনিয়াতে মক্কা এবং মদীনা থাকার সংবাদ ইত্যাদি।

২. যার মিথ্যা ও অসত্য হওয়া নিশ্চিত। যেমন- শুক্রবারকে শনিবার বলে সংবাদ দেওয়া, পৃথিবীতে আমেরিকা নামে কোনো দেশ নেই বলে খবর দেওয়া ইত্যাদি।

৩. যার সত্যতাও স্পষ্ট নয় আবার মিথ্যাটাও নিশ্চিত নয়। এমন খবরের স্বপক্ষে সত্য-মিথ্যার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে তার উপর কোনো হুকুম আরোপ করা সম্ভব নয়। তাই এমন খবরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে দলিল না পাওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খবরকে যে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে এই তৃতীয় প্রকার খবর। অর্থাৎ মূলত তৃতীয় প্রকার খবর নিয়েই উসূলুল হাদীসের যত আলোচনা। বাকি দু প্রকারের আলোচনা হয় প্রাসঙ্গিকভাবে।

খবরের এ তৃতীয় প্রকারটি আবার তিন প্রকার। যথা-

এক. গৃহীত (مَقْبُول)। অর্থাৎ তার মধ্যে সত্যতার গুণাবলি ও শর্ত পাওয়া যায়।

দুই. প্রত্যাখ্যাত (مَرْدُود)। অর্থাৎ যদি তার মধ্যে সত্যতার শর্ত না মিলে কিংবা প্রত্যাখ্যানের কোনো কারণ পাওয়া যায়।

তিন. স্থগিত (مَرْكُوف)। অর্থাৎ যদি তার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার দিক না পাওয়া যায় এবং প্রত্যাখ্যানেরও সুস্পষ্ট দিক প্রমাণিত না হয়, তবে এ অবস্থায় খবরটি যখন স্থগিত তখন তা দ্বিতীয় প্রকারের মতোই হয়ে গেল।

عَلَمًا هَذَا الْفَرْقِ : এ ফন বা শাস্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য উসূলুল হাদীস। আর ওলামায়ে কেরাম দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কেরাম। উসূলুল হাদীসের বিস্তারিত সংজ্ঞা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

وَاحِدٌ مُدْكَرٌ -এর অর্থ- পচাতে আরোহণকারী। -এর অর্থ- مُرَاوِنٌ : শব্দটি مُفَاعَلَةٌ হতে فَاعِلٌ হতে إِسْمٌ فَاعِلٌ -এর অর্থ- مُرَاوِنٌ : একই বাহনে একজনের পিছনে আরেকজন আরোহণ করলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা হয় প্রথম ব্যক্তির মুরাদিফ। তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো, সমার্থবোধক।

لِلْحَدِيثِ : হাদীসের দুভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যথা- ১. আভিধানিক ও ২. পারিভাষিক। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. হাদীসের আভিধানিক অর্থ : حَدِيثٌ শব্দটি فَعِيلٌ -এর ওয়ানে সিফাতের সীগাহ। এটা حَدُوثٌ মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন এবং তা قَدِيمٌ -এর বিপরীত। অভিধানে حَدِيثٌ শব্দের অর্থ অনেক। যথা-

১. كَلَامٌ অর্থ- কথা, বাণী। যেমন- وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا অর্থাৎ আল্লাহর থেকে কথায় অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?

২. النَّبَأُ অর্থ- বার্তা, সংবাদ। যেমন- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ অর্থাৎ আপনার কাছে কি সে সেনাবাহিনীর সংবাদ পৌঁছেছে অর্থাৎ ফিরআউনের ও ছামুদের?

৩. الْقِصَّةُ অর্থ- কাহিনী, ঘটনা। যেমন- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَبِيفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ অর্থাৎ আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে?

৪. الْعَبْدُ অর্থ- নতুন। যেমন বলা হয়- هَذَا أَمْرٌ حَدِيثٌ অর্থাৎ এটা নতুন বিষয়।

৫. النَّصِيحَةُ অর্থ- উপদেশ। যেমন- وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ অর্থাৎ আমি তাদেরকে উপদেশস্বরূপ করছি।

৬. قَلِيلٌ অর্থ- অল্প বয়স্ক। যেমন বলা হয়- فَلَا نَحْدِيثُ السِّنِّ অর্থাৎ অমূকের বয়স কম।

৭. **أَرْتَوَيْتُ** অর্থ- স্বপ্ন। যেমন- **وَعَلَّمَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ** অর্থাৎ আপনি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন।

حَدِيث শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো **أَحَادِيث**।

২. হাদীসের পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসীনে কেরামসহ অন্যান্য ওলামাগণের মহলে **حَدِيث** শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যথা-

(১) **الْحَدِيثُ** : **هُوَ اقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَفْعَالُهُ ، وَسَهْوُهُ ، وَتَقَارِيرُهُ ، وَتُرُوكُهُ ، وَمَا هُم بِهِ فَعَعَلَهُ أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ ، وَأَحْوَالُهُ ، وَشَمَائِلُهُ ، وَصِفَاتُهُ الْخَلْقِيَّةُ وَالْخَلْقِيَّةُ حَتَّى الْحَرَكَاتِ ، وَالسَّكَنَاتِ فِي الْبَقِيَّةِ وَالنَّمَامِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعَةِ أَوْ بَعْدَهَا .**

১. হাদীস হলো নবী করীম ﷺ -এর উক্তি, কর্ম, ভ্রান্তি, অনুমোদন, বর্জন, ইচ্ছা চাই তা বাস্তবে করেন অথবা না করেন, অবস্থা, জীবনচরিত, সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুণাবলি, এমনকি জাহাজ ও ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতি। চাই এগুলো নবুয়ত লাভের পূর্বে হোক অথবা পরে হোক।

(২) **الْحَدِيثُ** : **مَا أُصِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ ، أَوْ تَرْكِ ، أَوْ سِرٍّ ، أَوْ خَالٍ ، أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خَلْقِيَّةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعَةِ أَوْ بَعْدَهَا .**

২. হাদীস হলো, নবী করীম ﷺ -এর প্রতি সম্বন্ধিত উক্তি, কর্ম, অনুমোদন, বর্জন, ইচ্ছা, জীবনী, অবস্থা, সৃষ্টিগত বা চরিত্রগত গুণ। চাই তা নবুয়তের পূর্বের হোক অথবা পরের হোক।

(৩) **الْحَدِيثُ** : **اقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَفْعَالُهُ ، وَتُرُوكُهُ ، وَتَقَارِيرُهُ ، وَمَا هُم بِهِ ، وَأَحْوَالُهُ ، وَشَمَائِلُهُ ، وَسَائِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِشَوْئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ بَيْعَتِهِ ، وَمَا يُطْلَبُ فِيهِ التَّائِيْدُ ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ .**

৩. হাদীস হলো নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত পরবর্তী ঐ সকল উক্তি, কর্ম, বর্জন, অনুমোদন, ইচ্ছা, অবস্থা, চরিত্র এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত গঠন কিংবা তা হতে শরয়ী হুকুম নির্ণয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

(৪) **قَالَ السَّخَّارِيُّ فِي فَتَحِ الْمَغِيبِ ١ : ٣٩ : وَكَذَا أَثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ وَفَتَاوَاهُمْ ، وَمَا كَانَ السَّلَفُ يَطْلُقُونَ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ .**

৪. ফাতহুল মুগীছ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় ইমাম সাখাবী (র.) লেখেন- সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন প্রমুখের উক্তি, কর্ম, অনুমোদন ইত্যাদির উপরও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম 'হাদীস' শব্দ ব্যবহার করতেন।

(৫) **قَالَ الْفَقِيهَ نَجْمُ الدِّينِ الْقَمُولِيُّ : قَدْ كَانَ السَّلَفُ يَطْلُقُونَ الْحَدِيثَ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْأَسَانِيدِ وَأَثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ .**

৫. ফকীহ নাজমুদ্দীন (র.) বলেন, পূর্বসূরি মহান ওলামায়ে কেরাম 'হাদীস' শব্দটি হাদীসের সনদের অর্থেও ব্যবহার করতেন এবং সাহাবা, তাবেঈন প্রমুখের উক্তি কর্মের উপরেও। যেমন বলা হয়- **طَرِيقٌ فَلَانَ لِلْحَدِيثِ الْمَبْحُوثِ عَنْهُ أَصَحُّ مِنْ طَرِيقِهِ** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **حَدِيثٌ فَلَانَ أَصَحُّ** অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির আলোচ্য সনদ বা সূত্রটি তার অন্য সনদ অপেক্ষা সহীহ।

পাঁচ অর্থের মধ্যকার প্রভেদ : চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে তা খুবই সুস্পষ্ট, ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে না। কিন্তু প্রথম তিন অর্থের মধ্যকার ব্যবধান যেমনি সূক্ষ্ম তেমনি বুঝারও বটে। তাই সেগুলোর পার্থক্য বা ভিন্নতা নিম্নে সবিস্তারে তুলে ধরা হলো-

হাদীসের উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে মাত্র একটি দিক থেকে। তা হলো, দ্বিতীয় অর্থের দাবি অনুযায়ী 'হাদীস' শব্দ ঐ সকল বিষয় शामिल করে যা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি

সম্বন্ধযুক্ত। চাই এ 'সম্বন্ধ' বাস্তবতার বিচারে সঠিক হোক বা ভ্রান্ত হোক। পক্ষান্তরে হাদীসের প্রথম অর্থটি এর বিপরীত। কেননা, প্রথম অর্থ অনুযায়ী হাদীস কেবল সেটাই হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যার সম্বন্ধ বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। অর্থাৎ প্রথম অর্থ অনুযায়ী 'হাদীস' হতে হলে শুধু নবী করীম ﷺ -এর প্রতি সম্বন্ধকৃত হলেই হবে না, বরং এ সম্বন্ধ নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে।

এ ব্যাখ্যা অনুপাতে উসুলুল-হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত ভাষা :

وَمَوْضُوعُ -এর মধ্যকার 'الْعَدِيثُ' শব্দটি হাদীসের আলোচিত দ্বিতীয় অর্থেই প্রযোজ্য ও ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে আমরা كُتِبَ الْعَدِيثُ বা হাদীসের কিতাব যা বলি এখানেও الْعَدِيثُ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি-

(১) مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِعَدِيثٍ بَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

(২) اتَّقُوا الْعَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعِدٍّ فَلْيَتَبَرَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

এসব রেওয়াজেতের মধ্যস্থ 'الْعَدِيثُ' শব্দটি হাদীসের দ্বিতীয় অর্থে প্রযোজ্য ও ব্যবহৃত।

এর বিপরীতে নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসগুলো-

(১) نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَتْ حَدِيثًا فَحَفِظَتْهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ، فَرَبَّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرَبَّ حَامِلٍ فِيهِ لَبَسَ بِفَقِيهِ .

(২) حَدَّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ .

(৩) أَلَلَّكُمْ أَزْهَمَ خُلَفَائِي، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَنْ هُمْ خُلَفَاؤُكَ ؟ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ أَحَادِيثِي يُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ .

(৪) مَنْ حَفِظَ عَلَى أَمْرِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فَمِنْ دِينِيهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فِيهَا، وَكَتَبْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا .

এর মধ্যকার 'الْعَدِيثُ' শব্দটি হাদীসের প্রথম অর্থে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যার সম্বন্ধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

এ ব্যাখ্যা হতে জানা গেল যে, হাদীসের পরিচয় হিসেবে প্রথম সংজ্ঞাটি উল্লেখ করে পুনরায় তাকে 'সহীহ', 'হাসান', 'যা'ঈফ' ইত্যাদি প্রকারে ভাগ করা যাবে না। এমন করলে সুস্পষ্ট ভুল হবে। কেননা, হাদীসের প্রথম অর্থ হিসেবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, যার সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এ কথা স্বীকার করে পরক্ষণেই যদি এমন হাদীসকে সহীহ, যা'ঈফ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু উক্তি সহীহ, আর কিছু উক্তি যা'ঈফ। অথচ বাস্তব কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি উক্তিও যা'ঈফ বা দুর্বল হতে পারে না। প্রত্যেকটিই দিবালোকের ন্যায় সত্য ও অশ্রুত।

এ আলোচনা হতে এটা বুঝার অবকাশ নেই যে, সহীহ, হাসান, যা'ঈফ ইত্যাদি ভাগে হাদীসকে আর ভাগ করা যাবে না কিংবা এমন প্রকরণ ঠিক নয়। বরং সঠিক তথ্য হলো, হাদীসের দ্বিতীয় যে অর্থ করা হয়েছে অর্থাৎ مَا أُصِيبَ إِلَى النَّبِيِّ - সেই অর্থ অনুযায়ী হাদীসের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। যদি

রাসূলের প্রতি সম্বন্ধটা সন্দেহাতীতভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা 'সহীহ' হবে। আর যদি সম্বন্ধটা মৌলিকভাবে প্রমাণিত হলেও কিছুটা দুর্বলতা রয়ে যায়, তখন সেটা হাসান হবে। এর বিপরীতে রাসূলের প্রতি সম্বন্ধটা যদি নিতান্তই দুর্বল সূত্রে হয় এবং তা প্রমাণের স্তর কোনোভাবেই অতিক্রম না করে, তখন তা যা'ঈফ হবে। অবশ্য যা'ঈফেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সব যা'ঈফ একই মানের নয়। পূর্বে হাদীসের যে তৃতীয় অর্থ লেখা হয়েছে মুহাদ্দিসীনসহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম 'الْعَدِيثُ' শব্দটি সে অর্থেই বেশির ভাগ ব্যবহার করেন। এ সময় 'الْعَدِيثُ' শব্দটি 'السُّنَّةُ' -এর অর্থ দেয় যা শরিয়তের দ্বিতীয় দলিল এবং ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস।

হাদীসের এই তৃতীয় অর্থ ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে প্রভেদ দু' দিক থেকে হয়। যথা—

১. তৃতীয় অর্থে হাদীস তখনই হয় যখন তার সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে হাদীস হতে কেবল ন্যূনতম সম্বন্ধই যথেষ্ট।
২. তৃতীয় অর্থে হাদীস হতে হলে তা যেমনি নব্যুত পরবর্তী হতে হবে, তেমনি তার সাথে শরিয়ত গঠন কিংবা তা শরয়ী হুকুমের উৎস হতে হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে হাদীসের মধ্যে এমন কোনো শর্ত নেই। হাদীসের তৃতীয় ও প্রথম অর্থের মধ্যে ঠিক এ দ্বিতীয় প্রভেদটি বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি— نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَبَعَ مِثْلًا حَدِيثًا
এর মধ্যে ব্যবহৃত الْحَدِيثُ শব্দটি হাদীসের তৃতীয় অর্থেও ব্যবহৃত।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সবক ও শিক্ষা রয়েছে। আর তা হলো, الْحَدِيثُ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিভিন্ন অর্থ থাকায় কুরআন-হাদীসসহ যে কোনো গ্রন্থের (যেমন— উসুলুল হাদীসের কিতাবাদি ইত্যাদি) الْحَدِيثُ শব্দের ঢালাওভাবে একই অর্থ করা যাবে না। চিন্তাভাবনা করে সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য নিরূপণ না করে মনগড়া যে কোনো অর্থ করা ঠিক হবে না। পূর্বে উল্লিখিত হাদীসগুলো এর জলন্ত প্রমাণ।

الْحَدِيثُ শব্দের উল্লিখিত বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে—

১. ফাতহুল বারী ১৩ : ২৫২-২৫৩, ২. তাওযীহন নয়র ইলা উসুলিল আছর ১ : ৩৭, ৩. লামহাতু মিন তারীখিস সুন্নতি ওয়া উলমিল হাদীস— ১১-১৬।

খবর ও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং পরস্পরের মধ্যকার পার্থক্য :

সম্মানিত লেখক 'খবর' -এর প্রকরণ উল্লেখের পূর্বে খবর ও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং তন্মধ্যকার পার্থক্য ও পরস্পর সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। তিনি এ পর্যায়ে তিনটি উক্তি তুলে ধরেছেন। যথা—

১. الْخَبَرُ وَ الْحَدِيثُ -এর মধ্যে تَرَادُفٌ وَ تَسَاوٍ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ উভয়টি একই; তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম এবং অনুমোদনকে যেমনি 'খবর' বলে তেমনি 'হাদীস'ও বলে। এটাই হলো অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত।

২. কারো কারো মতে, খবর ও হাদীস-এর মধ্যে تَبَایُنٌ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণিত তাকে হাদীস বলে আর তিনি ব্যতীত অন্যদের থেকে যা বর্ণিত তাকে খবর বলে। এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যারা ইতিহাস, কাহিনী ইত্যাদি চর্চা করে তাদেরকে আখবারী বা ঐতিহাসিক বলে, আর যারা হাদীস নিয়ে গবেষণা ও তার চর্চা করে তাদেরকে মুহাদ্দিস বলা হয়।

৩. কারো কারো মতে 'খবর' ও 'হাদীস' -এর মধ্যে عُمُومٌ خُصْرُصٌ مُطْلَقٌ -এর সম্পর্ক। হাদীস খাস আর খবর আম। অর্থাৎ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে খাস আর খবর রাসূলসহ অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এ সংজ্ঞা অনুপাতে প্রত্যেক হাদীস খবরও, কিন্তু প্রত্যেক খবর হাদীস নয়।*

الْحَدِيثُ -এর সমার্থবোধক আরেকটি শব্দ হলো الْأَثَرُ। কেউ কেউ বলেছেন, الْأَثَرُ টি الْحَدِيثُ -এর مُرَادُفٌ বা সমার্থবোধক। আবার কারো কারো অভিমত, সাহাবী এবং তাবঈঈ-এর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদনকে কেবল أثر বলে। অর্থাৎ তাদের মতে الْحَدِيثُ যেমন রাসূলের সাথে খাস তেমনি الْأَثَرُ শব্দটি সাহাবী ও তাবঈঈদের সাথে খাস।

بِالتَّوَرِيعِ : এটা تَارِيخ -এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো—التَّوَرِيعُ বা সময় নির্ণয় করা। পরিভাষায় تَارِيخ বলা হয়—

* অবশ্য কেউ কেউ এ কথাতে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, এমনটি হওয়া জরুরি নয়; বরং এর বিপরীতও হতে পারে। কেননা, অনেক হাদীস খবর না হয়ে إِسْنَاءٌ হয়, ফলে তখন তা আর খবর হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খবর ও হাদীসের মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক সাবেদ হয়। তা হলো, رَسْبَةُ عُمُومٌ وَخُصْرُصٌ مِنْ وَجْهِ।

مَوْعِدٌ يَضْبُطُ بِهِ أَوْقَاتُ الْحَرَاحِ وَالْوَقَائِعِ، كَجُلُوسِ السَّلَاطِينِ عَلَى السَّرِيرِ، وَاسْتِبْلَاحِهِمْ عَلَى الْبِلَادِ، وَوُجُوحِ الْقَحْطِ وَالْمَلَاعُونِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَى.

অর্থাৎ যে বিদ্যা বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সময় ও কাল জানায়, তাকে বলে তারীখ বা ইতিহাস। যেমন-রাজা-বাদশাদের সিংহাসনে আরোহণের সময়-ক্ষণ, রাজ্যজয়, দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির মতো অসংখ্য বিষয় কোন দেশে কখন হয়েছিল।

مَوْعِدٌ : এর অভিধানিক অর্থ- যারা সংবাদ আদান-প্রদানের পেশায় নিয়োজিত। তবে শব্দটি মুওঈ তথা ঐতিহাসিক-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, তারাও মূলত অতীতের সংবাদ পরিবেশন করেন।

الْمَوْعِدُ : এখানে শব্দটি حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হলেও মূলত শব্দটি এর সাথেই খাস নয়; বরং সাহাবী ও তাবঈ -এর রেওয়ায়েতও যারা বর্ণনা করেন কিংবা তার চর্চা করেন, তাদেরকেও মুহাদ্দিস বলা হয়। এখানে تَغْلِيْبٌ বা আধিক্যের দিক বিবেচনায় বলা হয়েছে মাত্র।

تَغْلِيْبٌ : এখানে تَغْلِيْبٌ টি فَاءٌ -এর কারণ দর্শনের জন্যও হতে পারে। আর তা হলো এই যে, খবর ও হাদীসের মধ্যে عَامٌ - خَاصٌ -এর সম্পর্কের কারণ হলো, প্রত্যেক হাদীস খবর হয় কিন্তু এর বিপরীত হয় না তথা প্রত্যেক খবর হাদীস হয় না।

إِسْمٌ إِشَارَةٌ قَرِيبٌ : এখানে هُنَا শব্দটি عَرَبٌ - وَغَيْرُهَا -এর অর্থে هُنَا বলতে উদ্দেশ্য মতন। অর্থাৎ الْخَبَرُ ও الْحَدِيثُ শব্দদ্বয়ের মধ্য হতে الْخَبَرُ শব্দকে মতনে উল্লেখ করা হয়েছে।

الْخَبَرُ : কে উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করা -এর মধ্য হতে মতনে الْخَبَرُ ও الْحَدِيثُ -এর মধ্য হতে মতনে الْحَدِيثُ শব্দের তুলনায় الْخَبَرُ শব্দটি عَامٌ বা ব্যাপকার্থবোধক এবং তা সমস্ত আহকামের ক্ষেত্রে الْحَدِيثُ -এর অর্থও শামিলকারী, সেহেতু মতনে الْخَبَرُ শব্দটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

الْحَدِيثُ : কে শামিল করার ব্যাখ্যা : যেহেতু এদের মধ্যে তিন ধরনের নিসবত বা সম্পর্ক সাবেত করা হয়েছে, তাই তিন দৃষ্টিকোণ থেকে 'শামিল' -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

১. تَرَادُفٌ -এর অবস্থায় : যে সূরতে খবর ও হাদীস -এর মধ্যে تَرَادُفٌ -এর সম্পর্ক সে সূরতে الْخَبَرُ যে الْحَدِيثُ -কে পূর্ণমাত্রায় শামিলকারী তা যেমনি সুস্পষ্ট, তেমনি ব্যাখ্যার উর্ধ্বে। কেননা, এ সূরতে খবর ও হাদীস একই বিষয়।

২. تَبَاطُؤٌ -এর অবস্থায় : এ সূরতে الْخَبَرُ শব্দটি الْحَدِيثُ -কে এভাবে শামিল রাখে যে, খবর তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়েবের খবরের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন শর্তসমূহ অবলম্বন করতে হয়, তাহলে এ সকল শর্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবলম্বিত হবে।

৩. عَامٌ خَاصٌ مُطْلَقٌ -এর অবস্থায় : এ সূরতে খবরটা যেহেতু আম' এবং হাদীসটি খাস আর কায়দা আছে যে- مَا كُنْتُ لِأَعْمٍ نَبَتْ لِأَخَصٍ অর্থাৎ কোনো বিষয় عام -এর জন্য সাবেত হলে তা এমনিই خاص -এর জন্য সাবেত হয়, সেহেতু الْحَدِيثُ -কে الْخَبَرُ -এর শামিল করাটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

فَهُوَ يَاعْتَبَارِ وَصُولِهِ إِلَيْنَا أَمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرِيقٌ أَيْ أَسَانِيدُ كَثِيرَةٌ ، لِأَنَّ طَرِيقًا جَمْعُ طَرِيقٍ ، وَقَعِيلٌ فِي الْكَثَرَةِ يُجْمَعُ عَلَى فَعِيلٍ بِضَمَّتَيْنِ ، وَفِي الْقِلَّةِ عَلَى أَفْعِلَةٍ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّطَرُّقِ الْأَسَانِيدُ ، وَالْإِسْنَادُ حِكَايَةُ طَرِيقِ الْمَتَنِ ، وَالْمَتْنُ هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ مِنَ الْكَلَامِ .

অনুবাদ : খবর আমাদের পর্যন্ত হয়তো তুরূক তথা অনেক সনদে পৌছবে। (অনেক সনদ বলার কারণ হলো,) কেননা, طَرِيق শব্দটি طَرِيق -এর বহুবচন। আর فَعِيل -এর ওয়ানে আগত শব্দটির جَمْع হয় فَعِيل -এর ওয়ানে এবং أَفْعِلَة হয় أَفْعِلَة -এর ওয়ানে।

অবশ্য এখানে طَرِيق দ্বারা উদ্দেশ্য সনদ তথা সূত্র। 'সনদ' হলো মতন বা মূলভাষ্যের সূত্র বর্ণনা অর্থাৎ হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করা। সনদ যে বক্তব্যে গিয়ে শেষ হয় অর্থাৎ রাবীদের নামের (সনদের) শেষে যে বক্তব্য আসে তাকে 'মতন' বা মূলভাষ্য বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّنَدُ -এর অর্থ : দু'ভাবে এর অর্থ বর্ণনা করা যায়। যথা-

১. আভিধানিক অর্থ : অভিধানে শব্দটি তিনভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা-

প্রথম : السَّنَدُ একবচন। এর বহুবচন سَنَدَاتٌ অর্থ- ১. সনদ, ২. স্বীকৃতিপত্র, ৩. প্রতিশ্রুতিপত্র, ৪. প্রমাণপত্র, ৫. দস্তাবেজ, ৬. আইনানুগ কাগজ, ৭. রশিদ (মেমো)।

দ্বিতীয় : السَّنَدُ একবচন। এর বহুবচন إِسْنَادٌ অর্থ- ১. ঠেকনা, ২. ঠেস, ৩. অবলম্বন, ৪. ভরসার স্থল, ৫. নির্ভরতার ক্ষেত্র ইত্যাদি।

তৃতীয় : السَّنَدُ একবচন। এর বহুবচন أَسَانِيدُ অর্থ- ১. সনদ, ২. বর্ণনার সূত্র, ৩. বর্ণনাকারীদের পরম্পরা।

২. পারিভাষিক অর্থ : সনদের পারিভাষিক অর্থ হলো- سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُؤَصِّلَةِ إِلَى الْمَتَنِ

অর্থাৎ মতন পর্যন্ত রাবীদের পরম্পর ধারাক্রমকে সনদ বলে।

অন্যকথায়, হাদীসের মূল বক্তব্য শুরু হওয়ার পূর্বে রাবীদের যে নামগুলো থাকে ঐ নামগুলোকে সংক্ষেপে সনদ বলে।

الْإِسْنَادُ -এর অর্থ : অভিধানে الْإِسْنَادُ শব্দটি وَاحِدٌ বা একবচন। এর جَمْع বা বহুবচন হলো أَسَانِيدُ অর্থ- (তর্কবাগীশদের মতে,) উদ্ধৃতি দেওয়া। (নাহ্‌বিদদের মতে,) দু শব্দের মাঝে পূর্ণ অর্থবহ সংযোগ বা সংযোগসাধন।

পরিভাষায় الْإِسْنَادُ -এর কয়েকটি অর্থ আছে। যথা-

(١) الطَّرِيقُ الَّذِي يَطْلُقُ عَلَى مَا يُوصَلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ مُطْلَقًا .

অর্থাৎ ঐ সূত্র পরম্পরা যা সরাসরি ঈজিত লক্ষ্যে পৌছে দেয়।

(٢) حِكَايَةُ طَرِيقِ الْمَتَنِ أَيْ حِكَايَةُ أَسَانِيدِ رَوَاةِ الْمَتَنِ .

অর্থাৎ মতন তথা হাদীসের রাবীদের নামগুলো উল্লেখ করা।

উল্লেখ্য যে, এখানে أَسَانِيد শব্দটি إِسْنَاد -এর বহুবচন এবং এ অর্থেই ব্যবহৃত।

(۳) عَزَّوَالْحَدِيثِ إِلَى قَائِلِهِ مُسْنَدًا .

অর্থাৎ সনদে মুত্তাসিলের সাথে তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে **قَائِلٌ** পর্যন্ত (অর্থাৎ যার হাদীস তার পর্যন্ত)
হাদীসকে পৌছানো। (৬) **الْإِسْنَادُ هُوَ مُرَادُّ لِّلْمُسْنَدِ** .

ইসনাদ এটা সনদের সমার্থবোধক। অর্থাৎ শব্দগত পার্থক্য হলেও তাদের অর্থ এক ও অভিন্ন।*

إِسْتِنَادٌ শব্দটি اَلْمَسْنَدُ-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অনেক নজির রয়েছে। যেমন- اَلْاِسْتِنَادُ مِنَ الدِّينِ ইত্যাদি।
 اَلْمَتْنُ-এর অর্থ: اَلْمَتْنُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন আসে مَتْنُونَ ও مَتَانٌ। পিঠ। তবে
 শব্দটি বিভিন্ন নিসবতে বিভিন্ন অর্থ দেয়। যেমন- اَرْتَمَنَ الثَّيْبُ- বস্তুর বাইরের অংশ। مَتْنٌ
 اَرْتَمَنَ اَلْكِتَابَ-রাস্তার মধ্যস্থল। اَرْتَمَنَ الطَّرِيقَ- ভূপৃষ্ঠের উঁচু ও সমতল অংশ। اَرْتَمَنَ اَلْاَرْضَ
 -বইয়ের মূল অংশ (টীকা ইত্যাদি ছাড়া)। اَرْتَمَنَ اَللُّغَةَ- ভাষার মৌলিক নিয়ম-কানুন ও একক
 শব্দসমূহ। তবে مَتْنٌ فِى اَللُّغَةِ مَا يَتَقَرَّرُ بِهِ-এর অর্থ করা হয়েছে- اَرْتَمَنَ جَوَاهِرُ اَلْاَصْوِلِ-এর অর্থ করা হয়েছে-
 اَرْتَمَنَ অর্থাৎ অভিধানে মতন হলো যার দ্বারা কোনো কিছু বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়।

(১) هُوَ الْفَاطُ الْحَدِيثُ الَّتِي يَتَقَدَّمُ مِنْهَا السُّنَدُ -এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যথা-

অর্থাৎ হাদীসের মূল শব্দসমূহ, যার পূর্বে সনদ থাকে।

(۲) هُوَ الْفَاطُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا الْمَعَانِي .

অর্থাৎ হাদীসের ঐ সকল শব্দ যার দ্বারা অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(۳) هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ مِنَ الْكَلَامِ.

অর্থাৎ সনদের শেষে যে বক্তব্য আসে তার নাম মতন।

সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, হাদীসের রাবীদেরকে সনদ বলে আর সনদের পরে যে কথা থাকে তাকে মতন বলে। আর এই সনদ-মতন উভয়কে একত্রে হাদীস বা রেওয়ায়েত বলে। আবার কখনো পৃথক পৃথকভাবেও বলা হয়। অর্থাৎ রাবীদেরকে সনদ এবং মতনকে হাদীস বলা হয়।

বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বিচারে খবরের প্রকরণ

এর প্রকারসমূহ বর্ণনা করার **الْغَبْرُ** -এর থেকে সম্বানিত লেখক **الْغَبْرُ** "إِنَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ" এখান থেকে

প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর আলোচনার সারকথা নিম্নরূপ—

রাবীদের সংখ্যার (স্বল্পতা-বৃদ্ধির) দিক দিয়ে কিংবা আমাদের পর্যন্ত পৌছানোর পন্থাগত দিক দিয়ে খবর মৌলিকভাবে দু'প্রকার। যথা— ১. খবরে মৃত্যুওয়াতির এবং ২. খবরে ওয়াহিদ।

খবরে ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার। যথা- ১. মশহূর, ২. আযীয ও ৩. গরীব।

গরীবের আরেক নাম ফরদ। এই ফরদ আবার দু প্রকার। ১. ফরদে মুতলাক ও ২. ফরদে নিসবী।


তাহলে খবর মোট চার প্রকার হলো- ১. মৃত্যুওয়াতির, ২. মশাহূর, ৩. আযীয ও ৪. গরীব।

খবর চার প্রকারে সীমিত হওয়ার কারণ : হয়তো খবরটির রাবীর সংখ্যা অনেক হয়ে অনির্দিষ্ট হবে (অর্থাৎ সীমিত হবে না), অথবা অনেক হয়ে নির্দিষ্ট তথা-সীমিত হবে। প্রথম প্রকার হলে খবর মৃত্যুওয়াতির হবে। আর দ্বিতীয় রকম হলে হয়তো রাবীর সংখ্যা সনদের কোনো স্থানে একজন হবে বা দুজন হবে অথবা এর থেকে বেশি হবে। সনদের কোথাও রাবীর সংখ্যা একজন হলে তাকে গরীব বলে, দুজন হলে তাকে আযীয বলে আর দুয়ের বেশি হলে তাকে মাস্‌হুর বলে।

* এ আলোচনা প্রমাণ করে যে, **اُنْسَادٌ** -এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এটা **سُنْدٌ** -এরই অপর নাম। আর কারো মতে, **سُنْدٌ** এক জিনিস আর **اِنْشَادٌ** আরেক জিনিস। আর তা হলো, **سُنْدٌ** মানে সূত্র তথা রাবী। আর **اِنْشَادٌ** মানে ঐ সনদ বা রাবীদের উল্লেখ করা। যেমন- এভাবে বলা যে, **عَدْنَا فُلَانًا عَنْ كُلَّانٍ** অর্থাৎ সনদ বা রাবীদের কথা উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনার নাম **اِنْشَادٌ** (**اَوْجَزُ الْمَسَائِلِ ١ : ٨**)।

وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِإِلَّا حَضَرَ عَدِدٌ مُعَيَّنٌ بَلْ
تَكُونُ الْعَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُطَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَكَذَا رُقُوعُهُ مِنْهُمْ إِتِّفَاقًا
مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَلَا مَعْنَى لِتَعْيِينِ الْعَدَدِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ
عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ فِي الْخَمْسَةِ، وَقِيلَ فِي السَّبْعَةِ، وَقِيلَ فِي
الْعَشْرَةِ، وَقِيلَ فِي الْإِثْنَيْنِ عَشَرَ، وَقِيلَ فِي الْآرْتَعَيْنِ، وَقِيلَ فِي
السَّبْعَيْنِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ
ذَلِكَ الْعَدَدِ فَأَقَادَ الْعِلْمَ، وَلَيْسَ بِإِلَازِمٍ أَنْ يَطْرُدَ فِي غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ
الِاخْتِصَاصِ.

অনুবাদ : সনদের এ আধিক্যটাই হলো কোনো খবর মুতাওয়াতির হবার অন্যতম শর্ত। সনদের এ আধিক্যটা সুনির্দিষ্ট সংখ্যার সীমাবদ্ধতার সাথে নয়; বরং এমন সংখ্যার সাথে হতে হবে যে, স্বভাবত বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে এরূপ মনে করা অসম্ভব হয় যে, তারা সকলে মিথ্যার উপর একমত হয়েছেন কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাক্রমে সকলের দ্বারা একই মিথ্যাচার সংঘটিত হয়েছে।

তাই নির্ভরযোগ্য মত হলো, এখানে (মুতাওয়াতিরের ক্ষেত্রে) সংখ্যা-সীমা নির্ধারণ করার কোনো অর্থ নেই। তবে কেউ কেউ চার-এ নির্ধারণ করেছেন। কেউ পাঁচ, কেউ সাত, কেউ দশ, কেউ বারো, , কেউ চল্লিশ, আবার কেউ সত্তর নির্ধারণ করেছেন। অনেকে অন্য সংখ্যাও বলেছেন। প্রত্যেকেই এমন একটি দলিল পেশ করেছেন যাতে উক্ত সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে এবং তা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দিয়েছে। অথচ এটা মোটেও জরুরি নয় যে, (একটি সংখ্যা একটি ক্ষেত্রে যেভাবে নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দিয়েছে তেমনি) অন্যক্ষেত্রেও ফায়দা দেবে। কেননা, এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা (নির্দিষ্ট সংখ্যার ফায়দা দেওয়াটা) সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে সীমাবদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্বেক্ত **كَثْرَةُ طُرُقٍ** তথা সনদের আধিক্যটা। খবর মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য এ **كَثْرَةُ أَسَانِيدٍ** যেমন শর্ত তেমনি এটাও আরেকটি শর্ত যে, এই আধিক্যটা কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয় যে, উক্ত সংখ্যা এত হতে হবে, বরং উদ্দেশ্য হলো উক্ত অধিক সংখ্যা এমন পরিমাণ হতে হবে, সাধারণত বিবেক যাদের মিথ্যার উপর পরামর্শসাপেক্ষে একমত হওয়া কিংবা ঘটনাক্রমে সকলের মিথ্যাচার করা অসম্ভব বলে মনে করে।

وَالْأَرْبَعَةُ : এর সংজ্ঞা হলো—

هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ قَوْمٌ عَلَى اخْتِرَاعِ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْمُسَاوَرَةِ بِأَنْ لَا يَقُولَ أَحَدٌ خِلَافَ صَاحِبِهِ.

অর্থাৎ পরামর্শসাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর একদল লোকের ঐকমত্য পোষণ করা যে, স্বাম্বাদের কেউ অন্যের বিপরীত বলবে না।

এর বিপরীতে **الْتَرَافُ** বলা হয়- **حُصُولُ هَذَا الْإِخْتِرَاعِ مِنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ وَلَا إِتْفَاقٍ عَلَى إِخْتِرَاعِهِ** বলা হয়- অর্থাৎ পরামর্শ ও পরিকল্পনা ছাড়াই কোনো বিষয়ের উপর ঐকমত্য অর্জিত হওয়া।

عَلَى الصَّحِيحِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য জুমহরের মায়হাবের দিকে ইশারা করা এবং এটা প্রতিপন্ন করা যে, মুতাওয়াতিরের সুনির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারে জুমহরের মত ও অবস্থান হলো, এর জন্য ধরাবাঁধা কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা শর্ত নয়। জুমহরের বিপরীতে আরো যে সমস্ত দুর্বল অভিমত রয়েছে সম্মানিত লেখক "قَبْلَ" শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করেছেন।

بَطَرُهُ : এর অর্থ হলো **يَتَحَقَّقُ** অর্থাৎ সাব্যস্ত হওয়া। **بَطَرُهُ** : এর **فَاعِلٌ** এখানে উহ্য রয়েছে। আর তা হলো, **ذَلِكَ الْإِنْفَادُ** অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সংখ্যার নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেওয়াটা।

لِإِخْتِمَالِ الْإِخْتِصَاصِ : এর স্বাভাবিক অর্থ, খাস হওয়ার সম্ভাবনার কারণে। এর আসল রূপ হলো **لِإِخْتِمَالِ إِخْتِصَاصِ ذَلِكَ الْعِدَّةِ الْمُعَيَّنِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ** অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সংখ্যাটি তার স্বস্থানে সুনির্ধারিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনার কারণে।

খবরে মুতাওয়াতিরের আলোচনা

খবরে মুতাওয়াতির সংক্রান্ত আলোচনায় কয়েকটি দিক প্রণিধানযোগ্য। যথা- ১. মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা, ২. মুতাওয়াতিরের শর্ত, ৩. মুতাওয়াতিরের হুকুম, ৪. মুতাওয়াতিরের উদাহরণ বাস্তবে আছে কিনা, ৫. মুতাওয়াতিরের প্রকারভেদ, ৬. মুতাওয়াতিরের জন্য রাবীর সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সীমা আছে কিনা? এ ছয়টি বিষয় সম্মানিত লেখকের আলোচনায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মুতাওয়াতিরের রাবীর সংখ্যা সীমা সুনির্দিষ্ট হওয়া জরুরি কিনা?

কোনো হাদীস বা খবর মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য রাবীর সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি কিনা- এ প্রশ্নে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. জেনা-ব্যাভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন সাক্ষীর উপর কিয়াস করে কেউ কেউ রাবীর সংখ্যা চারজন হওয়াকে জরুরি বলেছেন।
২. কারো মতে রাবীর সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচজন হতে হবে। কেননা, লে'আন সাবেত হয় পাঁচবার সাক্ষ্যের মাধ্যমে।
৩. কারো মতে ৭ জন লাগবে। কেননা, আসমানের সংখ্যা সাত।
৪. কারো মতে দশজন হতে হবে। তাদের দলিল হলো- **تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ**
৫. কেউ কেউ বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধি সংখ্যা বারো থাকায় এখানেও বারো সংখ্যার কথা বলেছেন।
কুরআনে এসেছে- **رَبَعْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَفْسًا**

৬. কেউ কেউ চল্লিশ সংখ্যার কথা বলেছেন। তাদের দলিল হলো- **حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتْبَعَكَ مِنْ** এই আয়াত। কেননা, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ **ﷺ** -এর প্রতি নাজিল হওয়ার মুহূর্তে ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ।

৭. কারো অভিমত, ৭০ জন হতে হবে। তার দলিল হলো- **وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ رَجُلًا** এ আয়াতটি। কেননা, এখানে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ৭০ জন নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে।

৮. কারো কারো অভিমত ৩১৩-এর পক্ষে। কেননা, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল ৩১৩।

উপরোক্ত ৮ দল মুতাওয়াতিরের জন্য সুনির্দিষ্ট সংখ্যা-সীমা নির্ধারণের প্রবক্তা। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দাবি কুরআন, হাদীস কিংবা যুক্তির আলোকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এর বিপরীতে জুমহর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের সুচিন্তিত অভিমত হলো, খবরে মুতাওয়াতির সাবেত হওয়ার জন্য রাবীর সংখ্যা-সীমার সুনির্দিষ্টতা নিশ্চয়োজন। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সংখ্যা কোনো ধর্তব্য নয়; বরং জরুরি হলো মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহের উপস্থিতি। এ ব্যাপারে এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য অভিমত। কারণ, এর বিপরীতে সংখ্যা-সীমা নির্ধারণ করতে গেলে একে তো তার মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে যে, সে সংখ্যা কত হবে? দ্বিতীয়ত প্রত্যেক সংখ্যার পশ্চাতে যে দলিল পেশ করা হয়েছে, তাতে এর নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি যে, যে কোনো ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ফলপ্রসূ ও তার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক দলিলের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি সংশ্লিষ্ট স্থানেই খাস ও সীমিত হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোনো সংখ্যাই আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেবে না। আর এ কায়দা ও মূলনীতি তো সুবিদিত যে-

فَإِذَا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ بَطَلَ الْأَسْتِدْلَالُ۔

অর্থাৎ প্রত্যেকটি দলিল দ্ব্যর্থহীন হওয়া আবশ্যিক। কোনো দলিল দ্ব্যর্থবোধক কিংবা দ্বিমুখী হলে তার দালিলিক যোগ্যতা বাদ হয়ে যায়।

বস্তুত সম্মানিত লেখক " **وَلَيْسَ يَلَازِمُ أَنْ يَطْرُدَ فِي غَيْرِهِ لَاحْتِمَالِ الْإِخْتِصَاصِ** " বলে এ মূলনীতির দিকেই ইশারা করে সংখ্যা সীমিত নির্ধারণের প্রয়াসকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذْلِكَ ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَنْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيهِ فِي الْكُثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ إِبْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَسْتِوَاءِ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْكُثْرَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَا أَنْ لَا يَزِيدَ ، إِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَطْلُوبَةٌ مِنْ بَابِ الْأَوَّلَى ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدُ انْتِهَائِهِ الْأَمْرَ الْمُشَاهِدَ أَوْ الْمَسْمُوعَ ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْلِ الصَّرَفِ .

فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ وَهِيَ عَدَدٌ كَثِيرٌ أَحَالَتِ الْعَادَةُ تَوَاطُنَهُمْ وَتَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ ، رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ إِلَى الْانْتِهَاءِ ، وَكَانَ مُسْتَنِدُ انْتِهَائِهِمُ الْحِسَّ ، وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَضَعَبَ حَبْرُهُمْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ لِسَامِعِهِ ، فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ ، وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ عَنْهُ كَانَ مَشْهُورًا فَقَطْ ، فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُورٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ إِذَا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصُولَ الْعِلْمِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ ، لَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْبَعْضِ لِمَانِعٍ ، وَقَدْ وَضَعَ بِهَذَا التَّفْصِيلَ تَعْرِيفُ الْمُتَوَاتِرِ .

অনুবাদ : সুতরাং যখন খবরটি এভাবে (অর্থাৎ অনির্দিষ্ট অনেক সূত্রে) বর্ণিত হবে এবং এই আধিক্যের সাথে এ (শর্ত) টাও যুক্ত হবে যে, উল্লিখিত আধিক্যটা খবরের মধ্যে খবরের শুরু (উৎসস্থল) থেকে নিয়ে শেষ (সম্মানিত লেখক) পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যথার্থভাবে বজায় থাকবে।

যথার্থভাবে বজায় থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য উল্লিখিত আধিক্যটা সনদের কোনো স্তরে কম না হওয়া। বেশি না হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এখানে (অর্থাৎ খবরের অধ্যায়ে) সনদের প্রতি স্তরে রাবী বেশি হওয়াটাই অধিক কাম্য ও প্রত্যাশিত।

আর খবরের সনদের শেষে (উৎসপ্রাপ্তে) দেখা অথবা শোনার কথা থাকবে। এমন বিষয় থাকলে চলবে না, যা বিবেকের দাবিতে সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ বিবেকলব্ধ বিষয়।

সুতরাং যখন খবর এই চার শর্তের সমন্বয়কারী হবে আর তা হলো— বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক হওয়া, স্বভাবত তাদের দ্বারা পরামর্শসাপেক্ষে কিংবা ঘটনাক্রমে মিথ্যা সংঘটিত হবার সম্ভাবনা না থাকা, সনদের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক সংখ্যক রাবী অনেক সংখ্যক রাবী হতে বর্ণনা করা, সনদের শেষে ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয় থাকা এবং এর সাথে (উল্লিখিত চার শর্তের সাথে) যখন এটাও যুক্ত হবে যে, তাদের (অনেক সংখ্যক রাবীদের) খবর শ্রোতাকে নিশ্চিত জ্ঞান ও বিশ্বাস দান করবে, তখন খবরটি 'মুতাওয়াতির' হবে। আর যে খবর থেকে নিশ্চিত বিশ্বাসটা দূরে থাকবে অর্থাৎ যে খবর 'নিশ্চিত বিশ্বাস' -এর ফায়দা দেবে না সেটা শুধু খবরে মশহুর হবে। অতএব, প্রতিটি মুতাওয়াতির মশহুর; এর বিপরীত নয়।

নিশ্চিত বিশ্বাস ব্যতিরেকে বাকি চার শর্ত পাওয়া গেলে তা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হওয়াকে অনিবার্য করে বলে যে কথাটি বলা হয় তা অধিকাংশ (খবরের) ক্ষেত্রে তদ্রূপ (বাস্তব) হলেও কোনো কোনো খবর আবার প্রতিবন্ধকতা হেতু এ (নিশ্চিত বিশ্বাসের) ফায়দা দেয় না।

এ আলোচনার দ্বারা মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা (পূর্ণ ও) সুস্পষ্ট হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَوْ الْمَسْئُورِ : অথবা সনদের শেষে অমর মস্মুও তথা প্রত্যক্ষভাবে শোনার কথা থাকবে। অর্থাৎ শেষ রাবী বলবেন- سَمِعْنَا বা سَمِعْتُ 'আমি নিজ কানে শুনেছি বা আমরা শুনেছি।' যদি শেষ রাবী

এরূপভাবে নিজ কানে শোনা বা নিজ চোখে দেখার কথা না বলে, তাহলে তা **مُتَوَاتِرٌ** হবে না। মোটকথা, বিষয়টি যদি শ্রুতিগত হয়, তাহলে **سَمِعْتُ** বলতে হবে আর যদি দর্শনগত হয়, তাহলে **رَأَيْتُ** বলতে হবে।

لَا مَأْتِ بِقُضِيَّةِ الْعَقْلِ الْمَصْرَفِ : এ বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ হলো- শুধু বিবেকলব্ধ বিষয় হলে হবে না। যেমন- رَزَادَةُ عَدَدِ الْاِثْنَيْنِ عَلَى الْوَاحِدِ، حَدُوثِ عَالَمٍ، وَجُودِ صَانِعٍ ইত্যাদি। কেননা, এগুলো সবই عَقْلِي তথা বিবেকগত, দর্শন বা শ্রুতিগত নয়। অতএব এগুলো مُتَوَاتِر নয়।

কিন্তু এ আলোচনা হতে এটা বুঝা ঠিক হবে না যে, তাহলে যে হাদীসে **عَنْ** বিষয় বর্ণিত হবে তাও **مُتَوَاتِرٌ** হবে না। কারণ হলো, শেষ রাবীর কথায় **عَنْ** বিষয় থাকা আর হাদীসে **عَنْ** বিষয় থাকা এক নয়। এখানে রাবীর কথার মধ্যে **عَنْ** বিষয় থাকাকে **نَقْلٌ** করা হয়েছে; হাদীসে উল্লিখিত **عَنْ** বিষয়কে নয়। কেননা, হাদীসটি **سَنَدٌ** নয়; বরং তা **مَنْ** বা **مِنْ** হয়েছে।

فَإِذَا رَدَّ الْخَبَرُ الْبَاقِيَ ^{পৰ্যন্ত} ^{পূৰ্ববৰ্তী} ^{বাক্য} ^{ইন্তِهائِهِمُ الْحِسَّ} : فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةَ ^এ ^{বাক্যটি} ^{তফসীৰ} ^{বা} ^{ব্যাখ্যা} . ^{অতএব} ^{উভয়ই} ^{এক} ^ও ^{অভিন্ন} . ^{উভয়টির} ^{শর্ত} ^{হিসেবে} ^{ব্যবহৃত} ^{হয়েছে} . ^{পরবর্তীতে} ^{আগত} ^{هُوَ الْمُتَوَاتِرُ} ^{বাক্যটি} ^{হলো} ^{এদের} ^{একটির} ^{جَزَاءُ} ; ^{আর} ^{অপরটির} ^{جَزَاءُ} ^{উহা} ^{রয়েছে} ^{যার} ^{উপর} ^{এই} ^{جَزَاءُ} ^{টি} ^{দালালত} ^{করে} .

... رَوَّأَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِهِمْ ... : শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সনদের সংখ্যা সমান বা বরাবর থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য প্রতি স্তরে এমন সংখ্যক সনদ থাকা, যা মিথ্যার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয় এবং অকাটা বিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। এখানে সংখ্যার বরাবরটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, হতে পারে কোনো স্তরে রাবীর সংখ্যা বেশি হয়েও ঐভাবে ইলমের ফায়দা দেবে না যেভাবে আরেক স্তরে রাবীর সংখ্যা কম হলে দেবে। কেননা, রাবীর মান নিশীত হয় তার গুণাবলির দ্বারা। হতে পারে কোনো স্তরে রাবীর মধ্যে এ গুণাবলি বেশি মাত্রায় থাকায় তাদের সংখ্যা কম হলেও তা বিশ্বাসের ফায়দা দেবে। আবার কোনো স্তরে রাবীর গুণাবলি স্বল্প হেতু ঐ ফায়দা তদ্রূপ দেবে না।

আর **مَفْعُول** তার **خَبَرُهُمْ** - **يَضَعُ** শব্দটি **فَعْل** : **أَنْ يَضَعَ خَبَرَهُمْ** **إِنَادَةَ الْعِلْمِ** **لِسَابِعِهِ** হলে তার **فَاعِل** ; অর্থ হবে- শ্রোতার ইলমের ফায়দা দেওয়াটা তাদের খবরের সাথে হবে। অর্থাৎ খবরটা যখন উল্লিখিত শর্তের সাথে **عِلْم** -এরও ফায়দা দেবে।

جَزَاءُ এই বাক্যটি। جزاءه দুই শতের কোনো একটির। এখানে : فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ অর্থঃ -এর مُتَّارِلُهُ হলো الانْضِبَابِ الْمَكْثُورِ. خَيْرُ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ الْإِنْضِبَابِ الْمَكْثُورِ. خَيْرُ سِتِّهِ هِيَ الْمُتَوَاتِرَةُ. উল্লিখিত সকল শর্ত যে খবরের মধ্যে পাওয়া যাবে অর্থঃ পাঁচ শর্তবিশিষ্ট خَيْرُ سِتِّهِ সেটিই হলো মুতাওয়াতির।

তথা مَا مَرَجَعَ يَمِيْرُهُنَّ عَنْهُ ۚ اَلْخَبْرُ উদ্দেশ্য যমীরের عِنْدَهُ হলো مَا تَخَلَّفَتْ رِافِدَةُ الْوَيْلَمِ عَنْهُ ۚ اَلْخَبْرُ অর্থ হবে, যে খবর থেকে ইলমের ফায়দা দেওয়াটা পিছে রবে, সেটাই হলো মাশহুর। অর্থাৎ উল্লিখিত শূর্ত বিন্যাস থাকার সঙ্গেও যে খবরটা عِلْم -এর ফায়দা দেবে না, সেটা مُتَوَاتِر হতে পারবে না; বরং তা কেবল মাশহুরই হবে।

উদ্দেশ্য। নূরান যে খবর পরিভাষায় একবার মুতাওয়াতিহ হয় তা আর মাহতুর হয় না; মুতাওয়াতিহই থাকে।

وَكُلُّ مَشْهُورٍ مُتَوَاتِرٌ, তথা প্রতিটি
মাশহূর মুতাওয়াতির। অর্থাৎ এটা বলা যাবে না যে, مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ
এর বিপরীত নয়। কেননা, মাশহূর যদি একবার মুতাওয়াতির হতে পারে তবে তাকে আর মাশহূর
বলা যায় না।

وَقَدْ بَعَلَ : এর দ্বারা একটি মতভেদের দিকে ইশারা করছেন। তা হলো, অধিকাংশের মাত যদিও এটাই যে, মুতাওয়াতিহ হতে মোট ৫টি শর্ত প্রয়োজন; কিন্তু কেউ কেউ বলেন পঞ্চম বিষয়টিকে অর্থাৎ عِلْم

-এর ফায়দা দেওয়াকে শর্ত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের মত হলো, বাকি যে ৪টি শর্ত রয়েছে বিশেষ করে দ্বিতীয় শর্তের মধ্যে এই পঞ্চম শর্তটি এসে গেছে। আর তা এভাবে যে, যখন কোনো খবর-এর রাবীদেব উপর মিথ্যার ধারণা অসম্ভব হবে তখন আর বলা লাগে না যে, সেটা عِلْم -এরও ফায়দা দেবে। কেননা, মিথ্যার ধারণা দূরীভূত হলে এমনি এমনিই عِلْم -এর ফায়দা দেয়।

وَمُرُ كَذِبِكَ فِي الْغَالِبِ : এ বাক্যের দ্বারা লেখক কারো কারো মতটিকে এক প্রকার সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন যে, স্বাভাবিক ব্যাপার তো এটাই যে, পঞ্চম শর্তের প্রয়োজন হয় না; ৪টি শর্ত পাওয়া গেলেই কোনো খবর মুতাওয়াতির হবে।

لَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْبَعْضِ لِمَانِيعِ : তবে কখনো কখনো কারণবশত ঐ ৪টি শর্ত পাওয়া গেলেও পঞ্চম শর্ত পাওয়া যায় না। যেমন- কোনো দার্শনিককে চন্দ্র বিদীর্ণের খবর দেওয়া। কেননা, দার্শনিক চন্দ্র বিদীর্ণে বিশ্বাসী নয়। অতএব, এখানে ৪টি শর্ত পাওয়া গেলেও দৃঢ় ইলম-এর ফায়দা দেয়নি। তাই এটা খবরে মুতাওয়াতির হবে না।

وَقَدْ وَشَّعَ بِهَذَا التَّعْرِيفِ تَعْرِيفُ الْمُتَوَاتِرِ : এ দীর্ঘ আলোচনার আলোকে মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট হয়েছে নিশ্চয়। بِهَذَا التَّعْرِيفِ দ্বারা পূর্ব বর্ণিত সকল আলোচনা উদ্দেশ্য। تَعْرِيفُ الْمُتَوَاتِرِ দ্বারা পারিভাষিক সংজ্ঞা উদ্দেশ্য; আভিধানিক নয়। কেননা, লেখক পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়েছেন মাত্র।

মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা : মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা দুভাবে দেওয়া যায়। ১. আভিধানিক, ২. পারিভাষিক। নিম্নে উভয় সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো-

১. وَاحِدٌ مَذْكُورٌ-এর إِسْمٌ نَاعِلٌ শব্দটি التَّوَاتُرُ মাসদার হতে مُتَوَاتِرٌ-এর সীগাহ। এর অর্থ- ধারাবাহিকতা, পরাম্পরা ইত্যাদি। التَّوَاتُرُ অর্থ التَّسْلُكُ তথা পরপর।

২. مُتَوَاتِرٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : আরবিতে خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ-এর সংজ্ঞা এভাবে-

هُوَ خَبَرٌ عَنْ مَحْسُوسٍ أَخْبَرَ بِهِ جَمَاعَةٌ بَلَّغُوا فِي الْكُثْرَةِ مَبْلَغًا تُعْبِلُ الْعَادَةَ تَوَاتُرًا طَهُمٌ وَتَوَافُقُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَيَكُونُ عَدَدُهُمْ عَلَى السَّوَاءِ مِنْ إِبْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ بِحَيْثُ يُفِيدُ الْعِلْمَ لِسَامِعِهِ।

অর্থাৎ পরিভাষায় التَّوَاتُرُ এমন হাদীসকে বলে যার রাবীর সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা মিথ্যার উপর একমত হয়েছেন কিংবা ঘটনাক্রমে সকলে মিথ্যা কথা বলছেন- বিবেক তা অসম্ভব মনে করে; আর এই সংখ্যাধিকা সনদের সকল স্তরে সমান থাকে এবং সাহাবী থেকে হাদীসটি رَأَيْتُ বা سَمِعْتُ শব্দে বর্ণিত হয়, যা শোনার সাথে সাথে عِلْمٌ يَقِينٌ-এর ফায়দা দেয়।

مُتَوَاتِرٌ-এর শর্ত : مُتَوَاتِرٌ-এর تَعْرِيفٌ হতে জানা যায় যে, কোনো খবর مُتَوَاتِرٌ হতে ৫টি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। যথা-

১. عَدَدٌ كَثِيرٌ অর্থাৎ রাবী বেশি হবে।

২. أَحَالَتِ الْعَادَةُ تَوَافُقَهُمْ وَتَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ অর্থাৎ রাবী এমন সংখ্যক হতে হবে যে, তাদের ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা কিংবা ঘটনাক্রমে মিথ্যা বলার উপর একমত হওয়াকে বিবেক অসম্ভব মনে করবে।

৩. رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الْإِتِّبَاءِ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ অর্থাৎ ঐ রাবীর আধিক্যটা সনদের গুরু স্তর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত সমান থাকতে হবে।

৪. سَمِعْتُ বা رَأَيْتُ অর্থাৎ শেষ রাবী مُسْتَعِدٌّ لِنْتِهَائِهِمُ الْعِش বলে খবর বর্ণনা করবে।

৫. وَأَنْصَبَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ خَبَرُهُمْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ لِسَامِعِهِ অর্থাৎ পূর্বোক্ত ৪টি শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে এটাও পাওয়া যেতে হবে যে, ঐ খবরটি শোতাকে عِلْمٌ يَقِينٌ-এর ফায়দা দেবে। যদি কোনো কারণবশত খবর এই পঞ্চম ফায়দা না দেয়, তখন খবরটি মাহসূর হয়ে যাবে, মুতাওয়াতির হতে পারবে না। কোনো খবর مُتَوَاتِرٌ হতে এই পাঁচটি শর্তের সবকয়টি জরুরি। কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে খবর আর মুতাওয়াতির হবে না।

وَخِلَافُهُ قَدْ يَرُدُّ بِلَا حَضَرٍ أَيْضًا لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ أَوْ مَعَ حَضَرٍ
بِمَا فَرَّقَ الْاِثْنَيْنِ أَيْ بِثَلَاثَةِ فَصَاعِدًا مَا لَمْ يَجْتَمِعْ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ أَوْ
بِهِمَا أَيْ بِاِثْنَيْنِ فَقَطْ أَوْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ ، وَالْمُرَادُ يَقُولُنَا أَنْ يَرُدَّ بِاِثْنَيْنِ أَنْ
لَا يَرُدُّ بِأَقَلِّ مِنْهُمَا فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرِ فَنِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الْوَاحِدِ
لَا يَضُرُّ إِذِ الْأَقَلُّ فِي هَذَا الْعِلْمِ يَقْضِي عَلَى الْأَكْثَرِ .

অনুবাদ : গায়রে মুতাওয়াতির (অর্থাৎ মাসহুর) কখনও রাবীর সংখ্যার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও (অর্থাৎ অনেক অনিদিষ্ট সনদে) বর্ণিত হয়, তবে তখন তার মধ্যে **مُتَوَاتِر** -এর কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকে। অথবা খবরটি দুয়ের অধিক তথা তিন বা তিনের বেশি সীমিত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়। তবে শর্ত হলো, তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি পাওয়া যাবে না। অথবা খবর শুধুমাত্র দু সনদে বর্ণিত হবে অথবা শুধুমাত্র একটি সনদে বর্ণিত হবে।

দু সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুয়ের কম না হওয়া। হ্যাঁ, তবে যদি এক সনদের কোনো স্তরে রাবীর সংখ্যা দুয়ের বেশি হয়, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, উসুলুল হাদীসশাস্ত্রে কম আর বেশির মধ্যে কম-এর উপরেই ফয়সালা হয়, অর্থাৎ কমটা প্রাধান্য পায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَخِلَافُهُ : এখানে "و" **خَبَرُهُ** ফিরেছে **مُتَوَاتِر** -এর দিকে অর্থাৎ **مُتَوَاتِر** ; আর তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **الْخَبَرُ الْمَشْهُور** ।

تِلَا الْفَلَا لَمْ يَرُدُّ : এর পূর্বে **الشُّرُوط** -এর অর্থ থাকবে না। এখানে **الشُّرُوط** -এর অর্থ **بِمَا فَرَّقَ الْاِثْنَيْنِ** সারকথা হলো, **بَعْضُ شُرُوطِ الْمُتَوَاتِرِ** কেননা, আসলে ইবারত হলো **عَرَضَ مَضَائِجِ الْاِثْنَيْنِ** **مُتَوَاتِر** -এর ন্যায় **خَبَرُ مَشْهُور** টাও কখনও অনিদিষ্ট অনেক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়। কিন্তু সে **مُتَوَاتِر** না হয়ে **مَشْهُور** হওয়ার কারণ হলো, **مُتَوَاتِر** -এর অন্যান্য শর্তের কোনো শর্ত তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। যেমন- এমন অনেক সংখ্যক রাবী হয় না যাদেরকে মিথ্যার উপর একমত হওয়ার কল্পনা করতে বিবেক অসম্ভব মনে করে, অথবা শেষ রাবী **رَأَيْتُ** বা **سَمِعْتُ** দ্বারা বর্ণনা করে না, অথবা সনদের প্রতি স্তরে অনেক রাবী হয় না ইত্যাদি।

إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرُقٌ : এর উপর। **عَطَفَ** হয়েছে **مَعَطُوفُونَ** গুণ হওয়ার মাধ্যমে **طَرُقٌ** হওয়ার মাধ্যমে **إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرُقٌ** হওয়ার মাধ্যমে **عَطَفَ** হয়েছে **أَوْ بِهِمَا** মূল ইবারত এভাবে-

إِنَّ الْخَبَرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرُقٌ بِلَا حَضَرٍ ، أَوْ مَعَ حَضَرٍ أَوْ أَنْ يَرُدَّ بِهِمَا فَقَطْ أَوْ بِوَاحِدٍ .

يَعْلَمُ أَصُولُ حَدِيثٍ هَذَا الْعِلْمُ : এখানে **يَعْلَمُ** বলতেও **أَصُولُ حَدِيثٍ** **هَذَا الْعِلْمُ** ।

بِقَضَى : অর্থ **يَغْلِبُ** অর্থাৎ প্রাধান্য পায়। কম সনদটা বেশি সনদের উপর প্রাধান্য পাওয়ার অর্থ হলো, কম সনদের দিকে লক্ষ্য করে ফয়সালাটা হয় যে, সেটা **مَشْهُور** না **عَزِيز** ইত্যাদি। যেমন- কোনো একটি হাদীস প্রথম থেকে অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মধ্যখানে এসে এক স্তরে একজন রাবী ছিল মাত্র, তখন ঐ হাদীস **عَزِيز** হয়ে যাবে। এখানে এটা দেখা হবে না যে, প্রথমদিকে সনদে অনেক রাবী ছিল; বরং দীর্ঘ সনদের যে স্তরে সর্বনিম্ন রাবী থাকবে, তার হিসেবে ফয়সালা হবে। এটাই হলো **يَعْلَمُ** **هَذَا الْعِلْمُ** **بِقَضَى عَلَى الْأَكْثَرِ** -এর তাৎপর্য।

فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ وَهُوَ الْمُنْفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلَى مَا
يَأْتِي تَقْرِيرُهُ بِشُرُوطِهِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ ، وَالْيَقِينُ هُوَ الْإِعْتِقَادُ الْجَازِمُ
الْمُطَابِقُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ
وَهُوَ الَّذِي يَضْطَرُّ الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ ، وَقِيلَ لَا يُفِيدُ
الْعِلْمَ إِلَّا نَظَرِيًّا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْمُتَوَاتِرِ حَاصِلٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ
أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ كَالْعَامِيِّ إِذَا التَّنْظَرُ تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ
يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى عُلُومٍ أَوْ ظُنُونٍ وَلَيْسَ فِي الْعَامِيِّ أَهْلِيَّةٌ ذَلِكَ ، فَلَوْ كَانَ
نَظَرِيًّا لَمَا حَصَلَ لَهُمْ .

অনুবাদ : প্রথমটি মুতাওয়াতির। মুতাওয়াতির হাদীস পূর্বোল্লিখিত শর্তের সাথে ইলমে ইয়াকীন তথা অকাটা জ্ঞানের ফায়দা দেয়। এ উক্তি ইলমে নয়রীকে বাদ দিয়ে দিল- যার বিবরণ সামনে আসছে। ইয়াকীন অর্থ সেই দৃঢ়বিশ্বাস যা বাস্তবের অনুকূল। এটিই নির্ভরযোগ্য মত যে, খবরে মুতাওয়াতির আবশ্যিক ইলমের ফায়দা দেয়। আর তা হলো, মানুষ যে ইলম অর্জনে বাধ্য হয় এবং তা এড়াতে পারে না।

অনেকের অভিमत হলো, খবরে মুতাওয়াতির ইলমী নয়রী তথা যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়। এ অভিमतটি ঠিক নয়। কারণ, মুতাওয়াতির দ্বারা ইলম তারও অর্জিত হয় যার যুক্তি বিন্যাসের যোগ্যতা নেই। যেমন- সাধারণ লোক। কেননা, 'যুক্তি' -এর অর্থ হলো, কতিপয় জ্ঞাত কিংবা ধারণকৃত বিষয়কে এমনভাবে সাজানো, যার আলোকে নতুন কোনো জ্ঞান বা ধারণা অর্জিত হয়। আর এ (সাজানোর) যোগ্যতা সাধারণ লোকের নেই। অতএব, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অর্জিত জ্ঞান যদি যৌক্তিক হয়, তাহলে তা সাধারণ লোকদের অর্জিত হতো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ : এখানে الْأَوَّلُ দ্বারা যদিও উদ্দেশ্য ঐ খবর কিন্তু এর সাথে তার শর্তাবলিও যুক্ত আছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো, যে খবরটি অনির্দিষ্ট অনেক রাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের পূর্বোক্ত ৫টি শর্ত বিদ্যমান সেটাই হলো مُتَوَاتِرٌ ।

এখানে الْمُتَوَاتِرُ শব্দটি তারকীবে খবর হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো খবরটা নাকিরা হয়, আর মা'রিফা হলে حَصْر -এর ফায়দা দেয়। এ হিসেবে অর্থ দাঁড়াবে- প্রথমটিই কেবল مُتَوَاتِرٌ ; অন্যগুলো নয়। আর এটাই বাস্তব কথা যে, ৪ প্রকার খবর -এর মধ্যে প্রথমটিই কেবল مُتَوَاتِرٌ অন্যগুলোর নাম ভিন্ন ভিন্ন।

وَهُوَ الْمُنْفِيدُ : এখানে هُوَ টা مُبْتَدَأُ এটা ফিরেছে الْمُتَوَاتِرُ -এর দিকে। الْمُنْفِيدُ টা খবর। এখানে প্রশ্ন হয় যে, খবরটা هُوَ مُعْرِفَةٌ হওয়ায় তা حَصْر -এর অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ مُتَوَاتِرٌ -ই কেবল عِلْم

يَقِينٌ -এর ফায়দা দেয়। অথচ مُتَوَاتِرٌ ছাড়াও مُتَّاعِدَةٌ অর্থাৎ চাক্ষুষ দর্শনটাও ইলমের ফায়দা দেয়। এর জবাব হলো, এটা حَصْرٌ হলো وَاضِحٌ অর্থাৎ খবরের অন্যান্য প্রকারের মধ্যে কেবল এ প্রকারটা অর্থাৎ مُتَوَاتِرٌ টা عِلْمٌ يَقِينٌ -এর ফায়দা দেয়, অন্যগুলো -এর ফায়দা দেয় না। অথবা, এখানে উদ্দেশ্য হলো مُسْنَدٌ إِلَيْهِ -কে مُسْنَدٌ করা। অর্থাৎ حَصْرٌ مُتَوَاتِرٌ টা শুধু عِلْمٌ يَقِينٌ -এর ফায়দা দেয়, অন্য কোনো ফায়দা নয়।

مُتَوَاتِرٌ : لا يُبْعَدُ الْعِلْمُ إِلَّا نَظَرِيًّا : মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে শুধু نَظَرِيٌّ অর্জিত হয়। যেমন- এভাবে বলা যে, এটা এমন খবর যার রাবীদের মিথ্যার উপর একমত হতে বিবেক অসম্ভব মনে করে। আর যে খবর এমন তা সত্য। অতএব এ খবরটি সত্য।

أَوْ مُظَنُّونَةٌ : যেমন- যাদের রাতে ঘুরছে, আর রাতে যে ঘুরে সে চোর। অতএব যাদের চোর। ইত্যাদি।

ইলমের প্রকারভেদ : ইলম দু প্রকার। ১. يَقِينِي যার অপর নাম ضَرُورِي ও ২. نَظَرِي।

عِلْمٌ ضَرُورِي -এর সংজ্ঞা : যে ইলম অর্জন করতে মানুষ বাধ্য; অর্জনকে ঠেকাতে পারে না অর্থাৎ কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই যে ইলম অর্জিত হয়, তাকে عِلْمٌ ضَرُورِي বলে। এ عِلْمٌ প্রত্যেক এ ব্যক্তিরও অর্জিত হয় যার চিন্তাভাবনার যোগ্যতাও নেই। যেমন- সাধারণ অজ্ঞ লোকেরও অর্জিত হয়।

عِلْمٌ نَظَرِي -এর সংজ্ঞা : যে ইলম চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকে عِلْمٌ نَظَرِي বলে।

মুতাওয়াতিরের হুকুম : এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, عِلْمٌ مُتَوَاتِرٌ -এর ফায়দা দেয়; কিন্তু পরে এ ব্যাপারে মতভেদ হয়ে গেছে যে, কোন عِلْمٌ -এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ عِلْمٌ ضَرُورِي না عِلْمٌ نَظَرِي এর ?

১. জুমহরের অভিমত : জুমহরের অভিমত হলো, عِلْمٌ مُتَوَاتِرٌ টা -এর ফায়দা দেয়।

২. অন্যদের অভিমত : আশায়েরাদের মধ্য হতে ইমামুল হারামাইন, মু'তামিলাদের মধ্য হতে হযরত কা'বী এবং আবুল হাসান বসরীর মত হলো- عِلْمٌ نَظَرِي টা -এর ফায়দা দেয়।

সঠিক অভিমত নির্ণয় : এ দু মাযহাবের মধ্য হতে জুমহরের অভিমত বাস্তবভিত্তিক ও সঠিক। কারণ, عِلْمٌ مُتَوَاتِرٌ দ্বারা তারও عِلْمٌ অর্জিত হয়, যার চিন্তাভাবনার যোগ্যতা নেই। যদি তা نَظَرِي -এর ফায়দা দিত, তবে কেবল চিন্তাভাবনার যোগ্যতাসম্পন্নদের অর্জিত হতো সকলের নয়। কিন্তু عِلْمٌ مُتَوَاتِرٌ যখন জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের ইলমের ফায়দা দেয় অর্থাৎ সবাই বুঝে যে, এটা বাস্তবই বাসূল্লাহ -এর হাদীস, তখন বুঝা গেল যে, এটা عِلْمٌ ضَرُورِي -এর ফায়দা দেয়।

وَلَا حَ يَهَذَا التَّفَرِيرِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالْعِلْمِ النَّظَرِيِّ ، إِذِ
الضَّرُورِيُّ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِلَا اسْتِدْلَالٍ ، وَالتَّظَرُّ يُفِيدُهُ وَلَكِنْ مَعَ الْإِسْتِدْلَالِ
عَلَى الْإِنْفَادِ وَإِنَّ الضَّرُورِيَّ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامِعٍ ، وَالتَّظَرُّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا
لِمَنْ كَهْ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ ، وَإِنَّمَا أُبْهِمَتْ شُرُوطُ التَّوَاتُرِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ عَلَى
هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الْإِسْنَادِ ، إِذْ عِلْمُ الْإِسْنَادِ يُبْحَثُ
فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكَ بِهِ مِنْ حَيْثُ صِفَاتُ
الرِّجَالِ وَصِبْغِ الْأَدَاءِ ، وَالتَّوَاتُرِ لَا يُبْحَثُ عَنْ رِجَالِهِ بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ
مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ .

অনুবাদ : এ আলোচনা থেকে অবধারিত জ্ঞান (ইলমে জরুরী) ও যৌক্তি জ্ঞান (ইলমে নয়রী)
-এর মধ্যকার পার্থক্য পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অবধারিত জ্ঞান অর্জিত হয় যুক্তিবিন্যাস
ব্যতিরেকে, আর যৌক্তিক জ্ঞান যুক্তিবিন্যাসের দ্বারা অর্জিত হয়। তা ছাড়া অবধারিত জ্ঞান প্রত্যেক
শ্রোতারই অর্জিত হয়। আর যৌক্তিক জ্ঞান কেবলমাত্র তার অর্জিত হয়, যার যুক্তিবিন্যাসের যোগ্যতা
রয়েছে। মতনের মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তগুলো উহা রাখা হয়েছে। কারণ হলো, এ পদ্ধতিতে
মুতাওয়াতিরটা ‘ইলমুল ইসনাদ’-এর আলোচ্য বিষয় নয়। ইলমুল ইসনাদ হলো, যে শাস্ত্রে হাদীসের
শুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়, যাতে সে মোতাবেক আমল করা যায় কিংবা তা প্রত্যাখ্যান
করা যায়। এই বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সাব্যস্ত করা হয় বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের গুণাবলি ও হাদীস বর্ণনার
ভাষার উপর ভিত্তি করে। পক্ষান্তরে মুতাওয়াতির হাদীসের ব্যক্তিবর্গ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না;
বরং কোনোরূপ আলোচনা-সমালোচনা ছাড়াই সে মোতাবেক আমল করা ওয়াজিব হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا حَ : অর্থ- স্পষ্ট হওয়া, পরিষ্কার হওয়া।

بِلَا تَظَرٍّ : এখানে اسْتِدْلَالٌ শব্দটি فِكر -نَظَر- অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ اسْتِدْلَالٌ মানে تَظَرٍّ
وَفِكْرٌ চিন্তাভাবনা তথা যুক্তিবিন্যাস ছাড়া।

لِكِنْ مَعَ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى الْإِنْفَادِ : এর অর্থ- ফায়দা দেওয়ার উপর যুক্তিবিন্যাসের সাথে। অর্থাৎ যে
যুক্তি ও চিন্তাভাবনায় নতীজা দেয় তার চিন্তাভাবনার মাধ্যমে।

أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ : এর অর্থ- চিন্তা করার যোগ্যতা থাকা। অর্থাৎ কিভাবে যুক্তি সাজাতে হয় তার যোগ্যতা
যেন- صَفَرِي -কে আগে উল্লেখ করে পরে- كُبْرِي -কে এভাবে উল্লেখ করা যে, زَيْدٌ يَطْرُقُ
وَكُلٌّ مِّنْ يَطْرُقُ بِاللَّيْلِ، وَكُلٌّ مِّنْ يَطْرُقُ بِاللَّيْلِ، وَكُلٌّ مِّنْ يَطْرُقُ بِاللَّيْلِ، وَكُلٌّ مِّنْ يَطْرُقُ بِاللَّيْلِ
যে সে চোর হয়। সুতরাং যাকে চোর।

وَإِعِدَّ مَوْتُكَ غَائِبٍ مَجْهُولٍ থেকে بِأَبْ أَنْعَالَ أُهَيْمَتْ : وَاسْمًا أُهَيْمَتْ -এর সীগাহ। এর অর্থ-
মুহুম বা উহা রাখা হয়েছে।

شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য মুতওয়ীর ৫টি শর্ত।

نُخْبَةٌ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য মতন অর্থাৎ

إِلَاقَةُ : এখানে টি ফিরেছে الْمُتَوَاتِرُ -এর দিকে।

كَيْفِيَّةٌ আর তা كَيْفِيَّةٌ : এর মধ্যে উল্লিখিত شَرْحُ نُخْبَةٍ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ : عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ :
হলো, الْمُتَوَاتِرِ -এর শর্তাবলি উল্লেখ করা।

لِيَفْعَلَ بِهِ : এর অর্থ হবে, খবরটি لِيَفْعَلَ بِهِ : এখানে উভয় فِعْلٍ টি مَجْهُولٌ হবে। بِأَبْ أَنْعَالَ أُهَيْمَتْ : এর অর্থ হবে, খবরটি
আমলযোগ্য হলে তদনুযায়ী আমল করা। আর بِأَبْ أَنْعَالَ أُهَيْمَتْ : এর অর্থ হলো, খবরটি যদি যা'ঈফ হয় অর্থাৎ
আমলযোগ্য না হয়, তবে তা বর্জন করা হবে।

صِفَاتُ الرِّجَالِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য রাবীদের গুণাবলি। অর্থাৎ তাদের عَدَالَتٌ ضَبْطٌ ইত্যাদি গুণাবলী।

صَبَحَ الْأَدَاةِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য হাদীস বর্ণনার শব্দ। যথা- سَمِعْتُ -أَخْبَرَنَا، حَدَّثَنَا، صَبَحَ الْأَدَاةِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য হাদীস বর্ণনার শব্দ। যথা- سَمِعْتُ -أَخْبَرَنَا، حَدَّثَنَا

عَنْ صِفَتِهِمْ : এর অর্থ হবে عَنْ صِفَتِهِمْ : অর্থাৎ রাবীদের সিফাত নিয়ে।

মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি উহা রাখার কারণ : خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ -এর দুটি দিক। ১. অন্যান্য খবরের মতো

এটাও একটি খবর। ২. তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে আমাদের সামনের

نُزْعَةُ النَّظَرِ বা شَرْحُ نُخْبَةٍ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য ১. মতন অর্থাৎ نُخْبَةٍ ও ২. শরহ অর্থাৎ شَرْحُ نُخْبَةٍ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য্য ১. মতন অর্থাৎ نُخْبَةٍ ও ২. শরহ অর্থাৎ شَرْحُ نُخْبَةٍ

খবরে মুতাওয়াতিরটা প্রথমদিক থেকে অর্থাৎ অন্যান্য খবরের ন্যায় একটি খবর হওয়ার দিক থেকে

তার আলোচনা ইলমুল ইসনাদে হতে পারে। এ জন্য লেখক মতনের মধ্যে الْمُتَوَاتِرُ -এর উল্লেখ

করেছেন। কিন্তু যখন মুতাওয়াতিরের দ্বিতীয় দিকটা লক্ষণীয় হবে, তখন সেটা ইলমুল ইসনাদের

আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বস্তুত এ কারণে শর্তাবলির উল্লেখ মতনের মধ্যে না করে; বরং

শরহ-এর মধ্যে করা হয়েছে। অতএব, মতন ও শরহ মিলে যেমন কিতাব পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, তেমনি

মতনে الْمُتَوَاتِرُ আর শরহ -এ شُرُوطُ আলোচনা করায় আলোচনাও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।

فَائِدَةٌ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ مِثَالَ الْمُتَوَاتِرِ عَلَى التَّفْسِيرِ الْمُتَقَدِّمِ يَعُزُّ وَجُودُهُ إِلَّا أَنْ يَدْعَى ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَا أَدْعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُونٌ ، وَكَذَا مَا أَدْعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الْإِطْلَاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطَّرِيقِ وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ وَصِفَاتِهِمُ الْمُقْتَضِيَةِ لِابْتِعَادِ الْعَادَةِ أَنْ يَتَوَاتَرُوا عَلَى الْكِذْبِ أَوْ يَخْصُلَ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وَجُودَ كَثِيرٍ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ الْمُتَدَاوِلَةَ بِأَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا الْمَقْطُوعَةَ عِنْدَهُمْ بِصِغَةٍ نَسَبَتْهَا إِلَى مُصَيِّفِهَا إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى اخْرَاجِ حَدِيثٍ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدَّدًا تُحْبِلُ الْعَادَةَ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ إِلَى اخْرِ السُّرُوطِ أَفَادَ الْعِلْمَ الْبَقِيضِيَّ بِصِغَةٍ نَسَبَتْهُ إِلَى قَائِلِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ كَثِيرٌ .

অনুবাদ : ফাযলাহ : ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন, উপরিউক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী মুতাওয়াতিহ হাদীসের পরিমাণ খুবই কম। শুধুমাত্র “مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ” যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে নিজ বাসস্থান নির্ধারণ করে।” এ হাদীসের ক্ষেত্রে দাবি করা যায় যে, এটা মুতাওয়াতিহ হাদীস।

তার এই স্বল্পতার দাবি ঠিক নয়। অন্যরা যারা এরূপ হাদীস অস্তিত্বহীন বলে দাবি করেছেন তাদের অভিমতও সঠিক নয়। উভয় দলের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে পরামর্শক্রমে বা ঘটনাক্রমে রাবীদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া বিবেক অসম্ভব মনে করার দাবিদার সিফাতসমূহ, রাবীদের অবস্থা এবং অনেক সনদ সম্পর্কে কম অবগতির কারণে। মুতাওয়াতিহ মওজুদ থাকার সবচেয়ে বড় দলিল হলো, হাদীসের যে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞজ্ঞানদের হাতে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে এবং এসবের প্রণেতাদের সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ নেই- যদি এ সকল কিতাবে একযোগে একটি হাদীস সংকলিত হয় এবং তার এত অধিক সংখ্যক সনদ থাকে যে, স্বভাবত মিথ্যা সংঘটিত হবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়; এভাবে মুতাওয়াতিহ হাদীসের সকল শর্ত পূরণ হয়, তাহলে এটি যে নবী করীম ﷺ -এর হাদীস, সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারবো। এ ধরনের হাদীস প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে প্রচুর রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَوَاتِرٌ অর্থ- যমীর ফিরেছে মুতাওয়াতির -এর দিকে। অর্থাৎ عَزَّ وَجَدَ -এর অস্তিত্ব খুব কম; নেই বললেই চলে। এ ব্যাখ্যা অনুপাতে ইবনুস সালাহ ও তাদের দাবি এক ও অভিন্ন, যারা বলে حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ -এর অস্তিত্ব নেই।

عِدْثَ مَنْ كَذَبَ الْغ : এ হাদীস ১০০ -এরও অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আশারায়ে মুবশাশরাও আছেন। এভাবে পরবর্তী স্তরেও অনেক রাবী কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হওয়ায় এটি حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ -এর উদাহরণ।

مَنْعُ : এর শাস্তিক অর্থ- নিষিদ্ধ। এখানে উদ্দেশ্য হলো, সঠিক নয়।

وَكَذًا مَا ادَّعَاءُ غَيْرُهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইবনে হিব্বান (র.) এবং হাযিম (র.)। কারণ, তাঁদের দাবি হলো, حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ নেই।

أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে বলা হয়েছে, عِلْمُ الْإِسْنَادِ -এর মধ্যে মুতাওয়াতিরের أَحْوَالُ (বিশেষত) নিয়ে আলোচনা হয় না, অথচ এখান থেকে বুঝা যায় যে, আলোচনা হয়? এর উত্তর হল, عِلْمُ الْإِسْنَادِ -এর মধ্যে যে حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ নিয়ে আলোচনা হয় না সেটা হলো حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ সাব্যস্ত হওয়ার পর। আর এখানে যে আলোচনার কথা বলা হয়েছে, এটা হলো حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ টি حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ সাব্যস্ত হওয়ার আগে। অর্থাৎ حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ সাব্যস্ত হওয়ার পরে গিয়ে তার রাবীদের সম্পর্কে আর আলোচনা হয় না, কিন্তু حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ হওয়ার আগে আলোচনা করা হয়।

إِلَى أَخْرِ الْكُرُوطِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ -এর অন্যান্য শর্ত।

মুতাওয়াতিরের উদাহরণ বাস্তবে আছে কিনা? এ ব্যাপারে তিন ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

১. ইবনে হিব্বান এবং হাযিম (র.)-এর অভিমত : তাঁদের দাবি হলো, বাস্তবে মুতাওয়াতিরের কোনো উদাহরণ নেই।
২. ইবনুস সালাহ -এর অভিমত : তাঁর দাবি হলো, মুতাওয়াতিরের উল্লিখিত সংজ্ঞা এবং শর্তানুযায়ী মুতাওয়াতিরের অস্তিত্ব একেবারেই কম। শুধুমাত্র عَنْ كَذَبَ عَلَى এ হাদীসটির ব্যাপারে মুতাওয়াতির দাবি করা হয়।
৩. জুমহুরের অভিমত : জুমহুর ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত হলো, মুতাওয়াতিরের অস্তিত্ব ও উদাহরণ প্রচুর থাকা সম্ভব। শুধু তা-ই নয় এমন হাদীস বাস্তবে অনেক আছে, যাতে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি বিদ্যমান। বিশেষত বুখারী-মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থ, সারা মুসলিম বিশ্বে যার পঠন-পাঠন হয় এবং ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত, যখন এ সমস্ত কিতাবে একযোগে এমন হাদীস বর্ণিত হবে, যার রাবীদের ব্যাপারে মিথ্যার ধারণা হয় না এবং তাতে মুতাওয়াতিরের অন্যান্য শর্তও বিদ্যমান, তখন নিশ্চিতভাবে ঐ হাদীস মুতাওয়াতির হবে। যেমন- ১. দুই মৌজার উপর মাসাহ -এর হাদীস, ২. কিয়ামতের দিন শাফাআতের হাদীস, ৩. হাউজে কাওসারের হাদীস, ৪. দুই পা ধৌত করার হাদীস ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত মতভেদটি حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যে কোনো حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ -এর ক্ষেত্রে নয়। কেননা, مَطْلَقٌ مُتَوَاتِرٌ যে অনেক রয়েছে সে ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। যেমন- কুরআন বর্ণিত হয়ে আসা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা ইত্যাদি।

উক্ত ইখতিলাফের ভিন্ন ব্যাখ্যা : উপরে حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ -কে কেন্দ্র করে যে ইখতিলাফ বর্ণনা করা হয়েছে আরেক দৃষ্টিতে বিচার করলে উক্ত ইখতিলাফ বাকি থাকে না; বরং তা শাস্তিক ইখতিলাফে পরিণত হয়। আর তা এভাবে যে, ইবনুস সালাহ এবং ইবনে হিব্বানের উক্তি تَوَاتُرٌ لَفْظِي -এর ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাদের দাবি হলো **تَوَاتُرُ لَفْظِي** নেই বা থাকলেও খুব কম। আর জুমহুরের উক্তি **تَوَاتُرُ مَعْنَوِي** -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ **تَوَاتُرُ مَعْنَوِي** অনেক আছে, **تَوَاتُرُ لَفْظِي** নয়। আর এদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। কেননা, বাস্তবে **تَوَاتُرُ لَفْظِي** নেই কিছু **تَوَاتُرُ مَعْنَوِي** অনেক আছে। **تَوَاتُرُ مَعْنَوِي** বলা হয়, হাদীসের শব্দই **مُتَوَاتِر** ভাবে বর্ণিত হয়ে আসে। আর **تَوَاتُرُ مَعْنَوِي** হলো, শব্দ নয় বরং অর্থটা (শব্দটা ভিন্ন হয়ে) এক হয়ে **مُتَوَاتِر** হয়ে আসে। **مَنْعُ عَلَى الْخَفِيِّ** , **مَنْعُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ** এগুলো **مَعْنَى مُتَوَاتِر** , **لَفْظًا** মুতাওয়াতির নয়।

৩. **تَوَاتُرُ طَبَقَةً** ২. **تَوَاتُرُ إِسْنَادًا** ১. যথা- **مُتَوَاتِر** -এর প্রকারভেদ : মুতাওয়াতির মোট চার প্রকার। যথা- ১. **تَوَاتُرُ إِسْنَادًا** ২. **تَوَاتُرُ طَبَقَةً** ৩. **تَوَاتُرُ مَعْنَوِي** ৪. **تَوَاتُرُ عَمَلًا** -এর প্রত্যেকটির সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণিত হলো-

১. **تَوَاتُرُ إِسْنَادًا** -এর সংজ্ঞা : হাদীসটিকে সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে এমন সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করবেন যাদের ব্যাপারে এমন চিন্তা করা সম্ভব নয় যে, তারা সকলেই ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেছেন কিংবা তাদের সকলের দ্বারা ঘটনাক্রমে মিথ্যাচার সংঘটিত হয়েছে। এর আরেক নাম **تَوَاتُرُ مُعَدِّينَ** ।

২. **تَوَاتُرُ طَبَقَةً** -এর উদাহরণ : **مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ** -এর উদাহরণ :

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে নিজ বাসস্থান নির্ধারণ করে।

ইবনুস সালাহ বলেন, বাযিউজিন সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, শতাধিক সাহাবী এবং ইমাম নববী বলেন, প্রায় দুইশত সাহাবী এটি বর্ণনা করেছেন।

তবে আসল কথা হলো, হাদীসটি ৩৩ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু সনদ হাসান আর কিছু সহীহ। এ ছাড়া যাসীফ সনদে আরও প্রায় ৫০ জন সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ অগ্রহণযোগ্য সনদে আরো প্রায় ২০ জন সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

-[ফাতহুল বারী ১ : ২৪৫]

৩. **تَوَاتُرُ طَبَقَةً** -এর সংজ্ঞা : প্রতি যুগের একদল লোক হতে পরবর্তী যুগের আরেকদল গ্রহণ করে থাকে। এভাবে সবসময় চলতে থাকে।

৪. **تَوَاتُرُ طَبَقَةً** -এর উদাহরণ : যেমন- কুরআন মাজীদে তাওয়াত্বুর। পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র মানুষ তা পাঠ করছে, চর্চা করছে, মুখস্থ করছে, এক তবকা (স্তরের লোক) থেকে আরেক তবকা (স্তরের লোক) গ্রহণ করছে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সনদের প্রয়োজন হয় না এবং হয়ও না। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য লোক কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং এ ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এ কুরআনই মুহাম্মদ ﷺ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন এবং এ মর্মে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীরা মাধ্যমে তা প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তাঁর নিকট থেকে অগণিত সাহাবী তা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অগণিত সাহাবী থেকে অগণিত তাবয়ী, তাঁদের নিকট থেকে অগণিত তাবয়ে-তাবেয়ী এভাবে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে। এখানে মুহাদ্দিসগণের নিয়ম অনুযায়ী অনেকগুলো তো দূরের কথা, একটি সনদও উপস্থাপন করা দুষ্ট। আর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা, সনদের প্রয়োজন মূলত খবরে ওয়াহিদেদের ক্ষেত্রে হয়। কারণ, সেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

৩. **تَوَاتُرٌ عَمَلٌ** -এর সংজ্ঞা : মহানবী ﷺ -এর যুগ থেকে প্রতি যুগে কোনো বিষয়ে এমন বিরাট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ আমল করে আসবেন, যাদের ব্যাপারে এমন মনে করা সম্ভব নয় যে, তারা সকলেই ভিত্তিহীন বিষয়ে কিংবা ভুল বিষয়ে আমল করছেন।

تَوَاتُرٌ عَمَلٌ -এর উদাহরণ : যেমন- অজুর মধ্যে মিসওয়াব করা। এটি একটি সুন্নত এবং এটির সুন্নত হওয়ার আকিদা রাখা ফরজ। কেননা, এটা তাওয়াতুরে আমলী তথা প্রতি যুগের লোকদের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

৪. **تَوَاتُرٌ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ** -এর সংজ্ঞা : অনেক সময় রাবীগণের বর্ণনায় ভাষাগত পার্থক্য থাকে বা কোনো কোনো রাবী ঘটনাটি যেভাবে বর্ণনা করেন, অন্য রাবীগণ আবার অন্যভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু কিছু ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল থাকে।

এ সংজ্ঞাটি এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে, হাদীসের **لَفْظ** টা **مُتَوَاتِرٌ** না হয়ে যদি অর্থ বা **مَعْنَى** টা **مُتَوَاتِرٌ** হয়, তাহলে তাকে **تَوَاتُرٌ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ** বলে। অর্থাৎ **لَفْظ** টা **مُتَوَاتِرٌ** হবে না, কিন্তু তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা বিভিন্ন হাদীসে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হবে। এর অপর নাম **تَوَاتُرٌ مَعْنَوِيٌّ**।

تَوَاتُرٌ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ -এর উদাহরণ : যেমন- কেউ বর্ণনা করে, হাতিম একশত দিনার দান করেছে। আবার কেউ বর্ণনা করে, হাতিম একশত উট দান করেছে। এখানে ঘটনার বর্ণনায় বিভিন্নতা থাকলেও যে বিষয়ে মিল রয়েছে তা হলো, হাতিম দান করেছে।

এর আরেকটি উদাহরণ যেমন- **مَسَعَ عَلَى الْخَفِيِّ**। অনেক হাদীসে মোজার উপর মাসাহের বর্ণনা এসেছে, কিন্তু কোনো বর্ণনায় এসেছে মোজার উপরে, কোনো বর্ণনায় এসেছে মোজার নিচে, কোনো বর্ণনায় একবার, আবার কোনো বর্ণনায় তিনবার ইত্যাদি। এখানে বর্ণনার মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে মিল রয়েছে, আর তা হলো- মোজার উপর মাসাহ করা প্রমাণিত।

মুতাওয়াতিরের হুকুম : প্রথম তিন প্রকার **مُتَوَاتِرٌ** -এর হুকুম হলো, তার অস্বীকারকারী কাফির। আর চতুর্থ প্রকার **مُتَوَاتِرٌ** -এর হুকুম হলো, যদি হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি সুস্পষ্ট বিষয় হয়, তবে তার অস্বীকারকারীও কাফির হবে। আর যদি হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি দ্ব্যর্থবোধক **نَظَرِيٌّ** হয় (তথা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে হয়), তাহলে তার অস্বীকারকারী কাফির হবে না।

مُتَوَاتِرٌ -এর আরেকটি প্রকরণ **لَفْظ** (শব্দ) এবং **مَعْنَى** (অর্থ) -এর দিক থেকে **مُتَوَاتِرٌ** আবার দু প্রকার। ১. **تَوَاتُرٌ لَفْظِيٌّ** ২. **تَوَاتُرٌ مَعْنَوِيٌّ** নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা উদাহরণসহ দেওয়া হলো-

১. **تَوَاتُرٌ لَفْظِيٌّ** -এর সংজ্ঞা : যদি (হাদীসের) শব্দ এবং মতন তাওয়াতুরভাবে বর্ণিত হয়, তাহলে তাকে **تَوَاتُرٌ لَفْظِيٌّ** বলে। যেমন- নকলে কুরআন।

২. **تَوَاتُرٌ مَعْنَوِيٌّ** -এর সংজ্ঞা : যদি (হাদীসের) শব্দ ও মন তাওয়াতুরভাবে নয়; বরং বিভিন্ন রেওয়াজে শব্দ বিভিন্ন, কিন্তু সকল হাদীসের অর্থ এক হয়, তাহলে তাকে **تَوَاتُرٌ مَعْنَوِيٌّ** বা অর্থগত দিক থেকে **تَوَاتُرٌ** বলে। যেমন- মোজার উপর মাসাহের হাদীস, শাফাআতের হাদীস ইত্যাদি।

وَالثَّانِي وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الْأَحَادِ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْضُورَةٌ بِأَكْثَرٍ مِنْ اِثْنَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَادِّثِينَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِنْتِشَارِهِ مِنْ فَاضِ الْمَاءِ يَفِيضُ فَيُضًا وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بَيْنَ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ يَكُونُ فِي إِبْتِدَائِهِ وَإِنْتِهَائِهِ سَوَاءً وَالْمَشْهُورُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ يُطْلَقُ عَلَى مَا حَرَزْنَا وَعَلَى مَا اِشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فَيَشْمَلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا بَلْ مَا لَا يُوْجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلًا.

অনুবাদ : খবরের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে খবরে মাশহুর। আর এ খবরে মাশহুরটি হলো খবরে ওয়াহিদের তিন প্রকারের প্রথম প্রকার। আর তা হলো, ঐ খবর যার সনদ দুয়ের অধিক (তথা সর্বনিম্ন ৩ বা তার চেয়ে বেশি) হয়ে সীমিত হয়। সুস্পষ্ট এবং প্রসিদ্ধি লাভ কন্মার কারণে তাকে মাশহুর নাম রাখা হয়েছে। ফকীহগণের একশ্রেণির মতে এর নাম মুসতাহফীয। (চারদিকে) ছড়িয়ে পড়া এবং ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে তাকে মুসতাহফীয নামকরণ করা হয়েছে। فَاضِ الْمَاءِ يَفِيضُ فَيُضًا এ প্রবাদ বাক্য থেকে এ নামটি উদ্ভূত। অর্থাৎ পানি চতুর্দিকে খুব ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের অনেকে মাশহুর ও মুসতাহফীযের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, যে হাদীসের সনদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমান সংখ্যক, তাকে মুসতাহফীয বলে। আর মাশহুর হলো এর চেয়ে ব্যাপক। (অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদ সংখ্যা সমান হওয়া শর্ত নয়; বরং দুয়ের অধিক থাকলেই চলবে।) অনেকে আবার অন্যভাবে পার্থক্য করেছেন। এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়।

যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো, এটিই মাশহুর হাদীসের মূল পরিচয়। তবে অনেক সময় মাশহুর হাদীস বলতে বুঝানো হয়— যা মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। সে হিসেবে যে হাদীসের মাত্র একটি সনদ রয়েছে এমনকি যার কোনো সনদই নেই, তাও মাশহুর শ্রেণির অন্তর্গত হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهُوَ الْمَشْهُورُ ... وَالثَّانِي : এখানে الثَّانِي শব্দটি مُبْتَدَأُ আর الْمَشْهُورُ হলো তার খবর। তবে খবরের শুরুতে هُوَ যমীর নিয়ে আসার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, এখানে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে যথেষ্ট বাক্যের ব্যবধান রয়েছে।

- جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ : وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الْأَحَادِ : এটা হলো

। وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الْأَحَادِ : এটা হলো বদল। মুবদাল মিনহু হলো

فَاضِ الْمَاءِ يَفِيضُ فَيُضًا : এটি একটি আরব্য প্রবাদ বাক্য। যখন পানি বৃদ্ধি পেয়ে বাগ-বাগিচা প্রাণিত হয়ে যায়, তখন এ বাক্যটি বলা হয়। এখানে مُسْتَفِيض শব্দের অর্থ ও ক্রিয়ামূল বুঝাতে এ

প্রবাদ বাক্যটি উল্লিখিত হয়েছে। **فَيْضًا** শব্দ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটা **بَابُ ضَرْبٍ** -এর অর্থ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

... **مِنْهُمْ** : এখানে **مِنْهُمْ** -এর যমীর ফিরেছে পূর্ববর্তী **أَيُّمَةُ النَّفَقَاءِ** -এর প্রতি। অর্থাৎ ফকীহগণের থেকে কিছু লোক।

খবরে মশহুর প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে সম্মানিত লেখক তিনটি আলোচনার অবতারণা করেছেন। ১. সংজ্ঞা এবং নামকরণের কারণ, ২. মশহুর ও মুসতাকীযের মধ্যে পার্থক্য ও ৩. মশহুরের প্রকারভেদ। তবে আরো দুটি বিষয়ের অবতারণা হলে আলোচনাটি পূর্ণ হতো। যথা- ১. মশহুরের হুকুম। অবশ্য লেখক এ হুকুম সম্পর্কে পরে আলোচনা করবেন ও ২. মশহুরের উদাহরণ। নিম্নে পর্যায়ক্রমে লেখক কর্তৃক আলোচিত ওটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

মশহুরের আভিধানিক সংজ্ঞা : **إِسْمٌ مَفْعُولٌ الشَّهْرُ** -এর সীগাহ। এর অর্থ- পরিচিত, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।

মশহুরের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় মশহুর বলে প্রত্যেক ঐ খবরকে যার রাবী প্রতি তবকায় কমপক্ষে তিনজন বা তার চেয়ে বেশি হয় এবং তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি না থাকে।

আরবিতে **حَدِيثٌ مَشْهُورٌ** -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ অর্থাৎ মশহুর ঐ হাদীসকে বলে যার সনদের প্রতি স্তরে তিনজন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেন এবং তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছে না।

মশহুর-এর নামকরণ : **الشَّهْرُ** -এর অর্থ- প্রসিদ্ধ। যেহেতু মানুষের মাঝে এ হাদীসের ব্যাপক পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি অর্জিত হয়, তাই এ জাতীয় হাদীসকে মশহুর বলা হয়।

মুসতাকীয-এর নামকরণ : মশহুরের অপর নাম মুসতাকীয। একে এ নামকরণের কারণ হলো, মুসতাকীয মানে ছড়িয়ে পড়া, প্রসারিত। যেহেতু এ হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করে চারদিকে (বানের পানির মতো) ছড়িয়ে পড়ে, এ জন্য তাকে মুসতাকীয বলা হয়।

মশহুরের উদাহরণ : এর উদাহরণ হিসেবে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। তা হলো- **مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ** -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালো কাজ বা বিষয়ের পথ দেখায়, সেও ভালো কাজকারীর মতো হওয়াব পায়।

মশহুর ও মুসতাকীযের মধ্যে পার্থক্য : **الشَّهْرُ** এবং **الْمُسْتَفِيضُ** -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা? এ ব্যাপারে তিন ধরনের অভিমত রয়েছে। যথা-

১. কতিপয় ফকীহ -এর অভিমত : তাদের মতে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেই **مَشْهُورٌ** সেই **مُسْتَفِيضٌ** - এদের মধ্যে **تَسَاوَى** -এর সম্পর্ক।

২. কিছু ফকীহ -এর অভিমত : তবে কিছু ফকীহ বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আর তা হলো-

ক. মুসতাকীয ঐ খবর, যার সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাবীদের সংখ্যা একই সমান থাকে।

খ. আর মাশহুর হলো এর চেয়ে ব্যাপক। অর্থাৎ তাতে রাবীর সংখ্যা সমান হওয়া জরুরি নয়। বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে। তবে তিন-এর কম হলে হবে না। অতএব এ হিসেবে এ ফকীহগণের মতে এতদুভয়ের মধ্যে **عَامٌ خَاصٌّ مُطْلَقٌ**-এর নিসবত রয়েছে। **مُسْتَفِيدٌ** টা খাস আর **النَّهْرُ** টা হলো **عَامٌ**।

৩. আর কিছু ফকীহ-এর অভিमत : কিছু ফকীহ বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে **نَسَبَتْ تَبَايُنٌ**-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আর তা হলো-

ক. **النَّهْرُ**-এর মধ্যে রাবীর সংখ্যা ধর্তব্য। অর্থাৎ প্রতি স্তরে রাবী কমপক্ষে তিনজন বা তার বেশি হতে হবে।

খ. আর **مُسْتَفِيدٌ**-এর মধ্যে রাবীর সংখ্যা কোনো ধর্তব্য নয়; বরং এখানে মূল দেখার বিষয় হলো, মানুষ তাকে কবুল করেছে কিনা। যদি অনেক মানুষ কবুল করে নেয়, তাহলে তা মুসতাসফীয।

মাশহুরের প্রকারভেদ : মাশহুর মোট দু প্রকার। ১. মাশহুরে ইসতিলাহী ও ২. মাশহুরে লুগাবী। নিম্নে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো-

১. মাশহুরে ইসতিলাহী-এর সংজ্ঞা : কিতাবে মাশহুরের যে সংজ্ঞাটি উল্লিখিত হয়েছে সেটি **مَشْهُورٌ اصْطِلَاحِي**-এর সংজ্ঞা। আর তা হলো, প্রত্যেক ঐ খবর যার সনদের কোনো স্তরে তিন-এর কম রাবী না হয় এবং তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্ত পাওয়া যায় না।

২. মাশহুরে লুগাবী-এর সংজ্ঞা : কখনো আভিধানিক অর্থ (প্রসিদ্ধ) বিবেচনায় ঐ খবরকেও মাশহুর বলা হয়, যেটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চাই তার রাবী তিনজন হোক বা বেশি হোক এমনকি তার কোনো সনদ না থাকলেও সেটা মাশহুর।

مَشْهُورٌ لَفْوِي টা **عَامٌ خَاصٌّ مُطْلَقٌ**-এর সম্পর্ক। **مَشْهُورٌ اصْطِلَاحِي** এবং **مَشْهُورٌ لَفْوِي** টা **عَامٌ** আর **مَشْهُورٌ اصْطِلَاحِي** টা খাস। কেননা, **مَشْهُورٌ لَفْوِي**-এর মধ্যে **عَزِيزٌ وَغَرِيبٌ** সব রয়েছে। কিন্তু **مَشْهُورٌ اصْطِلَاحِي**-এর মধ্যে **عَزِيزٌ** ও **غَرِيبٌ** নেই।

وَالْقَالُ الْعَزِيزُ وَهُوَ أَنْ لَا يَرْوِيهِ أَقْلٌ مِنْ إثنينٍ عَنِ اثْنَيْنِ وَسَيَ يَذْلِكُ
إِمَّا لِقَلَّةِ جُودِهِ وَإِمَّا لِيَكُونِهِ أَغْرَ آتَى قَوَى بِمَجْبِيهِ مِنْ طَرِيقِ أُخْرٍ وَلَيْسَ
شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَبَائِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ
وَالْبِهِ يُؤْمِنُ كَلَامُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ
الصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الرَّائِلُ عَنْهُ إِنْهُ الْجَهَالَةُ بِأَنْ يَكُونَ
لَهُ رَاوِيَانِ ثُمَّ يَتَدَاوُلُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ بِأَنْ ذَلِكَ شَرْطُ
الْبُخَارِيِّ ، وَأَجَابَ عَمَّا أُوْرِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ قَالَ
فَإِنْ قِيلَ حَدِيثُ الْأَعْمَالِ بِالتَّيَّاتِ فَرَدَّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عِلْقَمَةُ ،
قُلْنَا قَدْ خُطِبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ ، وَلَوْلَا أَنَّهُمْ
يَغْفِرُونَهُ لَا تَكْفُرُوهُ ، كَذَا قَالَ ، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكْتُوا
عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ .

অনুবাদ : খবরের তৃতীয় প্রকারের নাম আযীয । এ হচ্ছে- যে খবর কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি থেকে দুইজন ব্যক্তি বর্ণনা করেন অর্থাৎ সনদের প্রতি স্তরে কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি থাকবেন, তাকে বলা হয় আযীয ।

আযীয শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে- স্বল্প ও শক্তিশালী । এ ধরনের (আযীযের) খবরের সংখ্যা একেবারেই স্বল্প । আবার একাধিক সনদের কারণে এ খবর তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী । এ দ্বিবিধ অর্থের যে কোনোটি বিচারে এর নামকরণ হতে পারে । কোনো হাদীস সহীহ বলে গণ্য হবার জন্য কমপক্ষে আযীয শ্রেণীর হতে হবে- এরূপ কোনো শর্ত নেই । অবশ্য কেউ কেউ এরূপ মনে করেন । যেমন- মু'তামিলা মতবাদের আবু আলী জুঝারী । হাকিম আবু আব্দুল্লাহ (র.) -এর বক্তব্যও এদিকে ইঙ্গিত করে । তিনি তার 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে বলেছেন- "সহীহ হাদীস হলো- যা এমন একজন সাহাবী বর্ণনা করবেন যার অপরিচিতি দূর হয়েছে এভাবে যে, তাঁর নিকট থেকে কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি বর্ণনা করবেন অতঃপর হাদীস চর্চাকারীগণ পর্যায়ক্রমে আমাদের সময় পর্যন্ত গ্রহণ করবেন । যেমন- সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য ।"

কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবী (র.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটি (আযীয হওয়া) ইমাম বুখারীর শর্ত ছিল । তাঁর এ বক্তব্যের উপর যে প্রশ্ন উঠতে পারে তিনি তার একটি জবাব দিয়েছেন । কিন্তু সে উত্তরও প্রশ্নাতীত নয় । তিনি বলেন- যদি প্রশ্ন করা হয় যে, (ইমাম বুখারীর) নিয়ত সংক্রান্ত (প্রথম) হাদীসটি তো এক সনদবিশিষ্ট । কেননা, হযরত ওমর (রা.) থেকে হযরত আলকামা (র.) ব্যতীত আর কেউ এটা বর্ণনা করেননি । তাহলে আমরা বলবো- হযরত ওমর (রা.)

মিশরে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে। তারা যদি এটা না জানতেন, তাহলে তারা দ্বিমত প্রকাশ করতেন।

এই হলো কাজি আবু বকরের বক্তব্য। এর সমালোচনায় বলা যায়, তাঁরা (সাহাবীরা) সবাই নীরব ছিলেন বলে এরূপ সাব্যস্ত হয় না যে, তাঁরা অন্যের নিকট এটি শুনেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَمَوَّانٌ لَا يَرْوِيهِ أَقْلٌ مِنْ : এ সংজ্ঞার উপর অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন যে, এ সংজ্ঞা তো صَادِقٌ এবং مَشْهُورٌ -এর উপর আসে। কেননা, সেগুলোও দুয়ের অধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়। তাই তারা عَزِيزٌ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করেছেন- مَوَّانٌ يَرْوِيهِ اِثْنَانٍ وَلَوْ فِي طَبَقَةٍ

আযীয ঐ خَبَرٌ কে বলে, যার কোনো এক ভবকায় হলেও দুজন রাবী বর্ণনা করে।

كَالْشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ : এর সুরত হলো, কোনো এক মামলায় আদালতে আসল সাক্ষীকে উপস্থিত করা সম্ভব না হলে তখন ঐ সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হবে দুজন সাক্ষী। তারা আদালতে বলবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই মামলায় অমুক সাক্ষী।

ব্যাখ্যাকারদের কেউ কেউ বলেছেন, এটা সম্ভবত ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব মোতাবেক। নতুবা হানাফী মাযহাব মতে এক সাক্ষীর পক্ষে একজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট, দুজন প্রয়োজন হয় না।

আযীযের আভিধানিক অর্থ : الْعَزِيزُ -এর অর্থ দুটি হতে পারে।

১. قَلِيلٌ তথা কম ও ২. قَوِيٌّ তথা শক্তিশালী। الْعَزِيزُ শব্দটি দুই বাব থেকে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. عَزِيزٌ তথা বাবে صَرَبٌ থেকে। তখন অর্থ হবে- কম হওয়া। যেহেতু এ রকম খবরের অস্তিত্ব কম সেহেতু একে আযীয বলা হয়।

২. عَزِيزٌ তথা বাবে نَصَرٌ থেকে। তখন অর্থ হবে- শক্তিশালী হওয়া। যেহেতু এ খবর অন্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় অধিকতর শক্তিশালী হয়, তাই একে আযীয বলা হয়।

আযীযের পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় عَزِيزٌ ঐ খবরকে বলা হয় যার সনদের কোনো এক স্থানে অথবা সকল স্থানে রাবীর সংখ্যা দুজন হয়। যদি কোনো স্থানে রাবীর সংখ্যা দুয়ের অধিক হয়, তাহলে এতে ঐ খবর عَزِيزٌ হতে কোনো অসুবিধা নেই। দেখার বিষয় হলো কোনো এক স্থানে হলেও রাবীর সংখ্যা দুই কিনা। যদি দুই হয়, তাহলে অপর স্থানে যতই বেশি হোক না কেন তা عَزِيزٌ-ই হবে।

হুও الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ اِثْنَانٍ وَلَوْ فِي طَبَقَةٍ -এর সংজ্ঞা : خَبَرٌ عَزِيزٌ

অর্থাৎ কোনো একটি স্তরে হলেও যে হাদীসের রাবী দুজন হয়, তাকে عَزِيزٌ বলে।

খবর সহীহ হওয়ার জন্য আযীযের শর্তারোপ : খবর সহীহ হতে হলে আযীয হতে হবে কিনা, নাকি গরীব হলেও সহীহ হতে পারে- এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন-

১. মু'তামিলা মতবাদের নেতা ইমাম আবু আলী জুহবায়ী -এর অভিমত হলো, খবর সহীহ হতে কমপক্ষে আযীয হওয়া শর্ত। ফলে তার মতে গরীব হাদীস সহীহ নয়।

হাকিম আবু আব্দুল্লাহ তার কিতাবে সহীহ -এর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন যে, সহীহ ঐ হাদীস যাকে মশহূর সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন অতঃপর তার থেকে দুজন রাবী অতঃপর প্রত্যেক রাবী থেকে দুজন বর্ণনা করবে এভাবে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছবে। বিষয়টির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি **شَهَادَةُ عَلَى الشَّاهِدِ** তথা এক সাক্ষীর জন্য দুজন সাক্ষী হওয়া-এর কথা বলেছেন- যা প্রমাণ করে যে, তার মতে সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত।

২. তবে জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মত হলো, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য **عَزِيزٌ** হওয়া শর্ত নয়; বরং গরীব হাদীসও সহীহ হতে পারে। যার বড় প্রমাণ বুখারী শরীফের প্রথম **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالتَّيَبَاتِ** হাদীসটি। কারণ, এ হাদীসটি সকলের মতে সহীহ। অথচ তা গরীব। অনুরূপভাবে বুখারীর শেষ **... كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ** হাদীসটিও গরীব।

এ দু দলের মধ্যে জুমহুরের মায়হাবই সত্য এবং সঠিক। কারণ, সামনে সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা আসছে। অথচ সেখানে গরীব না হওয়ার কোনো শর্ত নেই।

আযীয হওয়া বুখারীর শর্ত কিনা? কোনো হাদীস বুখারী শরীফে উল্লেখ করার জন্য তা আযীয হওয়া শর্ত নাকি ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে গরীব হাদীসও উল্লেখ করেছেন- এ ব্যাপারে কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবী (র.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এটা ইমাম বুখারীর শর্ত। তবে জুমহুরের মত হলো, খবর আযীয হওয়া ইমাম বুখারীর শর্ত নয়। এর বড় দলিল বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস- **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالتَّيَبَاتِ** কেননা, এটা গরীব হয়েও বুখারীতে উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপ শেষ হাদীস- **... كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ** ও বড় দলিল। কেননা, সেটাও গরীব। এজন্য ইবনে রুশাইদ বলেন, ইবনুল আরাবীর দাবি ভুল প্রমাণের জন্য বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসটিই যথেষ্ট। কেননা, নিয়তের এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুধু হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) থেকে শুধু আলকামা (র.) বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য ইবনুল আরাবী (র.) জুমহুরের দলিলের জবাব এভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সামনে খুতবা দানকালে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আলকামা (র.) এ সময় অন্যান্য সাহাবীদের সাথে উপস্থিত থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেন। তাই যদি অন্য কোনো সাহাবী এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে না শুনতেন, তাহলে তারা এর প্রতিবাদ করতেন। অথচ সবাই নীরব ছিলেন। সুতরাং অন্য যে সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং অনুরূপ আলকামার সাথিদের মধ্য হতে যারা এ হাদীসটি হযরত ওমর (রা.) হতে শুনেছেন, তারা রেওয়াজেত করার মধ্যে শরিক হয়ে গেলেন। অতএব, এ হাদীসটি গরীব নয়; বরং আযীযই। অতএব, বুখারীর শর্ত মোতাবেক হলো।

কিন্তু ইবনুল আরাবীর এ উত্তর দু কারণে ঠিক নয়।

১. সাহাবায়ে কেরামের চূপ থাকাটা এর দলিল নয় যে, তাঁরাও রাসূল ﷺ থেকে হাদীসটি শুনে থাকবেন। এতদ্ব্যতীত আযীয হওয়ার জন্য শোনা শর্ত না। বরং দুই রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া শর্ত, যা এখানে অনুপস্থিত।

وَيَا هَذَا لَوْ سَلِمَ فِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُنِعَ فِي تَفَرُّدِ عِلْقَمَةَ عَنْهُ، ثُمَّ تَفَرَّدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِهِ عَنْ عِلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرَّدَ بِخَبِيِّ بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابِعَاتٌ لَا يَعْتَبَرُ بِهَا، وَكَذَا لَا نُسَلِّمُ جَوَابَهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بَطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرَطُ الْبُخَارِيِّ أَوَّلَ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ وَادَّعَى ابْنُ جَبَّانٍ نَقِيضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لَا يُوْجَدُ أَصْلًا، قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ رَوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنْ اثْنَيْنِ فَقَطْ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لَا يُوْجَدُ أَصْلًا فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَمَّا صُورَةُ الْعَزِيزِ الَّتِي حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُودَةٌ يَأْنُ لَا يَزْوِيهِ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلِّ مِنَ اثْنَيْنِ، وَمِثَالُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ (رَضِيَ) وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَرَوَاهُ عَنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ وَالرَّابِعُ الْغَرِيبُ وَهُوَ مَا يَتَفَرَّدُ بِرَوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ عَلَى مَا سَيُقَسَّمُ إِلَيْهِ الْغَرِيبُ الْمَطْلُوقُ وَالْغَرِيبُ التَّسْبِيءُ.

অনুবাদ : দ্বিতীয়ত হযরত ওমর (রা.)-এর বেলায় হয়তো মানা গেল যে, তিনি এর একমাত্র বর্ণনাকারী নন। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে তো একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন আলকামা; অতঃপর তাঁর নিকট থেকে একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম এবং অতঃপর তার নিকট থেকে একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ। মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট এটিই এ হাদীসের প্রসিদ্ধ সনদ। অবশ্য প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর মুতাবি' বা সহযোগী রয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় মতে তা বিবেচ্য নয়। তেমনি হযরত ওমর (রা.) ব্যতীত অন্যদের বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে কাজি সাহেবের জবাব টিকে না। ইবনে রুশাইদ বলেন- কাজি আবু বকর যে এটি ইমাম বুখারীর শর্ত বলে দাবি করেছেন, তা অসার হবার জন্য বুখারী শরীফে বর্ণিত প্রথম হাদীসটিই যথেষ্ট। ইবনে হিব্বান তার দাবির বিপরীত দাবি করেছেন। তিনি বলেন- “প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে দুজন থেকে দুজনের বর্ণনা আদৌ পাওয়া যাবে না।” ইবনে হিব্বানের বক্তব্যের অর্থ যদি হয়, “মাত্র দুজন থেকে দুজন বর্ণনা করবেন- এভাবে শেষ পর্যন্ত আসবে- একশ হাদীস আদৌ পাওয়া যাবে না”-তাহলে তা মানা যেতে পারে। কিন্তু আযীয হাদীসের যে

ধরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরের কমপক্ষে দুজন বর্ণনাকারী থাকবেন- তা অনেক পাওয়া যায়।

আযীয হাদীসের উদাহরণ- বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে এবং বুখারী শরীফের বিভিন্ন স্থানে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, “তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাঙ্গ) মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট অধিক প্রিয় হই তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে।”

হযরত আনাস (রা.) হতে এটি বর্ণনা করেছেন কাতাদা ও আব্দুল আযীয ইবনে সুহাইব, কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন শু'বা ও সাঈদ এবং আব্দুল আযীয থেকে ইসমাঈল ইবনে উলায়্যা ও আব্দুল ওয়রিহ। অতঃপর প্রত্যেকের নিকট থেকে একদল লোক এটি বর্ণনা করেছেন।

খবরের চতুর্থ প্রকারের নাম গরীব। তা হলো- যে খবর একক ব্যক্তির বর্ণিত। সনদের যে কোনো স্থানে এই এককত্ব আসতে পারে। অবশ্য সকল স্তরে একজন রাবী থাকলে, তাকে গরীবের মুতলাক (غَرِيبٌ مُتْلَاكٌ) বলে আর স্থানবিশেষে একজন রাবী থাকলে, তাকে গরীবের নিসবী (غَرِيبٌ نَسَبِيٌّ) বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, হযরত ওমর (রা.) অনুরূপ হযরত আলকামার সাথে হাদীস রেওয়াজেতে অন্য শরিক আছেন, কিন্তু তার পরে যে রাবী আছেন তিনি তো গরীব। কেননা, আলকামা হতে শুধুমাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আর তার থেকে শুধুমাত্র ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রেওয়াজেত করেন। এটাও এ হাদীসের প্রসিদ্ধ সনদ। হ্যাঁ তবে এ সমস্ত রাবীর মুতাবি' আছেন। তবে তা ধর্তব্য নয় বিধায় আযীয হওয়া বুখারীর শর্ত থাকল না।

ইবনে হিষ্কানের দাবি বনাম লেখকের অভিমত : ইবনে হিষ্কান এ ব্যাপারে ইবনুল আরাবীর বিপরীত দাবি করেছেন যে, কোনো হাদীস এমন নেই, যার রেওয়ায়েত প্রতি স্তরে দুজন দুজন থেকে হয়েছে। এভাবে সনদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সম্মানিত লেখক এ দাবির প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ইবনে হিব্বানের উক্তিই অর্থ যদি এই হয় যে, দুজন থেকে দুজনের রেওয়ায়েত- এভাবে শেষ পর্যন্ত হবে, তাহলে তার কথা মেনে নেওয়া যায় যে, এরূপ হাদীসের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যদি তার কথার উদ্দেশ্য এই হয় যে, আযীয হলো, প্রত্যেক স্তরে কমপক্ষে দুজন রাবী হবেন, হ্যাঁ তবে কোথাও বেশি হলে ক্ষতি নেই, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে ইবনে হিব্বানের কথা ঠিক নয়। কারণ, এমন হাদীস বাস্তবে অনেক আছে। এর একটি উদাহরণ হলো- **يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ** এ হাদীসটি। এটি বর্ণিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে, হযরত আনাস (রা.) হতে। আর শুধু বুখারীতে অন্যস্থানে, বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে।

عَلَى مَا سَيَقُومُ : এর দ্বারা এটা বলা উদ্দেশ্য যে, গরীবের প্রকারভেদে এখানে বর্ণনা করা হবে না; বরং তা সামনে আসবে।

وَالْغَرِيبُ الْغَرِيبُ الْغَرِيبُ : এটা তারকীবে উহা মুবতাদার খবর। আর সে মুবতাদা হলো যমীর **هُوَ** যমীর। **الْغَرِيبُ** এটা **عَنْفٍ** হয়েছে **الْغَرِيبُ الْمَطْلُقُ** -এর উপরে। আর **مَعْفُونٌ عَلَيْهِ** ও **مَعْفُونٌ** মিলে হলো **مَا سَيَقْسَمُ إِلَيْهِ** -এর বয়ান। **سَيَقْسَمُ** -এর যমীর ফিরেছে **الْغَرِيبُ** -এর দিকে। পূর্ণ ইবারত হবে এরূপ-
عَلَى مَا سَيَقْسَمُ الْغَرِيبُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْغَرِيبُ الْمَطْلُقُ وَالْغَرِيبُ السَّيِّئُ

وَالْغَرْبُ الْبَسِيءُ: শব্দটির সহীহ উচ্চারণ 'নিসবী'। ব্যক্তি বিশেষের কারণে গরীব হওয়ায় তাকে গরীবে নিসবী বলা হয়।

وَكُلُّهَا أَيْ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ سِوَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ أَحَادٌ، وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَبَرٌ وَاحِدٌ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِي اللَّغَةِ مَا يَرْوِيهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَفِي الْأَصْطِلَاحِ مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطُ التَّوَاتُرِ، وَفِيهَا أَيْ فِي الْأَحَادِ الْقَبُولُ وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِيهَا الْمَرْدُودُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْجَعْ صَدَقُ الْمُخْبِرُ بِهِ لِتَوَقُّفِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رَوَاتِهَا دُونَ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ لِإِقَادَتِهِ الْقَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْأَحَادِ لَكِنْ إِنَّمَا وَجِبَ الْعَمَلُ بِالْمَقْبُولِ مِنْهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا أَنْ يُوْجَدَ فِيهَا أَصْلُ صِفَةِ الْقَبُولِ وَهُوَ ثُبُوتُ صَدَقِ النَّاقِلِ أَوْ أَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ وَهُوَ ثُبُوتُ كِذْبِ النَّاقِلِ أَوْ لَا فَالْأَوَّلُ يُعْلَبُ عَلَى الظَّنِّ صَدَقَ الْخَبَرُ لِثُبُوتِ صَدَقِ نَاقِلِهِ فَيُؤْخَذُ بِهِ، وَالثَّانِي يُعْلَبُ عَلَى الظَّنِّ كِذْبَ الْخَبَرِ لِثُبُوتِ كِذْبِ نَاقِلِهِ فَيُطْرَحُ وَالثَّالِثُ إِنْ وَجِدْتَ قَرِينَةً تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ التَّحَقُّقُ بِهِ وَلَا فَيَتَوَقَّفُ فِيهِ وَإِذَا تَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُودِ لَا لِثُبُوتِ صِفَةِ الرَّدِّ بَلْ لِكُونِهِ لَمْ يُوْجَدَ صِفَةُ تَوْجِبِ الْقَبُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : প্রথমটি অর্থাৎ মুতাওয়াতির ব্যতীত অবশিষ্ট (তিন) প্রকারগুলোকে এক নামে খবরে আশাদ বলে। আর তিন প্রকারের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে বলে খবরে ওয়াহিদ। খবরে ওয়াহিদের আভিধানিক অর্থ- যা এক ব্যক্তির বর্ণিত। আর পরিভাষায় এর অর্থ- যে হাদীসে মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহ অনুপস্থিত।

খবরে ওয়াহিদ দু প্রকার। যথা- ১. মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য। জুমহরের মতে এ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। ২. মারদূদ বা পরিত্যাজ্য। যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সত্যতা প্রবলতর নয়- তা এ শ্রেণীর অন্তর্গত।
এরূপ (চার প্রকার খবরের মধ্যে) শ্রেণিকরণের কারণ হলো, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলিল পেশ করতে হলে তা নির্ভর করে এর বর্ণনাকারীদের অবস্থা পর্যালোচনার উপর। কিন্তু প্রথমটি অর্থাৎ মুতাওয়াতির এমন নয়। এর প্রত্যেকটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা, এর বর্ণনাকারীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ এর ব্যতিক্রম। তা সত্ত্বেও মাকবুল শ্রেণির খবরে ওয়াহিদ মোতাবেক আমল করা ওয়াজিব হবার কারণ হলো- যদি এতে গ্রহণযোগ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য তথা বর্ণনাকারীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে প্রবল ধারণা হয় হাদীসটি সত্য হবার। তাই সে মোতাবেক আমল করতে হয়। আর যদি তাতে প্রত্যাখ্যানের মূল বৈশিষ্ট্য তথা বর্ণনাকারীর মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে প্রবল ধারণা হয় হাদীসটি মিথ্যা হবার। তাই তা পরিহার করা হয়। তৃতীয় শ্রেণি অর্থাৎ যেখানে গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান কোনোটিরই মূল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না- এরূপ ক্ষেত্রে কোনো নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রথমোক্ত দু শ্রেণির কোনো একটার সাথে শামিল করা গেলে তা করতে হবে। নইলে এরূপ হাদীস হবে মাওকুফ বা স্থগিত।

অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত না হলেও তা কোথাও দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। কোনো খবরের উপর আমল স্থগিত হলে তা মারদূদ বা প্রত্যাখ্যানের মতো হয়ে যাবে। তবে এ প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা তার মধ্যে প্রত্যাখ্যানের বৈশিষ্ট্য পাওয়ার কারণে নয়; বরং গ্রহণের বৈশিষ্ট্য না পাওয়ার কারণে। আদ্বাহ অধিক অবগত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَحِبُّ الْعَمَلُ بِهِ : এর দ্বারা মু'তাহিদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করা উদ্দেশ্য। কারণ তারা বলেন, খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা ওয়াজিব নয়।

খবরে ওয়াহিদের আভিধানিক অর্থ : অভিধানে খবরে ওয়াহিদ অর্থ- এক ব্যক্তির খবর। অর্থাৎ ঐ খবর, যা এক ব্যক্তি বর্ণনা করে। যেহেতু এটা সর্বনিম্ন এক ব্যক্তি বর্ণনা করে, তাই একে খবরে ওয়াহিদ বলা হয়।

খবরে ওয়াহিদের পারিভাষিক অর্থ : আরবিতে -خَبَرٌ وَاحِدٌ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

مُرَّ الْعَدِيثِ الَّذِي لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ شَرَايِطُ التَّوَاتُرِ

পরিভাষায় খবরে ওয়াহিদ ঐ খবরকে বলে, যার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে বা পাওয়া যায় না। খবরে ওয়াহিদের প্রকারভেদ এবং সীমাবদ্ধতার কারণ (وَجْهٌ خَفِصَ) : খবরে ওয়াহিদ মশহূর হোক, আযীয হোক কিংবা গরীব- তা দু প্রকার। কতিপয় মাকবূল অর্থাৎ আমলযোগ্য আর কিছু হলো মারদূদ তথা প্রত্যাখ্যাত ও আমলের অযোগ্য। এ দু প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, খবরে ওয়াহিদের মধ্যে কবুলের বৈশিষ্ট্য তথা রাবীর সত্যবাদিতা পাওয়া যাবে অথবা প্রত্যাখ্যানের বৈশিষ্ট্য তথা রাবীর অসত্যবাদিতা পাওয়া যাবে। অথবা, এ দুটির কোনোটিই পাওয়া যাবে না। প্রথম প্রকারকে মাকবূল বলে আর দ্বিতীয়টি হলো মারদূদ। আর তৃতীয় অর্থাৎ যার মধ্যে গ্রহণ কিংবা বর্জনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না- এটা আবার দু প্রকার। হয়তো তার সাথে কবুল বা রদের কোনো নিদর্শন পাওয়া যাবে অথবা পাওয়া যাবে না। যদি কবুলের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহলে কবুলের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর রদের বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তার সাথে এমন কোনো নিদর্শনও না থাকে, তাহলে খবরটির উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবে। আর যখন আমল স্থগিত হয়ে গেল, তখন সেটা কার্যত মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। মোটকথা, 8 প্রকার হয়। যথা-

১. খবরের মধ্যে কবুলের সিফাত পাওয়া গেলে তা মাকবূল হবে।
২. খবরের মধ্যে রদের সিফাত পাওয়া গেলে তা মারদূদ হবে।
৩. যার নিদর্শন পাওয়া যাবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।
৪. নিদর্শন না পাওয়া গেলে মারদূদ হবে।

তবে এ মারদূদ হওয়াটা তার মধ্যে রদের সিফাত পাওয়া যাবার কারণে নয়; বরং কবুলের সিফাত তার মধ্যে না পাওয়া যাওয়ার কারণে। অতএব মোট খবর দুই প্রকারই- মাকবূল ও মারদূদ।

জুমহূরের মতে মাকবূল বলে- যার দ্বারা শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হয়, আর মারদূদ হলো- যার দ্বারা শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হয় না।

খবরে মুতাওয়াতির ও খবরে আহাদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ : আগেই বলা হয়েছে, ৪ প্রকার খবরের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ খবরে মুতাওয়াতির ছাড়া বাকি তিন প্রকার অর্থাৎ মশহূর, আযীয ও গরীবকে একত্রে খবরে আহাদ বলা হয়। এই মুতাওয়াতির ও আহাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, খবরে মুতাওয়াতিরের উপর সর্বাবস্থায় আমল করা ওয়াজিব। কারণ, তার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে না। কিন্তু খবরে আহাদ এমনটি না হওয়ায় তার রাবীদের অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। রাবি ভালো হলে তা আমল ওয়াজিব করে আর রাবি ভালো না হলে তথা মিথ্যাবাদী হলে তা আমল ওয়াজিব করে না; বরং তা মারদূদ হয়ে যায়।

وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا أَيْ فِي أَخْبَارِ الْأَحَادِ الْمُتَقَسِّمَةِ إِلَى سَمْعِهِمْ وَعَزِيزٍ وَغَرِيبٍ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى الْمُخْتَارِ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ وَالْخِلَافُ فِي التَّحْتَبِيقِ لَفْظِيٌّ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطْلَاقَ الْعِلْمِ قَبْدَهُ بِكُنُوبِهِ نَظَرِيًّا وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنِ الْإِسْتِدْلَالِ وَمَنْ أَبَى الْإِطْلَاقَ حَصَّ لَفْظَ الْعِلْمِ بِالْمُتَوَاتِرِ وَمَا عَدَاهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ لِكَيْتَهُ لَا يَنْفِي أَنَّ مَا اخْتَفَى بِالْقَرَائِنِ أَرْجَعَ مِمَّا خَلَا عَنْهَا.

অনুবাদ : যে খবরে ওয়াহিদ মশহুর, আযীয ও গরীবের দিকে বিভক্ত হয় তা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী **عِلْم** **نظري** -এর ফায়দা দেয়। তবে অনেকে এটা অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে এ মতান্তরটা বাহ্যিক ও শাদ্দিক (আসলে কোনো ইখতিলাফ নেই)। কেননা, যারা **عِلْم** -এর ফায়দা দেয় বলেন, তারা তার সাথে **نظري** -এর শর্ত যোগ করে বলেন অর্থাৎ **عِلْمَ نظري** -এর ফায়দা দেয়। আর যারা **عِلْم** -এর ফায়দাকে অস্বীকার করেন তারা **عِلْم** -কে **مُتَوَاتِر** -এর সাথে খাস করেন অর্থাৎ বলেন, **عِلْمَ ضُرُوري** -এর ফায়দা দেয় কেবল খবরে মুতাওয়াতির। অস্বীকারকারীদের মতে, **مُتَوَاتِر** ছাড়া যত খবর আছে সবই হলো **طبي** অর্থাৎ ধারণার ফায়দা দেয় মাত্র। তবে তাদের এই অস্বীকারটা এটাকে নিষেধ করে না যে, নিদর্শন বিজড়িত খবরসমূহ নিদর্শনহীন খবরের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য। (অর্থাৎ তারা **عِلْمَ ضُرُوري** -এর ফায়দাকে অস্বীকার করে, **عِلْمَ نظري** -এর ফায়দাকে নয়। আর যারা **عِلْم** -এর ফায়দাকে সাবেত করেন তারাও **عِلْمَ نظري** -কেই সাবেত করেন। অতএব কোনো ইখতিলাফ নেই।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খবরে আহাদদের হুকুম এবং ফায়দা : পূর্বে বলা হয়েছে যে, খবরে ওয়াহিদ চাই মশহুর হোক, আযীয হোক কিংবা গরীব- এর মধ্য হতে কিছু মাকবুল আর কিছু মারদূদ। মারদূদ যা তা দলিলের ও আমলের অযোগ্য। আর যা মাকবুল তার হুকুম ও ফায়দা কি তা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন-

১. বিশুদ্ধ মাহযাব হলো, **عِلْمَ يَقِينِ نظري** টা **عِلْمَ ضُرُوري** -এর ফায়দা দেয়, **عِلْمَ ضُرُوري** -এর ফায়দা দেয়।

২. অনেকে এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, এটা **عِلْم** -এর ফায়দা দেয় না।

তবে বাস্তব বিচারে এ মতভেদটা বাহ্যিক ও শাদ্দিক মাত্র; দু দলের মধ্যে মূলত কোনো ইখতিলাফ নেই। আর তা এভাবে যে, যারা বলেন, এটা **عِلْم** -এর ফায়দা দেয় না, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো **عِلْم** **ضُرُوري**। অর্থাৎ মূল বক্তব্য হলো, **عِلْمَ ضُرُوري** টা **عِلْمَ ضُرُوري** -এর ফায়দা দেয় না। কারণ, এটা **عِلْم** **ضُرُوري** -এর সাথে খাস। অর্থাৎ কেবল **عِلْمَ ضُرُوري** -ই **عِلْمَ ضُرُوري** -এর ফায়দা দেয়। আর হুবহু এটাই হলো জুমহুরের মাহযাব। কেননা, তারা যে বলেন, **عِلْم** **ضُرُوري** টা **عِلْم** -এর ফায়দা দেয়- এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য **عِلْمَ نظري** ; অতএব উভয় দলের মতামত এক হওয়ায় কোনো ইখতিলাফ থাকে না।

তবে এ ইখতিলাফটা কেবল তখন প্রযোজ্য, যখন **عِلْم** **ضُرُوري** -এর সাথে করীনা বা নিদর্শন যুক্ত থাকবে।

যদি **عِلْم** **ضُرُوري** এই নিদর্শনশূন্য হয়, তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে **عِلْم** **ضُرُوري** -এরই ফায়দা দেয়, **عِلْم** -এর নয়।

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, যে **عِلْم** **ضُرُوري** টা করীনা সংশ্লিষ্ট হয় তা সর্বদা **عِلْم** **ضُرُوري** -এর উপর প্রাধান্য পায় যার সাথে কোনো এমন করীনা নেই। আর করীনা হলো তিনটি। যথা- ১. বুখারী-মুসলিমের রেওয়ায়েত হওয়া, ২. খবরে মশহুরটা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়া ও ৩. বড় বড় মুহাদ্দিস কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়া। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

وَالْخَبَرُ الْمُخْتَفٍ بِالْقَرَائِنِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِمَّا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ ، فَإِنَّهُ اخْتَفَى بِهِ قَرَائِنٌ مِنْهَا جَلَّالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّانِ وَتَقَدَّمُهَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهَا وَتَلَقَّى الْعُلَمَاءُ لِكِتَابَيْنِهَا بِالْقَبُولِ وَهَذَا التَّلَقُّي وَحَدَّهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مَجَرَّدِ كَثَرَةِ الطَّرِيقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ إِلَّا أَنَّ هَذَا يَخْتَصُّ بِمَا لَمْ يَنْتَقِدهُ أَحَدٌ مِنَ الْحُقَاطِ مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ وَمِمَّا لَمْ يَفِغِ التَّخَالُفُ بَيْنَ مَذْلُوكَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابَيْنِ حَيْثُ لَا تَرْجِعُ لِاسْتِحَالَةٍ أَنْ يُفِيدَ الْمُتَنَاقِضَانِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صَحَّتِهِ .

অনুবাদ : নিদর্শন বিজড়িত হাদীস কয়েক শ্রেণীর। ১. বুখারী ও মুসলিম শরীফে একযোগে বর্ণিত হাদীস, যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে উন্নীত নয়। (কারণ,) এতে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে। ক. হাদীসশাস্ত্রে তাঁদের (বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর) মর্যাদা, খ. হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ে তাদের অগ্রগামিতা ও গ. ওলামায়ে কেরামের নিকট তাঁদের কিতাব দুটি (ব্যাপক) গৃহীত হওয়া। মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত না হলে নিছক সনদের আধিক্যের চেয়ে শুধুমাত্র 'গৃহীত হওয়া' বেশিষ্টাটো কোনো হাদীস দ্বারা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পক্ষে অধিকতর মজবুত দলিল। অবশ্য এ নিয়ম সেই হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- বুখারী ও মুসলিম শরীফের যে হাদীস সম্পর্কে হাফিজুল হাদীসগণ কোনো সমালোচনা করেননি এবং উক্ত দু'গ্রন্থের যে দু'হাদীসের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে এমন বৈপরীত্য নেই যে, কোনোটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। কেননা, পরস্পর বিরোধী দু'হাদীসের মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত সে দুটি দ্বারা সত্যতার জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এ ছাড়া যা (বুখারী ও মুসলিম) রয়েছে, তা সহীহ বলে মেনে নিতে সকলেই একমত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিদর্শন বিজড়িত খবরে ওয়াহিদের শ্রেণিভেদ : নিদর্শন বিজড়িত খবর তিন প্রকার। যথা-

১. শায়খাইন তথা ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) কর্তৃক বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ।
২. ভিন্ন ভিন্ন একাধিক সনদে বর্ণিত খবরে মাশহুর।
৩. গরীব ছাড়া হাফিজে হাদীসগণ কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো-

প্রথম প্রকারের বিবরণ : ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ চাই তা মশহুর হোক, কিংবা আযীয কিংবা গরীব- তা বিভিন্ন কারণে নিশ্চিত যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়। যথা-

১. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়া।
২. সহীহ হাদীসকে গায়রে সহীহ হাদীস থেকে পৃথককরণ ও যাচাই-বাছাইয়ে অন্যান্য ইমামদের তুলনায় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর অগ্রগামী হওয়া।

৩. তাঁদের কিতাব তথা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সহীহ গ্রন্থ হিসেবে ওলামায়ে কেরাম তথা উম্মতে মুসলিমাহ কর্তৃক গৃহীত হওয়া। এই তৃতীয় কারণটি এমন শক্তিশালী যে, বিভিন্ন সনদে বর্ণিত খবরে মশহুরও নিশ্চিত যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দানের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হতে পারে না। অবশ্য দুটি অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। আর তা হলো-

১. শায়খাইনের রেওয়ায়েতটি যদি হাফিজ হাদীস ও হাদীস বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সমালোচিত হয়।
২. অথবা, শায়খাইনের দুই রেওয়ায়েতে এমন কোনো বিরোধ থাকে যে, একটি রেওয়ায়েতকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। কেবল এ দু অবস্থায় শায়খাইনের রেওয়ায়েত নিশ্চিত যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয় না। মোটকথা হলো, শায়খাইনের সমালোচিত কিংবা বিরোধপূর্ণ হাদীস ছাড়া তাতে আর যত রেওয়ায়েত রয়েছে সর্বসম্মত মতে তা সহীহ এবং নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়।

শায়খাইনের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা : হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কেরাম বুখারী ও মুসলিমের যে সমস্ত হাদীসের সমালোচনা করেছেন তার সর্বমোট সংখ্যা ২১০। এর মধ্যে শুধু মুসলিম শরীফে ১০০টি, আর শুধু বুখারীতে ৭৮টি। অবশিষ্ট ৩২টি উভয় গ্রন্থেই।

فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وَجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّتِهِ مَنَعْنَاهُ وَسَدُّ الْمَنَعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وَجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ فَلَمْ يَبْقِ لِلصَّحَابَةِ فِي هَذَا مِزَّةٌ وَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مِزَّةً فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصَّحَّةِ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ الْعِلْمَ التَّظَرُّيَّ الْأَسْتَاذُ أَبُو اسْحَاقَ الْإِسْفَرَايْنِيُّ وَمِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَمِيدِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ وَغَيْرُهُمَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ الْمِزَّةُ الْمَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الْحَدِيثِ .

অনুবাদ : প্রশ্ন হতে পারে, বুখারী ও মুসলিম শরীফের সকল হাদীস মোতাবেক আমল ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সকলের ঐকমত্য রয়েছে, বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নয়।

এ প্রশ্ন আমরা মানবো না। না মানার কারণ হলো, ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রতিটি সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করা ওয়াজিব যদিও তা বুখারী-মুসলিমের সংকলিত না হোক। সুতরাং এদিক বিচারে বুখারী-মুসলিমের বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য থাকল না। অথচ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ দু'গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে।

বুখারী-মুসলিম শরীফের একযোগে বর্ণিত হাদীস থেকে যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হওয়ার কথা যারা স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন মনীষী আবু ইসহাক ইসফিরাইনী এবং ইমামুল হাদীস আবু আব্দুল্লাহ হুমাইদী, আবুল ফযল ইবনে তাহির প্রমুখ।

এটাও বলা যেতে পারে যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ অধিকতর বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে মর্যাদার অধিকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কতিপয়ের অভিমত এই যে, বুখারী-মুসলিমের ব্যাপারে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা 'আমল ওয়াজিব হওয়া'র ব্যাপারে, বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নয়। তাদের এ কথা ঠিক নয়। কারণ হলো—

১. হাদীস জগতে বুখারী-মুসলিমের তিনু একটি মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট স্বীকৃত। আর খবরে ওয়াহিদ যে আমলকে ওয়াজিব করে এ কথা সকল হাদীসের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। চাই সে খবরে ওয়াহিদ বুখারী-মুসলিম শরীফের হোক কিংবা অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে থাকুক।

ফলে বুখারী-মুসলিমের ব্যাপারে ঐকমত্যটা যদি 'বিশুদ্ধতা'র বিচারে না হয়, তাহলে বাস্তবে বুখারী-মুসলিমের স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য আর রইবে না।

২. এ কথাও বলা যেতে পারে যে, বুখারী-মুসলিমের ব্যাপারে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নয়; বরং অধিকতর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে। অর্থাৎ বুখারী-মুসলিমের হাদীস অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস থেকে অধিক বিশুদ্ধ ও সহীহ। অতএব সহীহ তথা বিশুদ্ধ হাদীস যদি 'ধারণা' -এর ফায়দা দেয় তবে অবশ্যই 'অধিকতর বিশুদ্ধ' হাদীস 'যৌক্তিক জ্ঞান' -এর ফায়দা দেবে। যাতে বিশুদ্ধ ও অধিকতর বিশুদ্ধ -এর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرُقٌ مُبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ قُورٍ وَغَيْرُهُمَا .

وَمِنْهَا الْمُسْتَسْلَسُ بِالْأَيْمَةِ الْحِفَاطِ الْمُتَقِينِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيبًا كَالْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَثَلًا ، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَإِنَّهُ يَفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِالْأَسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةٍ جَلَالَةٍ رَوَاتِهِ ، وَإِنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمَوْجِبَةِ لِلْقَبُولِ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا مَثَلًا لَوْ شَافَهُ بِخَبَرٍ لَعِلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ فَإِذَا انْصَافَ إِلَيْهِ أَيْضًا مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ إِزْدَادَ قُوَّةٍ وَبَعْدَ عَمَّا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السُّهُورِ ، وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصَدَقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالْحَدِيثِ الْمُتَبَحَّرِ فِيهِ الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ الْمُطَّلِعِ عَلَى الْعِلَلِ وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصَدَقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَنْفِي حُصُولَ الْعِلْمِ لِلْمُتَبَحَّرِ الْمَذْكُورِ ، وَمَحْصُلُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَنَّ الْأَوَّلَ يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحَيْنِ وَالثَّانِي بِمَا لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدَّةٌ وَالثَّالِثُ بِمَا رَوَاهُ الْأَيْمَةُ ، وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ فَلَا يَنْعَدُّ جَ الْقَطْعُ بِصَدَقِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : ২. যে মশহূর হাদীসের এরূপ বিভিন্ন সনদ রয়েছে যা বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা ও সূক্ষ্ম ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত। এ ধরনের হাদীস যৌক্তিক জ্ঞান দান করে বলে যারা রায় দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে মনীষী আবু মানসুর বাগদাদী, আবু বকর ইবনে ফুরাক প্রমুখ।

৩. শক্তিশালী হাফিজুল হাদীস ইমামগণ ধারাবাহিকভাবে যে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে শর্ত হলো, তা গরীব শ্রেণির না হওয়া চাই। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং তাঁর সাথে আরো একজন একত্রে যে হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণনা করেন। আবার ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং তাঁর সাথে আরো একজন একত্রে সেটি ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেন। এ ধরনের হাদীস যেই গুনবে তারই 'عِلْمَ نَظَرِي' বা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হবে। আর সে যুক্তি হলো, বর্ণনাকারীরা উচ্চমর্যাদার

অধিকারী এবং তাদের এমন গুণাবলি রয়েছে যাতে গ্রহণযোগ্যতা অবধারিত হয়। অন্যদের সংখ্যাধিকা দ্বারা যা অর্জিত হয়, উক্ত ইমামদের গুণাবলিই তার জন্য যথেষ্ট। ইলমে-হাদীসের সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্ক রয়েছে এবং যিনি মানুষের অবস্থাদি জানেন, তিনি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করবেন না যে, ইমাম মালিক (র.) -এর মতো ব্যক্তি যদি সরাসরি কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী। সেই সাথে যদি আরো যুক্ত হয় এমন ব্যক্তি যিনি উক্ত পর্যায়ের, তাহলে বিষয়টি আরো মজবুত হয় এবং ভুলের আশঙ্কা আর থাকে না।

যে তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হলো, তা দ্বারা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হয় শুধুমাত্র এমন হাদীসশাস্ত্র বিশারদের যিনি এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী, হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত এবং সনদের সূক্ষ্ম দোষত্রুটির বিষয়ে সচেতন। উল্লিখিত গুণাবলির অভাবে কারো যদি জ্ঞান অর্জিত না হয় তাহলে পণ্ডিত আলিমেরও তা অর্জিত হবে না- এমন বলা যাবে না।

সারকথা, প্রথম শ্রেণি বুখারী ও মুসলিমের সাথে নির্ধারিত। দ্বিতীয় হলো যার একাধিক সনদ রয়েছে এবং তৃতীয় হলো যা ইমামদের বর্ণিত। একই হাদীসের ক্ষেত্রে উক্ত তিন বৈশিষ্ট্য সমবেত হতে পারে। সুতরাং তখন হাদীসটির সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই অবশিষ্ট থাকে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকারের বিবরণ : বিভিন্ন সনদে বর্ণিত ঐ খবরে মাহসূর যা বৈপরীত্য, দুর্বলতা এবং সূক্ষ্ম ত্রুটি হতে মুক্ত হয়। এটাও যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়। একাধিক আলিম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- গুস্তাদ আবু মানসূর বাগদাদী, গুস্তাদ আবু বকর ইবনে ফুরাক প্রমুখ।

তৃতীয় প্রকারের বিবরণ : গরীব ব্যতীত ঐ খবরে ওয়াহিদ, যা হাদীসের ইমামগণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন। যেমন- কোনো একটি হাদীস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর মতো আরেক ব্যক্তিত্ব ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণনা করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর মতো আরেক ব্যক্তিত্ব ইমাম মালিক (র.) হতে বর্ণনা করেন। এ হাদীসও **عَلِمَ نَظَرِي** তথা যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেবে। যুক্তি হলো, তাদের মাঝে এমন গুণাবলি রয়েছে, যা হাদীসকে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উপনীত করে। কেননা, তারা একাই কয়েক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত এবং মৌখিকভাবে যখন তাঁরা কোনো খবর দেন তখন তার সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাহলে তাঁদের সাথে যদি তাঁদেরই মতো আরেক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনায় যোগ দেন, তাহলে তাঁর সত্যতার ব্যাপারে শক্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই তা যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেবে।

এক ব্যক্তি অনেকের স্থলাভিষিক্ত : ব্যক্তির মতো ব্যক্তি হলে এক ব্যক্তিই যে অনেক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার এ ইরশাদ- **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً** হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর মাঝে বিশেষ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় তাঁকে **أُمَّة** (উম্মত) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত তিন প্রকারই যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়। তবে এ ফায়দা সকলকে দেয় না; বরং এর জন্য তিন প্রকার বিশেষ গুণ থাকতে হবে। যথা-

১. হাদীসশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে।
২. রাবী বিশেষজ্ঞ হতে হবে।
৩. সমালোচনা ও সূক্ষ্ম দোষ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

যাদের মধ্যে উল্লিখিত তিন গুণ বিদ্যমান থাকবে না তাদেরকে উল্লিখিত তিন প্রকার যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেবে না।

কখনো একই হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত তিন প্রকারই সমবেত হতে পারে। তখন সে হাদীস অবশ্যই যৌক্তিক জ্ঞান (**عَلِمَ نَظَرِي**) -এর ফায়দা দেবে।

ثُمَّ الْغَرَابَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ أَوْ فِي الْمَوْحِجِ الْمَرْفُوعِ
الْإِسْنَادُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ وَهُوَ حَرْفُهُ الَّذِي فِيهِ
الصَّحَابِيُّ أَوْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يَأْنِ يَكُونُ التَّفَرُّدُ فِي أَثْنَائِهِ كَانَ مَرْجُوعًا عَنْ
الصَّحَابِيِّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ثُمَّ يَتَّفَرَّدُ بِرَوَايَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصًا وَاحِدًا
فَالْأَوَّلُ الْفَرْدُ الْمَطْلُوقُ كَحَدِيثِ الثَّوْبِيِّ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبَيْتَةَ تَفَرَّدَ بِهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ يَتَّفَرَّدُ بِهِ رَأْيُ عَنْ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدِ
كَحَدِيثِ شُعْبٍ الْإِيمَانِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ وَتَفَرَّدَ بِهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِي جَمِيعِ رَوَاتِهِ
أَوْ أَكْثَرِهِمْ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَرْزَارِ وَالْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ لِلطَّبْرَانِيِّ أَمْثَلَةٌ
كَثِيرَةٌ لِذَلِكَ.

অনুবাদ : কোনো হাদীস গরীব হওয়ার কারণ তথা বর্ণনাকারীর এককত্ব হতে পারে সনদের মূল স্তরে অর্থাৎ যে স্থানে সনদ আবার্তিত হয় ও যেখানে গিয়ে সকল সনদ মিলিত হয়, যদিও সে পর্যন্ত একাধিক সনদ থাকে। এ হলো সনদের যে প্রান্তে সাহাবী থাকেন। আবার কখনো তা এরূপ হয় না; বরং সনদের মাঝখানে এককত্ব আসে। তা এভাবে যে, সাহাবী থেকে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেন। অতঃপর তাদের মধ্যকার একজন থেকে মাত্র একজন তা বর্ণনা করেন। প্রথম প্রকারের নাম ফরদে মুতলাক। এর উদাহরণ মনিবের সাথে আজাদকৃত গোলামের সম্পর্কে বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে শুধুমাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার এটি বর্ণনা করেন।

কখনো কখনো দেখা যায়, উক্ত একক ব্যক্তি থেকেও মাত্র একজন ব্যক্তিই বর্ণনা করেন। যেমন- ইমানের শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত হাদীস।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুধুমাত্র আবু সালিহ এটি বর্ণনা করেন। আর আবু সালিহ থেকেও শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারই তা বর্ণনা করেছেন।

কখনো কখনো এককত্বের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে সকল বর্ণনাকারী কিংবা অধিকাংশ বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে। মুসনাদে বায্হার ও ইমাম তাবারানীর মুজামুল আওসাত-এ এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গরীবের বর্ণনা : গরীবের আলোচনায় তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

১. গরীবের সংজ্ঞা, ২. গরীবের প্রকারভেদ ও ৩. ফরদ এবং গরীবের মধ্যকার পার্থক্য। নিম্নে তিনটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

غَرِيب (গরীব)-এর সংজ্ঞা : অভিধানে গরীব অর্থ- অপরিচিত। আর পরিভাষায় শ্রুত্যেক ঐ হাদীসকে গরীব (হাদীস) বলে, যার রাবী মাত্র একজন হয়। চাই এ একজন সনদের একস্থানে হোক কিংবা কয়েক স্থানে অথবা প্রতি স্থানে। সনদে রাবী একজন হওয়াকে গরীবাত এবং তাফাররুদ বলে।

আরবিতে غَرِيب -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ مَا يَتَفَرَّدُ بِرَوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ .

অর্থাৎ হাদীসের রাবী একজন হওয়া। এই একক হওয়াটা সনদের যে কোনো স্থানেই হোক না কেন।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, **تَفَرَّدَ مَعَالِي** ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী যদি মাত্র একজন হন এবং অন্য কোনো সাহাবী সে হাদীসটি বর্ণনা না করেন, তাহলে সে হাদীসটি উল্লিখিত পরিভাষা হতে ভিন্ন অর্থাৎ সেটি গরীব হবে না।

فَرْدٌ مُّطْلَقٌ ১. এ দু প্রকার। ১. فَرْدٌ (ফরদ) এর অপর নাম ফরদ - غَرِيبٌ : -এর প্রকারভেদ (ফরদে মুতলাক) ও ২. فَرْدٌ نِسْبِيٌّ (ফরদে নিসবী)। এ দু প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, فَتَرْدٌ তথা সনদে একাকীত্ব হওয়াটা হয়তো তাবেয়ীর ক্ষেত্রে হবে অথবা এর পরবর্তী কোথাও গিয়ে হবে। যদি তাবেয়ীর স্তরে হয়, তাহলে তাকে فَرْدٌ مُّطْلَقٌ বলে। আর অন্য কোথাও হলে তাকে فَرْدٌ نِسْبِيٌّ বলে।

সম্পর্কে আলোচনা : এর অপর নাম **غَرِيبٌ مُطَّلَقٌ** (গরীবে মুতলাক)। যে হাদীসের সনদের মূল স্তরে **تَفَرَّدَ** (একাকীত্ব) হয় অর্থাৎ সাহাবী থেকে বর্ণনাকারী তাবেয়ী যিনি তিনি একাই হাদীসটি বর্ণনা করেন। যেমন, রাসুলুল্লাহ **ﷺ** -এর উক্তি-

الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَّةٍ النَّسَبُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ .

অর্থাৎ “রাজীয় সম্পর্কের মতো وَلَا -ও একপ্রকার (নিকটতম) সম্পর্ক। এর ক্রয়-বিক্রয়, দান এবং উত্তরাধিকারত্ব বৈধ নয়।” একে حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ বলে। এ হাদীসটি হযরত ওমর (রা.) হতে শুধুমাত্র বিখ্যাত তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার বর্ণনা করেন।

আরবিতে **فَرْدٌ مُطَّلَقٌ**-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي تَكُونُ الْغَرَابَةُ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ أَوْ فِي مَوْضِعِ الَّذِي يَدُورُ الْإِسْنَادُ عَلَيْهِ وَتَرْجُمُ .
 অর্থঃ যে হাদীসে সংঘটিত হয় সনদের মূল স্তরে অর্থঃ যে স্তরে গিয়ে সনদ ঘুরে এবং ফিরে।

... وَقَدْ يَنْفِرُ بِهِ رَاۤى: ফরদে মুতলাকের ক্ষেত্রে তাবেয়ীর স্তরে যে **تَفَرَّدَ** পতিত হয় এটা কখনো পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকে। যেমন- **شُعَبُ الْإِيمَانِ** -এর হাদীস। অর্থাৎ **يَضَعُ وَتَسْبَعُونَ**। **الْإِيمَانُ يَضَعُ وَتَسْبَعُونَ** এ হাদীসটি। এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুধুমাত্র আবু সালিহ আর আবু সালিহ থেকে শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (র.) বর্ণনা করেন।

وَقَدْ يَسْتَمِيرُ الْفَرْدُ : এ-তফ্রুদ কখনো সনদের অধিকাংশ স্থানে এমনকি সকল স্থানে অব্যাহত থাকে। এর উদাহরণ মুসনাদে বাযযার প্রভৃতি গ্রন্থে বিপুল মাত্রায় রয়েছে। যেহেতু فَرْد مُطْلَق -এর কোনো কোনো হাদীসে সনদের প্রতি স্তরে تَفَرُّد সংঘটিত হয়, সেজন্য তাকে فَرْد مُطْلَق করে নাম রাখা হয়েছে।

وَالثَّانِي الْفَرْدُ النَّسَبِيُّ سُمِّيَ نَسَبِيًّا لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيهِ حَصَلَ بِالنَّسَبَةِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا وَتَقَدَّرَ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَرِيبَ وَالْفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْإِصْطِلَاحِ غَابَرُوا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَثْرَةُ الْإِسْتِعْمَالِ وَقَلَّتِهِ ، فَالْفَرْدُ أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَلَى الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ وَالْغَرِيبِ أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَلَى الْفَرْدِ النَّسَبِيِّ ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقُ الْأَسْمِ عَلَيْهِمَا ، وَامَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُمُ الْفِعْلَ الْمُشْتَقَّ فَلَا يُفَرَّقُونَ فَيَقُولُونَ فِي الْمَطْلُوقِ وَالنَّسَبِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ أَوْ غَرِبَ بِهِ فُلَانٌ وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمُنْقَطِعِ وَالْمُرْسَلِ ، هَلْ هُمَا مُتَغَايِرَانِ أَوْ لَا ، فَكَثُرَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ لِكُنْهَ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْأَسْمِ وَامَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمُشْتَقِّ فَيَسْتَعْمِلُونَ الْإِرْسَالَ فَقَطْ فَيَقُولُونَ أَرْسَلَهُ فُلَانٌ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ مُرْسَلًا أَمْ مُنْقَطِعًا ، وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَا يُلَاحِظُ مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يَغَايِرُونَ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا حَرَّرْنَاهُ ، وَقَدْ مَنَنْتَهُ عَلَى التُّكْحَةِ فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকারের নাম ফরদে নিসবী বা সম্পর্কিত একক। কেননা, এতে এককত্ব এসেছে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়ে। যদিও মৌলিকভাবে হাদীসটি মাশহূর। তবে এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে ‘ফরদ’ শব্দের ব্যবহার খুব কম হয়ে থাকে; বরং এক্ষেত্রে ‘গরীব’ শব্দটির বেশি ব্যবহার হয়। যদিও আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় দিক দিয়ে শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে; কিন্তু পরিভাষাবিগণ শব্দ দুটির ব্যবহারের আধিক্য ও স্বল্পতার দিক দিয়ে পার্থক্য করেন। ‘ফরদ’ শব্দটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘ফরদে মুতলাক’-এর বেলায় ব্যবহার করেন আর ‘গরীব’ শব্দটিকে ব্যবহার করেন ‘ফরদে নিসবী’-এর-বেলায়। তবে এ পার্থক্য করা হয় اسم বা বিশেষ্য ব্যবহারের দিক দিয়ে। কিন্তু যখন এ থেকে উৎপন্ন ফে’ল বা ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, তখন আর কোনো পার্থক্য করা হয় না। মুতলাক ও নিসবী উভয় ক্ষেত্রে তারা বলেন- تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ (তাকাররদা বিহী ফুলানু) কিংবা غَرِبَ بِهِ فُلَانٌ (আগররা বিহী ফুলানু)।

টিক এরই ক’ছাকাছি মতপার্থক্য ‘মুনকারি’ ও ‘মুরসাল’ শব্দদ্বয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এ দুটি সমার্থক না ভিন্নার্থক- এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ভিন্নার্থক বলে মত পোষণ করেন। তবে এ ভিন্নতা اسم বা

বিশেষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কিন্তু ক্রিয়া ব্যবহার করতে হলে তারা শুধুমাত্র 'ইরসাল' ক্রিয়ামূল থেকে তা ব্যবহার করেন। তা মুরসাল হোক কিংবা মুনকাতি।

যারা মুহাদ্দিসীনে কেরামের এ ব্যবহারক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেন না, তারা অনেক মুহাদ্দিস সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেন যে, তারা মুরসাল ও মুনকাতি' এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। খুব কম লোকই এ সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সতর্ক করে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফরদে নিসবী সম্পর্কে আলোচনা : ফরদে নিসবী-এর অপর নাম গরীব-এ নিসবী। আর তা বলা হয়, সনদের মধ্যখানে কিংবা শেষে **فَرَدٌ** বা এককত্ব হওয়া। অর্থাৎ তাবৈয়ীর স্তরের পরের কোনো স্তরে হাদীসের রাবী মাত্র একজন হওয়া। যেমন- নিয়তের হাদীস। এটা বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস। এর চার স্তরে সনদ গরীব তথা একক। যদিও এর পরে গিয়ে তা মাহুর হয়ে গেছে। যেহেতু সুনির্দিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে এর মধ্যে **فَرَدٌ** বা এককত্ব হয় এজন্য তাকে ফরদে নিসবী বলে।

আরবিতে **فَرَدٌ نِسْبِيٌّ** -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ الْحَدِيثُ الْغَرِيبُ الَّذِي تَكُونُ الْغَرَابَةُ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ كَانَ يَرْوِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ثُمَّ يَنْفَرِدُ بِرَوَايَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ.

অর্থাৎ **غَرِيبٌ نِسْبِيٌّ** বলা হয় ঐ হাদীসকে, যে হাদীস সাহাবী থেকে একাধিক রাবী রেওয়ায়েত করেন; কিন্তু সনদের পরবর্তী কোনো স্তরে একজন রাবী কর্তৃক রেওয়ায়েত হয়।

ফরদ এবং গরীব-এর মধ্যে পার্থক্য : অর্থের দিক বিচারে ফরদ ও গরীব-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটি অপরটির সমার্থক। অবশ্য তাদের মধ্যে ব্যবহারগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে, পরিভাষায় **فَرَدٌ** (ফরদ) শব্দের ব্যবহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফরদে মুতলাকের উপর হয়। আর 'গরীব' শব্দের ব্যবহার বেশি হয় ফরদে নিসবী-এর ক্ষেত্রে। অতএব, ব্যবহারের দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে **تَبَايُنٌ** -এর নিসবত। এ পার্থক্যটা মূলত হলো **فَرَدٌ** এবং **غَرِيبٌ** শব্দের ব্যবহারের দিক দিয়ে। এ শব্দদ্বয়ের **فِعْلٌ** -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং ফরদে মুতলাকের উপর যেমন **نَفَرَدَ بِهِ فَلَانٌ** শব্দ ব্যবহৃত হয় তেমনি ফরদে নিসবী-এর ক্ষেত্রেও তা ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ফরদে নিসবী -এর উপর যেমন- **غَرَّبَ بِهِ فَلَانٌ** ব্যবহার হয় তেমনি ফরদে মুতলাকের উপরও তা ব্যবহার হয়।

وَحَبَّرَ الْأَحَادَ يَنْقِيلَ عَدْلٍ تَامَ الصَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ
هُوَ الصَّحِيحُ لِدَاتِهِ ، وَهَذَا أَوَّلُ تَفْسِيمِ الْقَبُولِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ لِأَنَّهُ إِمَّا
أَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ الْقَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا الْأَوَّلُ الصَّحِيحُ لِدَاتِهِ
وَالثَّانِي إِنْ وَجَدَ مَا يُجَبِّرُ ذَلِكَ الْقُصُورَ كَكَثْرَةِ الطَّرِيقِ فَهُوَ الصَّحِيحُ
أَيْضًا لَكِنْ لَا لِدَاتِهِ ، وَحَيْثُ لَا جَبْرَانِ فَهُوَ الْحَسَنُ لِدَاتِهِ ، وَإِنْ قَامَتْ
قَرِينَةٌ تَرْجَحُ جَانِبَ قَبُولِ مَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَهُوَ الْحَسَنُ أَيْضًا لَكِنْ لَا لِدَاتِهِ
وَقُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِدَاتِهِ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِ .

অনুবাদ : যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারীরা আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ
আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শায় কিংবা মু'আল্লাল নয়- এরূপ হাদীসের নাম সহীহ লিয়াতিহী ।
এটা হলো খবরে মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য খবরের প্রথম বিভক্তি, যা চার প্রকারে বিভক্ত হয় । কেননা,
বর্ণনাকারীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার গুণাবলি উচ্চমাত্রায় থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে । থাকলে তার
নাম সহীহ লিয়াতিহী । যদি না থাকে, তাহলে ঘাটতি পূরণ হবার ব্যবস্থা থাকতে পারে, নাও থাকতে
পারে । ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা তথা সনদের সংখ্যাধিক্য থাকলে তার নাম সহীহ লিগায়রিহী, আর ঘাটতি
পূরণের ব্যবস্থা না থাকলে তার নাম হাসান লিয়াতিহী । মাওকুফ বা স্থগিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার দিকটি
প্রাধান্য দেওয়ার মতো নিদর্শন পাওয়া গেলে সে হাদীসের নাম হয় হাসান লিগায়রিহী ।

এ চার প্রকারের মধ্যে সহীহ লিয়াতিহী -এর মর্যাদা সবচেয়ে উন্নত । তাই এর আলোচনা প্রথমেই আসে ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খবরে মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য খবরের প্রকারভেদ : স্থানানিত লেখক তাঁর কিতাবে দু'বার খবরে
মাকবুলকে ভাগ করেছেন । ১. সহীহ লিয়াতিহী ও হাসান লিয়াতিহী ইত্যাদির দিকে এবং ২. নাসিখ ও
মানসূখ ইত্যাদির দিকে ।

এখানে প্রথম প্রকারের বিভক্তি হচ্ছে : আর তা হলো, বর্ণনাকারীদের গুণবিচার তথা স্তরভেদে খবরে
মাকবুল চার প্রকার । যথা-

১. সহীহ লিয়াতিহী (الصَّحِيحُ لِدَاتِهِ) ।
২. সহীহ লিগায়রিহী (الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ) ।
৩. হাসান লিয়াতিহী (الْحَسَنُ لِدَاتِهِ) ।
৪. হাসান লিগায়রিহী (الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ) ।

চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হবার কারণ বা দলিল : যে সমস্ত গুণ ও শর্ত থাকলে খবর মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য হয় তা খবরের মধ্যে থাকবে বা থাকবে না। (যদি না থাকে তার নাম হাসান লিগায়রিহী।) যদি থাকে, তাহলে তা আবার দু প্রকার। হয়তো ঐ গুণাবলি ও শর্ত পূর্ণ মাত্রায় থাকবে অথবা পূর্ণ মাত্রায় থাকবে না। পূর্ণ মাত্রায় থাকলে তার নাম সহীহ লিযাতিহী। আর পূর্ণ মাত্রায় না থাকলে তা আবার দু প্রকার। হয়তো সনদের অধিক্য ইত্যাদির দ্বারা ঐ কমতি বা ত্রুটি পূরণ হবে অথবা হবে না। যদি পূরণ হয়, তাহলে তার নাম সহীহ লিগায়রিহী। আর পূরণ না হলে তার নাম হাসান লিযাতিহী। আর যদি খবর কিছুটা দুর্বল হয়, রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে কিংবা খবরটি মাওকূফ থাকে, কিন্তু তার সাথে সনদের অধিক্য ইত্যাদি কোনো নিদর্শন মিলে, যা গ্রহণযোগ্যতার দিককে প্রাধান্য দেয়, তাহলে তার নাম হাসান লিগায়রিহী।

সহীহ লিযাতিহী-এর বর্ণনা : খবর গ্রহণযোগ্য হওয়ার গুণাবলি ও শর্ত সহীহ লিযাতিহী -এর মধ্যে বেশি পাওয়া যাওয়ায় যেহেতু চার প্রকারের মধ্যে তার মান সবচেয়ে উন্নত ও উর্ধ্বে, তাই তার সম্পর্কে আলোচনাও হয় সবার পূর্বে। সহীহ লিযাতিহী-এর মধ্যে ৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। যথা- ১. সংজ্ঞা ২. শর্ত ও গুণাবলির বিস্তারিত বিবরণ, ৩. সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ও ৪. সহীহ লিযাতিহী হাদীসের মধ্যে পার্থক্য ও স্তরভেদ। নিম্নে উক্ত ৪টি বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হলো-

সহীহ লিযাতিহী-এর সংজ্ঞা : সম্মানিত লেখক সহীহ লিযাতিহী -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

خَيْرُ الْأَحَادِ بِتَقْوَى عَدْلٍ تَامَ الضَّبْطُ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ .

অর্থাৎ যে খবরে ওয়াহিদ অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারী আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং খবরটি শায কিংবা তার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি না থাকে, তাহলে এরূপ খবরের নাম সহীহ লিযাতিহী। এ ধরনের খবরের বিশুদ্ধতা যেহেতু স্বয়ং খবরের কারণেই; বাইরের কোনো কারণে নয়, তাই তাকে সহীহ লিযাতিহী বলে। এর হুকুম হলো তা মাকবুল অর্থাৎ প্রমাণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এর মর্যাদা অন্য প্রকারের তুলনায় বেশি। এজন্য অন্য প্রকারের সাথে বৈপরীত্য দেখা দিলে এটা প্রাধান্য পাবে।

وَالْمَرَادُ بِالْعَدْلِ مَنْ لَهُ مَلَكَ تَحْمِيلُهُ عَلَى مُلَازِمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ ،
وَالْمَرَادُ بِالتَّقْوَى اجْتِنَابُ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنْ شَرِّكَ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بَذْعَةٍ
وَالضَّبْطُ ضَبْطَانٍ ، ضَبْطُ صَدْرٍ ، وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ يَتِمَّ كُنْ
مِنْ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ ، وَضَبْطُ كِتَابٍ وَهُوَ صِبَاغُهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ
فِيهِ وَصَحَّحَهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ مِنْهُ ، وَقَيَّدَهُ بِالنَّهْيِ بِإِشَارَةِ إِلَى الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا
فِي ذَلِكَ ، وَالْمُتَّصِلُ مَا سَلِمَ اسْنَادُهُ مِنْ سُقُوطٍ فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ
مِنْ رَجَالِهِ سَمِعَ ذَلِكَ الْمَرْوِيُّ مِنْ شَيْخِهِ ، وَالسَّنَدُ تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ ،
وَالْمُعَلَّلُ لُغَةً مَا فِيهِ عِلَّةٌ ، وَأَصْطِلَاحًا مَا فِيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ ،
وَالشَّاذُّ لُغَةً الْفَرْدُ ، وَأَصْطِلَاحًا مَا يُخَالِفُ فِيهِ الرَّاوِي مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ ،
وَلَهُ تَفْسِيرٌ آخَرُ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

অনুবাদ : আদিল হবার অর্থ হলো, এমন গুণের অধিকারী হওয়া যা তাকে তাকওয়া ও ব্যক্তিত্ব অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। তাকওয়া বলতে বুঝায় শিরক, কবীরা গুনাহ ও বিদআত কাজ থেকে বিরত থাকা। (মুত্তাকী বলে পরিগণিত হবার জন্য সগীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত কিনা সে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের অভিমত হলো, সগীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা অনেক সময় মানবীয় আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তাই তা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা শর্ত নয়। তবে কোনো সগীরা গুনাহ বারবার করলে তাকে আর মুত্তাকী বলা যাবে না। কেননা, তখন সেটি কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।) যবত বা আয়ত্ত দুভাবে হয়— হৃদয়ঙ্গম করে ও লেখে রেখে। হৃদয়ঙ্গম করার অর্থ যা গুনবে তা এমনভাবে মুখস্থ রাখবে যে, প্রয়োজনের সময় পেশ করতে পারে। আর লেখে রেখে থাকলে তা বর্ণনার সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে হবে।

আয়ত্তশক্তির সাথে ‘পূর্ণ’ কথাটি জুড়ে দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তা থাকতে হবে পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ তা উচ্চমাত্রায় থাকা জরুরি।

সনদ মুত্তাসিল বা অবিশ্বিন্ন হবার অর্থ হলো, মাঝখান থেকে কারো নাম বাদ না পড়া। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণনাকারী উক্ত হাদীস নিজ শাযখ থেকে সরাসরি শুনে থাকবেন।

মু‘আল্লাল (مُعَلَّل) শব্দের আভিধানিক অর্থ— যাতে কোনো ইল্লাত তথা দোষ-ব্যাধি রয়েছে। পরিভাষায় মু‘আল্লাল হলো, যাতে এমন কোনো সূক্ষ্ম দোষ রয়েছে, যা হাদীসটির বিশ্বস্ততা খর্ব করে।

শায (شَاز) -এর আভিধানিক অর্থ— একাকী। পরিভাষায় শায বলে, যে হাদীসের বর্ণনাকারী তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা থেকে ভিন্নরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য এর অন্য ব্যাখ্যাও রয়েছে, যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সহীহ লিয়াতিহী -এর শর্তের বিস্তারিত বিবরণ : সহীহ লিয়াতিহী-এর পূর্বোক্ত সংজ্ঞা হতে জানা যায় যে, কোনো খবর সহীহ লিয়াতিহী হতে হলে তার মধ্যে ৫টি গুণ কিংবা শর্ত থাকা অনিবার্য। যথা—

১. عَدَالَتْ رَوَاتُهَا তথা বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

২. تَامَ الضَّبْطُ তথা বর্ণনাকারীদের পূর্ণ আয়ত্তশক্তিসম্পন্ন হওয়া।

৩. مُتَّصِلُ السَّنَدِ তথা সূত্রের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন হওয়া।

৪. عَدَمُ عِلَّتِ তথা সনদে কোনো ইল্লত বা দোষ-ত্রুটি না থাকা।

৫. شَازَ عَدَمُ شَازَ তথা সনদটি শায না হওয়া।।

৫টি শর্তের বিবরণ : بِتَقْلٍ عَدْلُ শব্দটি مَصْدَر হলেও فَاعِل তথা عَادِل -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ রাবী আদিল হওয়া। আদালাতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

مِمَّا مَلَكَ تَحِيلُهُ عَلَى مَلَازِمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ.

অর্থাৎ আদালাত এমন এক যোগ্যতার নাম, যা মানুষকে তাকওয়া অর্জন এবং ভদ্রতা-ব্যক্তিত্ব অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। যার মধ্যে এই যোগ্যতা থাকে অর্থাৎ যিনি মুত্তাকী ও ভদ্র হন, তাকে বলে আদিল। তাকওয়া হলো শিরক, বিদআত, অন্যায় ইত্যাদি গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা।

ضَبْطُ শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ- হেফাজত করা, সংরক্ষণ করা। চাই তা বক্ষে ধারণ করে হোক কিংবা খাতার পৃষ্ঠায় তথা লেখে রেখে হোক। এ সংরক্ষণ দু প্রকার।

১. ضَبْطٌ صَدْرٍ : অর্থাৎ এভাবে মনে রাখা ও সংরক্ষণ করা যে, যখনই ইচ্ছা মুখস্থ বলে দিতে পারে।

২. ضَبْطٌ كِتَابَتٍ : অর্থাৎ খবর শোনার পরে লেখে রেখে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যে, হাদীস ছাত্রের কাছে আদায় বা বর্ণনা করা পর্যন্ত ঐ লিখিতভাবে সংরক্ষিত থাকে।

الضَّبْطُ التَّامُّ : এখানে إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ হয়েছে। আসলে ছিল الضَّبْطُ التَّامُّ। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য রাবী বা বর্ণনাকারীর জন্য كَامِلٌ ضَبْطٌ তথা পূর্ণ আয়ত্তশক্তির অধিকারী হওয়া জরুরি।

مُتَّصِلُ السَّنَدِ : সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো স্তরে রাবীর পতন না হওয়া। অর্থাৎ সকল স্তরে রাবী থাকা। যার সারকথা হলো, হাদীসের প্রত্যেক রাবী নিজের শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেছেন বর্ণনা করবেন। এ রকম অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়াকে 'ইত্তিসাল' বলে।

সনদের সংজ্ঞা পূর্বে চলে গেছে যে, সূত্র পরম্পরাকে সনদ বলে।

إِسْمٌ مَفْعُولٌ تَنْبِيلٌ مَسَدَارٌ هَتَ مَعْلَلٌ : এর সীগাহ। অর্থ- ইল্লতযুক্ত, যার মধ্যে ইল্লত থাকে। পরিভাষায় مَعْلَل বলে ঐ হাদীসকে, যার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম দোষ লুক্কায়িত থাকে। আর غَيْرُ مَعْلَل -এর অর্থ হলো, হাদীসটি এমন কোনো সূক্ষ্ম দোষ থেকে মুক্ত হওয়া।

غَيْرُ شَازَ : এটা فَاعِل মাসদার হতে শায হওয়া। এজন্য শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে তাশদীদযোগে শায় (شَازَ)। এর অর্থ- একাকী। পরিভাষায় শায় বলা হয় ঐ হাদীসকে, যার মধ্যে নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করে। অর্থাৎ দুজন ভিন্নরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। নির্ভরযোগ্য রাবীর এমন বিরোধিতা করাকে 'শুযুয' বলে। এর অন্য সংজ্ঞাও আছে, যা সামনে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

تَنْبِيْهِ قَوْلُهُ وَخَبَرُ الْأَحَادِ كَالْجَنَاسِ وَبَاقِي قُبُوْدِهِ كَالْفَصْلِ ، وَقَوْلُهُ يَنْقِلُ عَدْلٌ احْتِرَازًا عَمَّا يَنْقُلُهُ غَيْرُ الْعَدْلِ وَقَوْلُهُ هُوَ يُسَمَّى فَضْلًا يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ يُؤْذَنُ بِأَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبَرٌ عَمَّا قَبْلَهُ وَلَيْسَ يَنْعَتُ لَهُ وَقَوْلُهُ لِذَاتِهِ بِخُرُجٍ مَا يُسَمَّى صَحِيحًا بِأَمْرِ خَارِجٍ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَيَتَفَاوَتُ رُتْبَتُهُ أَيْ رُتْبُ الصَّحِيحِ بِسَبَبِ تَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْمُفْتَضِيَةِ لِلصَّحِيحِ فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلْبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصَّحَّةِ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بِحَسَبِ الْأُمُورِ الْمُقَوِّيَةِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَكُونُ رُؤَاؤُهُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرَجُّعَ كَانَ أَصَحُّ مِمَّا دُونَهُ فِيمَنْ الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَيْمَّةِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَكُمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَكَابِرِ أَهْنَمِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَدُونَهَا فِي الرُّتْبَةِ كِرْوَايَةُ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى وَكَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَدُونَهَا فِي الرُّتْبَةِ كَسَهْلِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَأَعْلَاءَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَشْمَلُهُمْ اسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ .

অনুবাদ : বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভাষ্যে উল্লিখিত "خَبَرُ الْأَحَادِ" টুকু جنس , বাকি শর্তগুলো فَصْل ; تَنْبِيْهِ বলে বাদ দেওয়া হয়েছে এ হাদীস- গায়রে আদিল রাবী যা রেওয়ায়েত করেন هُوَ সর্বনামটি وَقَوْلُهُ هُوَ يُسَمَّى فَضْلًا يَتَوَسَّطُ - এটা মুবতাদা ও খবরের মাঝে এসে এটা জানায় যে, (তারকীবে) এর পরের বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্যের খবর ; পূর্বের সিফাত নয়। لِذَاتِهِ বলার দ্বারা এ হাদীস বেরিয়ে গেছে, যাকে বাইরের কোনো কারণে সহীহ বলে নাম রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ লিগায়রিহী। যেমনটি পূর্বে চলে গেছে।

সহীহ লিয়াতিহী হাদীসের মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সহীহ বলে গণ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলিতে দৃঢ়তার দিক দিয়ে তারতম্যের কারণে এরূপ হয়ে থাকে। কেননা, এ ধরনের হাদীস থেকে যেহেতু প্রবলতর ধারণা অর্জিত হয় আর এরই উপর বিশ্বস্ততা নির্ভর করে, তাই এর চাহিদা হলো এক্ষেত্রে সমূহ স্তর থাকে যার কোনোটি অপেক্ষা কোনোটি উচ্চ হবে- শক্তিদায়ক বিষয়াবলির বিচারে। সুতরাং যে হাদীসের বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণতা, আয়ত্তশক্তি এবং অগ্রাধিকার প্রদায়ক অন্যান্য গুণাবলিতে উচ্চস্তরে অবস্থান করবেন, সে হাদীস অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ব্যক্তিদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত বলে

গণ্য হবে। উক্তস্তরের মধ্যে রয়েছে, যে সনদ সম্পর্কে কোনো কোনো ইমাম 'বিশুদ্ধতম' বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন- তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস। এরূপ সনদ রয়েছে কয়েকটি। যথা- ১. ইমাম যুহরী (র.) সালিম (র.) হতে, তিনি (সালিম) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে। ২. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) ওবায়দা ইবনে আমর (র.) হতে, তিনি (ওবায়দা) হযরত আলী (রা.) হতে। ৩. ইবরাহীম নাখায়ী (র.) আলকামা (র.) হতে, তিনি (আলকামা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে।

মর্যাদার দিক দিয়ে পরবর্তী স্তরের হলেন- ১. বুয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আবু বুরদা (র.) হতে, তিনি (আবু বুরদা) হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হতে। ২. হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) ছাবিত (র.) হতে, তিনি (ছাবিত) হযরত আনােস (রা.) হতে- এ দু সনদের কোনোটির মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস।

এরও পরবর্তী স্তর হলো, ১. সুহাইল ইবনে আবু সালিহ (র.) পিতা আবু সালিহ (র.) হতে, আর তিনি (আবু সালিহ) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে। ২. আলা ইবনে আব্দুর রহমান (র.) পিতা আব্দুর রহমান হতে, তিনি (আব্দুর রহমান) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে- এ দু সনদের কোনো একটির মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস।

সুতরাং (উল্লিখিত) সকল রাবী **عَدْلٌ** এবং **ضَبْطٌ** তথা আয়ত্তশক্তির অধিকারী। (যার ফলে এ সকল সনদে বর্ণিত সকল হাদীস সহীহ।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : **خَيْرُ الْأَحَادِ** এটা **جِنْسٌ**-এর স্থানে। বাকি শর্তগুলো **فَصْلٌ**-এর ন্যায়। যথা-

১. **يَتَقَلَّ عَدْلٌ** : এটা প্রথম শর্ত। এ শর্তের কারণে প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে যার বর্ণনাকারী **عَدْلٌ** নয় তথা মিথ্যাবাদী, মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, ফাসিক, অজ্ঞাত এবং বিদআতির বর্ণিত হাদীস বাদ পড়েছে।

২. **تَامَ الضَّبْطُ** : এটা দ্বিতীয় শর্ত। **ضَبْطٌ** শব্দটি মাসদার। এর অর্থ- হেফাজত করা। চাই বক্ষে হোক কিংবা গ্রন্থে। **ضَبْطٌ** দু প্রকার। ১. **ضَبْطٌ صَدْرٌ** অর্থাৎ এমনভাবে মুখস্থ করা যাতে যে কোনো সময় বলতে ও শুনিতে দিতে পারে। ২. **ضَبْطٌ كِتَابَتٌ** অর্থাৎ শোনার পরে লেখে এমনভাবে হেফাজত করা যেন আদায় তথা বর্ণনা করা পর্যন্ত ঠিক থাকে।

تَامَ الضَّبْطُ-এর মধ্যে **إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ** হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দশ্য যে, হাদীস সহীহ হওয়ার পর রাবীর জন্য **ضَبْطٌ كَامِلٌ** তথা পূর্ণ সংরক্ষণ গুণ থাকা জরুরি।

৩. **مُتَّصِلُ السَّنَدِ** : এটা তৃতীয় শর্ত। সনদ মুত্তাসিল তথা ধারাবাহিকভাবে অবিস্তিন্ন হওয়া। অর্থাৎ শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সনদের কোনো স্তর থেকে রাবীর পতন না হওয়া; বরং প্রত্যেক রাবী নিজ শাযখ থেকে শুনে বর্ণনা করবেন। সনদ এমন ধারাবাহিক হওয়াকে **إِتِّصَالٌ** বলে।

৪. **غَيْرُ مُعَلَّلٍ** : এটা চতুর্থ শর্ত। এটা **تَغْلِيلٌ** মাসদার হতে **إِسْمٌ مَفْعُولٌ**-এর সীগাহ। অর্থ- যার মধ্যে **عَلَّتْ** বা ক্রটি থাকে। পরিভাষায় **مُعَلَّلٌ** ঐ হাদীসকে বলে, যার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম দোষত্রুটি থাকে। পরে এর বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৫. **شَاذٌ** : এটা পঞ্চম শর্ত। এটা **فَاعِلٌ** থেকে **شَذَرُوهُ**-এর সীগাহ। অর্থ- একাকী, নিঃসঙ্গ পরিভাষায় **شَاذٌ** ঐ হাদীসকে বলে, যে হাদীসের মধ্যে নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য (أَوْثَقُ) রাবীর বিরোধিতা করে। এমন বিরোধিতা করাকে **شَذَرُوهُ** বলে। এর অন্য সংজ্ঞাও আছে যা সামনে স্বস্থানে বর্ণিত হবে।

শর্তাবলির ব্যাখ্যা : **خَيْرُ الْأَحَادِ** : এটা **جَنَسٍ** -এর স্থানে। বাকি শর্তগুলো **فَصْلٌ** -এটা **يَنْقُلُ عَدْلٌ** -এটা প্রথম শর্ত। এ শর্তের কারণে প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে, যার রাবী **عَدْلٌ** নয়। যেমন- মিথ্যাবাদী, মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, ফাসিক, অজ্ঞাত এবং বিদআতির হাদীস বাদ পড়েছে।

تَأْمُ الضَّبْطِ : এটা দ্বিতীয় শর্ত। এ শর্তের কারণে **حَسَنٌ** এবং **لِغَيْرِهِ** বাদ পড়েছে। কারণ, এর রাবী **تَأْمُ الضَّبْطِ** -এর অধিকারী নয়। সাথে সাথে ঐ হাদীসও বাদ পড়েছে যার রাবী **ضَابِطٌ** তথা হেফাজতকারী নয় বরং গাফেল, অধিক ভুলকারী ইত্যাদি। **مُتَّصِلُ السَّنَدِ** : এটা তৃতীয় শর্ত। এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে যার সনদ মুত্তাসিল নয়। যেমন- মুরসাল হাদীস, মু'আল্লাক হাদীস ইত্যাদি। **غَيْرُ مُعَلَّلٌ** : এটা চতুর্থ শর্ত। এর দ্বারা **عِدْثٌ مُعَلَّلٌ** বাদ পড়েছে। **وَلَا شَاذٌ** : এটা পঞ্চম শর্ত। এর দ্বারা শায হাদীস বাদ পড়েছে। যেহেতু **حَسَنٌ** -এর মধ্যে উল্লিখিত শর্ত বিদ্যমান নেই বিধায় সমষ্টিগত শর্তের দ্বারা সেগুলোও বাদ পড়েছে।

সহীহ লিয়াতিহী হাদীসের মধ্যে তারতম্যের কারণ : যেহেতু সহীহ লিয়াতিহী হাদীসের ভিত্তি **عَدْلٌ**, **ضَبْطٌ** ইত্যাদি গুণের উপর আর এ সমস্ত গুণের মধ্যে তারতম্য ও প্রভেদ হয়, তাই সহীহ লিয়াতিহী হাদীসের পরস্পরের মধ্যেও মর্যাদাগত তারতম্য হয়। শক্তি এবং বিশুদ্ধতার বিচারে কোনোটির স্তর কোনোটির উপরে হয়। এই মর্যাদাগত পার্থক্য দুই হিসেবে হতে পারে। ১. যে কোনো সহীহ হাদীসের মধ্যে অর্থাৎ তা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) -এর মধ্যে থাক বা অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে থাক। ২. নির্দিষ্ট কিতাবের সহীহ হাদীসের মধ্যে। প্রথম প্রকার হিসেবে স্তর হয় তিনটি আর দ্বিতীয় প্রকার হিসেবে স্তর হয় সাতটি।

যে কোনো সহীহ হাদীসের তিন স্তর : সহীহ হাদীস যদি সুনির্দিষ্ট কিতাবের না হয়; বরং যে কোনো হাদীসের কিতাবের হয়, তাহলে সে হাদীসসমূহের মধ্যে মর্যাদাগত তিনটি স্তর হতে পারে।

১. সর্বোচ্চ স্তর, ২. মধ্যস্তর ও ৩. নিম্নস্তর।

সর্বোচ্চ স্তরের বর্ণনা ও উদাহরণ : সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদায় উন্নীত হবে ঐ সকল সহীহ হাদীস যার সনদ সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণ এ স্বীকৃতি দেন যে, **هَذَا أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ** তথা এটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ। নিম্নোক্ত তিনটি সনদ এ জাতীয়- **الرَّاهِرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ** (১)

১. ইমাম যুহরী (র.) সালিম (র.) হতে, তিনি পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে।

(২) **مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ**

২. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) ওবায়দা (র.) হতে, তিনি হযরত আলী (রা.) হতে।

(৩) **إِبْرَاهِيمُ التَّخَمِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْرُودٍ**

৩. ইবরাহীম নাখায়ী (র.) আলকামা (র.) হতে, তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে।

যেহেতু এ সকল সনদের ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণ 'সর্বোচ্চ সহীহ' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাই এ সনদের সকল হাদীস সহীহ।

মধ্যস্তরের উদাহরণ : সহীহ হাদীসের মধ্যস্তরের সনদগুলো নিম্নরূপ-

(১) **بُرَيْدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى**

১. বুরাইদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আবু বুরদা হতে, তিনি হযরত আবু মূসা আশযারী (রা.) হতে।

(২) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ -

২. হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) ছাবিত হতে, তিনি হযরত আনাস (রা.) হতে।

এ দুই সনদের হাদীস সহীহ হাদীসের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বনিম্ন স্তরের উদাহরণ : সহীহ হাদীসের সর্বনিম্ন স্তরগুলো নিম্নরূপ-

(১) سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১. সুহাইল ইবনে আবু সালিহ (র.) তার পিতা আবু সালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে।

(২) الْأَعْلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

২. আলা ইবনে আব্দুর রহমান (র.) তার পিতা আব্দুর রহমান হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে।

এ দু সনদের হাদীস সহীহ হাদীসের তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ হাদীসের এই মোট তিনটি স্তর বা তবকা। এই তিন স্তরের হাদীসের সকল রাবীদের মাঝে আদালাত, যবত ইত্যাদি সহীহ লিয়াতিহী -এর সকল গুণাগুণ বিদ্যমান। যার ফলে উপরোল্লিখিত সনদসমূহে আগত বা বর্ণিত সকল হাদীস সহীহ লিয়াতিহী। তবে প্রথম স্তরের রাবীদের মধ্যে এ গুণগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এজন্য এ স্তরের হাদীস অন্য স্তরের হাদীস থেকে অগ্রবর্তী হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় স্তরের হাদীস তৃতীয় স্তর থেকে অগ্রবর্তী হবে। তবে তৃতীয় স্তরের হাদীস ঐ ব্যক্তির হাদীসের থেকে অগ্রবর্তী হবে একাকী বর্ণনা করলে যার হাদীস সহীহ বলে বিবেচিত হয় না। বরং 'হাসান' বলে গণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ ১. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) আসিম ইবনে ওমর থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা.) হতে। ২. ওমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা হতে, পিতা দাদা হতে- এ সনদের হাদীস। সুতরাং এ দু সনদের হাদীসের উপর তৃতীয় স্তরের হাদীস অগ্রবর্তী হবে। মোটকথা, সহীহ হাদীসের স্তর যত নিম্নই হোক না কেন তা 'হাসান' হাদীসের উপর অগ্রবর্তী (مُتَدَمِّنٌ) হবে।

إِلَّا أَنَّ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى مِنَ الصِّفَاتِ الْمُرَجَّحَةِ مَا يَفْتَضِي تَقْدِيمَ رَوَايَتِهِمْ عَلَى التِّي تَلِيهَا وَفِي التِّي تَلِيهَا مِنْ قُوَّةِ الضَّبْطِ مَا يَفْتَضِي تَقْدِيمَهَا عَلَى الثَّالِثَةِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةٍ مَنْ يُعَدُّ مَا يَتَقَرَّدُ بِهِ هُوَ حَسَنًا كَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَقَسَّ عَلَى هَذِهِ النَّمَاتِ مَا يَشَبَّهُهَا فِي الصِّفَاتِ الْمُرَجَّحَةِ وَالْمَرْتَبَةِ الْأُولَى هِيَ التِّي أَطْلَقَ عَلَيْهَا بَعْضُ الْأَيْمَةِ أَنَّهَا أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِطْلَاقِ لِتَرْجَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا، نَعَمْ يَسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا أَطْلَقَ الْأَيْمَةُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَرْجَحِيَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ يُطْلِقُوهُ.

অনুবাদ : তবে প্রথম স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদায়ক এমন গুণাবলি রয়েছে যার চাহিদা হলো তাদের বর্ণনাকে পরবর্তী স্তরের ব্যক্তিদের বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া। আর পরবর্তী স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে আয়ত্তশক্তির এমন দৃঢ়তা রয়েছে যার চাহিদা হলো তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিদের বর্ণনার উপর এদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তা সত্ত্বেও এই তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিদের আয়ত্তশক্তি এমন দৃঢ় যে, যাদের একক বর্ণনা ‘হাসান’ শ্রেণির বলে গণ্য হয়, তাদের চেয়েও এদের বর্ণনা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। যেমন— মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) আসিম ইবনে ওমর থেকে, তিনি (আসিম) হযরত জাবির (রা.) হতে। আর আমার ইবনে শুয়াইব পিতা শুয়াইব হতে, তিনি (শুয়াইব) দাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে। তুমি এই স্তরসমূহের উপর ঐ স্তরকে কিয়াস বা তুলনা করো যা অগ্রাধিকার দানকারী গুণাবলির মধ্যে তার (এই স্তরসমূহের) মতো। (সহীহ হাদীসের মধ্যে) সর্বোচ্চ স্তরের হলো, কোনো ইমাম যাকে ‘বিশুদ্ধতম সনদ’ বলেছেন। নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো একটি নির্দিষ্ট সনদকে ‘বিশুদ্ধতম’ না বলা চাই। তবে ইমামরা যাকে এরূপ (বিশুদ্ধতম) বলেছেন— সামগ্রিকভাবে সেগুলো ইমামরা যে ক্ষেত্রে এরূপ বলেননি সে তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পূর্বে বর্ণিত তিন সনদেরই ব্যাপারে যদিও কতিপয় মুহাদ্দিসীনে কেবাম (যেমন— ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমুখ) **أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ** তথা ‘বিশুদ্ধতম’ বলেছেন, কিন্তু সঠিক ও বাস্তব কথা হলো, কোনো বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট সনদ সম্পর্কে এমন না বলাটাই উচিত। এটাই বিশুদ্ধতম ও গ্রহণযোগ্য উক্তি। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, অবশ্য এটা ঠিক যে, আইয়াযে হাদীস যদি কোনো সনদের ব্যাপারে এ মন্তব্য করেন যে, ‘এটা বিশুদ্ধতম’ তবে অবশ্যই সে সনদটি ঐ সনদের তুলনায় অগ্রাধিকারী হবে, যে সনদ সম্পর্কে তারা এমনটি বলেননি।

وَلَتَحِقُّ بِهَذَا التَّفَاضُلِ مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِجِهِ بِالتَّسْبِئَةِ إِلَى
مَا انفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَمَا انفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ بِالتَّسْبِئَةِ إِلَى مَا انفَرَدَ بِهِ
مُسْلِمٌ لِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمَا عَلَى تَلْقَى كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ
وَإِخْتِلَافِ بَعْضِهِمْ فِي آيَتِهِمَا أَرْجَحُ فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَرْجَحُ مِنْ هَذِهِ
الْحَبِثَةِ وَمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ.

অনুবাদ : একই নিয়মে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) একযোগে যে হাদীসটি সংকলন করেছেন তা যে কোনো একজনের সংকলিত হাদীসের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য। আবার ইমাম বুখারীর একক সংকলিত হাদীস ইমাম মুসলিমের একক সংকলিত হাদীসের তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা, পরবর্তীকালের ওলামায়ে কেরাম এ দু'জনের গ্রন্থদ্বয় গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এ দু'টির মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য সে বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে। তাই এদিক দিয়ে যে হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের দুজনের ঐকমত্য রয়েছে, তার মর্যাদা যে হাদীসের ক্ষেত্রে তারা একমত হননি সে তুলনায় অধিক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সহীহ হাদীসের তিন স্তরের আলোচনা যেটা পূর্বে করা হয়েছে- এটা ছিল যে কোনো কিতাবের সহীহ হাদীসের স্তরবিন্যাস। এমনিভাবে সুনির্দিষ্ট কিতাবের সহীহ হাদীসের মধ্যেও স্তরের ব্যবধান হয়। সুনির্দিষ্ট কিতাবের বিচারে সহীহ হাদীস পর্যায়ক্রমে সাত প্রকার। যথা-

১. মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস। অর্থাৎ যে সমস্ত হাদীস ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) উভয়ে বর্ণনা করেছেন।
২. যে সমস্ত হাদীস শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন। (ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেননি।)
৩. যে সমস্ত হাদীস শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। (ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেননি।)
৪. যে সমস্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী অর্থাৎ তাঁদের রাবী কর্তৃক বর্ণিত, তবে তা বুখারী কিংবা মুসলিমে নেই।
৫. যে সমস্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হয়।
৬. যে সমস্ত হাদীস শুধু ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হয়।
৭. যে সমস্ত সহীহ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে নেই, আবার উভয়ের শর্ত অনুযায়ী কিংবা যে কোনো একজনের শর্ত অনুযায়ীও হয় না।

এভাবে স্তরবিন্যাসের কারণ : বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসমূহের মাঝে এভাবে স্তরবিন্যাসের কারণ হলো, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম, শুধু তা-ই নয় সমগ্র উম্মত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কিতাবদ্বয় ঐকমত্যে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তবে এর পরে গিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ প্রশ্নে মতভেদ হয়েছে যে, বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে কোন কিতাবটি অগ্রগণ্য (أَرْجَحُ)। জুমহুর ওলামায়ে কেরাম বুখারী শরীফের অগ্রগণ্যতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত

করেছেন। এজন্য যে সমস্ত হাদীস বুখারী-মুসলিম উভয়ে রেওয়ায়েত করেছেন, তা ঐ সমস্ত হাদীসের তুলনায় প্রাধান্য পাবে যেগুলো শুধুমাত্র তাদের কোনো একজন বর্ণনা করেছেন। এরপরে বুখারীর হাদীস মুসলিমের উপর প্রাধান্য পাবে। কারণ হলো, জুমহুর স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, বিশুদ্ধতার বিচারে বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের তুলনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে উত্তম। এ ব্যাপারে কারো ভিন্নমত নেই।

মোটকথা, মুত্তাফাকু আলাইহি হাদীসের স্তর এক নম্বরে। অন্য সকল গ্রন্থের হাদীসের তুলনায় তা প্রাধান্য পাবে। এরপরে দ্বিতীয় স্তরে হলো বুখারী শরীফের হাদীস। এরপরে তৃতীয় স্তরের হলো মুসলিম শরীফের হাদীস। মুসলিমের হাদীস অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসের উপর অগ্রগণ্য হবে। কারণ, বুখারী শরীফের পরে মুসলিম শরীফ ওলামায়ে কেরামের কাছে ব্যাপক মাকবুল কিতাব হিসেবে সমাদৃত।

বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়ার মর্মার্থ : বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বুখারী ও মুসলিম যে রাবীগণ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হওয়া। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) যে সমস্ত রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন অন্যান্য লেখকগণ সে সমস্ত রাবীর বর্ণিত অন্য হাদীস বর্ণনা করবেন।

বুখারী ও মুসলিমের রাবীদের মধ্যে এত শক্তির কারণ হলো, তাদের মধ্যে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার শর্তগুলো তথা আদালাত, যবত ইত্যাদি গুণ এমন পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান যে, সমগ্র উম্মত তাদেরকে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ্য- বুখারী ও মুসলিমকে ব্যাপকভাবে বরণ করে নিয়েছে।

কিছু রাবী এমন আছেন যাদের থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন রাবীর থেকে অন্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হওয়াকে বলে মুত্তাফাকু আলাইহি -এর শর্ত অনুযায়ী হওয়া।

কিছু রাবী এমন আছেন যাদের থেকে কেবল ইমাম বুখারী (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন রাবীর থেকে অন্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হওয়াকে বলে বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হওয়া।

কিছু রাবী এমন আছেন যাদের থেকে কেবল ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন রাবীর থেকে অন্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হওয়াকে বলে মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়া।

যেহেতু এই তিন প্রকারের মধ্যে 'মুত্তাফাকু আলাইহি-এর শর্ত অনুযায়ী হওয়া'টাই অধিক শক্তিশালী, তাই এমনভাবে বর্ণিত হাদীস অন্য দু প্রকার হতে অগ্রগণ্য হবে। অনুরূপ বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হওয়া'টাই যেহেতু মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়া -এর তুলনায় অধিক শক্তিশালী, তাই অন্য কিতাবের যে হাদীস বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হবে তা ঐ হাদীস হতে অগ্রগণ্য হবে যা কেবল মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হয়।

স্তরবিন্যাসের ফলাফল প্রকাশ : সহীহ হাদীসের মধ্যে এ সাত স্তর বিন্যাসের ফল তখন পাওয়া যাবে যখন এ সাত প্রকারের মধ্যে تَعَارُضُ বা বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। দ্বন্দ্বের সময় প্রাধান্য পাবে সেই স্তরের হাদীস যার স্তর অগ্রগামী। যেমন- বুখারী ও মুসলিমের রাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস যদি বিরোধী হয় (বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে) ঐ হাদীসের, যা কেবল বুখারী বা মুসলিমের রাবী কর্তৃক বর্ণিত, তাহলে এমতাবস্থায় বুখারী ও মুসলিমের হাদীসটি জয়ী হবে ও প্রাধান্য পাবে। অনুরূপ শুধু বুখারীর রাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস যদি বিরোধী হয় শুধু মুসলিমের রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের, তাহলে এক্ষেত্রে বুখারীর রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে এক স্তরের হাদীস আরেক স্তরের উপর প্রাধান্য পাবে।

وَقَدْ صَرَّحَ الْجَمْهُورُ بِتَقْدِيمِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي الصَّحَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ التَّصْرِيحِ بِتَقْضِيهِ وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ التَّنْسَائُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا تَحْتَ أَيْدِي السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وَجُودَ كِتَابِ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ إِذَا الْمَنْفِيُّ إِنَّمَا هُوَ مَا يَفْتَضِيهِ صِبْغَةُ أَفْعَلُ مِنْ زِيَادَةِ صَحَّةٍ فِي كِتَابِ شَارَكَ كِتَابَ مُسْلِمٍ فِي الصَّحَّةِ يَمْتَّازُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْفِ الْمُسَاوَاةَ وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُفَارِسَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ وَجُودِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ وَلَمْ يُفْصَحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصَحِّيَّةِ وَلَوْ أَفْصَحُوا بِهِ لِرَدِّهِ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُودِ، فَالْصِّفَاتُ الَّتِي تَذُورُ عَلَيْهَا الصَّحَّةُ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَتَمَّ مِنْهَا فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَدُّ، وَشَرْطُهُ فِيهَا أَقْرَى وَأَسَدُّ.

অনুবাদ : অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বুখারী শরীফকে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। স্পষ্টত কারো থেকে এর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় না। অবশ্য ইমাম আবু আলী নিশাপুরী (র.) -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয় যে, তিনি বলেছেন- ‘আসমানের নিচে মুসলিম শরীফের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোনো গ্রন্থ নেই।’ তিনিও এখানে মুসলিম শরীফকে বুখারী শরীফের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বলেননি। তিনি নাকচ করেছেন মুসলিম শরীফ অপেক্ষা ‘অধিকতর বিশুদ্ধ’ গ্রন্থের অস্তিত্ব। কেননা, **إِسْمُ تَفْضِيلٍ** তথা **أَفْعَلُ** -এর দাবি অনুযায়ী বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মুসলিমের সাথে শরিক কিতাবের ঐ অধিক বিশুদ্ধতাকে নফী (নাকচ) করা হয়েছে, যার (অধিক বিশুদ্ধতা) দ্বারা সে কিতাবটি মুসলিমের উপর অগ্রগামী হয়। তিনি (দুই কিতাব) বরাবর হওয়ার বিষয়টি নফী (নাকচ) করেননি।

পশ্চিম এলাকার কোনো কোনো মনীষী সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা মুসলিম শরীফকে বুখারী শরীফের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটিও বর্ণনার সৌকর্য ও বিন্যাসের আঙ্গিক বিচারে। তারা পরিষ্কার ভাষায় এমন কথা বলেননি যে, মুসলিম শরীফের অগ্রগণ্যতা বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে। যদি এমনটি তারা সুস্পষ্টভাবে বলতেন, বাস্তব অবস্থার সাক্ষ্য তাহলে তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করত। কেননা, যে গুণাবলীর উপর বিশুদ্ধতা নির্ভর করে, তা মুসলিম শরীফের তুলনায় বুখারী শরীফে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় ও কঠোরভাবে রয়েছে। এ ব্যাপারে তার (বুখারীর) শর্তও অধিক মজবুত ও সংহত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুখারী অগ্রগণ্য নাকি মুসলিম? এ ব্যাপারে কোনোই মতভেদ নেই যে, বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্বয় হাদীসের অন্যান্য সকল গ্রন্থ হতে অগ্রগণ্য। কারণ, উক্ত তাদের দু কিতাবকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তবে বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে কোন কিতাবটি অগ্রগণ্য? তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

১. জুমহুর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, বিশুদ্ধতার দিক বিচারে বুখারী মুসলিমের তুলনায় অগ্রগণ্য।
এ ব্যাপারে কারো ভিন্নমত নেই।
২. আবু আলী নিশাপুরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন—

مَا تَخْتَأِدُ بِهِ السَّامِعُ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ .

“আসমানের নিচে মুসলিমের থেকে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই।”

৩. পশ্চিম এলাকার কতিপয় মনীষী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মুসলিম শরীফ বুখারী শরীফ হতে শ্রেষ্ঠ।
৪. ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো মুয়াত্তা মালিক।

আবু আলী নিশাপুরীর উক্তির জবাব : ‘আসমানের নিচে মুসলিম থেকে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই’ – আবু আলী নিশাপুরীর এ উক্তিটি জুমহুরের মতামতের বিরোধী নয়। কারণ, এ উক্তি হতে সর্বোচ্চ এটা বুঝা যায় যে, মুসলিম শরীফ হতে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই। কিন্তু এটা হতে পারে যে, মুসলিমের মতো সহীহ আরো অনেক কিতাব আছে। আর উক্ত উল্লিখিত উক্তির দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ‘অধিক বিশুদ্ধ কিতাব’ অস্বীকার করা উদ্দেশ্য; সম সহীহ কিতাবের কথা নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। এর বড় প্রমাণ হলো, তাঁর উক্তিহে আগত **أَصَحُّ** শব্দটি **إِسْمٌ تَفْضِيلٌ** -এর সীগাহ, যা অতিরিক্ত অর্থ বুঝায়। আর নিয়ম আছে— **إِسْمٌ تَفْضِيلٌ** -এর পূর্বে **حَرْفُ نَفْيٍ** (তথা مَا لَا - ইত্যাদি) প্রবিষ্ট (وَإِخْلُ) হলে ঐ অতিরিক্ত অর্থের **نَفْيٌ** হয়, মূল **فَعْلٌ** -এর নয়। এই সূত্র অনুযায়ী এখানে **إِسْمٌ تَفْضِيلٌ** -এর পূর্বে **مَا** **نَفْيَةٌ** প্রবিষ্ট হওয়ায় ‘অতিরিক্ত বিশুদ্ধতা’কে নাকচ করেছে যে, মুসলিমের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব দুনিয়াতে নেই। হ্যাঁ, তবে এটা হতে পারে যে, তার মতো সহীহ ও বিশুদ্ধ কিতাব আরও থাকবে।

মোটকথা, আবু আলী নিশাপুরীর উক্তি অনুযায়ী বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ না হলেও বিশুদ্ধতার বিচারে উভয় কিতাব সমপর্যায়ের। মুসলিম শরীফ বুখারী হতে অধিক বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় না।

পশ্চিমা এলাকার লোকদের উক্তির জবাব : পশ্চিমা এলাকার কতিপয় মনীষী বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম শরীফকে শ্রেষ্ঠ বলে যেটা অভিহিত করেছেন, সেটা বিশুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং সুন্দর বিন্যাস এবং চমৎকার ধারার দিক থেকে। আর জুমহুরও এটা স্বীকার করে যে, বিন্যাসগত সৌন্দর্যের বিচারে মুসলিম শরীফ বুখারী শরীফ হতে অগ্রগণ্য।

বিন্যাসের দিক দিয়ে মুসলিম শরীফ অগ্রগণ্য হলেও বিশুদ্ধতার বিচারে বুখারীর উপরে কোনো কিতাব নেই। এ ব্যাপারে সবাই একমত। ভিন্নমত কেউ পোষণ করে না। যদি কেউ এমনটি করত, তাহলে বাস্তব অবস্থার সাক্ষ্যই তা প্রত্যাখ্যান করত। কারণ, যে সকল গুণের উপর বিশুদ্ধতা নির্ভর করে, তা মুসলিমের তুলনায় বুখারী শরীফের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় বিদ্যমান।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উক্তির জবাব : মুয়াত্তা মালিক সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বলে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে মন্তব্য করেছেন তা বুখারী শরীফ রচনার পূর্বের সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বুখারী শরীফ রচিত হওয়ার পূর্বে মুয়াত্তা মালিকই ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। বুখারী শরীফ রচনার পরে এই খেতাবে ভূষিত হয় বুখারী শরীফ। এর বড় দলিল এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর ইত্তেকাল্লের পরে বুখারী শরীফ লেখা হয়। আর উক্ত উক্তিটি ছিল তাঁর বেঁচে থাকাকালীন সময়ের।

أَمَّا رُجْعَانُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَصَالُ فَلَا شَرِاطَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوى قَدْ ثَبَتَ لَهُ لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاکْتَفَى مُسْلِمٌ بِمُطْلَقِ الْمُعَاَصَرَةِ وَالزَّمِ الْبُخَارِىُّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْعَنْعَنَةَ أَصْلًا وَمَا الزَّمَهُ بِهِ لَيْسَ بِالْإِزْمِ لِأَنَّ الرَّاوى إِذَا ثَبَتَ لَهُ الْإِقَاءُ لَا يَجْرِى فِي رِوَايَتِهِ إِحْتِمَالُ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ سَمِعَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جِرْيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مَذْلَسًا وَالْمَسْئَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ الْمَذْلَسِ .

অনুবাদ : সনদের ইতিসাল তথা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক সংযোগের দিক দিয়ে ইমাম বুখারীর প্রাধান্য রয়েছে। কেননা, তিনি শর্ত করেছেন, বর্ণনাকারী জীবনে একবার হলেও তার পূর্ববর্তী রাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন— এমন প্রমাণ থাকতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) শুধুমাত্র সমসাময়িকতাই যথেষ্ট মনে করেছেন। তিনি ইমাম বুখারীর উপর আপত্তি তুলেছেন যে, এতে করে তিনি ‘আনআনা’ হাদীস মোটেই গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর এ অভিযোগ ইমাম বুখারীর উপর বর্তায় না। কেননা, কোনো রাবী সম্পর্কে একবার হলেও সাক্ষাৎ লাভের প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে এরূপ সন্দেহনা আর থাকে না যে, তিনি উক্ত শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেনি। যদি এরূপ সন্দেহনা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে উক্ত রাবী একজন মুসাল্লিস। অথচ মুদাল্লিস নয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কেই আলোচনা চলছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুখারীর প্রাধান্যের কারণ : পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে বুখারী অগ্রগণ্য। কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বুখারী মুসলিমের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। এখান থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাধান্যের দিকগুলো আলোচনা করা হচ্ছে।

বুখারী প্রাধান্য পাওয়ার কারণ কয়েকটি রয়েছে। যথা—

১. শর্তের দিক দিয়ে। কোনো হাদীস ‘মুত্তাসিল’ হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (র.) শর্তারোপ করেন যে, বর্ণনাকারীকে তার পূর্ববর্তী রাবীর সাথে জীবনে একবার হলেও সাক্ষাৎ হতে হবে।

এর বিপরীতে ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস মুত্তাসিল হওয়ার জন্য বর্ণনাকারী ও তার পূর্ববর্তী রাবী সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাদের মধ্যে সাক্ষাতের শর্তারোপ করেন না।

বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা হলো, কোনো রাবী যদি তার শায়খ থেকে হাদীস শোনার কথা স্পষ্ট বর্ণনা করে, যেমন এভাবে বলে যে, سَمِعْتُ فُلَانًا ‘আমি অমুক থেকে শুনেছি’ অথবা حَدَّثَنِي فُلَانٌ ‘আমাকে অমুক বর্ণনা করেছে’, তাহলে নিঃসন্দেহে হাদীসটি ‘মুত্তাসিল’ হবে।

এর বিপরীতে রাবী যদি তার শায়খ থেকে শোনার কথা স্পষ্ট ভাষায় না বলে বরং عَنْ فُلَانٍ ‘অমুক থেকে’—এভাবে হাদীস বর্ণনা করে, তাহলে এক্ষেত্রে রাবী ও শায়খের জীবনকাল যদি এক সময়ের না

হয় বা এক সময়ের হলেও তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়াটা প্রমাণিত হয়, তাহলে হাদীস সন্দেহাতীতভাবে মুনকাতি (مَنْقُطٌ) হবে।

কিন্তু যদি রাবী ও শায়খের সময়কাল এক হয় এবং তাদের মাঝে সাক্ষাৎ না ঘটায় বিষয়টি প্রমাণিত না হয়; বরং উভয়ের মাঝে সাক্ষাতের সম্ভাবনাই বেশি থাকে এবং রাবী মুদাল্লিস না হয়, তাহলে এ হাদীস ইমাম মুসলিম (র.)-এর মতে মুত্তাসিল হবে। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে মুত্তাসিল হবে না।

নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী (র.)-এর এই অর্থাৎ জীবনে একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তটি কঠিন এবং قُرْتُتْ তথা সন্দেহাতীতভাবে মুত্তাসিল হওয়ার ফায়দা দেয়। তাই এ শর্তের দিক বিচারে বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের তুলনায় অগ্রগণ্য এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

ইমাম মুসলিমের প্রশ্ন ও লেখকের উত্তর : ইমাম বুখারী (র.)-এর উল্লিখিত শর্তের প্রেক্ষিতে ইমাম মুসলিম (র.)-এর পক্ষ হতে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর এ শর্ত আবশ্যিক করে যে, তিনি তার কিতাবে حَدِيثُ مُعْنَنٍ (অর্থাৎ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ করে বর্ণনা) মোটেও বর্ণনা করবেন না। কারণ, حَدِيثُ مُعْنَنٍ-এর মধ্যে সাক্ষাতের পরেও শায়খ থেকে হাদীস না শোনার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ রাবী তার শায়খের সাথে সাক্ষাতের পরেও এই সম্ভাবনা থাকে যে, বর্ণনাকৃত হাদীসটি তিনি (রাবী) শায়খ থেকে শ্রবণ করেননি। এ কারণে বুখারীর কর্তব্য যে, তিনি তার কিতাবে حَدِيثُ مُعْنَنٍ মোটেও উল্লেখ করবেন না। অথচ তিনি তার কিতাবে অনেক حَدِيثُ مُعْنَنٍ রেওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম বুখারীর হয়ে সম্মানিত লেখক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম বুখারীর প্রতি এ প্রশ্ন উত্থাপিতই হয় না। কারণ, ইমাম বুখারী যখন সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন তখন এটাই স্বাভাবিক যে, তার حَدِيثُ مُعْنَنٍ-এর মধ্যে সাক্ষাৎ প্রমাণিত। আর এটা এক রকম আবশ্যিক যে, সাক্ষাতের পরে রাবী শায়খ থেকে হাদীস অবশ্যই শুনবেন। নতুবা রাবী মুদাল্লিস হয়ে যাবেন। অথচ আলোচনা চলছে ঐ রাবীর হাদীস সম্পর্কে যিনি মুদাল্লিস নন। মোটকথা, যদিও সাক্ষাতের পরেও শায়খ থেকে হাদীস না শোনার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা, তাহলে রাবী মুদাল্লিস হয়ে যাবেন। অথচ আলোচনা চলছে عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ রাবী-এর عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ বর্ণনার হুকুম নিয়ে-مُدْلِسٌ রাবী-এর عَنْ فُلَانٍ-এর হুকুম নিয়ে নয়। কারণ, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, রাবী যদি মুদাল্লিস হয়, তাহলে তার عَنْ فُلَانٍ টা مُتَّصِلٌ হতে হলে প্রতিটি রেওয়ায়েতে এমন কোনো শব্দ থাকতে হবে, যা সেই রেওয়ায়েত শায়খ থেকে রাবী শুনেছে বলে খবর দেয়।

وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكَلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكَلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ مَعَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِمْ بَلْ غَالِبَهُمْ مِنْ شُبُوحِهِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ وَمَارَسَ حَدِيثَهُمْ بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فِي الْأَمْرَيْنِ ، وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الشُّذُوزِ وَالْإِغْلَالِ فَلِأَنَّ مَا انْتَقَدَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَدًا مِمَّا انْتَقَدَ عَلَى مُسْلِمٍ هَذَا مَعَ إِتْفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ أَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي الْعُلُومِ وَأَعْرَفَ عَنْهُ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّ مُسْلِمًا تَلْمِيزُهُ وَخَرَجُهُ وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ أَثَرَهُ حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَوْلَا الْبُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ ، وَمَنْ لَمْ أَيْ وَمِنْ هَذِهِ النِّجْمَةِ وَهِيَ أَرْجَحِيَّةُ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ عَلَى غَيْرِهِ قَدْ صَحِّحَ الْبُخَارِيُّ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ صَحِّحَ مُسْلِمٌ لِمُشَارَكْتِهِ لِلْبُخَارِيِّ فِي إِتْفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَلْقِي كِتَابِهِ بِالْقَبُولِ أَيْضًا سِوَى مَا عُلِّلَ .

অনুবাদ : ন্যায়পরায়ণতা ও আয়ত্তশক্তির দিক দিয়েও বুখারী শরীফ অগ্রগণ্য। কেননা, বুখারী শরীফের সমালোচিত ব্যক্তিদের তুলনায় মুসলিম শরীফের সমালোচিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অধিক। তা ছাড়া ইমাম বুখারী (র.) এ ধরনের ব্যক্তিদের নিকট থেকে তেমন বেশি হাদীস গ্রহণ করেননি; বরং তাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ ওস্তাদ, যাদের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের হাদীস তিনি (সরাসরি তাদের থেকে) চর্চা করেছেন। এ উভয় বিষয়ে ইমাম মুসলিম ব্যতিক্রম।

শায় ও মু'আল্লা না হওয়ার দিক দিয়েও বুখারী শরীফ অগ্রগণ্য। কেননা, বুখারী শরীফের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা মুসলিম শরীফের সমালোচিত হাদীসের তুলনায় স্বল্প সংখ্যক। সর্বোপরি ওলামায়ে কেরাম সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিমের তুলনায় ইলমী যোগ্যতায় যেমন উচ্চ অবস্থানের অধিকারী, তেমনি হাদীসশাস্ত্রেও অধিক বিজ্ঞ। ইমাম মুসলিম ছিলেন তাঁর ছাত্র এবং ফসল। তিনি নিয়মিত তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা নিতেন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। ইমাম দারাকুতনী এও পর্যন্ত বলেছেন, ইমাম বুখারী না থাকলে ইমাম মুসলিম (হাদীসশাস্ত্রে) মনোযোগী হতেন না এবং আসতেন না অর্থাৎ এই শাস্ত্রে পা রাখতে পারতেন না। অন্য সকল কিতাবের চেয়ে ইমাম বুখারীর শর্ত অধিকতর কঠোর হওয়ার কারণে বুখারী শরীফকে হাদীস বিষয়ে লিখিত সকল গ্রন্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতঃপর মুসলিম শরীফের স্থান। কেননা, ওলামায়ে কেরামের নিকট সমাদৃত হওয়ার দিক দিয়ে এটিও বুখারী শরীফের সমান। অবশ্য সমালোচিত হাদীসগুলো বাদ দিয়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. **عَدَالَتٌ وَ ضَبْطٌ** -এর দিক দিয়ে : **ضَبْطٌ** তথা আয়ত্তশক্তি এবং **عَدَالَتٌ** তথা ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকেও বুখারী মুসলিমের তুলনায় অগ্রগণ্য। মুসলিমের তুলনায় বুখারীর এই অগ্রগণ্যতার কারণ দুটি। যথা-

১. মুসলিমের তুলনায় বুখারীতে বিতর্কিত ও সমালোচিত রাবীর রেওয়ায়েত কম।

২. ইমাম বুখারী যে সমস্ত বিতর্কিত রাবীদের রেওয়ায়েত এনেছেন তারা হলেন তাঁর সরাসরি ওস্তাদ, যাদের **ضَبْطٌ** ও **عَدَالَتٌ** সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন।

ইমাম মুসলিম (র.) এর ব্যতিক্রম। একে তো তাঁর কিতাবের সমালোচিত ও বিতর্কিত রাবীর রেওয়ায়েত বেশি। তদুপরি যাদের থেকে তিনি এ সকল বিতর্কিত রেওয়ায়েত এনেছেন তারা তাঁর সরাসরি ওস্তাদ নন; বরং ওস্তাদের ওস্তাদ, যাদের **ضَبْطٌ** ও **عَدَالَتٌ** সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত ছিলেন না। অধিকাংশই ছিলেন তাবেরী বা তাবয়ে-তাবেয়ীন স্তরের লোক।

ইমাম সাখাবীর বর্ণনা মতে যে সমস্ত রাবী থেকে ইমাম বুখারী একাই রেওয়ায়েত করেছেন তাদের সর্বমোট সংখ্যা ৪৩৫। এর মধ্যে বিতর্কিত হলেন ৮০ জনের মতো। আর ইমাম মুসলিম (র.) যে সমস্ত রাবীদের থেকে একাই রেওয়ায়েত করেছেন তাদের সংখ্যা ৬১০। এদের মধ্যে বিতর্কিত হলেন ১৬০ জন। অর্থাৎ বুখারীর তুলনায় দ্বিগুণ।

৩. **শায় ও ইল্লত না হওয়ার দিক দিয়ে** : এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বুখারী মুসলিমের তুলনায় অগ্রগণ্য। কারণ, মুসলিমের তুলনায় বুখারী শরীফে শায় ও মু'আল্লাল হাদীসের সংখ্যা কম। এর বিবরণ হলো, বুখারী ও মুসলিমের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা সর্বমোট ২১০। এর মধ্যে ৩২টি উভয় কিতাবের। ৮০টি শুধু বুখারীতে। আর বাকি ৯৮ টি মুসলিম শরীফে আছে। এ হিসাব অনুপাতে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা বুখারীর তুলনায় মুসলিমে কমপক্ষে ১৮টি বেশি।

৪. **লেখকের দিক দিয়ে** : লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকেও বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের চেয়ে অগ্রগণ্য। কারণ, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, সাধারণত সকল ইলম বিশেষত ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ এবং মর্যাদায় উর্ধ্বে ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম মুসলিম হলেন ইমাম বুখারীর ছাত্র। তিনি হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। ইমাম দারাকুতনী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন- **لَوْلَا النَّبَخَرِيُّ لَسَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ**

অর্থাৎ যদি ইমাম বুখারী না হতেন তাহলে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (র.) পা রাখতে পারতেন না, সফলকাম হতে পারতেন না।

আর এটা স্বাভাবিক কথা যে, লেখক যত উচ্চমানের হন তার কিতাবের মানও তত বেশি হয়, তাই বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের তুলনায় অগ্রগণ্য।

মোটকথা, যে সমস্ত সিফাত ও শর্তের কারণে হাদীস বিশ্বকর্তার স্তরে পৌঁছে তার মধ্যে বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফ ইত্যাদি গ্রন্থ হতে অধিক উত্তম এবং অগ্রগণ্য। বস্তুত এ কারণেই হাদীসের সকল কিতাবের উপরে বুখারী শরীফের মান। এর পরের স্তরে হলো মুসলিম শরীফ। কেননা, মুসলিমের শর্তও বুখারীর কাছাকাছি। এতদ্ব্যতীত বুখারীর মতো মুসলিম শরীফকেও ওলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৫. **মাসআলা ইজ্জতিহাদ করার দিক দিয়ে** : মুসলিমের উপর বুখারীর প্রাধান্যের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (র.) হাদীসের আলোকে মাসআলা ইস্তিহ্বাত (উৎসারণ) করেছেন। এমনকি তিনি এক এক হাদীস হতে কয়েকটি মাসআলা বের করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিম শরীফে এমনটি করেননি।

ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فِي الْأَرْحَابِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْحَابُ مَا وَافَقَهُ شَرْطُهُمَا ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رَوَاتُهُمَا مَعَ بَاقِي سُرُوطِ الصَّحِيحِ وَرَوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الْإِتِّفَاقُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَغْيِيلِهِمْ بِطَرِيقِ الزُّوْمِ فَهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي رَوَايَاتِهِمْ وَهَذَا أَصْلٌ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعًا كَانَ دُونَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا فَيَتَقَدَّمُ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ وَخَدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَخَدَهُ تَبَعًا لِأَصْلٍ كُلِّ مِنْهُمَا فَخَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا سِتَّةُ أَقْسَامٍ يَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا فِي الصَّحَّةِ وَتُمْ قِسْمٌ سَابِعٌ وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا إِجْتِمَاعًا وَإِنْفِرَادًا .

অনুবাদ : বিসুদ্ধতার দিক দিয়ে অতঃপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেই হাদীসগুলোকে যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্ত মোতাবেক। শর্ত বলতে বুঝানো হয় তাঁদেরই ব্যক্তিবর্গ। অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যাদের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ দু'গ্রন্থের ব্যক্তিবর্গের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অনিবার্যরূপে একমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আর এটি এমন এক মূলনীতি যা কোনো দলিল ব্যতীত উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং যে হাদীস একযোগে উভয়ের শর্ত মোতাবেক, তা মুসলিম শরীফের হাদীসের চেয়ে উচ্চস্তরের কিংবা তার সমান বলে গণ্য হবে। আর যদি মাত্র একজনের শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে ইমাম বুখারীর শর্তকে ইমাম মুসলিমের শর্তের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। মূলগ্রন্থ অনুসারে এ বিন্যাস করা হয়েছে।

সারকথা আমরা ৬টি শ্রেণি খুঁজে পেলাম— বিসুদ্ধতার দিক দিয়ে যেগুলোর মধ্যে তারতম্য রয়েছে। অতঃপর সপ্তম একটি শ্রেণিও রয়েছে। তা হলো— যা বুখারী-মুসলিমের শর্ত মোতাবেক নয়। যুগল কিংবা একক কোনোভাবেই তাতে উক্ত দু'কিতাবের শর্ত অনুসরণ করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস উল্লেখের জন্য ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) যে সকল শর্ত ধর্তব্য করেছেন বুখারী ও মুসলিমের কোথাও তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নেই। তবে যে সকল ওলামায়ে কেরাম বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াজেত পস্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা সেসব শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেহেতু গবেষণা কর্মে মতান্তর হওয়া স্বাভাবিক, তাই বুখারী ও মুসলিমের শর্তাবলির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ হয়েছে। “শায়খাইনের শর্ত অথবা কোনো একজনের শর্ত”—এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে রাবীগণ থেকে বুখারী ও মুসলিম উভয়ে অথবা কোনো একজন হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সকল রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করা এবং হাদীস বর্ণনা করতে এ ভাবধারা অবলম্বন করা যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ অভিমত ও ব্যাখ্যাটিই সমর্থন করেছেন।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) “মুকাদামাতুশ শায়খ”—এ লেখেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ আয়ত্তশক্তি (ضَبْط), ন্যায়পরায়ণতা (عَدَالَت), শায় না হওয়া, মুনকার না হওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এমন গুণবিশিষ্ট রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা— বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ হতে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

وَهَذَا التَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْحَبِثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَمَّا لَوْ رَجَعَ قَسَمٌ عَلَى مَا فَوْقَهُ بِأَمْرٍ أُخْرَى تَقْتَضِي التَّرْجِيحَ عَلَى مَا فَوْقَهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا فَوْقَهُ إِذْ قَدْ يَغْرِضُ لِلْمُفَوِّقِ مَا يَجْعَلُهُ فَإِنَّمَا كَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَثَلًا وَهُوَ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ لَكِنْ حَقَّتْ قِرْنَتُهُ صَارِبًا يُفِيدُ الْعِلْمَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي يُخْرِجُهُ الْبَحَارِيُّ إِذَا كَانَ قَرْدًا مُطْلَقًا وَكَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخْرِجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وَصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كَمَا لِكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا انفردَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَثَلًا لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ.

অনুবাদ : এখানে যে মর্যাদার তারতম্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তা ন্যায়পরায়ণতা ও আয়ত্ত্বশক্তির দিক দিয়ে। অবশ্য কোনো একটি শ্রেণিকে যদি অগ্রাধিকার দানকারী অন্যান্য কারণে তার উপরস্থ শ্রেণির চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা, অনেক সময় নিম্নস্তরের বস্তুর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে যার ভিত্তিতে সেটিকেই উন্নত বলে গণ্য করতে হয়। মনে করা যাক, মুসলিম শরীফের একটি হাদীস যা মাশহুর শ্রেণির অর্থাৎ মুতাওয়াতির শ্রেণির নয়; কিন্তু তার সাথে এমন নিদর্শন যুক্ত হয়েছে যাতে তা দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। এ হাদীসটিকে বুখারী শরীফের সেই হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে হবে যা 'মুতলাক ফরদ'। অথবা মনে করা যাক, একটি হাদীস বুখারী কিংবা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়নি; কিন্তু তা বর্ণিত হয়েছে এমন সনদে যা 'বিশুদ্ধতম' বিশেষণের অধিকারী। যেমন- ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন নাফে থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে। এরূপ হাদীস বুখারী ও মুসলিমের যে কারো একক বর্ণনার চেয়ে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। বিশেষত যে সনদ সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে তার তুলনায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইতঃপূর্বে হাদীসের যে প্রকরণ ও স্তরবিन্যাস উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল বিশুদ্ধতার দিক বিচারে। উল্লিখিত প্রকারের কোনো প্রকারে যদি বিশুদ্ধতার সাথে সাথে এমন কোনো নিদর্শন যোগ হয়, যা তার উর্ধ্বস্তরের উপর অগ্রাধিকার দাবি করে, তাহলে সে প্রকারকে তার উর্ধ্বস্তরের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। যথা-

১. একটি হাদীস শুধু মুসলিমে আছে; বুখারীতে নেই। এ হাদীসটি আবার মাশহুর। এখন যদি এই হাদীসের সাথে এমন কোনো নিদর্শন যোগ হয়, যার দ্বারা হাদীসটি মুতাওয়াতিরের মতো **عَلَّمَ يَفِين** তথা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়, তাহলে মুসলিম শরীফের এ হাদীসটি বুখারী শরীফের এ হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাবে, যা মাত্র একক সনদে বর্ণিত। অথচ এর পূর্বে বিশুদ্ধতার বিচারে বুখারীর হাদীসটি মুসলিমের হাদীসের তুলনায় অগ্রগামী ছিল।
২. ঠিক এমনভাবে বুখারী ও মুসলিম যে হাদীস বর্ণনা করেনি, যদি সেই হাদীসের সনদের ব্যাপারে ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয় যে, তা **أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ** বা বিশুদ্ধতম সনদ। যেমন- হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম মালিক (র.) থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত নাফে (র.) থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে। তাহলে এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে না থাকা সত্ত্বেও এ হাদীসের উপর অগ্রগণ্য হবে যে হাদীস শুধুমাত্র ইমাম বুখারী অথবা শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে যদি বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের সনদ যাঈফ হয়, তাহলে তখন উক্ত হাদীস অবশ্যই এই যাঈফ হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে।

فَإِنْ خَفَّ الضَّبُّ أَيْ قَلَّ يُقَالُ خَفَّ الْقَوْمُ خُفُوفًا قَلُّوا وَالْمُرَادُ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ لَا لِشَيْءٍ خَارِجٍ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حَسَنَةً بِسَبَبِ الْإِعْتِضَادِ نَحْوُ حَدِيثِ الْمُسْتَوْرِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَخَرَجَ بِإِشْتِرَاطِ بَاقِي الْأَوْصَافِ الضَّعِيفِ وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيحِ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهِ وَلَنْ كَانَ دُونَهُ وَمُشَابِهَهُ لَهُ فِي انْتِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ .

অনুবাদ : আয়ত্তশক্তিতে যদি ঘাটতি হয় অর্থাৎ কম হয় (যেমন বলা হয়- লোক কম হয়েছে) এবং তার সাথে সহীহ -এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত অবশিষ্ট শর্তসমূহ বহাল থাকে, তাহলে তাকে বলা হয় 'হাসান লিয়াতিহী'। বাইরের কোনো কারণে (হাসান) নয়। হাসান লিগায়রিহী ঐ হাদীস যার হাসানটা (রাবীর আধিক্য ইত্যাদির) শক্তির কারণে হয়। যেমন- একাধিক সনদে বর্ণিত অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস। (এটা হাসান লিগায়রিহী)। সহীহ লিয়াতিহী-এর অবশিষ্ট শর্তারোপের দ্বারা যা 'স্বীকৃত হাদীস (হাসানের সংজ্ঞা হতে) বেরিয়ে গেছে। হাসান-এর এ প্রকার (অর্থাৎ হাসান লিয়াতিহী) মর্যাদার দিক দিয়ে (সহীহ হতে) নিম্নমানের হলেও সহীহ-এর সমপর্যায়ের এবং তারতম্যপূর্ণ বিভিন্ন স্তরের দিকে বিভক্ত হওয়ার দিক থেকে (হাসান লিয়াতিহীটা) সহীহ লিয়াতিহী-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাসান লিয়াতিহী-এর সংজ্ঞা : আরবিতে সংজ্ঞাটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ-

مَوْخَرَّ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَاتِ الضَّبُّ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ .

অর্থাৎ যে হাদীস অবিস্মিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারী আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও কম আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শায কিংবা মু'আল্লাল নয়- এরূপ হাদীসের নাম হাসান লিয়াতিহী।

নামকরণের কারণ : যেহেতু এ জাতীয় হাদীসের হাসান তথা ভালো হওয়াটা হলো ذات বা সত্তাগত, বাইরের কোনো কারণে নয়, তাই তাকে বলা হয় হাসান লিয়াতিহী।

হাসান লিয়াতিহী-এর ছকুম : সহীহ লিয়াতিহী হাদীসের মতো হাসান লিয়াতিহী হাদীসও দলিল ও আমলযোগ্য। অর্থাৎ হাসান লিয়াতিহী হাদীস দ্বারা যেমনিভাবে দলিল দেওয়া যায় তেমনি তার উপর আমলও করা যায়।

সহীহ লিয়াতিহী হাদীস যেমন বিভিন্ন স্তরের হয়, তেমনি হাসান লিয়াতিহী-এর মধ্যেও বিভিন্ন স্তর হয়। যার একটির স্তর অপরটির তুলনায় উর্ধ্বে হয়। অবশ্য সহীহ লিয়াতিহী ও হাসান লিয়াতিহী হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সহীহ লিয়াতিহী হাদীস প্রাধান্য পাবে। কারণ, সহীহ -এর মর্তবা হাসান থেকে উর্ধ্বে।

হাসান শিয়াতিহী-এর উদাহরণ : এর উদাহরণ এ সমস্ত হাদীস যা عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ এবং عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ সনেদ বর্ণিত হয়।

হাসান লিয়াতিহী ও সহীহ লিয়াতিহী -এর মধ্যে পার্থক্য : সহীহ লিয়াতিহী ও হাসান লিয়াতিহী-এর সংজ্ঞা ও শর্ত প্রায় বরাবর। মাত্র একটি স্থানে পার্থক্য। আর তা হলো, সহীহ লিয়াতিহী-এর মধ্যে রাবীর মাঝে **الْمُنْطِقُ** তথা পূর্ণ আয়ত্তশক্তি হয়। আর হাসান লিয়াতিহী -এর রাবীর মধ্যে **خَافَ الْمُنْطِقُ** তথা কম আয়ত্তশক্তি হয়। এটুকুই যা প্রভেদ। এ ছাড়া সহীহ-এর বাকি সকল শর্ত হাসানের জন্যও প্রযোজ্য।

হাসান লিগায়রিহী -এর সংজ্ঞা : যে হাদীস মূলত মাওকুফ, গায়রে মাকবুল এবং যা'ঈফ ও অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয়, সে হাদীসের সাথে যদি সনদের আধিক্য ইত্যাদি এমন নিদর্শন যুক্ত হয়, যা হাদীসটি কবুল হওয়ার দিককে প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে হাদীসকে হাসান লিগায়রিহী বলে।

هُوَ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ আরবিতে অর্থঃ যা 'ইসহাফী' হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগায়রিহী বলে।

হাসান লিগায়রিহী -এর উদাহরণ : দারাকুতনী গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) -এর **سَرَرٌ وَلَا سَرَارَ** হাদীসটি হাসান লিগায়রিহী। কারণ, এ হাদীসের যত সনদ আছে তার মধ্যে আপত্তি রয়েছে। তারপরেও ইমাম নববী (র.) এবং ইবনুস সালাহ (র.) সনদের আধিক্য হেতু হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

নামকরণের কারণ : যেহেতু এ জাতীয় নিদর্শনের কারণে তা বাইরের কারণের উপর মাণ্ডুক্ষ্য অর্থাৎ সংযুক্ত নিদর্শনের কারণে তা হাসান হয়, তাই তার নামকরণ করা হয়েছে হাসান লিগায়রিহী করে।

হাসান লিগায়রিহী-এর হুকুম : হাসান লিয়াতিহী-এর মতো হাসান লিগায়রিহীও আমল ও দলিলযোগ্য। কিন্তু এর মর্তবা যেহেতু খবরে মাকবুলের অন্যান্য প্রকার থেকে নিচু, তাই বিরোধের সময় তা অগ্রাধিকার পাবে না, অর্থাৎ **مَجْرُوم** হবে।

رَاوِي مَسْتُر - এর সংজ্ঞা : যে রাবীর عَدَالَتْ এবং جَرَحْ কোনোটিই সুপ্রমাণিত নয়, তাকে رَاوِي مَسْتُر বলে।

وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحِّحُ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ بِالصَّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطَّرِيقِ لِأَنَّ
لِلصُّورَةِ الْمَجْمُوعَةِ قُوَّةً تُجَبِّرُ الْقَدْرَ الَّذِي قَصَرَتْ بِهِ ضَبْطُ رَأْيِ الْحَسَنِ
عَنْ رَأْيِ الصَّحِيحِ وَمِنْ ثَمَّ يُطْلَقُ الصَّحَّةُ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي يَكُونُ
حَسَنًا لِذَاتِهِ لَوْ تَفَرَّدَ إِذَا تَعَدَّدَ وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ .

অনুবাদ : হাসান লিয়াতিহী হাদীসের সনদ সংখ্যা অধিক হলে তাকে বলা হয় সহীহ লিগায়রিহী । এ ধরনের হাদীসকে সহীহ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, সামগ্রিক রূপের মাধ্যমে এমন শক্তি অর্জিত হয়, যার ফলে সহীহ লিয়াতিহী -এর রাবী অপেক্ষা হাসান লিয়াতিহী-এর রাবীর মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ হয়ে যায় । সে কারণে যে সনদ একক হলে হাসান লিয়াতিহী হয়, সেটির একাধিক সনদ থাকলে তাকে সহীহ বলে সাব্যস্ত করা হয় । এটা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কেবল একটি সিফাত আসে ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ : এখানে হَذَا -এর مُشَارِكٌ হলো সহীহ ও হাসানের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা । حَدِيثُ الْوَصْفِ দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থাৎ صَحِيح বা حَسَن সারকথা হলো, যে হাদীসের সাথে কেবল একটি সিফাত আসবে এভাবে যে, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ বা هَذَا حَدِيثٌ, এবং একত্রে দুটো সিফাত এভাবে আসবে না যে, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ, সেক্ষেত্রে কেবল সহীহ ও হাসানের উক্ত সংজ্ঞা প্রযোজ্য । কিন্তু যদি কোনো হাদীসে দুটি সিফাত একসাথে আসে যেমন এভাবে যে, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ, তাহলে সেখানে حَسَن ও صَحِيح দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য হবে যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ ।

سَهِيْهُ لِيْغَايِرِيْهِ -এর সংজ্ঞা : আরবিতে সংজ্ঞাটি এভাবে দেওয়া যায় - **هُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ** - অর্থাৎ হাসান লিয়াতিহী হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তাকে বলে, সহীহ লিগায়রিহী ।

সনদ বেশি হলে হাসান হওয়ার কারণ : হাসান লিয়াতিহী হাদীসের সনদ বেশি হলে হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায় । এর কারণ হলো, অসংখ্য ও একাধিক সনদের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে, রাবীর মধ্যে কম আয়ত্তশক্তি থাকায় হাসান লিয়াতিহী-এর মধ্যে যে ত্রুটি ও কমতি সংঘটিত হয়েছিল তা পূরণ হয়ে বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছে দেয় । বস্তুত এ ক্ষতিপূরণের কারণেই হাসান লিয়াতিহী হাদীসটি সহীহ হয়ে যায় ।

নামকরণের কারণ : এ জাতীয় হাদীস সহীহ হলেও যেহেতু তা নিজস্ব শক্তি বলে হয় না ; বরং অন্যের কারণে অর্থাৎ সনদের আধিক্যের কারণে হয়, তাই তাকে সহীহ লিগায়রিহী বলে ।

সহীহ লিগায়রিহী-এর **হুকুম** : সহীহ লিয়াতিহী-এর মতো সহীহ লিগায়রিহীও দলিলযোগ্য । অবশ্য পরস্পর বিরোধের সময় সহীহ লিগায়রিহী হাদীস হাসান লিয়াতিহী ও হাসান লিগায়রিহী-এর উপর অগ্রাধিকার পাবে এবং সহীহ লিয়াতিহী-এর পরবর্তী স্তরে থাকবে ।

সহীহ লিগায়রিহী-এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী -এর উদাহরণ ।

مَعْدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

এ হাদীস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযী (র.) মন্তব্য করেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এ হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী । কারণ, এ হাদীসটি অনেক সনদে বর্ণিত । অবশ্য মুহাম্মদ ইবনে আমর ব্যতীত অন্যান্য সনদের হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে । এজন্য এ হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী হবে কেবল মুহাম্মদ ইবনে আমরের সনদে ।

সহীহ লিগায়রিহী ও হাসান লিয়াতিহী-এর মধ্যে পার্থক্য : সহীহ লিগায়রিহী -এর মধ্যে সনদ অনেক (একাধিক) হয়, আর হাসান লিয়াতিহী -এর মধ্যে সনদ হয় একটি ।

فَإِنْ جَمَعَ إِلَى الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَلِلتَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمُجْتَهِدِ فِي التَّائِيلِ هَلْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحَّةِ أَوْ قَصُرَ عَنْهَا وَهَذَا حَيْثُ بَخَصَلُ مِنْهُ التَّفَرُّدُ بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنْ اسْتَشْكَلَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ فَقَالَ الْحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدِيثَيْهِمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ اثْبَاتٌ لِذَلِكَ الْقُصُورِ وَنَفْيُهُ وَمَخَصَلُ الْجَوَابِ أَنَّ تَرَدُّدَ اثْمَةِ الْحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ فَيُقَالُ فِيهِ حَسَنٌ بِاعْتِبَارٍ وَصَفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارٍ وَصَفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ الْعَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَمَا قِيلَ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْجُزْمَ أَقْوَى مِنَ التَّرَدُّدِ وَهَذَا حَيْثُ التَّفَرُّدُ .

অনুবাদ : যদি একই হাদীসের ক্ষেত্রে 'সহীহ' ও 'হাসান' উভয় বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় যেমন- ইমাম তিরমিযী প্রমুখের উক্তি **حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ**, তাহলে এটা হবে রাবীর ব্যাপারে মুহাদ্দিসের (মুজতাহিদের) এ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে, রাবীর মধ্যে বিশুদ্ধতার শর্তাবলি আছে নাকি সে ব্যাপারে ত্রুটি বা কমতি রয়েছে? এ ব্যাখ্যা ঐ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যার সনদ মাত্র একটি। (আর যার সনদ অনেক তার জবাব সামনে আসছে।)

এ আলোচনা দ্বারা তাদের জবাব জানা গেছে, যারা হাসান ও সহীহ সিফাতদ্বয় একত্রিত হওয়াকে জটিল ও কঠিন মনে করেন এবং (প্রশ্নের সুরে) বলেন যে, সংজ্ঞার আলোকে 'হাসান' 'সহীহ' থেকে নিম্নমানের। (তাহলে দুটি সিফাত একত্রিত হয় কিভাবে? কেননা,) দুই সিফাত একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো! (হাসান হওয়ায়) রাবীর আয়ত্তগত ত্রুটিকে সাব্যস্ত করা এবং (সহীহ হিসেবে) ঐ ত্রুটিকে নাকচ করা, (আর একই সাথে এটা অসম্ভব।)

জবাবের সারকথা হলো, হাদীসের রাবীর মধ্যে মুহাদ্দিসগণের সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগাটা মুজতাহিদের জন্য দাবি করে যে, তিনি উক্ত হাদীসের দুই সিফাতের একটি সিফাত আনবেন (উল্লেখ করবেন) না; বরং (এভাবে) বলবেন, রাবীর মধ্যে 'হাসান'-এর সিফাত থাকায় এক দলের মতে হাদীসটি হাসান আর রাবীর মধ্যে সহীহ-এর সিফাত থাকায় আরেক দলের মতে হাদীসটি সহীহ।

বেশির থেকে বেশি এক্ষেত্রে এক দলের (**أَيْمَةُ جُرْحٍ وَتَغْيِيلٍ**) কাছে হাসান এবং অপর দলের কাছে সহীহ (-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে) **حَرْفُ تَرَدُّدٍ** থেকে **حَسَنٌ صَحِيحٌ** (তথা -কে) ফেলে দেওয়া হয়েছে। (এ প্রশ্ন করা যেতে পারে।) কেননা, উচিত ছিল এভাবে বলা যে, **حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ**, (জবাব হলো,) এখান থেকে হরফে আতফ (**جُ**) -কে ঐভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে যেভাবে এর পরে (দ্বিতীয় জবাবের মধ্য থেকে) ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এ জবাবের ভিত্তিতে যে হাদীসের বেলায় **حَسَنٌ صَحِيحٌ** বলা হয়, তা মর্যাদাগতভাবে নিম্নপর্যায়ের হবে ঐ হাদীস থেকে যার ব্যাপারে শুধু **صَحِيحٌ** বলা হয়েছে। কেননা, দ্বিধার সাথে প্রয়োগকৃত বিশেষণের চেয়ে দৃঢ়তার সাথে ব্যবহৃত বিশেষণটি অধিক শক্তিশালী। এটা সনদ এককের দিক দিয়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهَذَا الْحَوَابُّ وَهَذَا, অর্থাৎ সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) হাদীসের দুই সিফাত তথা **حَسَنٌ** ও **صَحِيحٌ** একত্রিত হবার ব্যাপারে যে জবাব প্রদান করেছেন তা কেবলমাত্র ঐ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার সনদ মাত্র একটি। আর যার সনদ দুই বা ততোধিক হয়, সেখানে একত্রে দুই সিফাত ব্যবহারের জবাব সামনে তিনি উল্লেখ করবেন।

প্রথম প্রশ্ন ও তার উত্তর : হাদীসের সিফাত একই সাথে **حَسَنٌ صَحِيحٌ** আনায় ইমাম তিরমিযী (র.) -এর উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথম প্রশ্নটি হলো, কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, একই হাদীসের একসাথে দুটি সিফাত আনা এবং এভাবে বলা যে, **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ**। যেমনটি ইমাম তিরমিযী (র.), হযরত আলী ইবনে মাদীনী (র.) এবং হযরত ইয়াকূব ইবনে আবী শায়বা (র.) করেছেন—এটা যেমনি জটিল তেমনি মুশকিলও বটে। কারণ হলো, কোনো হাদীসকে ‘হাসান’ বলার অর্থ হলো, হাদীসটির রাবীর আয়ত্তশক্তি কম। পুনরায় ঐ হাদীসকেই ‘সহীহ’ বলার অর্থ হলো, রাবীর আয়ত্তশক্তি মোটেও কম নয়; বরং পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। সুতরাং একই রাবীর একই সময় আয়ত্তশক্তি কম হওয়া ও পূর্ণ হওয়া—একটা অপরটির যেমনি বিপরীত তেমনি এটা সম্ভবও না।

সম্মানিত লেখক এ প্রশ্নের দুটি উত্তর প্রদান করেছেন। একটি উত্তর ঐ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে হাদীসটির সনদ মাত্র একটি। আর অপর উত্তরটি হলো ঐ হাদীসের যা একাধিক সনদে বর্ণিত।

প্রথম উত্তর : যে হাদীসের সনদ মাত্র একটি, সে হাদীসের সিফাত একসাথে দুটো এনে এভাবে বলা যে, **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** - এক্ষেত্রে লেখকের উত্তর নিম্নরূপ—

রাবী বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতান্তর হতে এটা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ রাবী বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি যে, এ হাদীসের রাবীর মধ্যে সহীহ -এর শর্ত বিদ্যমান নাকি হাসান-এর শর্ত বিদ্যমান। কেউ হাসান -এর শর্ত বিদ্যমান বলেছেন, কেউ বলেছেন সহীহ -এর শর্ত বিদ্যমান। তাদের এ ধরনের ইখতিলাফের কারণে ইমাম তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসের হুকুম লাগাতে গিয়ে দোটাণায় পড়েছেন। যারা রাবীর মধ্যে হাসান-এর শর্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তাদের অনুকরণে হাদীসটি হাসান বলতে হয়, আবার যারা রাবীর মধ্যে সহীহ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান বলেছেন, তাদের অনুসরণে হাদীসটিকে সহীহ বলতে হয়। এর মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দানেরও কোনো কারণ নেই। এমতাবস্থায় তারা শেষমেষ উভয় উক্তি নকল করে দেওয়া ভালো মনে করেছেন যে, **حَسَنٌ عِنْدَ قَوْمٍ** অর্থাৎ একদলের মতে হাদীসটি হাসান এবং **صَحِيحٌ عِنْدَ قَوْمٍ** অর্থাৎ আরেক দলের মতে হাদীসটি সহীহ। অর্থাৎ রাবীর হুকুমের ক্ষেত্রে যে সন্দেহ রাবী বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম হতে সৃষ্টি হয়েছে তা মুহাদ্দিসগণ **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** বলে তুলে ধরেছেন।

এ জবাবের ভিত্তিতে যে সমস্ত হাদীসের ব্যাপারে **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** বলা হয়েছে তা ঐ হাদীসের তুলনায় মর্যাদায় নিম্নস্তরের হবে যার ব্যাপারে **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ** বলা হয়েছে। কারণ, যে হাদীসের ব্যাপারে **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ** বলা হয়েছে তার **صَحِيحٌ** হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু যে হাদীসের ব্যাপারে **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ** বলা হয়েছে তার **صَحِيحٌ** হওয়াটা সন্দেহপূর্ণ। আর মূলনীতি আছে—**الْجَزْمُ أَقْوَى مِنَ التَّرَدُّدِ** অর্থাৎ নিশ্চিতটা সন্দেহপূর্ণ হতে অধিক শক্তিশালী। অবশ্য **حَسَنٌ** বিশিষ্ট হাদীস ঐ হাদীসের উপর অগ্রাধিকার রাখে যার ব্যাপারে শুধু **حَسَنٌ** শব্দ এসেছে।

وَأَلَّا أُنَى إِذَا لَمْ يَحْصَلِ التَّفَرُّدُ فَيَاطْلَقُ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ
بِإِعْتِبَارِ الْإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ وَعَلَى هَذَا فَمَا قَبِلَ
فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَوْقَ مَا قَبِلَ فِيهِ صَحِيحٌ فَقَطْ إِذَا كَانَ فَرْدًا لِأَنَّ كَثْرَةَ
الطَّرِيقِ تَقْوِي.

فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَرَحَ التِّرْمِذِيُّ بِأَنْ شَرَطَ الْحَسَنَ أَنْ يَرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ
فَكَيْفَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
فَالْجَوَابُ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَعْرِفِ الْحَسَنَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا عَرَفَ بِنَوْعِ خَاصٍّ
مِنْهُ وَقَعَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ حَسَنٌ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ أُخْرَى وَ ذَلِكَ أَنَّهُ
يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ حَسَنٌ وَفِي بَعْضِهَا صَحِيحٌ وَفِي بَعْضِهَا
غَرِيبٌ وَفِي بَعْضِهَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي بَعْضِهَا حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي
بَعْضِهَا صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَفِي بَعْضِهَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَتَعْرِيفُهُ إِنَّمَا
وَقَعَ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ، وَعِبَارَتُهُ تُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِهِ
وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حَسَنٌ إِسْنَادُهُ عِنْدَنَا
وَكُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى وَلَا يَكُونُ رَاوِيَهُ مُتَّهِمًا بِالْكَذِبِ وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ
نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ شَاذًا فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

অনুবাদ : আর যদি সনদ একটি না হয় (বরং বেশি হয়) তাহলে সে সময় একই হাদীসের উপর একসাথে দুই সিফাত আনাটা হবে দুই সনদের দিক দিয়ে। যার একটি 'সহীহ' আর অপরটি 'হাসান'। এ জবাবের ভিত্তিতে যে হাদীসের ব্যাপারে **حَسَنٌ صَحِيحٌ** বলা হয় তা ঐ হাদীসের তুলনায় উচ্চ স্তরের হবে যার ব্যাপারে শুধু **صَحِيحٌ** বলা হয়, যখন তার সনদ মাত্র একটি হবে। কেননা, সনদের আধিক্য হাদীসকে শক্তিশালী করে তোলে।

যদি প্রশ্ন করা হয় ইমাম তিরমিযী (র.) স্পষ্ট বলেছেন যে, 'হাসান' হবার জন্য শর্ত হলো একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়া। অতঃপর তিনি কিভাবে কোনো কোনো হাদীসের বেলায় এরূপ বলতেন যে, 'এটি হাসান গরীব, এই সনদ ব্যতীত অন্য কোনো সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই'?

এর জবাব হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) নির্বিচারে যে কোনো 'হাসান' হাদীসের এরূপ সংজ্ঞা দান করেননি; বরং তিনি হাসান-এর একটি শ্রেণির সংজ্ঞা দিয়েছেন মাত্র, যা তাঁর কিতাবে স্থান লাভ করেছে। তিনি যে হাদীসকে শুধুমাত্র 'হাসান' বলেছেন অর্থাৎ এর সাথে অন্য কোনো বিশেষণ ব্যবহার করেননি— এ সংজ্ঞা

সে 'হাসান' -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, তিনি কোনো হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন- 'হাসান', কোনোটির বেলায় বলেছেন- 'সহীহ', কোনোটির বেলায় 'গরীব' আবার কোনোটির ব্যাপারে বলেছেন- 'হাসান সহীহ', কোনোটির ক্ষেত্রে 'হাসান গরীব', কোনো কোনো হাদীসকে 'সহীহ গরীব' আবার কোনো কোনো হাদীসকে বলেছেন- 'হাসান সহীহ গরীব'। (অর্থাৎ একই হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি একসাথে তিনটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।) তার সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণির (অর্থাৎ শুধু 'হাসান' -এর) বেলায় প্রযোজ্য। ইমাম তিরমিযীর ভাষ্যও এদিকে ইঙ্গিত করে। কেননা, তিনি তাঁর কিতাবের শেষে বলেছেন, আমি আমার এ কিতাবে যেখানে বলেছি 'হাদীসটি হাসান' -উদ্দেশ্য, আমার মতে হাদীসটির সনদ খুব সুন্দর। আর তা হলো- এমন একটি হাদীস যার বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বলে সন্দেহভাজন নয়, তা একাধিক সনদে বর্ণিত এবং সেটি শায নয়। এরূপ হাদীসই আমার মতে হাসান হাদীস।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় উত্তর : যদি হাদীসের সনদ একাধিক হয়, তখন একই হাদীসের সিফাত **حَسَنٌ صَحِيحٌ** উল্লেখ করার জবাব সম্মানিত লেখক এটা প্রদান করেছেন যে, এ সময় দুই সিফাতের মর্মার্থ দাঁড়াবে :

حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ سَنَدِهِ، وَصَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ سَنَدِهِ -

অর্থাৎ এক সনদের বিচারে হাদীসটি হাসান এবং আরেক সনদের বিচারে হাদীসটি সহীহ। অতএব আর বৈপরীত্য হলো না। কারণ, হতে পারে এক সনদের রাবীর মধ্যে আয়ত্তশক্তি কম এবং অপর সনদের রাবীর মধ্যে আয়ত্তশক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে।

এ জবাবের ভিত্তিতে যে হাদীসের ব্যাপারে **حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** বলা হয় তা মর্যাদায় ঐ হাদীস থেকে উর্ধ্বে হবে যার ব্যাপারে শুধু **حَدِيثٌ صَحِيحٌ** বলা হয়।

যদি এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, লেখকের উভয় জবাব প্রমাণ করে যে, **حَسَنٌ صَحِيحٌ** -এর মাঝখানে **وَأَوْ** অথবা **حَرْفُ عَطْفٍ** অথবা **أَوْ** ছিল, তা কেন ফেলে দেওয়া হলো? উত্তরে বলা হবে, অধিক ব্যবহারের কারণে **حَرْفُ عَطْفٍ** বিলোপ করা হয়েছে। আর এমন বিলোপ করার অনেক নজির রয়েছে। যেমন আরবরা বলে- **كُلُّ سَكَّا لَعْنًا** অর্থাৎ আমি মাছ, দুধ খেয়েছি। অনুরূপ- **أَكَلْتُ سَكًّا لَبَنًا** অর্থাৎ আমি মাছ, দুধ খেয়েছি। **كُلُّ سَكَّا لَعْنًا** এবং **أَكَلْتُ سَكًّا وَلَبَنًا** -এর আরো অনেক জবাব হতে পারে, যার বিস্তারিত বিবরণ জামে তিরমিযীতে আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ও তার উত্তর : ইমাম তিরমিযী (র.) -এর উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, তিনি তিরমিযী শরীফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, কোনো হাদীস 'হাসান' হওয়ার জন্য তার সনদ একাধিক থাকা শর্ত। অথচ তিনি আবার তিরমিযী শরীফের বিভিন্ন হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন যে, **هَذَا** অর্থাৎ এটি হাসান গরীব হাদীস; এর এই সনদ ব্যতীত অন্য সনদ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাই প্রশ্ন হয় এটা কিতাবে সম্ভব হলো? কেননা, 'হাসান' দ্বারা বুঝা যায়, তার একাধিক সনদ রয়েছে আর গরীব দ্বারা বুঝা যায়, তার সনদ একটি। আর একই সময়ে একই হাদীসের এক সনদ হওয়া এবং একাধিক সনদ হওয়া একটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিষয়, যা হতে পারে না।

প্রশ্নের উত্তর : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইমাম তিরমিযী (র.) -এর পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর জামে তিরমিযীতে হাদীসের ব্যাপারে সাত ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা—

১. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ অর্থাৎ এটি হাসান হাদীস।
২. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ অর্থাৎ এটি সহীহ হাদীস।
৩. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ অর্থাৎ এটি গরীব হাদীস।
৪. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ অর্থাৎ এটি হাসান সহীহ হাদীস।
৫. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ অর্থাৎ এটি হাসান গরীব হাদীস।
৬. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ অর্থাৎ এটি সহীহ গরীব হাদীস।
৭. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ অর্থাৎ এটি হাসান সহীহ গরীব হাদীস।

এই সাত ধরনের শব্দের মধ্যে ইমাম তিরমিযী (র.) যার জন্য 'একাধিক সনদ হওয়া' শর্ত করেছেন তা হলো প্রথম প্রকার। অর্থাৎ শুধু প্রথম প্রকার তথা যেখানে তিনি কেবল 'হাসান' শব্দ এভাবে বলেছেন যে, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ - সে ক্ষেত্রেই কেবল তার এ শর্তটি প্রযোজ্য যে, এই 'হাসান' হতে হলে তার সনদ একাধিক হতে হবে। এ শর্ত এই প্রথম প্রকার ছাড়া অন্যান্য ৬ প্রকারের জন্য প্রযোজ্য নয়, যদিও সেখানে 'হাসান' শব্দ আছে।

এর বড় প্রমাণ ইমাম তিরমিযী (র.) -এর নিজেরই একটি ভাষ্য, যা তিনি তিরমিযী শরীফের শেষদিকে উল্লেখ করেছেন। তা হলো—

وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حَسَنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا وَكُلُّ حَدِيثٍ يَزِيدُ وَلَا يَكُونُ رَأْيُهُ مَتَّهِمًا بِالْكَذِبِ وَيَزِيدُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ شَاذًا فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

অর্থাৎ আমি আমার এ কিতাবে যেখানে বলেছি 'হাদীসটি হাসান'— উদ্দেশ্য হলো, আমার মতে হাদীসটির সনদ খুব সুন্দর। আর তা হলো— এমন একটি হাদীস যার বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বলে সন্দেহভাজন নয়, তা একাধিক সনদে বর্ণিত এবং সেটি শায নয়। এরূপ হাদীসই আমার মতে হাসান হাদীস।

সুতরাং ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এ ভাষ্যই প্রমাণ করে যে, একাধিক সনদের শর্ত কেবল উক্ত সাত প্রকারের প্রথম প্রকারের বেলায় প্রযোজ্য এবং প্রথম প্রকারেই তা সীমাবদ্ধ। আর তা হলো যেখানে শুধুমাত্র هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ শব্দ এসেছে। এছাড়া বাকি অন্যান্য প্রকারে যেখানে هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ শব্দের সাথে অন্য শব্দ যেমন—صَحِيحٌ বা غَرِيبٌ এসেছে, সেখানে উক্ত শর্ত প্রযোজ্য নয়। এ হিসেবে যেখানে هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ শব্দের সাথে هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ শব্দ এভাবে ব্যবহার হয়েছে— সেখানে 'হাসান'-এর জন্য একাধিক সনদ হওয়া শর্ত নয়। যার ফলে هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ শব্দের একত্রিত হওয়ার দ্বারা বৈপরীত্য আবশ্যিক হবে না।

فَعَرَفَ بِهَذَا أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَفَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ حَسَنَ فَقَطَّ أَمَّا مَا يَقُولُ فِيهِ حَسَنَ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنَ غَرِيبٌ أَوْ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى تَغْرِيفِهِ كَمَا لَمْ يُعَرِّجْ عَلَى تَغْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ صَحِيحٌ فَقَطَّ أَوْ غَرِيبٌ فَقَطَّ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً بِشَهْرَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِّ وَاقْتِصَارَ عَلَى تَغْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ حَسَنَ فَقَطَّ أَمَّا لِغُمُوضِهِ وَإِنَّمَا لِأَنَّهُ اضْطِرَّاجٌ جَدِيدٌ وَلِذَلِكَ قَبِلَهُ يَقُولُهُ عِنْدَنَا وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الْخَطَّابِيُّ وَبِهَذَا التَّفْصِيلُ يَنْدَفِعُ كَثِيرٌ مِنَ الْإِثْرَادَاتِ الَّتِي طَالَ الْبَحْثُ فِيهَا وَلَمْ يَسْتَقِرَّ وَجْهٌ تَوْجِيهًا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا آلَتْهُمْ وَعَلَّمَ.

অনুবাদ : এ থেকে জানা গেল যে, যে হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'হাসান' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে তিনি সেটিরই সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর যে হাদীসের বেলায় তিনি একসাথে একাধিক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তার সংজ্ঞা দানের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। শুধুমাত্র 'সহীহ' কিংবা 'গরীব' বলা হাদীসের বেলায় যেমনটি হয়েছে। কারণ, এগুলোর সংজ্ঞা অতিপ্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে 'হাসান' বলতে তিনি এক স্বতন্ত্র ধরনের হাদীস বুঝিয়েছেন বলেই তার সংজ্ঞা দানের প্রয়োজন পড়েছে। কেননা, এ অর্থটি সূক্ষ্ম। সেজন্যই তিনি 'আমার মতে' কথাটি যোগ করেছেন; মুহাদ্দিসীনে কেরামের দিকে সম্পর্কিত করেননি। ইমাম খাতাবী (র.) যেমনটি করেছেন। এ আলোচনার দ্বারা ঐ সমস্ত প্রশ্নের অধিকাংশই দূর হয়ে যায়, যার আলোচনা দীর্ঘ হয়েছে অথচ তার (উত্থাপিত প্রশ্নের) একটি ব্যাখ্যাও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সুতরাং আমাকে এ জবাব শিক্ষা দেওয়া এবং অন্তরে উদ্বেগ করার জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : ইমাম তিরমিযী (র.) -এর উপর আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনি শুধু ঐ 'হাসান' -এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন যেটা তাঁর কিতাবে একক সিফাত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ 'হাসান' -এর সংজ্ঞা তিনি দেননি যা 'গরীব' বা 'সহীহ' -এর সাথে মিলে এসেছে। তাই প্রশ্ন হয়, তিনি কেবল একক হাসান -এর সংজ্ঞা দিলেন কেন এবং গরীব ও সহীহ -এর সাথে মিলে আসা হাসান -এর সংজ্ঞা দেননি কেন ?

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইমাম তিরমিযী (র.) -এর পক্ষ হতে উল্লিখিত প্রশ্নের এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, পৃথক পৃথকভাবে সহীহ ও গরীব -এর সংজ্ঞা যেমনিভাবে প্রসিদ্ধ, তেমনিভাবে ঐ হাসান -এর সংজ্ঞাও প্রসিদ্ধ যা গরীব বা সহীহ -এর সাথে মিলে আসে। অতএব, প্রসিদ্ধতার কারণে তিনি হাসান গরীব এবং হাসান সহীহ -এর মধ্যস্থ হাসান -এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেননি বা দেননি। কিন্তু যে হাসান একক সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা যেহেতু ১. সূক্ষ্ম এবং ২. নতুন পরিভাষা, সে কারণে তার স্বতন্ত্র সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আর এটা যে তাঁরই সৃষ্ট নতুন পরিভাষা সেদিকে তিনি عِنْدَنَا বা 'আমার মতে' বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

সারকথা হলো, 'হাসান' (حَسَنٌ) শব্দ যখন গরীব (غَرِيبٌ) বা সহীহ (صَحِيحٌ) -এর সাথে মিলে আসে, তখন সে হাসান দ্বারা উদ্দেশ্য হয় হাসান -এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। আর حَسَنٌ শব্দ যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার দ্বারা ইমাম তিরমিযী (র.) প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা উদ্দেশ্য হয়।

وَزِيَادَةُ رَاوِيَهُمَا أَيْ الْحَسَنَ وَالصَّحِيحَ مَقْبُولَةً مَا لَمْ تَقْعْ مُنَافِيَةً لِرَوَايَةِ مَنْ هُوَ أَوثَقُ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِنَّمَا أَنْ تَكُونَ لَا تَنَافِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَوَايَةٍ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا فَهَذِهِ تُقْبَلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَقِيلِ الَّذِي يَتَقَرَّدُ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يَرَوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ الْمَرْجُوحُ.

অনুবাদ : সহীহ ও হাসান স্তরের ব্যক্তির বর্ণনায় যদি কিছু বাড়তি অংশ থাকে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবার জন্য শর্ত হলো অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার সাথে এর বৈপরীত্য সৃষ্টি না হওয়া চাই। বাড়তি বিষয়টির সাথে যদি অন্যদের বর্ণনার বৈপরীত্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ধরে নেওয়া হবে যে, এটি একটি স্বতন্ত্র হাদীস, যা নির্ভরযোগ্য রাবী তার শাযখ থেকে একাকী বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ সেটি বর্ণনা করেননি। আর যদি দুটি বর্ণনার মাঝে এরূপ বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় যে, একটি মেনে নিলে অপরটি প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য হয়, তাহলে যে কেনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। সে মতে অগ্রাধিকার প্রদত্ত হাদীসটিকে গ্রহণ এবং অপরটিকে পরিহার করা জরুরি হয়ে পড়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

‘রাবীর বৃদ্ধি’ -এর মর্মার্থ ও তার পদ্ধতি : একই হাদীস বর্ণনায় কোনো রাবীর সনদ অথবা মতনে যদি কিছু অংশ বৃদ্ধি পায় বা বাড়তি থাকে, তাহলে পরিভাষায় তাকে ‘যিয়াদাতে রাবী’ বা রাবীর বৃদ্ধি বলে। এর কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা—

১. যা ‘সিফ’ রাবী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করা। এমতাবস্থায় যা ‘সিফ’ রাবীর রেওয়ায়েত বর্জিত হবে এবং নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েত মাকবুল হবে।
২. নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক তার মতো নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করা।
৩. সহীহ বা হাসান রাবীর বৃদ্ধি অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করা। এই দু প্রকারের হুকুম নিম্নে বর্ণিত হলো।

নির্ভরযোগ্য রাবীর বৃদ্ধির হুকুম : হাসান অথবা সহীহ হাদীসের রাবী অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী যদি তার অধিক কিংবা সমপর্যায়ের নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ কিছু বাড়তি অংশ বর্ণনা করে, তাহলে এ বাড়তি অংশের হুকুমের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। যথা—

১. জুমহরের মতে এর হুকুম কিছুটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর তা হলো, এ রকম বৃদ্ধির তিনটি ধরন হতে পারে। যথা—
- ক. নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতমুখী হবে না।
- খ. অথবা, বিপরীতমুখী হবে।
- গ. দুটির অর্থের মধ্যে সামান্য ব্যবধান হবে।

নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতটি যদি অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতের বিপরীতমুখী না হয় এভাবে যে, উভয় হাদীসের উপর আমল করা যায়, তাহলে এ ধরনের 'বৃদ্ধি অংশ' গৃহীত হবে। কারণ, এ বৃদ্ধিটা তখন স্বতন্ত্র একটি হাদীস বলে বিবেচিত হবে, যা সে রাবী তার শায়খ থেকে একা শুনে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং যেমনিভাবে তার স্বতন্ত্র হাদীস মাকবুল হয় তেমনি বৃদ্ধি অংশও মাকবুল হবে।

নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ :

إِنَّ رَجُلًا تَوَلَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْعُ وَارِثًا إِلَّا قَوْلِي مَرَّ عَتَقَهُ فَقَالَ هَلْ لَهُ أَحَدٌ ؟ قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامٌ اَعْتَقَهُ فَبَعَلَهُ بِمِثْرَانِهِ لَهُ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করে। একজন আজাদকৃত গোলাম ছাড়া লোকটির আর কোনো ওয়ারিস ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীদেরকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তার কোনো ওয়ারিস আছে? জবাবে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না; তবে একজন আজাদকৃত গোলাম আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ গোলামকে (ডেকে) মৃত লোকটির পরিত্যক্ত সম্পদ দিয়ে দেন।

এ হাদীসটি ইবনে উয়াইনা এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ উভয়ে রেওয়ায়েত করেন। তবে ইবনে উয়াইনা মুত্তাসিলভাবে আর হাম্মাদ মুরসালভাবে। (এখানে ইবনে উয়াইনা সনদ বেশি উল্লেখ করে হাম্মাদ থেকে বৃদ্ধি করেছেন।) সুতরাং যদিও ইবনে উয়াইনা নির্ভরযোগ্য (ثِقَّةٌ) এবং হাম্মাদ অধিক নির্ভরযোগ্য (أَوْثَقُ), কিন্তু উভয়ের রেওয়ায়েত মাকবুল। কারণ, উভয়ের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্য বা বিরোধ নেই। আর দ্বিতীয় ধরনটি অর্থাৎ ছিকাহ রাবীর বর্ণিত অংশটি যদি অَوْثَقُ রাবীর বিপরীত এভাবে হয় যে, একটির উপর আমল করলে অন্যটির উপর আমল করা সম্ভব হয় না, তাহলে তখন প্রাধান্যের পস্থা অবলম্বন করতে হবে। আর এই প্রাধান্য দেওয়া যায় বিভিন্ন দিক বিচারে। যেমন- ১. রাবীর ফকীহ হওয়া, ২. সনদ عَالِي হওয়া, ৩. এমন কিতাবের হাদীস হওয়া, যা সাধারণভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। যথা- বুখারী ও মুসলিম। ৪. রাবী আয়ত্তশক্তির অধিকারী হওয়া, ৫. বেশি নির্ভরযোগ্য হওয়া ইত্যাদি। এ সকল দিক বিবেচনায় তখন অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস প্রাধান্য পাবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে।

এর উদাহরণ ইমাম তিরমিযী (র.) কর্তৃক বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস-
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْعِمَامُ

অর্থাৎ কবরস্থান এবং স্নানাগার ছাড়া পৃথিবীর সকল স্থানে নামাজ পড়া যায়।

এ হাদীসটি - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - সনদে হাম্মাদ বিন সালামা রেওয়ায়েত করেছেন। আর সুফিয়ান ছাওরী - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ - সনদে বর্ণনা করেছেন। এখানে হাম্মাদের রেওয়ায়েত "আবু সাঈদ" বর্ণিত অংশ, কিন্তু ছাওরী যেহেতু হাম্মাদ থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য, তাই প্রাধান্যের ভিত্তিতে ছাওরীর রেওয়ায়েত মাকবুল হবে।

আর তৃতীয় ধরন অর্থাৎ ছিকাহ রাবীর হাদীস ও অَوْثَقُ রাবীর হাদীসের মধ্যে সামান্য ব্যবধান এভাবে হবে যে, একজনের রেওয়ায়েত عَامٌ আর অপরজনেরটা خَاصٌ, তাহলে এমতাবস্থায় ছিকাহ রাবীর বর্ণিত অংশটি জুমহরের মতে মাকবুল হবে। অবশ্য সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর মতে এ জাতীয় বর্ণিত অংশ মাকবুল হবে না।

وَاشْتَهَرَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلَ بِقَبُولِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ
تَفْصِيلٍ وَلَا يَتَأْتِي ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي
الصَّحِيحِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاذًا ثُمَّ يَفْسِرُونَ الشُّذُوزَ بِمُخَالَفَةِ التَّقَةِ مَنْ هُوَ
أَوْثَقُ مِنْهُ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِاشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ
الشُّذُوزِ فِي حَدِّ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ
الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى الْقَطَّانِ وَاحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَعَلِيَّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيَّ وَأَبْنَى زُرْعَةَ وَأَبْنَى
حَاتِمٍ وَالتَّسَائِيَّ وَالْدَّارَقُطْنِيَّ وَغَيْرِهِمْ إِعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ
بِالزِّيَادَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِطْلَاقَ قَبُولِ الزِّيَادَةِ.

অনুবাদ : একদল মনীষী সম্পর্কে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, তারা কোনোরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াই বাড়তি অংশগ্রহণ করার পক্ষপাতী। যেসব মুহাদ্দিস সহীহ হাদীসের জন্য 'শায' না হওয়ার শর্ত প্রয়োগ করেন এবং এর অর্থ করেছেন— 'অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর খেলাপ না হওয়া' তাদের মূলনীতির সাথে এ নিয়ম খাপ খায় না। সহীহ ও হাসান হাদীসের সংজ্ঞায় 'শায' না হওয়ার শর্ত স্বীকার করেও যারা এ ব্যাপারে উদাসীন তাদের প্রতি অবাক লাগে। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, আবু যুরআ রাযী, আবু হাতিম, ইমাম নাসায়ী, ইমাম দারাকুতনী (র.) প্রমুখ ইমামুল হাদীসের অভিমত হলো, বাড়তি বিষয় সংযোজিত হাদীস ও অপর হাদীসের মধ্যে যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। নির্বিচারে বাড়তি অংশগ্রহণ করার কথা তাদের কেউই বলেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- জুমহুরের মতে নির্ভরযোগ্য রাবীর বৃদ্ধির হুকুম ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হলেও একদল ওলামা থেকে বর্ণিত আছে যে, নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবুল। তবে এ ব্যাপারে জুমহুরের অভিমতই সঠিক এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এর কারণ বা দলিল দুটি। যথা—
- দ্বিতীয় অভিমতটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমতের সাথে খাপ খায় না অর্থাৎ তাদের অবস্থানের বিরোধী। কারণ, তারা হাদীস সহীহ বা হাসান হওয়ার জন্য শায না হওয়া অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীর তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা না করার শর্তারোপ করেন। যার ফলে নির্ভরযোগ্য রাবী যদি তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করে বাড়তি অংশ বর্ণনা করে, তাহলে সে হাদীস হাসান বা সহীহ থাকবে না। আর যখন হাদীসটি সহীহ বা হাসান থাকল না, তখন তা নির্বিচারে মাকবুল হবে কিভাবে? এজন্য বড়ই বিস্তৃত হতে হয় তাদের উক্তির প্রতি, যারা কোনো হাদীস সহীহ হওয়া

জন্য শায় না হওয়ার শর্ত করেন. আর পরক্ষণেই বলেন যে, নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবুল। কারণ, এটা যে স্ববিরোধী উক্তি তা বলাই বাহুল্য।

২. আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, ইয়াহইয়া কাতান, আহমদ ইবনে হাযল, ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন, আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, আবু যুরআ, আবু হাতিম, ইমাম নাসায়ী, দারাকুতনী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীনে কেয়াম হতে বর্ণিত আছে যে, বিরোধের সময় নির্ভরযোগ্যরাবী বর্ণনা নির্বিচারে মাকবুল হবে না; বরং তখন অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েত প্রাধান্য পাবে।
৩. নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবুল নয় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুহাদ্দিসীনে কেয়ামের নামের সঠিক উচ্চারণ ও ইস্তেকাল :

১. **الْمُهَدِّي** : মীম বর্ণে যবর। হা বর্ণে সাকিন। দাল বর্ণে যের। ইয়া বর্ণটি তাশদীদবিশিষ্ট। ইবনে মাহদীর ইস্তেকাল ১৯৭ হিজরি।
২. **قَطَّان** : ক্বাফ বর্ণে যবর। ত্বা বর্ণে তাশদীদ এবং যবর। ইয়াহইয়া আল-কাতানের ইস্তেকাল ১৯৮ হিজরি।
৩. **مَعِين** : মীম বর্ণে যবর। আইন বর্ণে যের। ইয়া বর্ণে সাকিন। ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিনের ইস্তেকাল ২৩৩ হিজরি।
৪. **حَنْبَل** : হা বর্ণে যবর। নূন বর্ণে সাকিন। 'বা' বর্ণে যবর। ইবনে হাযল (র.) -এর ইস্তেকাল ২৪১ হিজরি।
৫. **الْمُهَدِينِي** : মীম বর্ণে য়ড়বর। দাল বর্ণে যের। ইয়া বর্ণে সাকিন। বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী মাদীনা মুনাওয়ারার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। ইবনে মাদীনীর ইস্তেকাল ২৩৩ বা ২৩৪ হিজরি।
৬. **الْبَخَارِيُّ** : 'বা' বর্ণে পেশ। 'খ' বর্ণে যবর। 'র' বর্ণে যের। ইয়া বর্ণটি তাশদীদযুক্ত। ইমাম বুখারীর ইস্তেকাল ২৫৬ হিজরি।
৭. **أَبُو زُرْعَةَ** : 'যা' বর্ণে পেশ। 'র' বর্ণে সাকিন। আইন বর্ণে যবর। আবু যুরআর ইস্তেকাল ২৭৩ বা ২৭৪ হিজরি।
৮. **أَبِي حَاتِم** : 'হা' বর্ণে যবর। 'তা' বর্ণে যের।
৯. **نَسَائِي** : নূন বর্ণে যবর। সীন বর্ণে যবর। খোরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহরের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। ইমাম নাসায়ীর ইস্তেকাল ৩০৩ হিজরি।
১০. **الدَّارَقُطْنِي** : এটি একটি একক শব্দ। বাগদাদের একটি মহল্লার নাম দারাকুতন। দাল বর্ণে যবর। 'র' বর্ণে যবর। ক্বাফ বর্ণে পেশ। ত্বা বর্ণে সাকিন। নূন বর্ণে যের। ইমাম দারাকুতনীর ইস্তেকাল ৩৪৮ হিজরি।

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ إِطْلَاقُ كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْقَوْلَ يَقْبُولُ زِيَادَةَ التَّحْقِيقِ مَعَ أَنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُغْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّأْيِ فِي الضَّبْطِ مَا نَصَّه وَيَكُونُ إِذَا شَرِكَ أَحَدًا مِنَ الْحَفَاطِ لَمْ يُخَالِفْ فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صَحَّةٍ مَخْرَجَ حَدِيثِهِ وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ إِنْتَهَى كَلَامُهُ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَزِيدَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْعَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَقْبَلُ مِنَ الْحَافِظِ فَإِنَّهُ إِعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمَخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثٍ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْحَفَاطِ .

অনুবাদ : শাফেয়ী মতাবলম্বী অনেকের নির্বিচারে বাড়তি অংশ গ্রহণযোগ্য বলটা এর থেকে আরো বিশ্বাস্যকর। অথচ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভাষ্য এর বিপরীত বুঝায়। কেননা, তিনি “আয়ত্ত্বশক্তির দিক দিয়ে রাবীর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি” প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই বলেন যে, “তিনি এমন হবেন যে, হাফিজুল হাদীসগণের কারো সাথে একযোগে হাদীস বর্ণনা করলে তিনি তার খেলাপ (গড়মিল) করবেন না। যদি পার্থক্য করেন আর তার হাদীসটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, হাদীসটির উৎস সঠিক। আর যদি তিনি উল্লিখিত সিফাতের খেলাপ করেন (অর্থাৎ তার হাদীসটি বড় হয়,) তাহলে এ খেলাপ করাটা তার হাদীসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।” ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, হাফিজুল হাদীস-এর বর্ণনার সাথে গড়মিল (খেলাপ) বর্ণনাটি বড় হলে তা উক্ত বর্ণনাকারীর জন্য ক্ষতির কারণ হবে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যে কোনো আদিল ব্যক্তির বাড়তি বর্ণনা নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং হাফিজুল হাদীস-এর বর্ণনায় বাড়তি অংশ থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তিনি গড়মিল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাফিজুল হাদীসের বর্ণনার চেয়ে সেটির ছোট হওয়ার দিক বিবেচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শাফেয়ী মতাবলম্বী যে সকল ওলামায়ে কেরাম নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশকে নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য বলেছেন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নিজে শাফেয়ী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বে তাদের প্রতি একরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদের এহেন কথায় বিশ্বয়াবিস্ট হয়ে বলেন, তাদের এ উক্তি খোদ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সুস্পষ্ট ভাষ্যের পরিণতি। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, “যদি নির্ভরযোগ্য রাবী হাফিজে হাদীস তথা তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য (أَوْثَقُ) রাবী-এর সাথে হাদীস বর্ণনায় গড়মিল করে আর নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীসের শব্দ কম হয়, তাহলে এই কম হওয়াটাই তার হাদীস বিতৃষ্ণ হওয়ার উপর বড় প্রমাণ। আর যদি সে কম বর্ণনা না করে; বরং অন্যভাবে বর্ণনা করে হাফিজুল হাদীস রাবীর সাথে গড়মিল করে, তাহলে এই গড়মিল করাটা তার হাদীসের জন্য ক্ষতিকর হবে।”

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যখন নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবী হতে হাদীসের কম অংশ বর্ণনা না করে; বরং অন্যভাবে যেমন বৃদ্ধি ইত্যাদি করে তার বিরোধিতা করে, তাহলে এটা ক্ষতিকর হবে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য রাবীর যে কোনো বাড়তি অংশই যদি গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) বৃদ্ধি করে বর্ণনা করাকে কেন ক্ষতিকর বললেন? বরং তিনি ক্ষতিকর না বলে উপকারী বলতেন। তাই প্রমাণ হলো, শাফেয়ী মতাবলম্বীদের যারা নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবুল দাবি করেন তাদের দাবি সঠিক নয়।

وَجَعَلَ نَقْصَانَ هَذَا الرَّاَوِيَّ مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صَحِّهِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَعْرِيفِهِ وَجَعَلَ نَقْصَانَ هَذَا الرَّاَوِيَّ مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صَحِّهِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَعْرِيفِهِ وَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ مُضَرًّا بِحَدِيثِهِ فَدَخَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةٌ مُطْلَقًا لَمْ تَكُنْ مُضَرَّةً بِحَدِيثِ صَاحِبِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحٍ مِنْهُ لِمَزِيدٍ ضَبْطٌ أَوْ كَثْرَةُ عَدَدٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحاتِ فَالْأَرْجَحُ يَقَالُ لَهُ الْمَحْفُوظُ وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ يَقَالُ لَهُ الشَّاذُّ ، مِثْلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا تَوَفَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْعُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَى هُوَ اعْتَقَهُ الْحَدِيثُ وَتَابَعَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى وَحْدِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْمَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ انْتَهَى كَلَامُهُ فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَمَعَ ذَلِكَ رَجَعَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةً مِنْهُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ وَعَرَفَ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الْإِصْطِلَاحِ .

অনুবাদ : ছোট হওয়াকেই তিনি হাদীসটির বিশ্বস্ততার প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে এ থেকে বর্ণনাকারীর অনুসন্ধিৎসু ও সাবধানী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট হওয়ার ব্যতিক্রমকে তিনি ক্ষতিকর বিবেচনা করেছেন। এতে বাড়তিও शामिल। সুতরাং তিনি যদি নির্বিচারে বাড়তি অংশ গ্রহণ করার পক্ষপাতী হতেন, তাহলে এটিকে (বড় হওয়াকে) ক্ষতিকর সাব্যস্ত করতেন না। (একই জাতীয়) দুটি হাদীসের মধ্যে (শাদ্দিক কমবেশি হওয়ার মাধ্যমে) গড়মিল দেখা গেলে বর্ণনাকারীর আয়ত্তশক্তি, সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি দিক দিয়ে যেটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়, তার নাম হয় মাহফূয এবং অপরটিকে শায বলে। এর উদাহরণ ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম নাসায়ী (র.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস, যা ইবনে উয়াইনা আমর ইবনে দীনার হতে, তিনি আওসাজা হতে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু সে একজন আজাদকৃত গোলাম ছাড়া কোনো ওয়ারিশ রেখে যায়নি...। ইবনে উয়াইনার মতোই এটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন ইবনে জুরাইজ প্রমুখ। আর অন্যরূপ বর্ণনা করেছেন হাশ্বাদ ইবনে য়ায়েদ। তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি আওসাজা থেকে এটি বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম আবু হাতিম (র.) বলেন, ইবনে উয়াইনার হাদীসটিই 'মাহফূয'।

উল্লেখ্য, হাশ্বাদ ইবনে য়ায়েদ আদিল ও আয়ত্তশক্তির পূর্ণ মাত্রার অধিকারী। তা সত্ত্বেও ইমাম আবু হাতিম (র.) এমন একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক।

এ আলোচনা থেকেই শায় -এর সংজ্ঞাও পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনার সাথে গড়মিল হয়, তাহলে সেটিকে বলা হয় শায়। এটিই পরিভাষার দিক দিয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবীর গড়মিলের বর্ণনা ও তার প্রকারভেদ : একই হাদীস রেওয়ায়েত করতে গিয়ে যদি কোনো রাবী অপর রাবী হতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করে, তাহলে তাকে রাবীর বিরোধিতা বা মুখালাফাতে রাবী বলে। মুখালাফাতে রাবী (রাবীর গড়মিল) এবং যিয়াদাতে রাবী (রাবীর বর্ধিত করা) -এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মুখালাফাতটা যিয়াদাত হতে আম বা ব্যাপক। মুখালাফতটাই হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদিভাবে হতে পারে, কিন্তু যিয়াদাতটা শুধু সনদ বা মতনে বৃদ্ধির মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

মুখালাফাতে রাবী ৪ প্রকার। যথা-

১. সনদের মধ্যে বৃদ্ধি। ২. মতনের মধ্যে বৃদ্ধি। ৩. সনদের মধ্যে হ্রাস। ৪. মতনের মধ্যে হ্রাস।

যে রাবী মুখালাফাত বা গড়মিল করেন, তা দু ধরনে হতে পারে।

১. নিজে নির্ভরযোগ্য হয়ে তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করবে।

২. দুর্বল রাবী নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করবে।

এদের মধ্যে প্রথম ধরনের আলোচনা সম্মানিত লেখক শায় এবং মাহফূয-এর মধ্যে আর দ্বিতীয় ধরনের আলোচনা মা'রুফ এবং মুনকার-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

'মাহফূয' -এর আভিধানিক অর্থ : **مَحْفُوظٌ** শব্দটি **الْعَفَاطَةُ** ক্রিয়ামূল হতে **اسْمٌ مَّفْعُولٌ** -এর সীগাহ। অর্থ- সংরক্ষিত।

মাহফূয -এর পারিভাষিক অর্থ : নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে যদি এমন রাবীর সাথে বিরোধিতা কিংবা গড়মিল করে যিনি আয়ত্তশক্তি, অধিক সনদ, ফিক্হ, **سَنَدٌ عَالِي** ইত্যাদি কোনো কারণে উক্ত রাবী হতে অগ্রাধিকার রাখে, তাহলে অগ্রাধিকারীর হাদীসকে উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় মাহফূয বলে।

আরবিতে **الْمَحْفُوظُ** -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- **رَوَاهُ الْيَقَّةُ** অর্থাৎ ছিকাহ রাবী কিংবা **وَقْفٌ** রাবীর রেওয়ায়েত, যা অপর কোনো ছিকাহ রাবীর রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়, তাকে **الْمَحْفُوظُ** বলে।

মাহফূয -এর নামকরণ : যেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, এমন হাদীস ভুল ও বিভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত থাকে, তাই তাকে মাহফূয (সংরক্ষিত) করে নাম রাখা হয়েছে।

শায় -এর আভিধানিক অর্থ : **شَاوٌ** শব্দটি **شَاوٌ** হতে **اسْمٌ فَاعِلٌ** -এর সীগাহ। অভিধানে **شَاوٌ** অর্থ- একাকী হওয়া, নিঃসঙ্গ।

শায়-এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় **شَاوٌ** -এর সংজ্ঞায় কয়েকটি উক্তি উল্লিখিত হয়েছে। যথা-

১. ইমাম শাফে'রী, আহলে হিজাব এবং জুমহুরের অভিমত : সংখ্যাগরিষ্ঠ এ ওলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, **يَقَّةٌ** রাবী যদি **وَقْفٌ** রাবীর **مَخَالَفَتٌ** করে, তাহলে **يَقَّةٌ** রাবীর হাদীসকে শায় বলে।

২. ইমাম খালীলির অভিমত : তার মতে শায় প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার রাবী একজন হয়। চাই সে নির্ভরযোগ্য হোক বা অনির্ভরযোগ্য, অপর রাবীর **مَخَالَفَتٌ** করুক বা না করুক। অবশ্য রাবী অনির্ভরযোগ্য হলে তার হাদীস বর্জিত হবে। আর রাবী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার হাদীস মাওকূফ (স্থগিত) হবে, দলিল ও আমলযোগ্য হবে না।

৩. হাকিমের অভিমত : তাঁর মতে শায় প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যা নির্ভরযোগ্য রাবী একাকী বর্ণনা করেন এবং তার কোনো মুতাবি (সহায়ক) না থাকে। চাই কারো **مُخَالَفَتْ** করুক বা না করুক।

৪. আরেকটি সংজ্ঞা : লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) 'মারদুদের প্রকারে' শায়-এর আরেক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তা হলো, যে রাবীর স্বরণশক্তি লোপ পাওয়াটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে তার হাদীসকে শায় বলে।

নির্ভরযোগ্য ও সঠিক অভিমত : **شَاؤُ** -এর উপরিউক্ত চার প্রকার সংজ্ঞার মধ্যে লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) -এর মতে জুমহরের অভিমতটিই সর্বোচ্চ সঠিক এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা, এ সংজ্ঞার মধ্যে দুটি শর্ত রয়েছে। ১. **ثِقَةً** রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া ও ২. **أَوْثَقُ** রাবী-এর **مُخَالَفَتْ** করা। জুমহরের এ সংজ্ঞাটিই যে অধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়, তার প্রতি সম্মানিত লেখক-
هُوَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الثَّقَةُ مُخَالَفًا لِمَا رَوَاهُ الثَّقَاتُ أَوْ الْأَوْثَقُ বলে ইঙ্গিত করেছেন।

আরবিতে **الشَّاذُّ** -এর সংজ্ঞা হলো- **الشَّاذُّ** -এর অর্থঃ ছিকাহ রাবীর হাদীস যদি অপর ছিকাহ (**ثِقَةً**) বা **أَوْثَقُ** রাবীর রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়, তাহলে তাকে **الشَّاذُّ** বলে।

শায়-এর নামকরণ : শায় হাদীসের রাবী যেহেতু বাড়তি অংশ বর্ণনায় অন্যান্য রাবী হতে একাকী হয়ে যায়, তাই তাকে **شَاؤُ** (একাকী) বলে।

শায় ও মাহফূয -এর উদাহরণ : এক রেওয়ায়েতে এসেছে-

إِنَّ رَجُلًا تَوَقَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدْعُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَهُ أَحَدٌ ؟ قَالُوا إِلَّا غُلَامٌ أَعْتَقَهُ فَعَمَلَهُ مِثْرَاهُ لَكَ .

এ হাদীস যেমনি মাহফূয-এর উদাহরণ তেমনি শায় -এরও উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম নাসায়ী (র.) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) এ হাদীসটি **عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ** হাদীসটি **عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ** -এর উল্লেখ করেছে। হাম্বাদ ইবনে যায়েদও এ হাদীসটি **عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ النَّبِيِّ** সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ নেই। সুতরাং এ হাদীসের বর্ণনাকারী দুজন হলেন। ১. ইবনে উয়াইনা এবং ২. হাম্বাদ ইবনে যায়েদ। ইবনে উয়াইনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করে হাদীসটি মুত্তাসিলভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। আর হাম্বাদ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বাদ দিয়ে হাদীসটি মুরসালভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। প্রসিদ্ধ হাফিজুল হাদীস আবু হাতিম (র.) বলেন, ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়েতটি মাহফূয। সুতরাং হাম্বাদ ইবনে যায়েদ আদিল এবং আয়ত্তশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আবু হাতিম ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়েতকে মাহফূয বলেছেন। কারণ, ইবনে উয়াইনার মতো ইবনে জুরাইজও হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে উল্লেখ করে মুত্তাসিলভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং রাবী বা সনদের আধিক্যের কারণে ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়েতটি প্রাধান্য পাবে এবং তা মাহফূয ও হাম্বাদ ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েতটি শায় হবে।

শায় -এর প্রকারভেদ : শায় মোট চার প্রকার। যথা-

১. অর্থাৎ সনদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শায় **۱. شُدُّوْذٌ بِزِيَادَةِ السَّنَدِ .**
২. অর্থাৎ মতন বৃদ্ধির মাধ্যমে শায় **۲. شُدُّوْذٌ بِزِيَادَةِ فِي الْمَتْنِ .**
৩. অর্থাৎ সনদ-হ্রাসের মাধ্যমে শায় **۳. شُدُّوْذٌ بِنَقْصِ فِي السَّنَدِ .**
৪. অর্থাৎ মতন-হ্রাসের মাধ্যমে শায় **۴. شُدُّوْذٌ بِنَقْصِ فِي الْمَتْنِ .**

শায়ের পূর্ববর্তী উদাহরণটি ছিল তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত। অর্থাৎ সেখানে সনদ-হ্রাসের মাধ্যমে শায় হয়েছে।

وَأَنَّ وَقَعَتِ الْمَخَالَفَةُ مَعَ الضَّعِيفِ فَالْزَّاجِحُ يَقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَمَقَابِلُهُ يَقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ مِثْلَهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ أَخُو حَمْرَةَ ابْنِ حَبِيبِ التَّيَّاتِ الْمُقَرِّي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَقَرَأَ الضَّعِيفُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرٌ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ وَعَرِفَ بِهِذَا أَنَّ بَيْنَ الشَّاذِ وَالْمُنْكَرِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهِ لَأَنَّ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعًا فِي إِشْتِرَاطِ الْمَخَالَفَةِ وَافْتِرَاقًا فِي أَنَّ الشَّاذَّ رَوَايَةٌ ثِقَّةٌ أَوْ صَدُوقٌ وَالْمُنْكَرُ رَوَايَةٌ ضَعِيفٌ وَقَدْ غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : যদি নির্ভরযোগ্য রাবীর গড়মিল হয় দুর্বল রাবীর সাথে, তাহলে যেটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতকে) তাকে বলে, মা'রুফ এবং অপরটিকে বলে মুনকার। এর উদাহরণ ইবনে আবু হাতিম (র.) কর্তৃক বর্ণিত ঐ হাদীস, যা তিনি হুবায়েব (হামযা ইবনে হাবীব-এর ভাই) ইবনে হাবীব যায়্যাত মুকরী থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আয়যার ইবনে হুরাইস থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করবে, রোজা রাখবে এবং মেহমানদারি করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু হাতিম বলেন, এটি মুনকার। কেননা, তিনি ব্যতীত অন্য নির্ভরযোগ্য রাবীগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এটি 'মাওকুফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সেটিই অর্থাৎ এ মাওকুফ রেওয়ায়েতটি মা'রুফ। এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শায় ও মুনকার-এর মধ্যে উম্ম খুসূস মিন ওয়াজহিন বা 'দ্বিপক্ষী' সাধারণ বিশেষ' সম্পর্ক বিদ্যমান। গড়মিল হবার শর্তের দিক দিয়ে দুটির মধ্যে মিল রয়েছে (অর্থাৎ শায় যেমন আরেকটির সাথে গড়মিল করার কারণে শায় হয়, তেমনি মুনকারও আরেকটির সাথে গড়মিল করার কারণে মুনকার হয়)। আবার দুটির মধ্যে এদিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে যে, শায় হলো নির্ভরযোগ্য বা সত্যবাদী রাবীর বর্ণনা, পক্ষান্তরে মুনকার হলো দুর্বল রাবীর বর্ণনা। এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করার কারণে অনেকে দুটিকে এক করে দেখেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মা'রুফ -এর আভিধানিক অর্থ : **إِسْمٌ مَعْرُوفٌ** -এর সীপাহ **عَرَفَ يَعْرِفُ** ফে'ল থেকে **مَعْرُوفٌ** -এর আভিধানিক অর্থ- প্রসিদ্ধ, পরিচিত ইত্যাদি।

মা'রুফ -এর পারিভাষিক অর্থ : দুর্বল রাবী যদি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করে, তাহলে নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীসকে মা'রুফ বলে।

আরবিতে **الْمَعْرُوفُ** -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَهُوَ الْخَيْرُ الَّذِي رَوَاهُ الثَّقَةُ مُتَابِعًا لِمَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ অর্থাৎ সিকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা মা'রুফ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়।

মা'রুফ -এর নামকরণ : হাদীসে মা'রুফ যেহেতু মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে মাশহূর ও প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তাই তাকে মা'রুফ বা প্রসিদ্ধ/পরিচিত বলে।

মুনকার-এর আভিধানিক অর্থ : **النُّكَارُ** শব্দটি **بَابُ إِنْفَعَالٍ** হতে **مَنْفَعُولٌ** -এর সীগাহ। এর অর্থ- অস্বীকৃত, অসমর্থিত, গর্হিত ইত্যাদি।

মুনকার-এর পারিভাষিক অর্থ : দুর্বল রাবী যদি নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করে, তাহলে দুর্বল রাবীর রেওয়ায়েতকে মুনকার বলে।

আরবিতে **النُّكَارُ**-এর সংজ্ঞা হলো- **أَرْتَأَى رَأَى النَّفْعَةِ** অর্থাৎ যা'সফ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা ছিকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মধ্যে মুনকার -এর আরেকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করে বলেছেন- **فَمَنْ تَعَبَّشَ غَلَطًا أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ أَوْ ظَهَرَ نِسْفُهُ فَعَدِيثُهُ مُنْكَرٌ**

অর্থাৎ হাদীসে মুনকার প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার রাবী অতিশীতায় ভুল, অত্যন্ত উদাসীন এবং ফিসক-এর দোষে দোষী। চাই তার রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতের খেলাপ হোক বা না হোক।

মুনকার -এর নামকরণ : যেহেতু মুনকার হাদীস কবুল করতে মুহাদ্দিসীনে কেলাম অস্বীকার করেছেন এবং এমন হাদীসের তারা সমর্থন করেন না, তাই তাকে মুনকার বলে।

মা'রুফ এবং মুনকার -এর উদাহরণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَحَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَكَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

এ হাদীসটি যেমনি মা'রুফ-এর উদাহরণ তেমনি মুনকার -এরও উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, এ হাদীসটি ইবনে আবু হাতিম **حَبِيبُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ** সূত্রে মারফু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেন, এটি মুনকার। কারণ, হুবায়েব ইবনে হাবীব ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীগণও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সেখানে **(ص) عَنْ النَّبِيِّ** নেই। সুতরাং দুর্বল রাবী হুবায়েব ইবনে হাবীব সনদের মধ্যে বৃদ্ধি (নবী করীম ﷺ -এর কথা) করে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা করেছেন। ফলে তার মারফু' রেওয়ায়েতটি মুনকার এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাওকুফ রেওয়ায়েতটি মা'রুফ হবে।

শায় এবং মুনকার-এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. **ইবনুস সালাহ** -এর অভিমত : বিশিষ্ট এ মুহাদ্দিস বলেন, মুনকার শায় -এরই অপর নাম এবং উভয় সমার্থবোধক। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এ অভিমতটি যে সঠিক নয় হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলে **فَدَغْفَلَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا** বলে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

২. **জুমহুরের অভিমত** : জুমহুরের মতে শায় ও মুনকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে **عُومٌ** **مُحْصَرٌ مِنْ وَجْهِ** -এর সম্পর্ক। তবে এটা মানতিকী পরিভাষা হিসেবে নয়; বরং আভিধানিক

অর্থের দৃষ্টিকোণ হতে মাত্র। আর তা হলো, উভয়টার মধ্যে **مُخَالَفٌ** -এর দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

এটাই হলো তাদের **عَامٌ** -এর দিক। আর তা হলো, শায় যেমন আরেকটির সাথে গড়মিল করার

কারণে শায় হয়, তেমনি মুনকারও আরেকটির সাথে গড়মিল করার কারণে মুনকার হয়। আর উভয়ের মধ্যে অমিল রয়েছে এদিক দিয়ে যে, শায় -এর রাবী **نَفْعٌ** বা নির্ভরযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে

মুনকার -এর রাবী **ضَعِيفٌ** বা দুর্বল হয়। এটা হলো তাদের **خَاصٌ** হওয়ার দিক অর্থাৎ শায়টা **نَفْعٌ**

রাবীর সাথে খাস আর মুনকার-টা **ضَعِيفٌ** রাবীর সাথে খাস।

শায় ও মুনকার -এর মধ্যে এ পার্থক্যটা বেশির ভাগ বিচারে। নতুবা কোনো কোনো সময় একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়।

মাহফূয ও মা'রুফ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে দুদিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। যথা-

১. মাহফূয -এর বিপরীতটা হয় শায় আর মা'রুফ -এর বিপরীতটা হয় মুনকার।

২. মাহফূয রাবীর বিপরীত রাবী শক্তিশালী হয়। আর মা'রুফ রাবীর বিপরীত রাবী হয় দুর্বল।

حَبِيبُ بْنُ حَبِيبٍ : এখানে প্রথম নামটির সঠিক উচ্চারণ হুবায়েব। আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ হাবীব হুবায়েব হলেন হামযার ভাই।

وَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْفَرْدِ التَّسْبِيءِ إِنْ وُجِدَ بَعْدَ ظَنِّ كَوْنِهِ فَرْدًا قَدْ وَاقَعَهُ
غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ بِكُسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَالْمُتَابَعَةُ عَلَى مَرَاتِبٍ إِنْ حَصَلَتْ
لِلرَّأْيِ نَفْسَهُ فَهِيَ الثَّامَّةُ وَإِنْ حَصَلَتْ لِشَيْخِهِ فَكُنْ قَرْفَهُ فَهِيَ
الْقَاصِرَةُ وَتُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ .

অনুবাদ : কোনো ফরদে নিসবী হাদীস সম্পর্কে প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, সেটি ফরদ বা একক সনদবিশিষ্ট। পরে তার সমার্থক একটি হাদীস পাওয়া গেল। এই পরবর্তী হাদীসটিকে বলা হয় মুতাবি'। মুতাবা'আতের কয়েকটি স্তর রয়েছে। যদি খোদ রাবীর ক্ষেত্রে এটা অর্জিত হয়, তাহলে তার নাম পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত। আর যদি তার শায়খ কিংবা আরো উপরের ব্যক্তির ক্ষেত্রে অর্জিত হয়, তাহলে তার নাম অসম্পূর্ণ মুতাবা'আত। যে কোনো ধরনের হোক না কেন, মুতাবা'আত দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুতাবা'আতের আলোচনায় কয়েকটি দিক প্রণিধানযোগ্য। ১. মুতাবে', মুতাবা' এবং মুতাবা'আতের অর্থ। ২. মুতাবা'আতের স্তর। ৩. মুতাবা'আতের উদাহরণ। ৪. মুতাবা'আতের শর্ত। ৫. মুতাবা'আতের হুকুম। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এগুলোর আলোচনা পেশ করা হলো—
মুতাবি', মুতাবা' এবং মুতাবা'আত-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে মুতাবা'আত অর্থ—সমর্থন করা। মুতাবি' অর্থ-সমর্থনকারী। মুতাবা' অর্থ—সমর্থনপুষ্ট।

মুতাবি', মুতাবা' এবং মুতাবা'আত -এর পারিভাষিক অর্থ : যে ফরদে নিসবী হাদীসকে প্রথমে ফরদ তথা একক রাবীবিশিষ্ট মনে করা হয়েছিল। এরপর অনুসন্ধান করে এমন এক ব্যক্তি পাওয়া গেল যিনি এ একক মনে করা রাবীর সমার্থক হাদীস রেওয়াজেত করেন, তাহলে এই খুঁজে পাওয়া ব্যক্তিকে বলে মুতাবি' (সমর্থনকারী) আর পূর্বের রাবীকে বলে মুতাবা' (সমর্থনপুষ্ট) আর এভাবে হাদীস বর্ণনা করাকে বলে মুতাবা'আত।

আরবিতে اَلْعِدِيْتُ الْمُتَابِعُ -এর সংজ্ঞা হলো—

هُوَ الْعِدِيْتُ الْمُشَارِكُ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ فَرْدٌ لَفْظًا وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى فَقَطَّ مَعَ الْإِتِّعَادِ فِي الصَّحَابَةِ
অর্থাৎ যে হাদীসের রাবীকে মুহাদ্দিসগণ مُتَّفَرِّدٌ ধারণা করেছেন, لَفْظًا অথবা مَعْنًى সেই হাদীসের অনুরূপ কোনো হাদীস যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তাকে اَلْعِدِيْتُ الْمُتَابِعُ বলে। তবে শর্ত হলো উভয় হাদীসের সর্বশেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হতে হবে।

মুতাবা'আতের স্তর : মুতাবা'আত দু প্রকার। ১. ثَامَّةٌ বা পূর্ণাঙ্গ। ২. قَاصِرَةٌ বা অসম্পূর্ণ। নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেওয়া হলো—

১. مُتَابِعَةٌ ثَامَّةٌ -এর সংজ্ঞা : যদি মুতাবা'আত বা সমর্থনটা খোদ রাবীর (মুসান্নিফের) ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তাকে مُتَابِعَةٌ ثَامَّةٌ বা পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত বলে।

২. مُتَابِعَةٌ قَاصِرَةٌ -এর সংজ্ঞা : যদি মুতাবা'আত বা সমর্থনটা রাবীর শায়খ বা তারও উপরের কোনো রাবীর ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তাকে مُتَابِعَةٌ قَاصِرَةٌ বা অসম্পূর্ণ মুতাবা'আত বলে। এর অপর নাম مُتَابِعَةٌ نَاقِصَةٌ।

مِثَالِ الْمُتَابَعَةِ التَّامَّةِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى
تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
ثَلَاثِينَ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ ظَنُّ قَوْمٍ أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ
مَالِكٍ فَعَدَّوهُ فِي غَرَائِبِهِ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ لَكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعًا وَهُوَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ وَهَذِهِ
مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ وَوَجَدْنَا لَهُ أَيْضًا مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِي صَحِيحِ ابْنِ حُرَيْمَةَ
مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَفْظِ "فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ" وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ
مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ فَأَقْدِرُوا
ثَلَاثِينَ وَلَا اقْتِصَارَ فِي هَذِهِ الْمُتَابَعَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ تَامَّةً أَوْ قَاصِرَةً عَلَى
الْلَفْظِ بَلْ لَوْ جَاءَتْ بِالْمَعْنَى لَكُنْ لَكِنَّا مُخْتَصَّةٌ بِكُونِهَا مِنْ رِوَايَةِ
ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ .

অনুবাদ : পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আতের উদাহরণ- কিতাবুল উম্ম-এ ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম মালিক (র.) থেকে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন- "মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। অতএব তোমরা চাঁদ না দেখে রোজা রাখবে না, তা না দেখে রোজা ছাড়বেও না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তোমরা ত্রিশদিনের মেয়াদ পূর্ণ করবে।"

হাদীসটি সম্পর্কে অনেকে মনে করেন, ইমাম মালিক (র.) থেকে এ শব্দে একমাত্র ইমাম শাফেয়ী (র.)-ই বর্ণনা করেছেন। তাই তারা এটিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত গরীব হাদীস বলে গণ্য করেন। কেননা, ইমাম মালিক (র.)-এর অন্য ছাত্ররা এটিকে এভাবে বর্ণনা করেন- 'যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তোমরা পরিমাণ রক্ষা করবে।' কিন্তু, আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর একজন মুতাবে'-এর সন্ধান পেলাম। তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা কা'নাবী ইমাম বুখারী (র.) তার বরাত দিয়ে ইমাম মালিক (র.) থেকে এরূপই সংকলন করেছেন। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত।

আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি অসম্পূর্ণ মুতাবা'আতও পাই। সহীহ ইবনে খুযায়মাতে আসিম ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা মুহাম্মদ ইবনে যায়দ থেকে তিনি দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তাহলে তোমরা ত্রিশদিন পূর্ণ করবে।' তা ছাড়া মুসলিম শরীফে উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর নাফে থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'তাহলে তোমরা ত্রিশ দিনের পরিমাণ রক্ষা করবে।'

মুতাবা'আত পূর্ণাঙ্গ কিংবা অসম্পূর্ণ কোনো ক্ষেত্রেই একই শব্দে হবার শর্ত নেই; বরং অর্থের দিক দিয়ে মিল থাকলেই যথেষ্ট হবে। তবে শর্ত হলো একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَابَعَةٌ -এর উদাহরণ : এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَانْكُمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ .

এ হাদীসটি مُتَابَعَةٌ -এর উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর 'উম্ম' নামক কিতাবে عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। একদল মুহাদ্দিস (যাদের মধ্যে ইমাম বায়হাকীর নাম উল্লেখযোগ্য) ধারণা করেছিলেন যে, ইমাম মালিক (র.) হতে হাদীসটি فَانْكُمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ শব্দে কেবলমাত্র ইমাম শাফেয়ী (র.) রেওয়ায়েত করেন। এ ধারণার ভিত্তিতে তারা এ হাদীসকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর গরীব শ্রেণির হাদীস বলে গণ্য করেন। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.) ছাড়া ইমাম মালিক (র.)-এর অন্যান্য ছাত্রগণ এ সনদেই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু তাদের হাদীসে শব্দ এসেছে- فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَانْكُمِلُوا لَهُ -পরে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর مُتَابِعٌ তথা সমর্থনকারী বিদ্যমান। আর তিনি হলেন ইমাম কানাবী (র.)। ইমাম বুখারী (র.) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ সূত্রে একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, যার শব্দ হচ্ছে- فَانْكُمِلُوا الْعِدَّةَ -সুতরাং এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা কানাবী (র.) খোদ রাবী তথা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর مُتَابَعَةٌ এভাবে করেছেন যে, উভয়ে ইমাম মালিক (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। অতএব, এটা مُتَابَعَةٌ হলো।

مُتَابَعَةٌ -এর উদাহরণ : আলোচ্য হাদীসটি مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ -এরও উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, সহীহ ইবনে খুযায়মা গ্রন্থে এ হাদীসটি عَنْ عَاصِمِ بْنِ مَعْمَدٍ عَنْ أَبِيهِ مَعْمَدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের শব্দ এসেছে- فَنَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ -অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَدٍ عَنْ أَبِيهِ مَعْمَدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের শব্দ এসেছে- فَانْكُمِلُوا ثَلَاثِينَ -সুতরাং সহীহ ইবনে খুযায়মার সনদে মুহাম্মদ এবং মুসলিমের সনদে নাফে (র.) 'ইবনে দীনার'-এর مُتَابَعَةٌ করেছেন। আর ইবনে দীনার হলেন খোদ রাবী তথা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শায়খের শায়খ। অতএব এটা مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ হলো। অবশ্য فَنَكْمِلُوا -এর স্থলে فَانْكُمِلُوا এবং فَانْكُمِلُوا শব্দ এসেছে। শব্দের এ পার্থক্য বা ভিন্নতা مُتَابَعَةٌ-এর জন্য অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক নয়।

উল্লিখিত উদাহরণসমূহের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ, মুহাম্মদ এবং নাফে' হলেন مُتَابِعٌ তথা সমর্থক। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে দীনার হলেন مُتَابِعٌ বা সমর্থনপুষ্ট।

مُتَابِعَةٌ -এর মতো مُتَابِعٌ ও দু প্রকার। ১. مُتَابِعٌ تَامٌ ও مُتَابِعٌ نَاقِضٌ উল্লিখিত উদাহরণে ইবনে মাসলামাহ হলেন مُتَابِعٌ تَامٌ আর মুহাম্মদ ও নাফে' হলেন مُتَابِعٌ نَاقِضٌ।

مُتَابِعَةٌ -এর শর্ত: যে কোনো مُتَابِعَةٌ (চাই تَامَةٌ হোক কিংবা نَاقِضَةٌ) -এর জন্য হুবহু শাব্দিকভাবে مُتَابِعَةٌ টা জরুরি নয়; বরং مُتَابِعَةٌ -এর জন্য দুটি শর্ত অনিবার্য। যথা-

১. উভয় রেওয়াজেত অর্থ ও উদ্দেশ্য এক হওয়া। সুতরাং যদি শব্দ এবং মূলধাতু ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। مُتَابِعَةٌ نَاقِضَةٌ -এ বর্ণিত উদাহরণটি এর উজ্জ্বল নজির।

২. مُتَابِعٌ (সমর্থক) এবং مُتَابِعٌ (সমর্থনপুষ্ট) উভয় রেওয়াজেত একই সাহাবী থেকে হতে হবে। যেমন- পূর্বে উল্লিখিত সকল রেওয়াজেত একই সাহাবী অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। এ দুই শর্ত ব্যক্ত করতে সম্মানিত লেখক ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ ... وَلَا اِقتِصَارَ বাক্য উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য এ বাক্যাংশ উল্লেখ করার আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে যে, সম্মানিত লেখক এ বাক্যের দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর সে প্রশ্ন হলো, কেউ হয়তো বলতে পারে مُتَابِعَةٌ نَاقِضَةٌ -এর মধ্যে مُتَابِعَةٌ পাওয়া যায়নি। কেননা, مُتَابِعٌ (মুতাবি')-এর রেওয়াজেতে نَأْكُلُوا عَنْكَ ثَلَاثِينَ আর দুই মুতাবা' রেওয়াজেতে نَكْتَلُوا ثَلَاثِينَ এবং نَأْكُلُوا ثَلَاثِينَ শব্দ এসেছে। অর্থাৎ মুতাবি' ও মুতাবা' -এর মধ্যে শব্দের মিল নেই। এ প্রশ্নের উত্তর সম্মানিত লেখক উক্ত বাক্যের মাধ্যমে এই দিয়েছেন যে, مُتَابِعَةٌ -এর জন্য দুই রেওয়াজেতের শব্দ হুবহু এক হওয়া জরুরি নয়; বরং উভয়ের অর্থ এক হওয়াই যথেষ্ট।

مُتَابِعَةٌ -এর হুকুম: تَامَةٌ টা হোক কিংবা نَاقِضَةٌ তা শক্তির ফায়দা দেয়। অর্থাৎ মুতাবি'-এর মাধ্যমে মুতাবা' হাদীসের বিশ্বস্ততা জোরালো হয়। অবশ্য এ ফায়দা প্রদানে مُتَابِعَةٌ تَامَةٌ টা مُتَابِعَةٌ نَاقِضَةٌ হতে অধিক কার্যকর এবং ফলপ্রসূ।

وَأَنَّ وَجَدَ مَتْنٌ يَرَوِي مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ يَشْبُهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى
أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ فَهُوَ الشَّاهِدُ وَمِثَالُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمَاهُ مَا
رَوَاهُ التَّنَائِيُّ مِنْ رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءٌ فَهَذَا بِاللَّفْظِ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى فَهُوَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
مِنْ رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) يَلْفِظُ فَإِنَّ عُمَ عَلَيْهِمُ
فَاكْمَلُوا عِدَّةَ شُعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَخَصَّ قَوْمَ الْمُتَابَعَةِ بِمَا حَصَلَ بِاللَّفْظِ
سَوَاءً كَانَ مِنْ رَوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا وَالشَّاهِدُ بِمَا حَصَلَ بِالْمَعْنَى
كَذَلِكَ وَقَدْ بَطُلَتْ الْمُتَابَعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ وَيَالْعَكْسُ وَالْأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ.

অনুবাদ : যদি একটি হাদীসের সাথে অন্য সাহাবী থেকে এমন একটি হাদীস পাওয়া যায় যা শব্দ ও অর্থ কিংবা শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে তাকে বলা হয় শাহিদ। এর উদাহরণ আমাদের পূর্বোল্লিখিত হাদীসটি, যা ইমাম নাসায়ী (র.) মুহাম্মদ ইবনে যুবায়েরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হুব্ব হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারের মতোই একই শব্দে সংকলন করেছেন। এ হলো শব্দগত শাহিদ-এর উদাহরণ। অর্থগত শাহিদ-এর উদাহরণ হলো ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীসটিকে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ-এর বরাত দিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে সংকলন করেছেন এ শব্দে- যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তোমরা শাবান মাসের মেয়াদ ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

অনেকের মতে শব্দের দিক দিয়ে মিল থাকলে তার নাম মুতাবা'আত, একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক বা না হোক। আর অর্থের দিক দিয়ে মিল থাকলে তার নাম শাহিদ। আবার অনেক সময় শাহিদ অর্থে মুতাবা'আত আর মুতাবা'আত অর্থে শাহিদ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপারে অর্থাৎ একটি অপরটির স্থলে ব্যবহারের দিক দিয়ে বিষয়টি (জটিল নয়; বরং) সহজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِطْلَاقُ الْمُتَابَعَةِ عَلَى الشَّاهِدِ وَيَالْعَكْسُ - আর এটা সহজ হওয়ার কারণ হলো مُتَابَعَةٌ বলুন অথবা شَاهِدٌ বলুন তার দ্বারা উদ্দেশ্য অপর রেওয়ায়েতের শক্তি পৌঁছানো। আর এটা যেমনিভাবে শাহিদ দ্বারা হয়, তেমনি মুতাবা'আত দ্বারাও হয়। তাই একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হলে তাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

إِشْهَادٌ এবং شَهَادَةٌ -এর অর্থ : কোনো হাদীস ফরদে নিসবী প্রমাণিত হওয়ার পর অপর কোনো সাহাবী থেকে যদি এমন কোনো 'মতন' পাওয়া যায় যা শব্দগত এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র অর্থগত দিক দিয়ে ঐ ফরদে নিসবী হাদীসের মতো হয়, তাহলে এ দ্বিতীয় সাহাবীর রেওয়ায়েতকে শাহিদ এবং এমন এক রকম হওয়াকে শাহাদাত বলে।

إِشْهَادٌ -এর সংজ্ঞা হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الْمُشَارِكُ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ فَرَدٌ لَفْظًا وَمَعْنَى أَوْ مَعْنَى فَقَطْ مَعَ الْإِخْتِلَافِ فِي الصَّحَابِيِّ.

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবীকে মুহাদ্দিসগণ مُتَّفَرِّقٌ ধারণা করেছেন مَعْنَى অথবা لَفْظًا وَمَعْنَى, সেই হাদীসের অনুরূপ কোনো হাদীস পাওয়া গেলে যদি উভয় হাদীসের সর্বশেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবী ভিন্ন হয়, তবে তাকে الشَّاهِدُ الثَّامِلُ বলে।

শাহিদ-এর প্রকারভেদ : শাহিদ দু প্রকার। যথা-

১. অর্থাৎ শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ।

১. شَاهِدٌ بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى

২. অর্থাৎ অর্থগত শাহিদ।

২. شَاهِدٌ بِالْمَعْنَى

নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেওয়া হলো-

১. শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ : দুই সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের অর্থ এক হওয়ার সাথে সাথে উভয়ের শব্দও যদি হুবহু একই হয়, তাহলে তাকে শব্দগত ও অর্থগত (شَاهِدٌ بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى) বলে।

২. অর্থগত শাহিদ : দুই সাহাবীর রেওয়ায়েতের অর্থ এক হয়ে যদি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে তাকে অর্থগত শাহিদ (شَاهِدٌ بِالْمَعْنَى) বলে।

শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ-এর উদাহরণ : নাসায়ী শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস, যাতে বর্ণিত হয়েছে- نَكِيلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ ইমাম নাসায়ী (র.) এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মুহাম্মদ ইবনে যুবায়ের-এর সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ হাদীসের শব্দ হুবহু হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ঐ হাদীসের শব্দের মতো, যা مُتَابِعَةٌ-এর উদাহরণে উল্লিখিত হয়েছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ হাদীস শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ।

অর্থগত শাহিদ-এর উদাহরণ : বুখারী শরীফে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি-

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكِيلُوا عِدَّةَ شَعْبَانٍ ثَلَاثِينَ

কেননা, ইমাম বুখারী (র.) হাদীসটি مُتَابِعَةٌ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি যদিও হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের সাথে হুবহু শাব্দিকভাবে মিল নেই, তথাপি উভয় হাদীসের অর্থ একই। যার ফলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর এ হাদীসটি অর্থগত শাহিদ হবে।

মুতাবা'ি এবং শাহিদ-এর মধ্যে পার্থক্য : এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. জুমহুরের অভিমত : জুমহুরের মতে مُتَابِعَةٌ ও شَهَادَةٌ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মুতাবা'াত-এর জন্য সাহাবী একই হওয়া শর্ত, আর শাহাদাত-এর জন্য সাহাবী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া শর্ত।

২. একদল মুহাদ্দিসের অভিমত : জুমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিপরীতে একদল মুহাদ্দিস অন্যভাবে মুতাবা'াত ও শাহাদাত-এর মধ্যে পার্থক্য করেন। যথা-

ক. مُتَابِعَةٌ টা مُوَافَقَةٌ بِاللَّفْظِ-এর সাথে খাস। অর্থাৎ উভয় রেওয়ায়েতের শব্দ যদি এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে তা মুতাবা'াত। চাই উভয় হাদীসের সাহাবী এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হোন না কেন।

খ. مُتَابِعَةٌ টা شَاهِدٌ بِالْمَعْنَى-এর সাথে খাস। অর্থাৎ উভয় রেওয়ায়েত যদি অর্থগতভাবে এক হয়; শব্দগতভাবে নয়, তাহলে তাকে শাহিদ বলে। চাই উভয় হাদীসের সাহাবী একজনই হোন না কেন।

উল্লেখ্য যে, মুতাবা'াত ও শাহিদ-এর মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্যটা বেশিরভাগে ব্যবহারের দিক দিয়ে। নতুবা কোনো কোনো সময় একটি অপরটির স্থলেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যখন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিবেচ্য হবে তখন তাদের মধ্যে نَسَبَتْ تَبَايُنٌ হবে। আর যখন উভয় একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হবে, তখন তাদের মধ্যে نَسَبَتْ تَسَاوٍ হবে।

وَأَعْلَمَ أَنَّ تَتَبَعَ الطَّرْقَ مِنَ الْجَوَامِيعِ وَالْمَسَانِيدِ وَالْأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ
الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ فَرَدٌ لِيَعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ لَا هُوَ الْإِعْتِبَارُ ، وَقَوْلُ ابْنِ
الصَّلَاحِ مَعْرِفَةُ الْإِعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ قَدْ يَوْهَمُ أَنَّ الْإِعْتِبَارَ
قَسِيمٌ لَهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ أَقْسَامِ الْمَقْبُولِ تَحْصُلُ فَائِدَةُ تَقْسِيمِهِ بِإِعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ
الْمُعَارَضَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : জামি', মুসনাদ, জুয (ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের হাদীসের কিতাব থেকে 'ফরদ' হাদীসের মুতাবি' ও শাহিদ অনুসন্ধানের নাম ই'তিবার (إِعْتِبَارُ)। ইবনুস সালাহ -এর একটি উক্তি এক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেছেন, "ই'তিবার, মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ -এর অবগতি।" এ থেকে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, এটি (ই'তিবার) হয়তো শাহিদ ও মুতাবি'-এর মতোই একটি শ্রেণি। অথচ তা নয়; বরং এ (ই'তিবার) হলো, উক্ত দু শ্রেণিকে খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া।

মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য হাদীসের যে সমুদয় শ্রেণির উল্লেখ করা হলো, যখন দুটি হাদীসের মধ্যে বিরোধিতা পরিলক্ষিত হবে, তখন এর উপকারিতা পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِعْتِبَارُ -এর সংজ্ঞা : إِعْتِبَارُ হলো মুতাবি' এবং শাহিদ চেনার প্রক্রিয়ার নাম। এটা তাদের কোনো শ্রেণি নয়। যারা إِعْتِبَارُ -কে مُتَابِعٌ ও شَاهِدٌ -এর শ্রেণি ভেবেছেন এবং উল্লেখ করেছেন তারা ভুল করেছেন। যেমন- ইবনুস সালাহ -এর একটি উক্তি থেকে এমনটি বুঝে আসে যে, তিনি إِعْتِبَارُ -কে مُتَابِعٌ ও شَاهِدٌ -এরই একটি শ্রেণি ভেবেছেন।

فَو تَتَبَعَ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

অর্থাৎ কোনো হাদীসকে 'ফরদ' ধারণা করার পর জামি', মুসনাদ, জুয ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থে তার মুতাবি' বা শাহিদ অন্তর্ভুক্ত করাকে ই'তিবার বলে।

কেউ কেউ إِعْتِبَارُ -এর সংজ্ঞা একটু বিস্তারিতভাবে এভাবে প্রদান করেছেন যে-

إِلْعَابُ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَوْ شَاهِدٌ أَمْ لَا .

অর্থাৎ إِعْتِبَارُ হলো, যে হাদীসকে فَرْد ধারণা করা হয় তার কোনো مُتَابِع বা شَاهِد আছে কিনা তা জানার জন্য বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ ঘাটাঘাটি করা, সনদসমূহ পর্যালোচনা করা।

একটি উহা প্রশ্নের উত্তর : সম্মানিত লেখক إِعْتِبَارُ ইবারত এনে একটি উহা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কেউ বলতে পারে, এখানে মাকবুল খবরের যত প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে সবই তো মাকবুল, তাহলে এগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাসের কি দরকার? এর উত্তর দিতে গিয়ে সম্মানিত লেখক বলেন, খবরে মাকবুলকে এভাবে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করার ফলাফল হাদীসের মধ্যে تَعَارُض বা বৈপরীত্য সৃষ্টি হলে প্রকাশ পাবে। কারণ, তখন নিম্নস্তরের

হাদীসের উপর উক্তরের হাদীস প্রাধান্য পাবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কখনো সহীহ হাদীস ও হাসান হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়, তখন সহীহ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। কারণ, তার মর্যাদা হাসানের তুলনায় উর্ধ্বে।

বিভিন্ন পরিভাষার সংজ্ঞা : এখানে আগত তিনটি পরিভাষার সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো—

১. الْجَمَاعَاتُ : এ শব্দটি جَمَاعَة -এর বহুবচন। جَمَاعَة হাদীসের এরূপ গ্রন্থকে বলা হয় যাতে আটটি বিষয়ের হাদীস সংকলিত হয়। এ আটটি বিষয় একটি পঞ্জিকিতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

سَبْعَ آدَابٍ وَتَفْسِيرٍ وَعَقَائِدٍ * فَتَنٍ أَشْرَاطٍ وَأَحْكَامٍ وَمَنَاقِبٍ

তথা সীরাতে, আদব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতনা, কিয়ামতের আলামত, আহকাম, ফাযায়িল-মানাকিব।

سَبْعَ শব্দটি سَبْعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সেসব বিষয় যেগুলোতে প্রিয়নবী ﷺ -এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে

أَدَابٍ শব্দটি أَدَبٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সামাজিক শিষ্টাচার। যেমন— খাওয়া ও পান করার আদব।

تَفْسِيرٍ অর্থাৎ কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসগুলো।

عَقَائِدُ অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

فَتَنُ শব্দটি فِتْنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সেসব বড় বড় ঘটনা যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

أَشْرَاطُ তথা কিয়ামতের আলামতসমূহ।

أَحْكَامُ তথা আমল সংক্রান্ত বিধিবিধান। যেগুলো ফিকহ-এর কিতাবে পাওয়া যায়। এগুলোকে সুনানও বলে।

مَنَاقِبُ এটি مَنَاقِبَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ মহিলা, পুরুষ সাহাবী এবং বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণির ফাযায়িল।

২. الْمَسَانِيدُ : এটি مَسْنَدٌ -এর বহুবচন। মুসনাদ হলো হাদীসের এরূপ কিতাব যাতে হাদীসসমূহকে সাহাবায়ে কেরামের তারতীব অনুসারে সংকলন করা হয়। অর্থাৎ একজন সাহাবীর সমস্ত রেওয়ায়েত একবারে উল্লেখ করা হবে। চাই যে কোনো অধ্যায়ের সাথে তা সম্পৃক্ত করা হোক। অতঃপর দ্বিতীয় সাহাবীর হাদীস।

অতঃপর কোনো কোনো সময় হুরুফে হিজার তারতীব ধর্তব্য হয়। কোনো সময় আগে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ধর্তব্য এনে এরূপ সাহাবীর হাদীস প্রথমে উল্লেখ করা হয়। আবার কোনো কোনো সময় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি ধর্তব্য হয়। এরূপভাবে মুহাজির ও আনসার শ্রেণির তারতীবেও মুসনাদগুলো বিন্যস্ত করা হয়।

৩. الْأَجْزَاءُ : এটি جُزْءٌ -এর বহুবচন। الْجُزْءُ এরূপ কিতাবকে বলে যাতে কোনো একটি শাখাগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীস একত্রিত করা হয়। যেমন—

۱. جُزْءُ الْقِرَاءَةِ لِلْإِسْلَامِ الْبَحَارِيِّ (رح)

۲. جُزْءُ الْقِرَاءَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ (رح)

۳. جُزْءُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْبَحَارِيِّ (رح)

۴. جُزْءُ الْجَهْرِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لِلدَّارَقُطْنِيِّ

۵. جُزْءُ الْجَهْرِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لِلدَّارَقُطْنِيِّ

ثُمَّ الْمَقْبُولُ يَنْقَسِمُ أَبْضًا إِلَى مَعْمُولٍ بِهِ وَغَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ لِأَنَّهُ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ أَيْ لَمْ يَأْتْ خَبَرٌ يُضَادُّهُ فَهُوَ الْمَحْكَمُ وَأَمِثْلُهُ كَثِيرَةٌ وَإِنْ عَوَّضَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارَضُهُ مَقْبُولًا وَمِثْلُهُ أَوْ يَكُونَ مَرْدُودًا وَالثَّانِي لَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّ الْقَوِيَّ لَا يُؤْتَرُ فِيهِ مُخَالَفَةُ الضَّعِيفِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُمَكِّنَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَذْلُولَيْهِمَا بِغَيْرِ تَعَسُّفٍ أَوْ لَا فَإِنْ أُمَكِّنَ الْجَمْعُ فَهُوَ التَّوَعُّ الْمُسْتَسَى بِمُخْتَلَفِ الْحَدِيثِ وَمِثْلُ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِحَدِيثٍ لَا عَدْوَى وَلَا طَبِيرَةَ مَعَ حَدِيثٍ فَرَمَ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ وَجَهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ لَا تُغْدِي بِطَبْعِهَا لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ مُخَالَطَةَ الْمَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَبًا لِأَعْدَائِهِ مَرَضَةً.

অনুবাদ : মাকবুল হাদীস আবার আমলযোগ্য ও আমলের অযোগ্য-এর দিকে বিভক্ত হয়। কেননা, যে হাদীসের বিপরীতে কোনো হাদীস নেই সেটি মুহকাম বা অবশ্য পালনীয়। এর প্রচুর নজির রয়েছে। আর যদি তার বিপরীত কোনো হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে দেখতে হবে সেটি অনুরূপ গ্রহণযোগ্য না প্রত্যাখ্যাত। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হলে তো তার কোনো প্রভাব পড়বে না। কেননা, কোনো শক্তিশালীর উপর তার দুর্বল প্রতিপক্ষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। আর যদি সমান পর্যায়ে দুটি হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়, তাহলে প্রথমত চেষ্টা করতে হবে দু হাদীসের অর্থের মধ্যে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে সমন্বয় সাধনের। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তার নাম হয় 'মুখতালিফুল হাদীস'।

ইবনু সালাহ 'মুখতালিফুল হাদীস'-এর একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন-
لَا عَدْوَى وَلَا طَبِيرَةَ

অর্থাৎ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, অস্ত্র লক্ষণ বলতেও কিছু নেই।

আবার তিনি এ-ও ইরশাদ করেছেন-
فَرَمَ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

অর্থাৎ সিংহ থেকে পালানোর মতো কুঠরোগী থেকে পালাবে।

দুটি হাদীসই সহীহ সনদে বর্ণিত। প্রথম হাদীসটি রয়েছে মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফে, আর দ্বিতীয় হাদীসটি রয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে। হাদীস দুটি দৃশ্যত পরস্পর বিরোধপূর্ণ। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় হলো- এ সকল রোগ প্রকৃতিগতভাবে সংক্রামক নয়, কিন্তু এতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিতে এ রোগ সংক্রমিত হবার কারণ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পূর্বে আলোচনা হয়েছে খَبَرٌ প্রথমত দু প্রকার : ১. خَبَرٌ مَتَوَاتِرٌ এবং ২. خَبَرٌ أَحَادٌ - অতঃপর খবর বাকীর সিফাতের দিক দিয়ে দু প্রকার : ১. مَقْبُولٌ এবং ২. مَرْدُودٌ - আবার সওয়াত দিক দিয়ে ৩'র প্রকার : ১. সহীহ লিযাতিহী, ২. সহীহ লিগযারহী, ৩. হাসান লিযাতিহী ও ৪. হাসান লিগযারহী

খবরে মাকবুল আবার مُعَارَضُ-এর দিক দিয়ে দু প্রকার। ১. مَعْمُولٌ তথা আমলযোগ্য ও ২. غَيْرُ مَعْمُولٌ অর্থাৎ আমলের অযোগ্য। অর্থাৎ কিছুর উপরে আমল করা হবে আর কিছুর উপরে আমল করা হবে না।

খবরে মাকবুলটা আমলযোগ্য হওয়া- না হওয়ার দিক দিয়ে মোট সাত প্রকার হয়। যথা- ১. مُعْكَمٌ

مُتَوَقَّفٌ فِيهِ ৭. وَ مَرْجُوحٌ ৬. رَاجِعٌ ৫. مَنَسُوحٌ ৪. نَاسِخٌ ৩. مُخْتَلَفٌ الْحَدِيثُ ২

সাত প্রকারে সীমিত হওয়ার কারণ : خَيْرٌ مَقْبُولٌ প্রথমত দু প্রকার। হয়তো সেটা مَعْمُولٌ হবে অথবা হবে না। কারণ خَيْرٌ مَقْبُولٌ-এর বিরোধী অন্য কোনো খবর হবে বা হবে না। যদি না হয়,

তাহলে তাকে مُعْكَমٌ বলে। আর যদি বিরোধী হয়, তাহলে সেই বিরোধী হাদীস প্রথম হাদীসের মতো

মাকবুল হবে অথবা মারদূদ। যদি মারদূদ হয়, তাহলে তার বিরোধীতায় মাকবুল হাদীসের প্রতি কোনো

প্রতিক্রিয়া পড়বে না। আর যদি দ্বিতীয়টিও প্রথমটির মতো মাকবুল হয়, তাহলে হয়তো এ দু হাদীসের

মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি সম্ভব হয়, তাহলে তাকে مُخْتَلَفٌ الْحَدِيثُ

বলে। আর যদি সমন্বয় সাধন না করা যায়, তাহলে হয়তো উভয় হাদীসের তারিখ জানা যাবে অথবা

যাবে না। সুতরাং তারিখ ইত্যাদির দ্বারা যদি একটির আগে ও অপরটির পরে হওয়া জানা যায়, তাহলে

পরেরটির দ্বারা পূর্বেরটা مَنَسُوحٌ হয়ে যাবে এবং نَاسِخٌ-এর উপর আমল হবে। আর যদি হাদীসের

আগে-পিছে হওয়া না জানা যায়, তাহলে হয়তো একটি হাদীসকে অপর হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া

সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে প্রাধান্য দিতে হবে এবং رَاجِعٌ-এর

উপর আমল হবে। আর যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে উভয় হাদীসের উপর আমল স্থগিত

হয়ে যাবে- যতক্ষণ তাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের কোনো ব্যবস্থা না হয়। এই মোট সাত প্রকার

হলো। এর মধ্যে চার প্রকার হলো আমলযোগ্য (مَعْمُولٌ)। আর তা হলো- ১. مُعْكَمٌ ২. مُخْتَلَفٌ الْحَدِيثُ ৩. نَاسِخٌ ও ৪. رَاجِعٌ আর বাকি তিন প্রকার হলো আমলের অযোগ্য। আর তা হলো-

১. مَتَوَقَّفٌ فِيهِ ৩ ও ৬. مَرْجُوحٌ ২. مَنَسُوحٌ -

মাকবুল হাদীসের মধ্যকার বিরোধ নিরসন পদ্ধতি : একটি مَقْبُولٌ-এর সাথে যদি অপর একটি

خَيْرٌ مَقْبُولٌ-এর বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা নিরসনের পদ্ধতি তিনটি। আর তা পর্যায়ক্রমে এভাবে-

১. সম্ভব হলে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২. নতুবা সম্ভব হলে একটির দ্বারা অপরটি মানসূখ করতে হবে।

৩. তাও সম্ভব না হলে একটার উপর অপরটির প্রাধান্য দিতে হবে। এটাও সম্ভব না হলে উভয়

হাদীসের উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবে।

مُعْكَمٌ-এর সংজ্ঞা : بَابُ إِنْغَالٍ হতে مَعْمُولٌ-এর সীগাহ। এর অর্থ- সুদৃঢ়, মজবুত।

مُرُ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ الَّذِي سَلِمَ مِنْ مُعَارَضَةِ مِثْلِهِ- হলো الْحَدِيثُ الْمَعْمُومٌ

অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবুল অনুরূপ কোনো হাদীসে মাকবুলের বিরোধী হয় না, তাকে الْحَدِيثُ الْمَعْمُومٌ বলে।

বি. দ্র. অধিকাংশ হাদীস এই مُعْكَمٌ জাতীয়।

মুখতালিফুল হাদীস-এর সংজ্ঞা : এটা প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার مُعَارَضُ তার মতো অন্য খবরে

মাকবুলের সাথে হয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে تَطْبِيقٌ দেওয়া তথা সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব হয়।

আরবিতে এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায়-

مُرُ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ الَّذِي يُعَارِضُهُ مَقْبُولٌ آخَرٌ مِثْلَهُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَذْهَبَيْهِمَا .

অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবুল তার অনুরূপ আরেকটি হাদীসে মাকবুলের مُعَارَضُ হয়, তবে উভয়

হাদীসের মধ্যে تَطْبِيقٌ দেওয়া সম্ভব হয়, তাকে مُخْتَلَفٌ الْحَدِيثُ বলে।

মুখতালিফুল হাদীস-এর উদাহরণ : নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত দুটি হাদীস এর উদাহরণ।

১. لَا عُدْوَى وَلَا طَبِيرَةَ.

২. قَرَّ مِنَ السَّجْدِمْ فَرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ.

এ উভয় হাদীস মাকবুল এবং সহীহ অথচ পরস্পর বিরোধপূর্ণ। কারণ, প্রথম হাদীসে রোগ সংক্রামক (ছোয়াছে) না হওয়া এবং দ্বিতীয় হাদীসে পালানোর নির্দেশ দানের দ্বারা রোগের সংক্রামক হওয়া বুঝা যায়।

দু হাদীসের মধ্যে সময় সাধন : উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধ অবসানের লক্ষ্যে একাধিক মহল থেকে সময় সাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১. ইবনুস সালাহ-এর সময় সাধন : ইবনুস সালাহ (র.) উক্ত হাদীসদ্বয়কে মুখতালিফুল হাদীস-এর উদাহরণ পেশ করে তাদের মাঝে এভাবে সময় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন যে, রোগের সত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে সংক্রমণের গুণ ও শক্তি নেই। এ কথা বলা হয়েছে لَا عُدْوَى হাদীসে। অবশ্য অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করলে কখনো আল্লাহ তা'আলা এই উঠা-বসাটা সুস্থ লোকের অসুস্থ হওয়ার কারণ বানিয়ে দেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ قَرَّ مِنَ السَّجْدِمْ হাদীসে রোগী থেকে পালাবার কথা বলেছেন।

২. ইবনে হাজার -এর সময় সাধন : উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এক চমৎকার সময় সাধন করেছেন। তিনি বলেন, রোগ সংক্রমণ না হওয়াটা عَامٌ (ব্যাপক বিষয়)। এটা প্রকৃতিগতভাবেও সংক্রমণ হয় না আবার সুস্থ ব্যক্তির সাথে অসুস্থ ব্যক্তির উঠাবসার কারণেও হয় না। এর প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি দুটি দলিল পেশ করেছেন। যথা-

১. এক হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন- اَرْتَابِيْ لَا يَغْدِيْ شَيْءٌ ثَبِيْتًا অর্থাৎ কোনো কিছু কোনো কিছুতে সংক্রামক হয় না। (প্রকৃতিগতভাবেও না আবার কারণ হিসেবেও না।)

২. আরববাসীদের সাধারণ ধারণা-বিশ্বাস অনুযায়ী এক সাহাবী যখন সংক্রমণের স্বপক্ষে নবী করীম ﷺ -এর সামনে একটি দলিল এভাবে পেশ করেন যে, খোস-পাঁচড়াযুক্ত উট সুস্থ উটের পালের মধ্যে কিছুদিন রাখলে সুস্থ উঠাওলাও খোস-পাঁচড়া আক্রান্ত হয়ে যায় (যা প্রমাণ করে রোগ সংক্রমণ হয়)। আরবের এ ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাসের মূলভিত্তি ঠুড়িয়ে দিতে তখন তিনি তাকে পাল্টা এই প্রশ্ন করেন যে, اَرْتَابِيْ اَعْنَى الْأَرْلِ? অর্থাৎ তাহলে বলা, প্রথমটিতে কিসে সংক্রমণ করল?

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সাহাবীর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, অনেক সময় বাহ্যিকভাবে রোগ সংক্রমণ হয় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নিজে নিজে সংক্রামক হয় না। আর হবেই বা কিভাবে, তার মধ্যে সংক্রমণের সত্তাগত শক্তিই নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণীর সারকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে প্রথম উটকে সংক্রমণ ছাড়াই রোগগ্রস্ত করেন, তেমনি অপর উটকেও সংক্রমণ ছাড়াই রোগগ্রস্ত করেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ قَرَّ مِنَ السَّجْدِمْ হাদীসে রোগ থেকে পালানোর নির্দেশ দিয়েছেন খারাপ আকিদা-বিশ্বাস লালন ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য। আর তা এভাবে যে, কোনো সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তারও ঐ রোগ হলো, তাহলে এ ব্যক্তি মানব প্রবৃত্তিবশত এই ধারণা করবে যে, হয়তো অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করার কারণেই তার এই রোগ হয়েছে। এতে করে তার আকিদা বিনষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ আকিদা বিনষ্ট ও তার মাধ্যমে ক্ষতি হতে বাঁচানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেভাগেই অসুস্থ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। (রোগ সংক্রমণের কারণে না।) যাতে করে তার ভ্রান্ত ধারণার উপলক্ষ মূলোৎপাটিত হয়ে যায় এবং ভুল ধারণার কোনো সুযোগ আর না থাকে।

مُخْتَلَفٌ -এর তাহকীক : اِخْتِلَافٌ শব্দটি ক্রিয়ামূল হতে فَاعِلٌ -এর সীগাহ।

এর অর্থ- দ্বন্দ্বমুখর, মতভেদপূর্ণ ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ শব্দটি مَفْعُولٌ -এর সীগাহ তথা لَا مَ -এর বর্ণে যবর দিয়েও পড়েছেন।

ثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ كَذَا جَمَعَ
بَيْنَهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ ، وَالْأَوَّلَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ
أَنَّ نَفْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِلْعَدُوِّ بَاقٍ عَلَى
عُمُومِهِ وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَا
يَعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ
عَارَضَهُ بِأَنَّ الْبَعِيرَ الْأَجْرَبَ يَكُونُ فِي الْأَيْلِ الصَّحْبَةِ فَيُخَالِطُهَا
فَتَجْرُبُ حَيْثُ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ
إِنْتَدَأَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا إِنْتَدَأَ فِي الْأَوَّلِ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ
الْمَجْدُومِ فَمِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ لِئَلَّا يَتَّفِقَ الشَّخْصُ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ
مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْتِدَاءً لَا بِالْعَدُوِّ الْإِنْفِئَةِ فَيُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ
بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ فَيَعْتَقِدُ صَحَّةَ الْعَدُوِّ فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ فَأَمَرَ بِتَجَنُّبِهِ
حَسَنًا لِلْمَادَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : অতঃপর তা কখনো কখনো তার কারণ এড়িয়ে যায়, অন্যান্য কারণের বেলায় যেমন হয়ে থাকে। ইবনুস সালাহ অন্যদের অনুসরণে এ দু হাদীসের মধ্যে এরূপ সমন্বয় সাধন করেছেন। তবে এ দুয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সমন্বয় হতে পারে এভাবে যে, যদি বলা হয়— সংক্রমক ব্যাধির অস্তিত্ব অস্বীকার সম্পর্কে মহানবী ﷺ -এর বক্তব্য যথাস্থানে বহাল। কেননা, মহানবী ﷺ -এর এ উক্তি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে— لَا يَعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا -এর অর্থঃ কোনো কিছু কোনো কিছুকে সংক্রমিত করে না।

জৈনিক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন— একটি খোস-পাঁচড়া যুক্ত উট এক পাল সুস্থ উটের মধ্যে তাদের সংশ্বে থাকার পরে দেখা যায় যে, সেগুলোরও খোস-পাঁচড়া হয়। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেন— 'তাহলে প্রথমটিতে কিসে সংক্রমণ করল?'

অর্থঃ প্রথমটির মধ্যে যেমন আল্লাহ তা'আলা নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি দ্বিতীয়টির মধ্যেও নতুনভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর কুষ্ঠরোগী থেকে পালানোর আদেশ হলো খারাপ বিশ্বাস সৃষ্টি

হওয়ার কারণসমূহ দূর করার একটি উপায়। যাতে এমন যেন না হয় যে, এক ব্যক্তি একজন কুষ্ঠরোগী বা এমন কোনো রোগীর সংশ্রবে গেল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার স্বতন্ত্র ফয়সালা অনুসারে তার সে রোগ হলো, যে সংক্রমণের কথা নাকচ করা হয়েছে, তাতে নয়। কিন্তু সে ধারণা করবে যে, উক্ত রোগীর সংশ্রবে যাবার কারণেই তার এ রোগ হয়েছে। এভাবে সে সংক্রমণে বিশ্বাস করবে, ফলে সে সঙ্কটে পড়বে। সে কারণে আল্লাহর নবী তাকে উক্ত রোগীর সংশ্রব পরিহার করতে বলেছেন, যাতে এ খারাপ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : **أَمْ قَدِ ابْتَغَلَفَ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فَنَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ** এ বাক্যে দ্বারা সম্মানিত লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসুস্থ ব্যক্তির উঠাবসাকে রোগ সংক্রমণের কারণ স্থির করেছেন। অথচ আমরা অনেক সময় দেখি যে, অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তি উঠাবসা ও চলাচল করলেও সে ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না, তাহলে উঠাবসাটা কিভাবে কারণ (سَبَبٌ) হলো ?

এ প্রশ্নের উত্তর সম্মানিত লেখক আলোচ্য ইবারতে প্রদান করেছেন। তিনি এর যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা হলো, অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা হলো سَبَبٌ আর রোগ সংক্রমণ হওয়াটা হলো مُسَبَّبٌ আর মূলনীতি আছে, অনেক সময় سَبَبٌ পাওয়া গেলেও مُسَبَّبٌ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ মূলনীতি অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসার পরেও যদি সুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত না হয়, তাহলে এতে প্রশ্ন বা আপত্তির কোনো কারণ নেই।

وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا التَّنَوُّعِ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ كِتَابَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ لِكِنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ اسْتِنْعَايَهُ وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا .
وَأَنَّ لَمْ يُمَكِّنَ الْجَمْعَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّائِيخُ أَوْ لَا فَإِنَّ عُرْفَ وَثَبَتَ الْمُتَأَخَّرُ بِهِ أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ فَهُوَ التَّائِيخُ وَالْآخِرُ الْمَنْسُوحُ ، وَالتَّائِيخُ رَفْعُ تَعْلُقِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ وَالتَّائِيخُ مَا بَدَّلَ عَلَى الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ وَتَسْمِيَّتُهُ نَاسِخًا مَجَازًا لِأَنَّ التَّائِيخَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى .

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বিষয়ে ইখতিলাফুল হাদীস নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এ সংক্রান্ত সকল হাদীস তাতে উল্লেখ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। অতঃপর ইবনে কুতাইবা, ইমাম তাহাবী (র.) প্রমুখ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যদি দু হাদীসের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে সমন্বয় সাধন না করা যায়, তাহলে দু হাদীসের ইতিহাস জানার চেষ্টা করতে হবে। ইতিহাস কিংবা এর চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা যদি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালেরটি চিহ্নিত করা যায়, তাহলে সেটিকে নাসিখ বা রহিতকারী ও অপরটিকে মানসূখ বা রহিত বলে নির্ধারণ করতে হবে।

নসখ বলতে বুঝায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালীন শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে পূর্ববর্তীকালের শরয়ী হুকুম রহিত করা। যে দলিলের ভিত্তিতে এরূপ রহিত করা হয়, তাকে বলা হয় নাসিখ বা রহিতকারী। বস্তুত উক্ত দলিলকে নাসিখ বলে আখ্যায়িত করা হয় রূপক অর্থে। কেননা, প্রকৃত নাসিখ হলেন আল্লাহ তা'আলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমাম শাফেয়ী (র.) হুন্মুখর ও বিভিন্নমুখী হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি কিতাব লেখেছেন। কিতাবটির নাম- **كِتَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ** ; কিন্তু তিনি এ কিতাবে পরস্পর বিরোধী সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেননি। এর পরে এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কুতাইবা **نَائِلُ مُخْتَلَفِ** এবং ইমাম তাহাবী (র.) **الْآثَارِ** নামে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব লেখেছেন।

হাদীসে নাসিখ এবং হাদীসে মানসূখ-এর সংজ্ঞা : পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীসের মধ্যে যদি সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয়, কিন্তু ইতিহাস বা এর চেয়ে সুস্পষ্ট কোনোভাবে দু হাদীসের একটি আগে ও আরেকটি পরের হওয়া জানা যায়, তাহলে আগেরটিকে বলে মানসূখ আর পরেরটিকে বলে নাসিখ। নাসিখের উপর আমল করতে হয় আর মানসূখটি পরিত্যক্ত হয়।

খুলাসা কিতাবে **نَائِيخٌ** ও **مَنْسُوحٌ** হাদীসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ-

النَّاسِخُ : كُلُّ حَدِيثٍ دَلَّ عَلَى رَفْعِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ سَابِقٍ .

অর্থাৎ নাসিখ হলো প্রত্যেক ঐ হাদীস যা পূর্ববর্তী শরয়ী হুকুম উঠিয়ে দেয় তথা বাতিল করাকে বুঝায়।

وَالْمَنْسُخُ : كُلُّ حَدِيثٍ رُفِعَ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ .

অর্থাৎ মানসূখ হলো প্রত্যেক ঐ হাদীস যার হুকুম পরবর্তীতে আগত শরয়ী দলিলের মাধ্যমে উঠিয়ে দেওয়া হয়।

نَسَخَ -এর অভিধানিক অর্থ : অভিধানে نَسَخَ শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. نَسَخَ অর্থ- মিটিয়ে দেওয়া, উঠিয়ে দেওয়া, অপসারিত করা। যেমন- বলা হয় : نَسَخَتِ الشُّمُسُ

الظِّلَّ অর্থাৎ সূর্য ছায়াকে মিটিয়ে দিয়েছে বা অপসারিত করেছে।

২. نَسَخَ অর্থ- পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা, অনুলিপি তৈরি করা। যেমন- বলা হয় : نَسَخَتِ الْكِتَابَ

অর্থাৎ আমি কিতাবের অনুলিপি তৈরি করেছি। এ অর্থ থেকেই কপি কৃত বই বা অনুলিপিকে 'নুসখা'

বলা হয়।

نَسَخَ -এর পারিভাষিক অর্থ : نَسَخَ -এর দু রকম সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যথা-

১. কেউ কেউ বলেন, نَسَخَ -এর সংজ্ঞা হলো- رَفَعَ حُكْمَ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ -

অর্থাৎ কোনো শরয়ী হুকুমকে তার পরবর্তীতে আগত শরয়ী দলিলের মাধ্যমে উঠিয়ে দেওয়া।

২. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) نَسَخَ -এর সংজ্ঞায় বলেন-

رَفَعَ تَعْلُقَ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ .

অর্থাৎ পরবর্তীতে আগত শরয়ী দলিলের মাধ্যমে কোনো (আগের) শরয়ী হুকুমের সম্পর্ক (বান্দা হতে) উঠিয়ে দেওয়া।

এখানে প্রভেদ হলো, হাফিজ ইবনে হাজার (র.) এ সংজ্ঞায় تَعْلُقَ শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। আর তার কারণ হলো, আল্লাহর ন্যায় আল্লাহর হুকুমও কদীম বা চিরন্তন। আর কদীম কখনো উঠে যায় না; চিরন্তনভাবে বিদ্যমান থাকে। অবশ্য বান্দার সাথে হুকুমের যে সম্পর্ক তা ছিন্ন হতে পারে। এ কারণে তিনি تَعْلُقَ শব্দ বৃদ্ধি করেছেন।

যে দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী হুকুমকে উঠিয়ে দেওয়া হয় তথা বাদ দেওয়া হয়, তাকে نَاسِخٌ (রহিতকারী) বলে। কিন্তু দলিলের দিকে نَسَخَ -এর এ সম্পর্ক রূপকভাবে। কেমনা, প্রকৃত রহিতকারী বা نَاسِخٌ কোনো দলিল হয় না; বরং প্রকৃত نَاسِخٌ হলেন আল্লাহ। আর আল্লাহর এই রহিত করাটা যেহেতু প্রকাশ পায় দলিলের মাধ্যমে, তাই দলিলের দিকে রূপকভাবে نَسَخَ -এর সম্পর্ক দিয়ে বলা হয় যে, পরবর্তী দলিলটা হলো نَاسِخٌ।

وَيَعْرِفُ النَّسَخَ بِأُمُورٍ أَصْرَحُهَا مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ كَحَدِيثِ بَرْنَدَةَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَيُزَوَّرُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" وَمِنْهَا مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخَّرُ كَقَوْلِ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَمِنْهَا مَا يُعْرِفُ بِالتَّارِيخِ وَهُوَ كَثِيرٌ ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَزُونُهُ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخَّرُ الْإِسْلَامَ مُعَارِضًا لِلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ لِإِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ الْمَذْكُورِ أَوْ مِثْلَهُ فَأَرْسَلَهُ لِكِنْ إِنْ وَقَعَ التَّضَرُّعُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَيَتَّبِعْهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَبْلَ إِسْلَامِهِ .

অনুবাদ : নসখ হওয়াটা জানা যায় কয়েক উপায়ে। সবচেয়ে সুস্পষ্ট হলো, যদি খোদ হাদীসেই সে কথা উল্লেখ থাকে। যেমন- মুসলিম শরীফে হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জেয়ারত করতে পার। কেননা, তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় উপায় হলো, কোনো সাহাবী যদি জোর দিয়ে বলেন যে, এটিই সর্বশেষ বিধান। যেমন- হযরত জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর সর্বশেষ রীতি ছিল আগুনে স্পর্শ করা (রান্না করা) বড় খাওয়ার পর অজু না করা। নাসায়ী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফে হাদীসটি সংকলিত হয়েছে।

নসখ সাব্যস্ত করার তৃতীয় উপায় হলো ইতিহাস। এর নজির প্রচুর রয়েছে। তবে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী কোনো সাহাবী যদি পূর্ববর্তী কালে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে তা দ্বারা নসখ সাব্যস্ত হয় না। কেননা, হতে পারে যে, পরবর্তীকালের সাহাবী অপর এমন এক সাহাবী থেকে এটি শুনেছেন যিনি আরো প্রবীণ অথবা সমসাময়িক; কিন্তু তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য যদি তিনি মহানবী ﷺ থেকে শুনেছেন বরং স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন, তাহলে সেটি নাসিখ হবার যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মহানবী ﷺ থেকে কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছেন- এমনটি না হওয়া চাই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নসখ জানার পদ্ধতি : নসখ কয়েকটি পদ্ধতিতে জানা যেতে পারে।

১. সবচেয়ে সুস্পষ্ট পদ্ধতি হলো, নসের মধ্যে নসখের কথা বর্ণিত থাকা অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নিজেই বলে দেবেন যে, কোন হুকুমটি মানসূখ। যেমন- সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর হাদীস। হাদীসটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- **كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبْرِ فَرُوزُوا** বলেছেন-এর দ্বারা জানা গেছে যে, কবর জেয়ারতের এখানে নবী করীম ﷺ -এর উক্তি **فَرُوزُوا** -এর দ্বারা জানা গেছে যে, কবর জেয়ারতের নিষেধাজ্ঞাটা মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে।

২. সাহাবী কোনো হুকুমের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলবেন যে, এটা সর্বশেষ নির্দেশ। তাহলে এমন বলার দ্বারা পূর্ববর্তী হুকুম মানসূখ হয়ে যাবে। যেমন, হযরত জাবির (রা.)-এর উক্তি- **كَانَ آخِرُ الْأَمْرِينِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الرُّسُومَ وَمَا مَسَّهَ النَّارُ** সুতরাং রান্না করা খানা খাওয়ার পরে অজু করার পূর্ববর্তী নির্দেশ হযরত জাবির (রা.)-এর এ উক্তি দ্বারা মানসূখ হয়েছে।

৩. ইতিহাস তথা সন-তারিখের দ্বারা যদি জানা যায় যে, কোন হুকুমটি আগের আর কোন হুকুমটি পরের, তাহলে পরের (শেষের) হুকুমের দ্বারা আগের হুকুমটি মানসূখ হয়ে যাবে। যেমন- শাদ্দাদ ইবনে আওয়াস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে- **أَنْطَرُ الْعَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ** অর্থাৎ যে শিঙ্গা লাগায় আর যাকে লাগায় উভয়ের রোজা ভেঙ্গে যায়।

অপর দিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَفَرَ صَائِمٌ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।

এ হাদীস দুটি পরস্পর বিরোধী। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসটির মাধ্যমে প্রথম হাদীসটি মানসূখ। কারণ, সন-তারিখ দ্বারা জানা যায় যে, প্রথম হাদীসটি অষ্টম হিজরির, আর দ্বিতীয় হাদীসটি দশম হিজরির। অতএব প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসটির দ্বারা মানসূখ হবে।

৪. পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস যদি পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর বিরোধী হয়, তাহলে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী যখন স্পষ্ট ভাষায় বলবেন যে, তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস শুনেছেন, তখন তার হাদীসের মাধ্যমে পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস মানসূখ হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও শর্ত হলো, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস শুনেবেন না।

শুধু ইসলাম গ্রহণের অগ্র-পশ্চাতের কারণে পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীসের দ্বারা মানসূখ হবে না। কারণ, হতে পারে, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী এ হাদীসটি এমন সাহাবী থেকে শুনে থাকবেন যিনি পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী অপেক্ষা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী অথবা সমসাময়িক। কিন্তু তিনি তার নাম উল্লেখ না করে মুরসালভাবে রেওয়ায়েত করেছেন।

৫. নসখ জানার উপরিউক্ত চার পদ্ধতি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উল্লেখ করেছেন। এ চার পদ্ধতি ছাড়াও পঞ্চম আরেকটি পদ্ধতিও রয়েছে। তা হলো, পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীসের মধ্যে উম্মত যদি একটি হাদীসের উপর আমল করে আর অপরটির উপর আমল ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের এ ছাড়াটাই উক্ত হাদীস মানসূখ হওয়ার দলিল।

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ كَمْ يُعْرِفُ التَّارِخُ فَلَا
يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِرَجْحٍ مِنْ وَجْهِهِ التَّرْجِيحِ
الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَتْنِ أَوْ بِالْإِسْنَادِ أَوْ لَا فَإِنْ أَمَكَّنَ التَّرْجِيحُ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ
إِلَيْهِ وَالْأَفْلَا ، فَصَارَ مَا ظَاهَرَهُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ
الْجَمْعِ إِنْ أَمَكَّنَ فَاِعتِبَارُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فَالتَّرْجِيحُ إِنْ تَعَيَّنَ ثُمَّ
التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَلِ بِأَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوَّلَى مِنْ
التَّعْيِيرِ بِالتَّسَاقُطِ لِأَنَّ خِفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إِنَّمَا هُوَ
بِالتَّيَسُّبَةِ لِلْمُعْتَبَرِ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ مَعَ إِحْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا
خَفِيَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : ইজমা মৌলিকভাবে নাসিখ হতে পারে না, তবে নাসিখ হয়েছে বলে ইঙ্গিত করতে পারে। আর যদি ইতিহাস জানা না যায়, তাহলে এর থেকে খালি হবে না যে, হয়তো সনদ কিংবা মতনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য দানকারী বিষয়াদির মধ্য থেকে কোনো একটির দ্বারা কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তার দিকে ফেরাটাই অর্থাৎ প্রাধান্য দেওয়াটাই সুনির্দিষ্ট হবে। আর যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তা সুনির্দিষ্ট হবে না অর্থাৎ প্রাধান্য দেওয়া হবে না।

সূত্রাং যে (দুই) হাদীসের বাহ্যিকটা বিরোধপূর্ণ তা এই পর্যালোচনায় পতিত হবে। (অর্থাৎ প্রথমে) সম্ভব হলে সমন্বয় সাধন করতে হবে। (এটা সম্ভব না হলে) অতঃপর নাসিখ-মানসূখ (-এর নিয়ম) গ্রহণ করতে হবে। (এটাও সম্ভব না হলে) প্রাধান্য দিতে হবে, যদি তা সুনির্দিষ্ট হয়। (আর যদি প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব না হয়, তাহলে) অতঃপর উভয় হাদীসের উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবে।

'পতিত হবে' বলার থেকে 'স্থগিত হবে' কথাটি বেশি উত্তম। কেননা, দুটি হাদীসের মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দানের বিষয় গোপন হওয়াটা বর্তমান অবস্থায় (সনদ) অনুসন্ধানকারীর বিবেচনায় হয়েছে। অথচ এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, যে বিষয়টি তার গোপন রয়েছে তা অন্যের কাছে (কিংবা তারই কাছে পরে) প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইজমা নাসিখ নয় : ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে কোনো হাদীস অথবা কোনো শরয়ী হুকুম মানসূখ হয় না। তবে ইজমা এমন দলিল বিদ্যমান হওয়ার প্রতি প্রমাণ হতে পারে, যে দলিল কোনো হুকুমের জন্য নাসিখ হয়।

ইজমায়ে উম্মত দ্বারা হাদীস বা শরয়ী হুকুম নসখ না হওয়ার কারণ দুটি।

১. ইজমায়ে উম্মতের এমন শক্তি নেই যে, তা হাদীস বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের থেকে প্রমাণিত হুকুমকে নসখ করবে।

২. দ্বিতীয়ত কথা হলো, ইজমা সংঘটিত হওয়ার সময়কাল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পর। এ দিকে নসখের সম্ভাবনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে বাকি থাকে না। যার ফলে ইজমা নাসিখ হতে পারবে না। অবশ্য ইজমাটা নসখের উপর দলিল হতে পারে। যেমন- চতুর্থ বারের মতো মদপানকারীকে হত্যার বিষয়টি। যদি কোনো মদপানকারী চূতর্থ বারও মদ পান করে, তাহলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীসে তার শাস্তি কতলের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটি মানসূখ। এর দলিল হলো, এ হাদীসের উপর আমল করা তরক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। সুতরাং এখানে ইজমা নাসিখ হলো না; বরং যে দলিল দ্বারা নসখ হয়েছে তার উপর প্রমাণ হলো। আর সে দলিল হলো, হাদীসের উপর আমল তরক করা।

মেট্রিকথা, নস, সাহাবীর জোরালো দাবি, ইতিহাস (সন-তারিখ) এবং শর্ত সাপেক্ষে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস নসখ জানার উপায়। ইজমা এবং যে কোনো পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস নাসিখ নয়।

رَاجِعٌ وَ مَرْجُوعٌ -এর সংজ্ঞা : পরপক্ষ বিরোধপূর্ণ দুটি হাদীস যদি এমন হয় যে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় না, নাসিখ-মানসূখ করা যায় না, তবে মতন বা সনদ সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য দানকারী বিষয় দ্বারা কোনো একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়, তাহলে যে হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাকে বলে **رَاجِعٌ**, আর অপর হাদীসকে বলে **مَرْجُوعٌ**। উদাহরণস্বরূপ মনে করি একটি হাদীসের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় আর অপর হাদীস দ্বারা হালাল সাব্যস্ত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় 'হারাম হওয়ার' হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। সেটি হবে **رَاجِعٌ** আর হালাল সাব্যস্তকারী হাদীসটি হবে **مَرْجُوعٌ**।

আরবিতে **الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ** -এর সংজ্ঞা হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الْمَقْبُولُ الْمُتَعَارِضُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ رَجَعَ يَوْجُو مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَتْنِ أَوْ بِالْإِسْنَادِ .

অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবুল অপর কোনো হাদীসে মাকবুলের **مُتَعَارِضُ**, কিন্তু সনদ কিংবা মতনের সাথে সম্পর্কযুক্ত **وَجْهُ تَرْجِيحٍ** -এর কোনো **وَجْهُ** -এর ভিত্তিতে তাকে **تَرْجِيحٍ** দেওয়া হয়, এমন হাদীসকে **الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ** বলে।

আরবিতে **الرَّاجِعُ الرَّاجِعُ** -এর সংজ্ঞা এভাবে-

هُوَ الْحَدِيثُ الْمَقْبُولُ الْمُتَعَارِضُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْجَعْ يَوْجُو مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَتْنِ أَوْ بِالْإِسْنَادِ .

অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবুল অপর কোনো হাদীসে মাকবুলের **مُتَعَارِضُ** এবং তাকে কোনোভাবেই **تَرْجِيحٍ** দেওয়া হয়নি।

وَجْهُ تَرْجِيحٍ -এর বিবরণ : **وَجْهُ تَرْجِيحٍ** দুভাবে হতে পারে। ১. **مَتْنًا** ২. **إِسْنَادًا**। নিম্নে উভয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. মতন সংশ্লিষ্ট **وَجْهُ تَرْجِيحٍ** : এটা একাধিক হতে পারে। যথা-

ক. একটি হাদীস **مُتَبَّنٍ** আর অপর হাদীস **مَنْفِيٍّ**, এমতাবস্থায় **النَّاسِئِ** মূলনীতি অনুযায়ী **مُتَبَّنٍ** হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

খ. একটি হাদীস **مُحَرَّمَ** (হারাম সাব্যস্তকারী) আর অপরটি **مُحِلٌّ** (বেধ সাব্যস্তকারী), তাহলে এমতাবস্থায় **مُحَرَّمَ** হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

২. সনদ সংশ্লিষ্ট **وَجَوَّزَجِينِ** : এটাও কয়েকটি হতে পারে। যথা—

ক. একটি হাদীসের সনদ সহীহ (**صَحِيح**) আর অপরটি **أَصَحُّ**, তাহলে **أَصَحُّ** হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

খ. একটি হাদীস এক সনদে বর্ণিত আর অপর হাদীসটি কয়েক সনদে বর্ণিত, তাহলে কয়েক সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

গ. একটি হাদীসের সনদ দুর্বল (**ضَعِيف**) আর অপর হাদীসের সনদ **صَحِيح**, তাহলে সহীহ সনদবিশিষ্ট হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

ঘ. একটি হাদীস **مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ** (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত) আর অপরটি **غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ**, তাহলে **مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ** হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

মতন ও সনদ সংশ্লিষ্ট **وَجَوَّزَجِينِ** অনেক। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো মাত্র।

مُتَّوَقَّفٌ فِيهِ বা স্থগিত হাদীসের সংজ্ঞা ও হুকুম : যে হাদীসের বিরোধ সমন্বয় সাধন, রহিতকরণ, প্রাধান্য দান—কোনোভাবেই দূর করা সম্ভব হয় না, তাকে বলা হয় **مُتَّوَقَّفٌ فِيهِ** বা স্থগিত হাদীস। এ হাদীসের হুকুম হলো, বিরোধ দূর না হওয়া পর্যন্ত উভয় হাদীসের উপর আমল স্থগিত থাকবে। তার উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবার কারণে তাকে **مُتَّوَقَّفٌ فِيهِ** বা স্থগিত হাদীস বলে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : **وَالْتَّعْيِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوَّلَى مِنَ التَّعْيِيرِ بِالتَّسَاقُطِ** এ বাক্যে সম্মানিত লেখক একটি উহা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, **مُتَّوَقَّفٌ فِيهِ** তথা স্থগিত হাদীসের উপর যখন আমল হয় না; বরং তা আমল থেকে বাদ যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে **تَوَقَّفَ** (স্থগিত) শব্দ ব্যবহার করার কি অর্থ? এর চেয়ে **تَسَاقَطَ** (বাদ যায়) শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হতো না?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সম্মানিত লেখক বলেন, **تَسَاقَطَ** শব্দের চেয়ে **تَوَقَّفَ** শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। এ উত্তমতার কারণ দুটি। যথা—

১. হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে কোনো মুহাদ্দিস হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধ কোনো পন্থায় দূর করে স্থগিত হাদীসের উপর আমল করার সুযোগ করে দিবেন। কেননা, আয়াতে আছে—**وَتَوَقَّ كَلِّ ذِي**—**عَلَيْهِم** অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছে। আর তখন হাদীসটি আমল থেকে বাদ পড়বে না; বরং স্থগিতাদেশ উঠে গিয়ে আমলযোগ্য হবে। এজন্য **تَسَاقَطَ** বলার চেয়ে **تَوَقَّفَ** বলাটাই অধিক কার্যকর। কেননা, **تَسَاقَطَ** বললে বুঝা যেত কোনো সময় হাদীস দুটি আর আমলযোগ্য হবে না।

২. হাদীসের ব্যাপারে **تَسَاقَطَ** (বাদ যাওয়া) শব্দ ব্যবহার করা একপ্রকার বেআদবিও বটে। এজন্য **تَسَاقَطَ**—এর চেয়ে **تَوَقَّفَ** শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম।

পরস্পর বিরোধী হাদীসের সারকথা : দুটি হাদীসের মধ্যে দৃশ্যত বিরোধিতা থাকলে প্রথমে সমন্বয় সাধন, অতঃপর নসখ, অতঃপর অগ্রাধিকার প্রদান—এ নিয়মে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ তিনটির কোনোটি না করা গেলে উভয় হাদীসকে মূলতুবি রাখতে হবে।

এটা হলো শাফেয়ী মাযহাবের নীতি। হানাফীদের মতে এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, সর্বপ্রথম নসখ, অতঃপর অগ্রাধিকার প্রদান, অতঃপর সমন্বয় সাধন। এ তিনটির কোনোটি না করা গেলে উভয় হাদীসকে স্থগিত রাখতে হবে।

كَمْ الْمَرْدُودَ وَمَوْجِبَ الرَّدِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادٍ أَوْ طَعْنٍ فِي رَأْيٍ عَلَى اخْتِلَافٍ وَجَوِّهِ الطَّعْنُ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرِ يُرْجَعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّائِي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ فَالَسَقَطُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِي السَّنَدِ مِنْ تَصَرُّفٍ مُصَنَّفٍ أَوْ مِنْ آخِرِهِ أَوْ الْإِسْنَادُ بَعْدَ التَّابِعِيِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَالْأَوَّلُ الْمُعْلَقُ سَوَاءً كَانَ السَّاقِطَ وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْضِلِ الْإِسْنَادُ ذِكْرُ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ مِنْ وَجْهِ ، فَمِنْ حَيْثُ تَغْرِيفِ الْمُفْضِلِ بِأَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ إِثْنَانِ فَصَاعِدًا يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُورِ الْمُعْلَقِ وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدِ الْمُعْلَقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُصَنَّفِ مِنْ مَبَادِي السَّنَدِ يَفْتَرِقُ عَنْهُ إِذَا هُوَ أَعْمٌ مِنْ ذَلِكَ .

অনুবাদ : অতঃপর মারদূদ। হাদীস রদ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ হয়তো সেটা হবে সনদ থেকে রাবীর পড়ে যাবার কারণে অথবা অভিযোগের বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে রাবীর ব্যাপারে অভিযোগের কারণে। চাই সে বিভিন্ন কারণ রাবীর দীনদারি সম্পর্কিত হোক কিংবা আয়ত্তশক্তি সম্পর্কিত হোক। রাবী বাদ পড়তে পারে সনদের শুরু থেকে লেখকের পক্ষে অথবা সনদের শেষভাগ থেকে তাবয়ীর পরে। অথবা অন্যস্থান (মাঝখান) থেকে। প্রথমটি হলো মু'আল্লাক। চাই পতিত রাবী একজন হোক কিংবা একাধিক। মু'আল্লাক এবং মু'যালের (যার বিবরণ সামনে আসবে) মাঝে উমূম খুসূস মিন ওয়াজহিন-এর সম্পর্ক রয়েছে।

যে হাদীসের সনদ থেকে দুজন বা দুয়ের অধিক রাবী বাদ পড়েছে- মু'দালের এ সংজ্ঞার সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মু'আল্লাকের মিল রয়েছে। কিন্তু মু'আল্লাক হতে হলে 'সনদের শুরু থেকে লেখকের পক্ষে বাদ পড়তে হবে'- এ শর্তের দিক দিয়ে দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, মু'দাল এ ক্ষেত্রে ব্যাপক। তাতে সনদের শুরু থেকেও হতে পারে, মাঝখান কিংবা শেষভাগ থেকেও হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবীর সিফাতের দিক দিয়ে দু প্রকার ছিল। ১. **حَبْرٌ مَقْبُولٌ** ও ২. **حَبْرٌ مَرْدُودٌ**। ইতঃপূর্বে **حَبْرٌ مَقْبُولٌ** -এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে **حَبْرٌ مَرْدُودٌ** -এর আলোচনা শুরু হচ্ছে।

مَوْجِبٌ শব্দের বিশ্লেষণ : **مَوْجِبٌ** শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা-

১. **مَوْجِبُ الرَّدِّ** -এর অর্থ হবে- রদ সাব্যস্তকারী বিষয়।

২. **مَوْجِبُ الرَّدِّ** -এর অর্থ হবে- যার রদ সাবেত করা হয়েছে।

৩. মাসদারে মীম হিসেবে মীম বর্ণে যবর যোগে। তখন **مَوْجِبُ الرَّدِّ** -এর অর্থ হবে- ওয়াজিব করা। আর রদ ওয়াজিব করার বিষয় হলো দুটি।

১. **سُقُوطُ رَأْيٍ** তথা সনদ থেকে এক বা একাধিক রাবীর পতন হওয়া বা পড়ে যাওয়া।

২. **طَعْنٌ رَأْيٍ** তথা কোনো রাবী দোষী ও অভিযুক্ত হওয়া। চাই এই দোষ তার দীনদারি সংক্রান্ত হোক,

চাই আয়ত্তশক্তি সংক্রান্ত হোক, অথবা আয়ত্তশক্তি ও স্মরণশক্তি সংক্রান্ত হোক।

হাদীস মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মর্মার্থ : হাদীস মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হাদীসটি সঙ্গাতভাবে পরিত্যাজ্য। কোনো হাদীস একবার হাদীস হিসেবে সাবেত হয়ে গেলে তা রদ

করার অধিকার কারো নেই; বরং তা গ্রহণ করে নেওয়া ওয়াজিব। তবে হাদীস মারদূদ হওয়ার মর্মার্থ হলো, অনিবার্য কোনো কারণে হাদীসটি আমল ও দলিলের অযোগ্য হওয়া।

খবরে মারদূদ ও খবরে মাকবুলের **غَيْرَ مَقْبُولٍ** হাদীসের মধ্যে পার্থক্য : আর তা হলো, যে হাদীস মাকবুল কিন্তু **غَيْرَ مَقْبُولٍ** তথা আমলযোগ্য নয় তার মধ্যে এই সন্দেহ থাকে না যে, হাদীসটি সহীহ কিনা; বরং তার সত্য ও সহীহ হওয়াটা নিশ্চিত হয়। অবশ্য অনিবার্য কোনো কারণে তদনুযায়ী আমল করা যায় না। এর বিপরীতে খবরে মারদূদের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। যার কারণে খবরে মারদূদ বিলকুল অগ্রহণযোগ্য এবং দলিল ও আমলের অনুপযুক্ত। আর **غَيْرَ مَقْبُولٍ** **غَيْرَ مَقْبُولٍ** ৫ টা আমলের যোগ্য, কিন্তু অনিবার্য কারণে বর্তমানে তার উপর আমল করা হয় না।

রাবীর পতনের দিক দিয়ে **خَبَرٌ مَرْدُودٌ** -এর প্রকরণ : **خَبَرٌ مَرْدُودٌ** -এর বিভক্তি দুই দিক থেকে হয়।

১. রাবীর পতনের দিক দিয়ে। ২. রাবীর অভিযুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে। রাবীর পতনের দিক দিয়ে খবরে মারদূদ চার প্রকার। ১. **مُعَلَّقٌ** (মু'আল্লাক), ২. **مُرْسَلٌ** (মুরসাল), ৩. **مُغْضَلٌ** (মু'ঘাল) ও ৪. **مَنْطِقٌ** (মনকতি)।

রাবীর পতনের দিক দিয়ে খবরে মারদূদ চার প্রকারে সীমিত হওয়ার কারণ : সনদ থেকে রাবীর পড়ে যাওয়াটা হয়তো সনদের শুরু দিক অর্থাৎ লেখকের দিক থেকে লেখকের ইচ্ছায় ঘটবে অথবা সনদের শেষ থেকে তাবেয়ীর পরে হবে অথবা অন্য কোথাও হতে অর্থাৎ মাঝখান হতে হবে। সনদের শুরু থেকে রাবীর পতন হলে তাকে বলে **مُعَلَّقٌ**, আর সনদের শেষ থেকে রাবীর পতন হলে তাকে বলে **مُرْسَلٌ**, আর যদি রাবীর পতনটা সনদের মাঝখান থেকে হয় তা আবার দু প্রকার। হয়তো রাবী মাঝখান থেকে পরপর দুজন পড়বে অথবা পরপর দুজন পড়বে না। যদি রাবী সনদের মাঝখান হতে পরপর দুজন পড়ে, তাহলে তাকে **مُغْضَلٌ** বলে। আর পরপর দুজন না হলে তাকে বলে **مَنْطِقٌ**।

প্রসঙ্গ **مُعَلَّقٌ** (মু'আল্লাক) : **مُعَلَّقٌ** বিষয়ে ৪ টি আলোচনা প্রাধান্যযোগ্য। ১. **مُعَلَّقٌ** -এর অর্থ, ২. **مُعَلَّقٌ** ও **مُغْضَلٌ** -এর মধ্যকার পার্থক্য, ৩. **مُعَلَّقٌ** -এর ধরনসমূহ ও ৪. **حَدِيثُ مُعَلَّقٌ** -এর হুকুম। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

مُعَلَّقٌ -এর সংজ্ঞা : **مُعَلَّقٌ** ঐ হাদীসকে বলে যার সনদের শুরু থেকে লেখকের ইচ্ছায় এক বা একাধিক রাবী পড়ে যায়। চাই এ পতনটা একই স্থান থেকে হোক কিংবা বিভিন্ন স্থান থেকে। সনদের শুরু থেকে হওয়ার সাথে সাথে মাঝখান বা শেষ থেকেও হোক বা না হোক। সনদের শুরু থেকে লেখকের ইচ্ছায় এক বা একাধিক রাবী পড়ে যাওয়ার নাম তালীক (تعلیق)। এর বহুবচন হলো **تَغْلِيقَاتٌ**। আরবিতে **حَدِيثُ مُعَلَّقٌ** -এর সংজ্ঞা হলো-

مَوْأَلِ حَدِيثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مَبْدَأِ سَنَدِهِ رَآءِ فَأَكْثَرَ وَلَوْ إِلَى آخِرِ السَّنَدِ .

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবীকে বাদ দেওয়া হয় সেই হাদীসকে **حَدِيثُ مُعَلَّقٌ** বলে।

মিশকাত শরীফের হাদীস কি **مُعَلَّقٌ** ? মিশকাত শরীফের হাদীসে শুধুমাত্র সাহাবী বা তাবেয়ীর নাম আছে, বাকি রাবীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু বাহ্যত এটা সনদের শুরু থেকে রাবীর পতন- তাই এটাকে কেউ **مُعَلَّقٌ** -এর সংজ্ঞা অনুসারে **مُعَلَّقٌ** বলে মনে করতে পারে, কিন্তু বাস্তব কথা হলো, মিশকাত শরীফের হাদীসগুলো **مُعَلَّقٌ** নয়; বরং এ হাদীসগুলো যে কতুবে সিওয়াহ বা হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে পুরো সনদ বিদ্যমান আছে। মিশকাত শরীফের লেখক যেহেতু হাদীসগুলোকে সনদ থেকে আলাদা করে বর্ণনা করেছেন, পরিভাষায় যার নাম তাজরীদ, তাই মিশকাত শরীফের হাদীসকে **مُرْوَدَاتٌ** বলা হবে।

وَمِنْ صُورِ الْمُعَلَّقِ أَنْ يُخَذَفَ جَمِيعُ السَّنَدِ وَيُقَالُ مَثَلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا أَنْ يُخَذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيُّ أَوْ إِلَّا التَّابِعِيُّ وَالصَّحَابِيُّ مَعًا وَمِنْهَا أَنْ يُخَذَفَ مِنْ حَدِيثِهِ وَيُضَيَّفَهُ إِلَى مَنْ قَرَنَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَرَنِهِ شَيْخًا لِذَلِكَ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ أُخْتَلِفَ فِيهِ هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيْقًا أَوْ لَا وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنْ عُرِفَ بِالتَّحْصِصِ أَوْ الْإِسْتِقْرَاءِ أَنْ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ قُضِيَ بِهِ وَإِلَّا فَتَعْلِيْقٌ.

অনুবাদ : মু'আল্লাকের অন্যতম ধরন হলো পুরো সনদ উহ্য রাখা এবং এরূপ বলা যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন। দ্বিতীয় প্রকার : সাহাবী কিংবা তাবেয়ী ও সাহাবী ব্যতীত পুরো সনদ উহ্য রাখা। তৃতীয় প্রকার : যিনি লেখকের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার নাম উহ্য রেখে তার উপরের ব্যক্তির সাথে সেটিকে সম্পৃক্ত করা। যদি সেই উপরস্থ ব্যক্তি লেখকের শায়খ বা শিক্ষক হন, তাহলে সেটিকে তা'লীক নামে আখ্যায়িত করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ হত হলো, এ বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যদি বর্ণনা কিংবা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, যিনি এটি করেছেন তিনি একজন মুদাল্লিস, তাহলে সেই ফয়সালা করতে হবে। নইলে সেটি তা'লীক হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَلَّقٌ -এর ধরনসমূহ : **مُعَلَّقٌ** -এর সুরত বা ধরন ৫টি। যথা-

১. হাদীসের পুরো সনদ ফেলে দেওয়া। যেমন- এভাবে বলা- **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ...**। তবে এ সুরতে **مُعَلَّقٌ** এবং **مُنْقَطِعٌ** এর অধীনে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।
২. সাহাবী, ব্যতীত বাকি সব সনদ ফেলে দেওয়া।
৩. সাহাবী এবং তাবেয়ী ছাড়া বাকি সব সনদ ফেলে দেওয়া।
৪. যে রাবী (মুহাদিস) থেকে হাদীস শুনেছে তাকে বাদ দিয়ে তার উপরের রাবীর দিকে ঐ হাদীসের সম্পর্ক দেওয়া। এটিও তা'লীক। অবশ্য উপরের যে রাবীর দিকে সম্পর্ক দিল তিনিও যদি সম্পর্ক দানকারীর গুস্তাদ হন, তাহলে এমতাবস্থায় এটি **تَعْلِيْقٌ** হবে কিনা- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা-
 - ক. কারো মতে এটা তা'লীক হবে।
 - খ. কারো কারো মতে এটা তা'লীক নয়; বরং তাদলীস।
 - গ. তবে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এটা নির্বিচারে তা'লীকও হবে না আবার তাদলীসও হবে না; বরং তার হুকুমটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর তা হলো এই যে, যদি আইম্মায়ে হাদীস স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন অথবা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, সম্পর্ক দানকারী রাবী তাদলীসে অভ্যস্ত, তাহলে তখন সেটা তাদলীসই হবে। আর যদি রাবীর ব্যাপারে এমনটি জানা না যায়, তাহলে তা তা'লীক হবে। তবে উপরের রাবী যদি গুস্তাদ না হয়, তাহলে হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে মু'আল্লাক হবে।
৫. **مُعَلَّقٌ** -এর আরেকটি সুরত হলো, সনদের শুরু থেকে কয়েকজন রাবী পড়ে যাবে।

وَأَمَّا ذِكْرُ التَّغْلِيْقِ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ وَقَدْ
يُحْكَمُ بِصَحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ بِأَنْ يَجْعَلَ مُسَمًّى مِنْ وَجْهِ آخَرٍ فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ
مَنْ أَخَذَهُ يُقَاتُ جَاءَتْ مَسْأَلَةُ التَّغْدِيلِ عَلَى الْإِبْهَامِ وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا
يُقْبَلُ حَتَّى يُسَمَّى لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا إِنْ وَقَعَ الْحَذْفُ فِي كِتَابٍ
الْتَزِمَتْ صِحَّتُهُ كَالْبُعَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فَمَا أَتَى فِيهِ بِالْجَزْمِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ
ثَبَّتَ إِسْنَادُهُ عِنْدَهُ وَأَمَّا حَذْفُ لِفَرْضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ وَمَا أَتَى فِيهِ بِتَغْيِيرِ
الْجَزْمِ فَنِيهِ مَقَالٌ وَقَدْ أَوْضَحْتُ أَمِثْلَهُ ذَلِكَ فِي التُّكَيْتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ .

অনুবাদ : তা'লীককে মারদুদ হাদীসের অন্যতম প্রকার হিসেবে উল্লেখ করার কারণ হলো, উহ্য রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। আর কোনো রাবীর পরিচয় অজ্ঞাত থাকা হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ক্ষতিকর।

মু'আল্লাক হাদীস যদি অপর কোনো এমন সনদে বর্ণিত পাওয়া যায় যেখানে উহ্য রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে তখন সেটিকে সহীহ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

কোনো ব্যক্তি যদি বলেন, “আমি যাদের নাম উহ্য রাখি তারা সবাই নির্ভরযোগ্য”, তাহলে সেটি হলো তা'দীলে মুবহাম বা অস্পষ্ট প্রত্যয়ন প্রসঙ্গ। অধিকাংশের মতে উক্ত উহ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত সে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্যই ইবনুস সালাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “যে কিতাবে একমাত্র সহীহ হাদীস গ্রহণকে বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে পালন করা হয়েছে, যেমন- বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, তাতে যদি কোনো হাদীসের রাবীকে উহ্য রাখা হয়, তাহলে যেটিকে জোরালো ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির সনদ তাঁর নিকট রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। তিনি হয়তো কোনো কারণবশত তা উহ্য রেখেছেন। আর যেটিকে তিনি তেমন জোরালো ভাষায় উল্লেখ করেননি, সেটির ব্যাপারে বক্তব্য রয়েছে।” আমি ‘আন-নুকাহু আলা ইবনিস সালাহ’ কিতাবে এর উদাহরণসমূহ ব্যাখ্যা করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : **وَأَمَّا ذِكْرُ التَّغْلِيْقِ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ** - এ বাক্যে সম্মানিত লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর সে প্রশ্নটি হলো, **مُعَلَّنٌ** -এর সকল প্রকার মারদুদ না হওয়া সত্ত্বেও তাক মারদুদের প্রকারে উল্লেখ করা হলো কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সম্মানিত লেখক বলেন, **مُعَلَّنٌ** -কে মারদুদের প্রকারে উল্লেখ করার কারণ হলো, **مُعَلَّنٌ** -এর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ এমনই হয় যে, তার উহ্য রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। অর্থাৎ এটা জানা যায় না যে, সে আদিল ও আয়ত্তশক্তির অধিকারী কিনা।

حَدِيثُ مُعَلَّنٌ -এর হুকুম : **مُعَلَّنٌ** হওয়ায় তা মূলত মাকবুলই নয়; বরং মারদুদ। আর তার কারণ হলো, তার উহ্য রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। অর্থাৎ এটা জানা যায় না যে, উহ্য রাবী আদিল ও আয়ত্তশক্তির অধিকারী কিনা। তবে অন্য কোনো সনদে যদি উহ্য রাবীর নাম প্রকাশ পায়

অথবা حَدِيثٌ مُعَلَّقٌ টা এমন কোনো কিতাবে বর্ণিত হয়, যার বিশুদ্ধতা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তখন এ বর্ণিত নিদর্শনের সুবাদে حَدِيثٌ مُعَلَّقٌ টি **مَقْبُولٌ** হবে। আর যদি এমনটি না হয়, তাহলে তা মাকবূল হবে না।

تَعْدِيلُ مُبْنِهِم-এর হুকুম : যদি কোনো মুহাদ্দিস দাবি করে বলেন যে, আমি সনদ থেকে যতজন রাবীর নাম উহ্য রেখেছি- তাদের সবাই নির্ভরযোগ্য, তাহলে একে বলে **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم** (অস্পষ্টভাবে উত্তমতা প্রতিপন্ন করা)। এ **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم**-এর হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে। যথা-

১. জুমহরের অভিমত : জুমহরের মতে **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم** বা অস্পষ্ট প্রত্যয়নের কোনো ধর্তব্য নেই অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত উহ্য রাবীর নাম প্রকাশ না করা হবে ততক্ষণ তা মাকবূল হবে না। সুতরাং **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم** ভাবে বর্ণিত حَدِيثٌ مُعَلَّقٌ জুমহরের মতে মাকবূল হবে না।

২. ইবনুস সালাহ-এর অভিমত : রাবীর উহ্য থাকাটা যদি বুখারী-মুসলিমের মতো যে সমস্ত হাদীসের কিতাব বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক শর্ত করে তাদের কিতাবে **صِيغَةُ مَعْرُوفٍ** তথা দৃঢ়তাবাচক শব্দে (উদাহরণস্বরূপ এমন আসে-**ذَكَرَ فُلَانٌ** অথবা **قَالَ فُلَانٌ**) বর্ণিত হয়, তাহলে এমন **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم** মাকবূল হবে। কারণ, দৃঢ়তাবাচক শব্দই এর উপর প্রমাণবহ যে, লেখকের নিকট হাদীসের সনদ সহীহ। তবে সংক্ষিপ্ততা কিংবা অন্য কোনো স্বার্থে তিনি রাবীকে উহ্য রেখেছেন।

পক্ষান্তরে বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতাকারী কিতাবসমূহে যদি **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم** টা দুর্বলতাজ্ঞাপক শব্দ তথা **صِيغَةُ مَجْهُولٍ**-এর সাথে বর্ণিত হয়, তাহলে এ ধরনের **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم**-এর হুকুম মতভেদপূর্ণ।

আর যে সমস্ত হাদীসের কিতাব বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক করেনি যদি তাদের কিতাবে **تَعْدِيلُ مُبْنِهِم** আসে, তাহলে ইবনুস সালাহ-এর ভাষ্যমতে তা কখনো মাকবূল হবে না।

وَالثَّانِي وَهُوَ مَا سَقَطَ عَنْ آخِرِهِ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيِّ هُوَ الْمُرْسَلُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ سَوَاءٌ كَانَ كَيْسَرًا أَوْ صَغِيرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذًا أَوْ فَعَلَ كَذًا أَوْ فَعَلَ بِحَضْرَتِهِ كَذًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمُحَذَّوْفِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيًّا وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلًا عَنْ صَحَابِيٍّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلًا عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ وَعَلَى الثَّانِي فَيَعُودُ الْإِحْتِمَالُ السَّابِقُ وَتَتَعَدَّدُ أَمَّا بِالتَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ فَاِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَأَمَّا بِالِاسْتِقْرَاءِ فَاِلَى سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ وَهُوَ أَكْثَرُ مَا وَجَدَ مِنْ رَوَايَةٍ بَعْضُ التَّابِعِينَ عَنْ بَعْضٍ -

অনুবাদ : মারদূদ হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যার শেষভাগ থেকে তাবেয়ীর পরের রাবী বাদ পড়ে গেছে। এর নাম 'মুরসাল'। যেমন- একজন তাবেয়ী তিনি প্রবীণ হোক কিংবা কনিষ্ঠ, বললেন- "নবী করীম ﷺ এরূপ বলেছেন বা এরূপ করেছেন অথবা তাঁর উপস্থিতিতে এরূপ করা হয়েছে।" কোন সাহাবী মারফত এটি জানা গেল তা উল্লেখ করা হলো না। এটিকে মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত শ্রেণির মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো, উহা রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকা। কেননা, উক্ত উহা ব্যক্তি সাহাবী হতে পারেন, তাবেয়ীও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বল হতে পারেন, নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি কোনো সাহাবী থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারেন, অন্য কোনো তাবেয়ী থেকেও শিখতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় পূর্ববর্তী সজাবনা ফিরে আসবে। আর এরূপ একধিকবার হতে পারে। যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করলে এ সজাবনার কোনো শেষসীমা নেই। তবে অনুসন্ধানে দেখা যায়, ছয় বা সাত পর্যন্ত এ সজাবনা চলতে পারে। এক তাবেয়ী থেকে অন্য তাবেয়ীর বর্ণনার এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১. **মُرْسَل** -এর আভিধানিক অর্থ : **مُرْسَل** শব্দটি তিনটি উৎসারণস্থল হতে উৎপন্ন ও গৃহীত হতে পারে। যথা-
 ১. **نَاقَةُ رُسُلٍ أَيْ سَرِيعَةٍ** (অর্থাৎ দ্রুতগামী উটনী) থেকে। তখন মর্মার্থ হবে, মুরসিল হাদীসটি বর্ণনায় দ্রুততা ও তাড়াহুড়া করেছে এবং সনদ থেকে রাবী বাদ দিয়েছে, এজন্য তার হাদীসকে **مُرْسَل** তথা তাড়াহুড়াকৃত করে নাম রাখা হয়েছে।
 ২. আহলে আরবের উক্তি : **جَاءَ الْقَوْمَ إِسْرَافًا أَيْ مُتَفَرِّقِينَ** (অর্থাৎ লোকেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে এসেছে) থেকে। যেহেতু রাবীকে বাদ দেওয়ার কারণে সনদের একাংশ অপর অংশ হতে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই এমন হাদীসকে **مُرْسَل** (বিচ্ছিন্ন) বলে।
 ৩. **إِسْرَافٌ بِمَعْنَى الْإِطْلَاقِ وَعَدَمُ الْمَنْعِ** (অর্থাৎ মুক্ত ও শর্তহীন) থেকে। কেমন যেন মুরসিল সনদকে মৃতলাক রেখেছে এবং প্রসিদ্ধ রাবীর সাথে শর্তযুক্ত করেনি, এজন্য তাকে **مُرْسَل** (শর্তহীন) বলে।
- مُرْسَل** -এর পারিভাষিক অর্থ : **مُرْسَل** এ হাদীসকে বলে যার সনদের শেষ থেকে তাবেয়ীর পরে কোনো রাবী পড়ে যায়। এভাবে সনদ থেকে রাবী ফেলে দেওয়াকে **إِسْرَاف** বলে।

আরবিতে حَدِيثُ مُرْسَل -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي حُذِفَ مِنْ أَصْلِ سَنَدِهِ أَوْ بَعْدَ التَّابِعِيِّ كَانَ يَقُولُ التَّابِعِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا .

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদ থেকে সাহাবীর নাম বাদ দেওয়া হয়, তাবেয়ী সরাসরি قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলে, তাকে الْحَدِيثُ الْمُرْسَل বলে ।

مُرْسَل -এর কয়েকটি ধরন : مُرْسَل -এর ধরন কয়েকটি হতে পারে । যার উদাহরণ নিম্নরূপ-

১. কোনো প্রবীণ বা কনিষ্ঠ তাবেয়ী বলবেন : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا . অর্থাৎ নবী করীম ﷺ এমন বলেছেন ।

২. কোনো প্রবীণ বা কনিষ্ঠ তাবেয়ী বলবেন : فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا . অর্থাৎ নবী করীম ﷺ এমন করেছেন ।

৩. কোনো প্রবীণ বা কনিষ্ঠ তাবেয়ী বলবেন : فَعَلَ يَحْضُرُهُ كَذَا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে এমন করা হয়েছে, ইত্যাদি ।

مُنْقَطِعٌ , مُعْضَلٌ , অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্যে ছেদ করা হয়, তাই তা

مُرْسَل -এর সুরতে হোক না কেন । কুতুবে সিদ্দাহ-এ مُرْسَل শব্দ এ অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়েছে ।

তাঁবেয়ী প্রবীণ (كَبِيرٌ) ও কনিষ্ঠ (صَغِيرٌ) দ্বারা উদ্দেশ্য : তাঁবেয়ী প্রবীণ হওয়ার দ্বারা বয়সে প্রবীণ

(বড়) এবং তাঁবেয়ী কনিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা বয়সে কনিষ্ঠ (ছোট) হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং হাদীসের পরিভাষায় কিবারে তাঁবেয়ী বা প্রবীণ তাঁবেয়ী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি অনেক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং অনেক রেওয়ায়েত সাহাবীদের থেকেই গ্রহণ করেছেন । যেমন- হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাযিব (র.), হযরত কায়স ইবনে আবী হাযেম (র.) প্রমুখ ।

আর সিগারে তাঁবেয়ী তথা কনিষ্ঠ তাঁবেয়ী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যার অল্প রেওয়ায়েত সাহাবী হতে আর অধিক রেওয়ায়েত কিবারে তাঁবেয়ী হতে । যেমন- হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী (র.) প্রমুখ ।

একটি দলের দাবি নাকচ : সম্মানিত লেখক اَوْ صَغِيرًا - বাক্যে ঐ দলের দাবি রদ

বা নাকচ করেছেন, যারা বলে যে, সিগারে তাঁবেয়ীদের হাদীস মুরসাল হয় না; বরং مُنْقَطِعٌ হয় ।

কারণ, তাদের সাক্ষাৎ মাত্র দু-একজন সাহাবীর সাথে হয় এবং তাদের অধিকাংশ রেওয়ায়েত কিবারে তাঁবেয়ী থেকে হয় । তাই সাধারণত তাদের রেওয়ায়েতে রাবী উহা থাকে দুজন- কিবারে তাঁবেয়ী ও সাহাবী । তাই مُرْسَل নয় ।

মুরসাল মারদূদের শ্রেণিভুক্ত হবার কারণ : যে কারণে حَدِيثُ مُعْضَلٌ মারদূদের শ্রেণিভুক্ত, ঠিক সে

কারণেই مُرْسَلও মারদূদের অন্তর্গত হয়েছে । অর্থাৎ مُرْسَل -এর মধ্যে যেহেতু উহা রাবীর অবস্থা জানা

যায় না, সেজন্য তাকে মারদূদের শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয় । কারণ, হতে পারে উহা রাবী সাহাবী হবেন

অথবা তাঁবেয়ী । তাঁবেয়ী হলে তিনি যা'ঈফ হবেন (যার কারণে হাদীস মারদূদ হয়) অথবা ছিকাহ

(নির্ভরযোগ্য) । ছিকাহ হলে আবার তার মধ্যে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি কোনো সাহাবী হতে

হাদীসটি শুনে থাকবেন অথবা অপর কোনো তাঁবেয়ী হতে । যদি তাঁবেয়ী হতে শুনে, তাহলে আবার

পূর্ববর্তী সম্ভাবনা ফিরে আসে যে, সেই তাঁবেয়ী যা'ঈফ হবেন অথবা ছিকাহ । এভাবে পর্যায়ক্রমে

সম্ভাবনা হতেই থাকবে । যুক্তির বিচারে এ সম্ভাবনার কোনো শেষসীমা নেই । অবশ্য বাস্তব দৃষ্টিকোণ

থেকে অনুসন্ধান মারফত এক তাঁবেয়ী হতে অপর তাঁবেয়ীর রেওয়ায়েত করার ধারাবাহিকতা ছয় কিংবা

সাত স্তর পর্যন্ত চলতে পারে ।

মোটকথা, মুরসালের হকুমের ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও পূর্বোক্ত সম্ভাবনার কারণে তাকে মারদূদের শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।

فَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسَلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَذَهَبَ جُمُهورُ
الْمُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ لِبَقَاءِ الْإِحْتِمَالِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ وَثَانِيهِمَا
وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيِّينَ وَالْكَوْفِيِّينَ يَقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحه)
يَقْبَلُ إِنْ اِعْتَصَدَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ يَبَيِّنُ الطَّرِيقَ الْأَوَّلَى مُسْنَدًا كَانَ
أَوْ مُرْسَلًا لِيَتَرَجَّحَ إِحْتِمَالُ كَوْنِ الْمُحَدَّثِ ثِقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَنَقَلَ أَبُو
بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الرَّاويَ إِذَا
كَانَ يُرْسَلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَقْبَلُ مُرْسَلُهُ إِتِّفَاقًا .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ السِّقْطِ مِنَ الْإِسْنَادِ إِنْ كَانَ يَأْتِيْنِ فَصَاعِدًا
مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ الْمَعْضَلُ وَالْأَيَّانُ كَانَ السِّقْطُ اثْنَيْنِ غَيْرِ مُتَوَالِيَيْنِ
فِي مَوَاضِعٍ مَثَلًا فَهُوَ الْمَنْقَطِعُ وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ
إِثْنَيْنِ لَكِنْ يَشْرَطُ عَدَمُ التَّوَالِي .

অনুবাদ : যদি উক্ত তাবেয়ী সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কারো
নিকট থেকে মুরসাল রেওয়ায়েত করেন না, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেবাম হাদীসটিকে মূলতুবি
(স্থগিত) রাখার পক্ষপাতী। কেননা, সন্দেহ বহাল থেকে যায়। এটি ইমাম আহমাদ (র.)-এর দুই
অভিমতের একটি। দ্বিতীয় মত যা ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও অভিমত, তা
হলো- সাধারণভাবে তা গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে- তা শক্তি
সম্বন্ধ করে অন্য একটি সনদে বর্ণিত হবার কারণে। সে সনদটি মুত্তাসিল হোক কিংবা মুরসাল।
কেননা, এতে করে উহা ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের
মধ্যে আবু বকর রাযী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাযী বর্ণনা করেছেন, কোনো রাবী যদি
নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল রেওয়ায়েত করেন, তাহলে সকলে একমত
যে, তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সনদ থেকে রাবী বাদ পড়ে যাওয়ার তৃতীয় প্রকার হলো, যদি পরস্পর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ
পড়ে, তাহলে তার নাম 'মু'যাল'। আর যদি এরূপ না হয়; বরং দুজন বাদ পড়লেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
থেকে হয়, কিংবা মাত্র একজন বাদ পড়ে, অথবা দুয়ের অধিক বাদ পড়লেও এক স্থান থেকে না হয়,
তাহলে তার নাম মুনকাতি'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرْسَل -এর হুকুম : যে তাবেয়ী إرسال করেন, তার অভ্যাস সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, তিনি
নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য সকল রাবীকে حَدَّث করেন অর্থাৎ তাদের বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন,
তাহলে তার হাদীসে মুরসাল আবু বকর রাযী হানাফী এবং আবুল ওলীদ রাযী মালিকী-এর বর্ণনা মতে
সর্বসম্মতিক্রমে মারদূদ।

আর যদি এ অভ্যাস সম্পর্কে জানা যায় যে, তাবেয়ী কেবল নির্ভরযোগ্য রাবী হতে **إِسْرَافُ** করেন, তাহলে তার **حَدِيثُ مُرْسَلٌ** -এর হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. **জুমহুরের*** অভিমত ও ইমাম আহমদ (র.) -এর এক উক্তি : তাঁদের সূচিস্থিত অভিমত হলো, এমন মুরসাল হাদীসের হুকুম হলো তা স্থগিত থাকবে। কারণ, এ সম্ভাবনা থাকে যে, তাবেয়ী হয়তো অভ্যাসের বিপরীত অনির্ভরযোগ্য রাবী হতে **إِسْرَافُ** করেছেন। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, উহ্য রাবী তাবেয়ীর মতে নির্ভরযোগ্য হলেও বাস্তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

২. মালিকী, আহলে কুফা এবং আহনাফের অভিমত : তাঁদের মতে হাদীসে মুরসাল নির্বিচারে মাকবুল। চাই তার সমর্থক পাওয়া যাক বা না যাক। এটা ইমাম আহমদ (র.) -এর দ্বিতীয় আরেকটি উক্তি।

কতকের মতে এ প্রকার মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীস থেকেও শক্তিশালী। কারণ, যিনি **مُسْنَدًا** হাদীস রেওয়ায়েত করেন তিনি সনদের দায়িত্ব অন্যের কাঁধে অর্পণ করেন। আর যিনি **مُرْسَلًا** রেওয়ায়েত করেন, তিনি নিজেই সনদের দায়িত্বশীল হন।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে মুরসাল হাদীস মারদূদ। তবে যদি এ হাদীসটি ভিন্ন আরেকটি সনদে বর্ণিত হয়, চাই সেটা (দ্বিতীয় হাদীসটি) **مُرْسَلٌ**, **مُسْنَدٌ**, **مَقْبُولٌ**, **مَرْدُودٌ** হোক না কেন। যেহেতু এ সুরতে উহ্য রাবীর নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবে অধিক মাত্রায় থাকে, তাই হাদীসে মুরসালটি মাকবুল হবে।

উল্লেখ্য যে, **مُرْسَلٌ** -এর উল্লিখিত হুকুম তখনকার, যখন উহ্য রাবী সাহাবী হবেন না। যদি উহ্য রাবী সাহাবী হন, তাহলে সে মুরসাল হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে মাকবুল। কেননা, সকল সাহাবী আদিল। অনুরূপ সাহাবীদের মুরসাল হুজ্জত এবং দলিলযোগ্য। কারণ, তাবেয়ী প্রমুখ থেকে সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত করাটা খুব কমই হয়। আর হলেও তাঁরা তা বলে দেন।

সারকথা হলো, **مُرْسَلٌ** -এর কিছু সুরত সর্বসম্মতিক্রমে মাকবুল, আর কিছু সুরত মতভেদপূর্ণ। তারপরেও সম্মানিত লেখক মুরসালকে মারদূদের শ্রেণিতে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর কাছে তৃতীয় অভিমতটি অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক বর্ণিত অভিমতটি অধিক পছন্দনীয়। আর তিনি যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবালম্বী তাই এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

مُغْضَلٌ -এর আভিধানিক অর্থ : **مُغْضَلٌ** শব্দটি **إِفْعَالٌ** থেকে **إِسْمٌ مَفْعُولٌ** -এর সীগাহ। এটা **أَغْلَضَ** থেকে এসেছে। এর অর্থ - যার মাধ্যমে ক্রান্ত করা হয়েছে অথবা যার ব্যাপারে ক্রান্ত করা হয়েছে। যেহেতু পরপর দুই রাবীর নাম উল্লেখ না করায় মানুষ এ হাদীসের ব্যাপারে ক্রান্ত হয়ে যায়, তাই **مُغْضَلٌ** (ক্রান্ত) করে নাম রাখা হয়েছে।

مُغْضَلٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : **حَدِيثُ مُغْضَلٌ** হাদীসের পরিভাষায় **مُغْضَلٌ** -এর সংজ্ঞা হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي حُذِفَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ فَاتَّكَرَرَ مَعَ التَّوَالِيِ -

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে পরপর দুজন রাবীকে **حُذِفَ** করে (বাদ) দেওয়া হয়, তাকে বলে **مُغْضَلٌ**। (চাই এই রাবীর বাদ পড়াটা সনদের শুরু থেকে হোক, কিংবা মাঝখান থেকে হোক কিংবা শেষ থেকে হোক।)

বস্তুত এ কারণে **مُغْضَلٌ** কখনো **مُحْتَلَقٌ**, কখনো **مُرْسَلٌ** এবং কখনো **مَنْقَطِعٌ** -এর সাথে একত্রিত হয়ে যায়।

حَدِيثُ مُغْضَلٌ -এর শর্ত : কোনো হাদীস **مُغْضَلٌ** হওয়ার জন্য শর্ত দুটি।

* সম্মানিত লেখক জুমহুরের যে মতামত এখানে উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব ধারণা ও জ্ঞানের আলোকে। নতুবা বাস্তব তথ্য হলো, হাদীসে মুরসাল মাকবুল হওয়াই হলো জুমহুরের মাযহাব।

১. নূনতম (কমপক্ষে) দুজন রাবী বাদ পড়া এবং

২. দু রাবীর বাদ পড়াটা পরপর হওয়া। এ দু শর্তের কোনো একটি অনুপস্থিত হলে সে হাদীস **مُنْقَطِعٌ** হয়ে যাবে।

مُنْقَطِعٌ এবং **مُنْعَضٌ** -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যথা—

১. সনদের যে কোনো স্থান থেকে পরপর দুজন রাবী পড়ে গেলে তার নাম মু'যাল, তবে **مُنْعَضٌ** হওয়ার জন্য সনদের শুরু থেকে রাবীর পড়ে যাওয়া শর্ত।

২. **مُنْعَضٌ** -এর জন্য দুজন রাবী পড়ে যাওয়া শর্ত; কিন্তু **مُنْعَضٌ** এক রাবী পড়ে গেলেই হয়ে যায়। তবে তা সনদের শুরু থেকে হতে হবে।

৩. **مُنْعَضٌ** -এর মধ্যে দুই রাবীর পতনটা পরপর হতে হবে; **مُنْعَضٌ** -এ এই শর্ত নেই।

৪. **مُنْعَضٌ** -এর মধ্যে রাবীর পতনটা লেখকের ইচ্ছায় হয়, আর **مُنْعَضٌ** টা এর তুলনায় **عَامٌ** অর্থাৎ তা কখনো লেখকের ইচ্ছায় হয় আবার কখনো লেখকের ইচ্ছা ছাড়াই হয়।

مُنْعَضٌ ও **مُنْعَضٌ** -এর মধ্যে সম্পর্ক : উল্লিখিত পার্থক্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, **مُنْعَضٌ** ও **مُنْعَضٌ** -এর মধ্যে **عَامٌ** ও **وَخَاصٌّ مِنْ وَجْهِ** -এর সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, যদি সনদের শুরু থেকে পরপর দুজন রাবী পড়ে যায়, তাহলে সেটা **مُنْعَضٌ** এবং **مُنْعَضٌ** উভয়ই। আর যদি সনদের শুরু থেকে একজন রাবী পড়ে যায় অথবা দুজন কিন্তু পরপর নয়, তাহলে সেটা **مُنْعَضٌ**; **مُنْعَضٌ** নয়।

مُنْقَطِعٌ -এর আভিধানিক অর্থ : **مُنْقَطِعٌ** শব্দটি **بَابُ اِنْقِطَاعٍ** থেকে **اِسْمٌ فَاعِلٌ** -এর **رَاجِدٌ مَذْكُورٌ** ; এর অর্থ— যে বিচ্ছিন্ন হয়। যেহেতু এ হাদীস থেকে রাবী পড়ে যাওয়ায় সনদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়, তাই তাকে **مُنْقَطِعٌ** বলে।

مُنْقَطِعٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : **مُنْقَطِعٌ** -এর পারিভাষিক অর্থ হলো—

مَوْلَا الْعِدَّةِ الَّذِي حُذِفَ مِنْ اَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ فَاكْثَرَ مَعَ عَدَمِ التَّوَالِيِ .

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে এক বা একাধিক রাবীকে বাদ দেওয়া হয়, তবে একাধিক রাবী পরপর হবে না।

مُنْقَطِعٌ এবং **مُرْسَلٌ** -এর মধ্যে পার্থক্য : **مُنْقَطِعٌ** ও **مُرْسَلٌ** -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা—

১. জুমহুরের অভিমত : এ ব্যাপারে জুমহুরে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত হলো— **مُرْسَلٌ** ও **مُنْقَطِعٌ**

-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে এ পার্থক্য কেবল **اِسْمٌ** -এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ **مُنْقَطِعٌ** ও **مُرْسَلٌ** শব্দ

ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যেমন— যখন বলা হবে **هَذَا مُرْسَلٌ** বা **هَذَا مُنْقَطِعٌ** তখন এ পার্থক্য প্রযোজ্য

হবে। অর্থাৎ **مُرْسَلٌ** -এর অর্থ হবে, যে হাদীসের সনদ থেকে সাহাবী বাদ পড়েছে। আর **مُنْقَطِعٌ**

হলে তখন অর্থ হবে, সনদ থেকে সাহাবী ব্যতীত অপর কোনো রাবী বাদ পড়েছে।

অবশ্য **فِعْلٌ** ব্যবহারের সময় কেবল **اِرْسَالٌ** মাসদার থেকেই **فِعْلٌ** ব্যবহৃত হয়; **اِنْقِطَاعٌ** মাসদার থেকে

فِعْلٌ ব্যবহৃত হয় না। যেমন বলা হয়— **اَرْسَلَهُ فَلَانَ**। চাই বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল হোক কিংবা মুনকাত্তি'।

ثُمَّ أَنَّ السَّقَطَ مِنَ الْإِسْنَادِ قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا يَخْصُلُ الْإِشْتِرَاكُ فِي مَعْرِفَتِهِ
يَكُونُ الرَّاَوِيُّ مَثَلًا لَمْ يَعْاصِرْ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ يَكُونُ خَفِيًّا فَلَا يُذَرِّكُهُ إِلَّا
الْأَيْمَةُ الْحَدَّاقُ الْمُطَّلِعُونَ عَلَى طُرُقِ الْحَدِيثِ وَعِلَلِ الْأَسَانِيدِ فَالْأَوَّلُ وَهُوَ
الْوَاضِحُ يُذَرِّكُ بَعْدَهُمُ التَّلَاقِي بَيْنَ الرَّاَوِيِّ وَشَيْخِهِ بِكَوْنِهِ لَمْ يُذَرِّكَ عَصْرَهُ أَوْ
أَذَرَّكَ لَكِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَلَيْسَتْ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وَجَادَةٌ وَمَنْ ثُمَّ اخْتَبَعَ
إِلَى التَّارِيخِ لِيَتَضَمَّنِهِ تَحْرِيزَ مَوَالِيدِ الرَّوَاةِ وَقَبَائِلِهِمْ وَأَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ
وَارْتِحَالِهِمْ وَقَدْ افْتَضَحَ أَقْوَامٌ أَدْعَوُا الرَّوَايَةَ عَنْ شَيْخٍ ظَهَرَ بِالتَّارِيخِ
كَذِبَ دَعْوَاهُمْ.

অনুবাদ : সনদ থেকে রাবীর নাম বাদ পড়ে যাবার বিষয়টি অনেক সময় স্পষ্ট থাকে। যে কেউ তা জানতে ও বুঝতে পারে। রাবী যখন তার পূর্বের ব্যক্তির সমসাময়িক না হয়, তখন এরূপ হয়ে থাকে। আবার কখনো হয় সূক্ষ্ম। হাদীসের সনদসমূহ ও সনদের দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ইমামগণ ব্যতীত অন্যেরা তা জানতে পারে না। প্রথম প্রকার অর্থাৎ স্পষ্ট ছেদ জানা যায় রাবী ও তার শায়খের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা জানা গেলে। যেমন— কোনো রাবী যদি তার উপরস্থ রাবীর সমসাময়িক না হন অথবা সমসাময়িক হলেও দুজন কখনো একত্রিত না হয়ে থাকেন এবং তার নিকট থেকে ইজাযত (অনুমতি) কিংবা কপি লাভ না করে থাকেন, তাহলে দুজনের মাঝে ছেদের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এ কারণে ইতিহাসের প্রয়োজন, যাতে রাবীদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, শিক্ষাকাল, শিক্ষা সমাপনকাল ইত্যাদি বর্ণিত থাকে।

এমন অেকেই অপমানিত হয়েছেন যারা বিভিন্ন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনার দাবি করেছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা তাদের দাবির অসত্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَقَطَ—এর সংজ্ঞা ও প্রকরণ : হাদীসের সনদ থেকে রাবীর পতনের নাম **سَقَطَ**। এটা দু প্রকার।

১. **سَقَطَ وَاضِحٌ** অর্থাৎ রাবীর পতন এমনভাবে হওয়া যে, যে কেউ তা বুঝে। চাই সে শাস্ত্রজ্ঞ হোক অথবা না হোক। এর অপর নাম মুরসালে জলী। ২. **سَقَطَ خَفِيٌّ** অর্থাৎ রাবীর পতন এমনভাবে হওয়া যে, সবাই তা বুঝে না; বরং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গই কেবল তা অনুধাবন করতে পারেন। এই **سَقَطَ خَفِيٌّ** দু প্রকার। ১. মুদাল্লাস ও ২. মুরসালে খফী।

مُرْسَلٌ جَلِيٌّ—এর সংজ্ঞা : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় **مُرْسَلٌ** হলো—

هُوَ مَا رَوَاهُ رَاوٍ كَبَتَ عَدَمَ التَّلَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ إِجَازَةٌ مِنْهُ وَلَا وَجَادَةٌ يَوْمَهُ السَّمَاعِ مِنْهُ وَقَدْ سَقَطَ رَاوٍ مِنْ بَيْنَهُمَا مِنَ السَّنَدِ .

অর্থাৎ যে হাদীসের **رَاوٍ** (বর্ণনাকারী) এবং **مُرَوِّى عَنْهُ** (যার থেকে বর্ণনা করছে) এর মাঝে জীবনে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি তা প্রমাণিত এবং বর্ণনাকারী তার গুস্তাদ হতে **إِجَازَةٌ** বা **وَجَادَةٌ** কোনোটাই পাননি,

কিন্তু রাবী এমন শব্দে (যেমন- عَنْ) হাদীস রেওয়ায়েত করেন যে, মনে হয় তিনি শুত্তাদ (سُرَيْدُ) থেকে হাদীসটি শুনেছেন অথচ বাস্তবে শুনেনি এবং তিনি মাঝখানে একজন রাবী বাদ দিয়েছেন।

سِنَطُ رَاضِعٍ বা سِنَطُ مَرْسَلٍ জানার পদ্ধতি : এটা তিনভাবে জানা যেতে পারে। যথা-

১. বর্ণনাকারী তার শায়খের জামানা পাননি।
২. জামানা পেয়েছেন, কিন্তু তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ না হওয়াটা প্রমাণিত।
৩. বর্ণনাকারী তার শায়খ থেকে إِجَازَةٌ পাননি আবার وَجَادَةٌ পাননি।

এ তিন সূরত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সনদে একজন রাবীর পতন হয়েছে।

ইতিহাস জানার গুরুত্ব : বর্ণনাকারী তার শায়খের যুগ পেয়েছেন কিনা, তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা এটা জানতে হলে রাবীদের জন্ম-মৃত্যু, ইলমার্জন, সফরের স্থান ও সময় ইত্যাদি জানা যেহেতু জরুরি আর এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ইতিহাসশাস্ত্রে, তাই হাদীসশাস্ত্রে ইতিহাসেরও বড় গুরুত্ব রয়েছে এবং এটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যুগে যুগে অনেকে বড় বড় ও নামকরা শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণের দাবি করেছিল এবং তাদের সূত্রে রেওয়ায়েতও করেছিল; কিন্তু ইতিহাসের সুবাদে যখন গিয়ে তাদের দাবি মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়েছে তখন তারা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়েছে।

سِنَطُ خَفِيِّ -এর প্রকরণ : سِنَطُ خَفِيِّ অর্থাৎ সনদ থেকে রাবীর পতনটা এমন অপ্রকাশ্য ও সূক্ষ্ম হওয়া যে, প্রাজ্ঞ ও হাদীসশাস্ত্রবিদ ছাড়া তা ধরতে পারে না। এ سِنَطُ خَفِيِّ দু প্রকার। ১. মুদাল্লাস ও ২. মুরসালে খফী। সামনে এগুলোর আলোচনা আসছে।

দুটি পরিভাষার ব্যাখ্যা : বক্ষ্যমাণ আলোচনায় উসুল হাদীসের দুটি পরিভাষা এসেছে। ১. إِجَازَةٌ ও ২. وَجَادَةٌ। কিতাবের শেষ দিকে এদের বিস্তারিত আলোচনা আসবে। তবে এখানে সংক্ষেপে তাদের পরিচয় তুলে ধরছি।

إِجَازَةٌ -এর ব্যাখ্যা : إِجَازَةٌ -এর অর্থ হলো, শায়খ কর্তৃক কাউকে তার সূত্রে হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করা। চাই সে সরাসরি শায়খ থেকে হাদীস শুনে থাকুক বা না শুনে থাকুক।

এ অনুমতি কখনো শায়খ মৌখিকভাবে প্রদান করেন, কখনো অনুমতি লিখিত আকারে প্রদান করেন।

وَجَادَةٌ -এর ব্যাখ্যা : ছাত্র যদি কারো কাছ থেকে হাদীসের এমন একটি লিখিত কপি পায় যার লেখক একজন পরিচিত মুহাদ্দিস, তাহলে তাকে وَجَادَةٌ (পাওয়া) বলে।

وَالْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ الْخَفِيُّ الْمُدْلِسُ بِفَتْحِ اللَّامِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الرَّائِي
لَمْ يَسْمِ مَنْ حَدَّثَهُ وَأَوْهَمَ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ وَأَشْتَقَّاهُ مِنَ
الدَّلِيسِ بِالتَّحْرِيكِ وَهُوَ اخْتِلَاطُ الظَّلَامِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي
الْخَفَاءِ .

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যেখানে রাবী পড়ে যাবার বিষয়টি সূক্ষ্ম হয় তার নাম মুদাল্লাস। এ নামকরণের কারণ, রাবী যার কাছে হাদীসটি শুনেছেন তার নাম উল্লেখ না করে এরূপ শব্দ ব্যবহার করেন যাতে হাদীসটি এমন ব্যক্তি থেকে শুনেছেন বলে মনে হয় যিনি তার কাছে সেটি বর্ণনা করেননি।

আর মুদাল্লাস শব্দটি 'দালাস' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ— অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া। এ নামকরণের কারণ (যুক্তি) হলো, উভয় ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংক্রান্ত আলোচনা : এ বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। আর তা হলো— ১. তাদলীসের অর্থ, ২. তাদলীসের প্রকারভেদ, ৩. তাদলীস করার কারণ, ৪. তাদলীস ও তা'লীকের মধ্যে পার্থক্য, ৫. হাদীসে মুদাল্লাসের সংজ্ঞা, ৬. হাদীসে মুদাল্লাসের নামকরণ, ৭. হাদীসে মুদাল্লাসের হুকুম। সম্মানিত লেখক শেষোক্ত তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শাস্ত্রীয় আলোচনার দাবিতে নিম্নে উক্ত সাত প্রকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. তাদলীসের অর্থ : **تَذْلِيلُ** শব্দটি **تَفْعِيلُ** -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অভিধানে এর অর্থ— ১.

দোষ লুকানো, ২. বিক্রীত-পণ্যের ক্রটি গোপন করা। পরিভাষায় **تَذْلِيلُ** বলে, রাবী যে ওস্তাদ থেকে হাদীস শুনেছেন তার নাম বাদ দিয়ে হাদীসকে ঐ উপরের রাবীর দিকে নিসবত দেওয়া যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলেও তিনি তার থেকে হাদীস শুনেনি।

অথবা, ওস্তাদের নামের পরিবর্তে তার অপরিচিত কোনো গুণ বা কুনিয়াত উল্লেখ করা।

অথবা, নিজের ওস্তাদের নাম উল্লেখ করলেও হাদীসকে অধিকতর ভালো বানানোর জন্য সনদের উপরের দিক থেকে কোনো যা'ঈফ বা নিম্নমানের রাবীকে বাদ দিয়ে সেখানে এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা শোনার কথা বুঝানোর সম্ভাবনা রাখে। এমন কারবার যে করে তাকে বলে মুদাল্লাস।

২. তাদলীসের প্রকারভেদ : তাদলীসের প্রসিদ্ধ প্রকার তিনটি। যথা—

ক. **تَذْلِيلُ إِسْنَادٍ** : অর্থাৎ রাবী নিজের ওস্তাদকে বাদ দিয়ে হাদীসের নিসবত উপরের রাবীর দিকে এমন শব্দের মাধ্যমে প্রদান করা, যা শোনার অর্থ বুঝিয়ে থাকে। যেমন— এভাবে বলা : **قَالَ** **بِأَسْنَانٍ** **عَنْ** **فُلَانٍ** **فُلَانٍ** ইত্যাদি। এমন তাদলীস নাজায়েজ এবং নিন্দনীয়।

খ. **تَذْلِيلُ سُبُحٍ** : রাবী ওস্তাদের পরিচিত নাম বাদ দিয়ে তার অপরিচিত নাম, গুণ, কুনিয়াত উল্লেখ করা। যদিও এমন তাদলীস জায়েজ কিন্তু না করাই ভালো।

গ. **تَذْلِيلُ التَّسْوِيَةِ** : অর্থাৎ মুহাদ্দিস তার ওস্তাদকে বাদ দেবে না; বরং হাদীসকে অধিকতর ভালো বানাতে উপরের কোনো যা'ঈফ বা নিম্নমানের রাবীকে বাদ দিয়ে সেখানে এমন শব্দ ব্যবহার করবে, যা শোনার কথা বুঝায়। এমন তাদলীস কঠিন হারাম এবং চরম নিন্দনীয়।

উল্লেখ্য যে, তাদলীস শব্দ মূলতাকভাবে বলা হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় **تَذْلِيلُ إِسْنَادٍ** -ই। বস্তুত এ কারণেই সামনে মুদাল্লাসের যে সংজ্ঞা ও হুকুম আসছে তা **مُدْلِسُ إِسْنَادٍ** -এরই।

৩. তাদলীস করার কারণ : তাদলীস মন্দ এবং নিন্দনীয় হলেও তা করা হয় দু কারণে। যথা—

ক. সংক্ষিপ্ততার জন্য। যেমন— এ উদ্দেশ্যে তাদলীস করেছেন ইমাম বুখারী (র.) এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.)। এমন তাদলীস নাজায়েজ নয়, তবে না করাই ভালো।

খ. অনেক সময় নিজের ওস্তাদ যা 'সিফ বা নিম্নমানের হয়, তখন নিজের হাদীসকে মাকবুল বানাতে অথবা হাদীসের স্তরকে উন্নত করতে ওস্তাদকে বাদ দিয়ে তাদলীস করে। যেহেতু এটা অসমর্থিত এবং মন্দ কারণ, তাই এমন তাদলীস হারাম এবং নিন্দনীয়।

৪. তাদলীস ও তা'লীকের মধ্যে পার্থক্য : তাদলীস ও তা'লীকের মধ্যে তিন ধরনের পার্থক্য রয়েছে। যথা—

ক. রাবীর পতন বা বাদ পড়াটা **تَغْلِيْق** -এর মধ্যে সুস্পষ্ট হয়; পক্ষান্তরে **تَذْلِيْس** -এর মধ্যে হয় অস্পষ্ট।

খ. রাবীর পতনটা **تَغْلِيْق** -এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে হয়; পক্ষান্তরে **تَذْلِيْس** -এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে হওয়ার পাশাপাশি মন্দ উদ্দেশ্যেও হয়।

গ. রাবীর পতন **تَغْلِيْق** -এর মধ্যে শুধু সনদের শুরু থেকে হয়; পক্ষান্তরে **تَذْلِيْس** -এর মধ্যে সনদের যে কোনো স্থান থেকে হয়।

৫. **إِسْمُ هَادِيْسٍ مَدْلُوْسٌ** -এর সংজ্ঞা : **الْمَدْلُوْسُ** (লাম বর্ণে যবর যোগে) শব্দটি **التَّذْلِيْسُ** মূলধাতু হতে **اسْمُ مَفْعُوْل** -এর **وَاحِدٌ مَذْكُوْرٌ**। **التَّذْلِيْسُ** শব্দের অর্থ **السَّلْعَةُ** অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যের দোষ গোপন করা। **الْمَدْلُوْسُ** শব্দটি **الذَّلْسُ** থেকে নির্গত। **الذَّلْسُ** অর্থ **اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ** তথা আলোর সাথে অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া।

উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় **الْحَدِيْثُ الْمَدْلُوْسُ** -এর সংজ্ঞা হলো—

هُوَ مَا رَوَاهُ رَآوٍ مِّنْ لَّمْ يَحْدِثْهُ بِهِ وَقَدْ عَرِفَ لِقَائَهُ إِثَاءً يَلْفِظُ بِهِمُ السَّمَاعَ مِنْهُ وَقَدْ سَقَطَ رَأْيُ مَنْ بَنِيَهُمَا مِنَ السَّنَدِ .

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী এবং তার ওস্তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়েছে তা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুবিদিত এবং রাবী এমন শব্দে (যেমন— **عَنْ**) হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন যে, মনে হয় তিনি তা তার ওস্তাদ থেকে শুনেছেন; কিন্তু বাস্তবে তিনি হাদীসটি শুনেনি— মাঝে একজন রাবীকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

সংক্ষেপে সংজ্ঞাটি এভাবেও দেওয়া যায় যে, **سَقَطَ** সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ রাবী তার ওস্তাদকে (যার থেকে সে হাদীস শুনেছে তাকে) বাদ দিয়ে তার উপরের এমন রাবীর প্রতি হাদীসের নিসবত দেয়, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলেও বর্ণিত হাদীসটি তিনি তার থেকে শুনেনি।

৬. মুদাল্লিসের নামকরণ : **التَّذْلِيْسُ** শব্দটির অর্থ দু রকম হয়। যথা—

ক. বিক্রীত-পণ্যের দোষ গোপন করা। এ প্রেক্ষিতে **الْمَدْلُوْسُ** -কে **التَّذْلِيْسُ** বলার কারণ হলো, **تَذْلِيْس** -এর মাধ্যমে শ্রোতা থেকে সঠিক বিষয়কে গোপন করা হয়।

খ. **التَّذْلِيْسُ** শব্দটি **الذَّلْسُ** থেকে নির্গত। **الذَّلْسُ** অর্থ **اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ** তথা আলোর সাথে অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া। এ অর্থে **الْمَدْلُوْسُ** -কে **التَّذْلِيْسُ** বলার কারণ হলো, যেহেতু মুদাল্লিস রাবী নিজ ওস্তাদের নাম উল্লেখ করে না; বরং হাদীসকে এমন রাবীর দিকে নিসবত করে যার থেকে সে শুনেনি। যার ফলে হাদীসের অশ্রবণটা (যেটা অন্ধকার) শ্রবণের (যেটা আলো তার) সাথে গুলিয়ে যায়।

وَرَدُّ الْمَدْلَسِ بِصِبْغَةٍ مِنْ صَبِغٍ أَلَدَاءِ يَخْتَمِلُ وَفُتُوْعَ اللَّقَاءِ بَيْنَ الْمَدْلَسِ
وَمَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ كَعْنٌ وَكَذَا قَالَ وَمَتَى وَقَعَ بِصِبْغَةٍ صَرِيحَةٍ كَانَ كَذِبًا
وَحَكْمٌ مَنْ ثَبَّتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ إِذَا كَانَ عَدْلًا أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا مَا صَرَحَ
فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ عَلَى الْأَصَحِّ.

অনুবাদ : মুদাল্লিস ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার সময় এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যাতে মুদাল্লিস ও তার বরাত দেওয়া ব্যক্তির মাঝে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন- ‘থেকে’, ‘বলেছেন’ ইত্যাদি। আর যদি সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহলে তো মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে।

যে রাবী সম্পর্কে প্রমাণিত হবে যে, তিনি তাদলীস করেন, তিনি যদি আদিল হন, তাহলে তার বর্ণনা বিশুদ্ধমত অনুসারে কেবলমাত্র সেটি গ্রহণযোগ্য হবে যাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় ‘শনেছেন’ বলে ঘোষণা দেন। (অস্পষ্ট কিংবা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করলে চলবে না।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৭. **حَدِيثٌ مُدْلَسٌ** -এর **হুকুম** : হাদীসে মুদাল্লাস-এর রাবী আদিল হবে না অথবা হবে। প্রত্যেকটি আবার দু দু প্রকার। রাবী সুস্পষ্ট শোনার শব্দে হাদীস বর্ণনা করবে (যেমন- **سَمِعْتُ** বা **رَأَيْتُ** ইত্যাদি) অথবা অস্পষ্টভাবেচ শব্দে বর্ণনা করবে (যেমন- **عَنْ فُلَانٍ كَذَا** ইত্যাদি)। এই মোট চার প্রকার হলো। এর হুকুম নিম্নরূপ-

প্রথম প্রকারের হুকুম : অর্থাৎ রাবী যদি আদিল না হয় এবং এমন শব্দ দ্বারা হাদীসে মুদাল্লাস বর্ণনা করে যা রাবী ও তার ওস্তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে- নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় না, যেমন- এভাবে বলে **عَنْ فُلَانٍ كَذَا** বা **قَالَ فُلَانٌ كَذَا** তাহলে এমন রাবীর হাদীসে মুদাল্লাস মারদূদ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম : আদিল নয় এমন রাবী যদি এমন শব্দ দ্বারা রেওয়াজেত করে যা রাবীর সাথে তার ওস্তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানায়, যেমন- এভাবে বলে **سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ كَذَا** বা **رَأَيْتُ فُلَانًا يَفْعَلُ كَذَا** ইত্যাদি তাহলে এমন রাবী ডাহা মিথ্যাবাদী হবে এবং তার হাদীস অবশ্যই মারদূদ হবে।

তৃতীয় প্রকারের হুকুম : তাদলীসটা যদি আদিল রাবী কর্তৃক এমন শব্দ দ্বারা হয়, যা রাবীর তার ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটা বুঝায় কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে না, তাহলে তার হাদীসও মাকবূল হবে না।

চতুর্থ প্রকারের হুকুম : আর যদি আদিল রাবী এমন সুস্পষ্ট শব্দে তাদলীস করে, যা তার ওস্তাদ থেকে শ্রবণের ফায়দা দেয়, যেমন- এভাবে বলে **سَمِعْتُ رَحَدَنَّا** ইত্যাদি, তাহলে এমন রাবীর হাদীস কারো কারো মতে মাকবূল না হলেও বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য উক্তি মতে তা মাকবূল হবে।

وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ إِذَا صَدَرَ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مِنْ حَدَّثَ عَنْهُ بَلْ بَيْنَهُ
وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدْلِسِ وَالْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ دَقِيقٌ يَخْصُلُ
تَحْرِيرُهُ بِمَا ذَكَرْ هُنَا وَهُوَ أَنَّ التَّدْلِيْسَ يَخْتَصُّ بِمَنْ رَوَى عَنْ مَنْ عُرِفَ
لِقَائِهِ إِيَّاهُ فَأَمَّا إِنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ إِنَّهُ لِقَبِيْهِ فَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ وَمَنْ
أَدْخَلَ فِي تَعْرِيفِ التَّدْلِيْسِ الْمُعَاصِرَةَ وَلَوْ يَغْيِرُ لِقَى لَزِمَهُ دُخُولُ الْمُرْسَلِ
الْخَفِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ وَالصَّوَابُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَبَدَلُ عَلَى أَنْ إِعْتِبَارَ
الِلْقَى فِي التَّدْلِيْسِ دُونَ الْمُعَاصِرَةِ وَحَدَّثَا لَا بَدَّ مِنْهُ إِطْبَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ
بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ الْمُخْضَرِمِيِّنَ كَأَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيّ وَقَيْسَ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمٍ مِنْ قُبَيْلِ
الْإِرْسَالِ لَا مِنْ قُبَيْلِ التَّدْلِيْسِ وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْمُعَاصِرَةِ يَكْتَفِي بِهِ فِي
التَّدْلِيْسِ لَكَانَ هَؤُلَاءِ مُدْلِسِينَ لَا تَتَّهَمُ عَاصِرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمٍ قَطْعًا وَلَكِنْ لَمْ يَعْرِفْ هَلْ لِقَوُهُ أَمْ لَا وَمِمَّنْ قَالَ
بِاشْتِرَاطِ اللَّقَاءِ فِي التَّدْلِيْسِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ وَكَلَامُ
الْخَطِيبِ فِي الْكِفَايَةِ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الْمَعْتَمَدُ.

অনুবাদ : মুরসালে খফীর ক্ষেত্রে একই হুকুম যদি তা এমন সমসাময়িক রাবী থেকে সংঘটিত হয় যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি; বরং দুজনের মাঝখানে মাধ্যম রয়েছে। মুদাল্লাস ও মুরসালে খফীর মধ্যকার পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম, আমার এখানকার আলোচনা দ্বারা তা উদ্ঘাটিত হয়। তা হলো, তাদলীস শুধু তার ব্যাপারে প্রযোজ্য যিনি এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা যায়। আর যদি তিনি সমসাময়িক হলেও তার সাথে সাক্ষাৎ হবার কথা জান না যায়, তাহলে তার নাম হয় মুরসালে খফী। যারা তাদলীসের সংজ্ঞায় ‘সাক্ষাৎ লাভ প্রমাণিত না হলেও সমসাময়িক হতে হবে’ বলে শর্ত যোগ করেছেন, তাদের সংজ্ঞা অনুসারে মুরসালে খফীও এর সাথে शामिल হয়ে যাবে। কিন্তু সঠিক মত হলো, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা। তাদলীসের জন্য শুধুমাত্র সমসাময়িকতা যথেষ্ট নয়; বরং সাক্ষাৎ লাভও যে জরুরি তার দলিল হলো, আবু ওহমান নাহদী, কয়েস ইবনে আবী হাযিম প্রমুখ মুখাযরাম ব্যক্তির নবী করীম ﷺ থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের ঐকমত্য হলো সেগুলোকে মুরসাল শ্রেণির অন্তর্গত করা, তাদলীসের নয়। তাদলীসের জন্য যদি শুধুমাত্র সমসাময়িকতা যথেষ্ট হতো, তাহলে এরা সবাই মুদাল্লাস বলে গণ্য হতেন। কেননা, তারা তো নবী করীম ﷺ -এর যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

তাদলীসের জন্য যারা সাক্ষাৎ লাভের শর্ত আরোপ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী (র.), আবু বকর বাযযার (র.) প্রমুখ। কিফায়া গ্রন্থে খতীবে বাগদাদীর বক্তব্যেরও এটি চাহিদা। আর এ মতই নির্ভরযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِرْسَال -এর মশহুর অর্থ হলো, সনদের শেষ থেকে তাবেয়ীর পরে রাবীকে বাদ দেওয়া। কিন্তু কখনো কখনো সনদের যে কোনো স্থান থেকে রাবী ফেলে দেওয়াকে إِرْسَال বলা হয়। (যেটা إِنْقِطَاع -এর অর্থ।) আর যে হাদীসের মধ্যে রাবীর এমন পতন ঘটে, তাকে বলে مُرْسَل -এর বক্ষ্যমাণ স্থলে مُرْسَل -এর এ অর্থটিই উদ্দেশ্য। এই মুরসাল হলো দু প্রকার।

إِرْسَالُ خَفِيٍّ -এর সিন্ধু-এর নাম سِقْطُ وَاضِع আর দ্বিতীয় প্রকার হলো مُرْسَلُ خَفِيٍّ, যা سِقْطُ خَفِيٍّ -এর দু প্রকারের (১. مُدَلَّسُ خَفِيٍّ) একপ্রকার।

إِرْسَالُ خَفِيٍّ -এর সংজ্ঞা : আরবিতে مُرْسَلُ خَفِيٍّ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ مَا رَوَاهُ رَآو تَبَيَّنَ الْمَعَاصِرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ لِقَبِهِ أَمْ لَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وَجَادَةٌ يَكْفِيهِمْ السَّمَاعُ مِنْهُ وَقَدْ سَقَطَ رَآوٌ مِنْ بَيْنِهِمَا مِنَ السَّنَدِ .

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী ও যার থেকে সে বর্ণনা করছে একই যুগের, কিন্তু উভয়ের মাঝে জীবনে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে কি হয়নি- তা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুবিদিত নয় এবং রাবী عَنْهُ থেকে إِجَازَةٌ বা مُرَوِّ عَنْهُ কোনোটাই লাভ করেননি; কিন্তু এমন শব্দে رَآوী রেওয়ায়েত করে যে, মনে হয় তিনি عَنْهُ থেকে হাদীসটি শুনেছেন অথচ বাস্তবে শুনেছেন; মাঝে একজন رَآوী -কে ফেলে দিয়েছেন।

এ সংজ্ঞাটি সংক্ষেপে এভাবেও দেওয়া যে, مُرْسَلُ خَفِيٍّ প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার রাবী এমন সমসাময়িক থেকে রেওয়ায়েত করেন, যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি; বরং রাবী ও مُرَوِّ عَنْهُ -এর মধ্যে মাধ্যম রয়েছে।

إِرْسَالُ خَفِيٍّ -এর উদাহরণ : ইবনে মাজাহ শরীফে عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ সূত্রে বর্ণিত রাসূলুহু ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসটি مُرْسَلُ خَفِيٍّ -এর উদাহরণ- رَجِمَ اللَّهُ حَارِثَ الْحَرَمِ -এর উদাহরণ-

কারণ হলো, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) -এর সাক্ষাৎ উকবা ইবনে আমিরের সাথে হয়নি।

(كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْمُرْزِيُّ فِي الْأَطْرَافِ)

إِرْسَالُ خَفِيٍّ -এর হুকুম : مُرْسَلُ خَفِيٍّ -এর হুকুম مُدَلَّس -এর মতো। অর্থাৎ مُدَلَّস যেমন অগ্রহণযোগ্য তেমনি مُرْسَلُ خَفِيٍّ ও অগ্রহণযোগ্য।

إِرْسَالُ خَفِيٍّ এবং مُرْسَلُ خَفِيٍّ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যথা নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. ইমাম শাফেয়ী, আবু বকর বাযযার ও খতীবে বাগদাদীর অভিমত : এ ব্যাপারে তাঁদের সূচিভিত্তি অভিমত হলো, রাবীর مُرَوِّ عَنْهُ -এর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটা যদি প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ হয়; কিন্তু রাবী عَنْهُ থেকে হাদীস না শুনে থাকেন, তাহলে সেটা তাদলীস।

পক্ষান্তরে রাবী যদি مُرَوِّ عَنْهُ -এর কেবল সমসাময়িক হন এবং তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ না হয়, তাহলে তা مُرْسَلُ خَفِيٍّ। এ ব্যাখ্যার সুবাদে তাদের মধ্যে نَسَبَتْ تَبَايُن -এর সম্পর্ক।

২. খুলাসা প্রণেতা, ইমাম নববী ইরাকীর অভিমত : তাঁদের মতে তাদলীসের জন্য لِقَاءُ তথা সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই; বরং রাবী ও مَرْوِي عَنْهُ সমসাময়িক হওয়াটাই যথেষ্ট, চাই সাক্ষাৎ হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে مُرْسَلٌ خَفِيٍّ -এর জন্য সাক্ষাৎ জরুরি। এ ব্যাখ্যার সুবাদে مُدَّلَّسٌ ও مُرْسَلٌ خَفِيٍّ -এর মধ্যে خَاصُّ مُطْلَقٌ -এর সম্পর্ক।

সঠিক মাযহাব ও তার দলিল : উপরিউক্ত দু অভিমতের মধ্যে প্রথম অভিমতটি অধিক বিস্তৃত এবং গ্রহণযোগ্য। এর বড় দলিল হলো, مُخْضَرِّمِينَ -এর রেওয়ায়েতকে সর্বসম্মতিক্রমে مُرْسَلٌ خَفِيٍّ -এর অন্তর্গত করা, مُدَّلَّسٌ -এর অন্তর্গত নয়।

এর ব্যাখ্যা হলো, যে সকল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ পেয়েছেন কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি তাদেরকে পরিভাষায় মুখাযরামীন বলে। (مُخْضَرِّمِينَ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। এদের মধ্যে আবু ওহমান নাহদী, কায়েস ইবনে আবী হাযিম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের রেওয়ায়েতকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে مُرْسَلٌ خَفِيٍّ বলে অভিহিত করেন, مُدَّلَّসٌ -এর অন্তর্গত করেন না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি তাদলীসের ক্ষেত্রে 'সাক্ষাৎ'-এর শর্ত না হতো; বরং শুধু সমসাময়িক হওয়াই যথেষ্ট হতো, তাহলে মুখাযরামীনদের রেওয়ায়েত অবশ্যই মুদাল্লাস-এর অন্তর্গত হতো, মুরসালে খফীর নয় এবং মুখাযরামীনরা মুদাল্লিস হতেন। অথচ কেউ তাদেরকে মুদাল্লিস বলেননি। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাদলীসের জন্য সাক্ষাৎ জরুরি; কেবল সমসাময়িক হওয়াই যথেষ্ট নয়।

مُرْسَلٌ خَفِيٍّ এবং مُدَّلَّسٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ-

১. مُرْسَلٌ جَلِيٍّ -এর রাবী ও مَرْوِي عَنْهُ সমসাময়িক হন না অথবা সমসাময়িক হন; কিন্তু উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ না হওয়াটা প্রমাণিত হয় এবং রাবী مَرْوِي عَنْهُ থেকে إِجَازَةٌ বা وَجَادَةٌ কোনোটাই পান না।

২. مُرْسَلٌ خَفِيٍّ -এর রাবী ও مَرْوِي عَنْهُ একই যুগের হন; কিন্তু তাদের মাঝের সাক্ষাৎ হওয়াটাও প্রমাণিত হয় না আবার না হওয়াটাও জানা যায় না।

৩. مُدَّلَّسٌ -এর রাবী ও مَرْوِي عَنْهُ -এর মাঝে সাক্ষাৎ হওয়াটা সুবিদিত হয়, কিন্তু বর্ণিত হাদীসটি রাবী مَرْوِي عَنْهُ থেকে শুনেন না।

وَعَرَفَ عَدَمَ الْمَلَقَاتِ بِأَخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ أَوْ يَجْزِمُ إِمَامٌ مُطَّلِعٌ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقَعَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ زِيَادَةٌ رَأَوْ أَوْ أَكْثَرُ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَنَّ مِنَ الْمَزِيدِ وَلَا يُحْكَمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِحُكْمِ كُلِّيٍّ لِتَعَارُضِ احْتِمَالِ الْإِتِّصَالِ وَالْإِنْقِطَاعِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ كِتَابَ التَّفْصِيلِ لِمَبْهَمِ الْمَرَاسِيلِ وَكِتَابَ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ وَأَنْتَهَتْ هُنَا أَقْسَامُ حُكْمِ السَّاقِطِ مِنَ الْإِسْنَادِ .

অনুবাদ : সাক্ষাৎ না হবার কথা জানা যায় রাবীর নিজ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার দ্বারা অথবা কোনো পণ্ডিত ইমামের জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে। রাবী ও তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির মাঝখানে কোনো কোনো সনদে সনদে অধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কেননা, এটি অতিরিক্ত বা সংযোজিত হতে পারে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদলীস বলে সাধারণ নীতি ঘোষণা করা যাবে না। কেননা, এখানে মুত্তাসিল ও মুনকাতি 'যে কোনোটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। খতীবে বাগদাদী এ সম্পর্কে লেখেছেন 'আত-তাফসীল লিমুবহামিল মারাসীল' ও 'আল-মায়ীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ'।

সনদ থেকে রাবী বাদ পড়ার প্রকারভেদ ও হুকুমের আলোচনা এখানে শেষ হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাক্ষাৎ না হওয়া জানার উপায় : **سَنُطَّ وَاضِعٌ** -এর মধ্যে রাবী ও **مَرْوِيُّ عَنْهُ** -এর মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়াটা খুব সহজেই জানা যায়। কিন্তু **مُدَّكِّنٌ** ও **مُرْسَلٌ خَفِيٌّ** -এর মধ্যে রাবী ও **مَرْوِيُّ عَنْهُ** -এর মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়াটা খুব সহজে জানা যায় না; বরং তা কেবল জানা যায় দু' উপায়ে।

১. রাবী নিজেই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, আমার সাক্ষাৎ **مَرْوِيُّ عَنْهُ** -এর সাথে হয়নি। যেমন- আলী ইবনে খাশরাম ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে ছিলাম। তিনি **عَنِ الزُّهْرِيِّ** বলে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইমাম যুহরী আপনাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি এ প্রশ্নে চুপ করে যান। পুনরায় **قَالَ الزُّهْرِيُّ** বলে হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে আবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি ইমাম যুহরী থেকে শুনেছেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি এ হাদীসটি ইমাম যুহরী থেকে শুনিনি এবং তার থেকেও শুনিনি, যিনি ইমাম যুহরী থেকে শুনেছেন; বরং **حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ** অর্থাৎ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক, তাকে বর্ণনা করেছেন মা'মার, তাকে বর্ণনা করেছেন ইমাম যুহরী।

২. হাদীসের কোনো ইমাম দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার সংবাদ দেবেন। যেমন- আওয়াম ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ يَلَأُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ وَكَبَّرَ .

কারণ হলো, হযরত ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের বেলায় বলেন যে, আওয়াম ইবনে হাওশাব আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফাকে পাননি। অর্থাৎ তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়নি। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, আওয়াম ও আব্দুল্লাহ-এর মাঝখানে একজন রাবীর পতন হয়েছে।

রাবী বৃদ্ধি পাওয়াটা সাক্ষাৎ না হওয়ার দলিল নয় : যদি অপর কোনো সনদে রাবী ও **مَرْوِيُّ عَنْهُ** -এর মাঝে এক বা একাধিক রাবী বেড়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা রাবী ও **مَرْوِيُّ عَنْهُ** -এর মাঝে সাক্ষাৎ না হওয়াটা প্রমাণিত হবে না। কারণ, হতে পারে এ সনদে রাবী বেড়ে গেছে যা প্রথম সনদে নেই; যাকে পরিত্যাজ্য **الْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ** বলে। আর তা বলা হয়, রাবী সনদে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভুলে বৃদ্ধি করে। এর বিবরণ সামনে আসবে।

ثُمَّ الطَّعْنُ يَكُونُ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ بَعْضُهَا أَشَدُّ فِي الْقَذْحِ مِنْ بَعْضٍ خَمْسَةٌ مِنْهَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَدَالَةِ وَخَمْسَةٌ يَتَعَلَّقُ بِالضَّبْطِ وَلَمْ يَخْصُلِ الْإِعْتِنَاءُ بِتَمْيِيزِ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ مِنَ الْآخِرِ لِمُضْلِحَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ وَهِيَ تَرْتِيبُهَا عَلَى الْأَشَدِّ فَالْأَشَدُّ فِي مُوجِبِ الرَّدِّ عَلَى سَبِيلِ التَّدْلِيلِ .

অনুবাদ : অভিযোগ হয় দশটি কারণে, দৃষ্ণীয়তার দিক দিয়ে যার কোনোটি অপেক্ষা কোনোটি অধিক গুরুতর। এর মধ্যে পাঁচটি হলো আদালাত বা দীনদারি সম্পর্কিত আর পাঁচটি আয়ত্তশক্তি সম্পর্কিত। এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিকে পৃথক করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি একটি কল্যাণ চিন্তায় যা এরূপ দাবি করেছে। আর তা হলো, প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে গুরুতর হবার দিক দিয়ে নিম্ন ক্রমানুসারে সাজানো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَعْن-এর অর্থ : হাদীস মারদুদ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ **طَعْن**। এর অভিধানিক অর্থ- বর্শা মারা, দোষ লাগানো। পরিভাষায় **طَعْن** বলা হয়, সুনির্দিষ্ট কতক কারণে রাবী দোষী ও অভিযুক্ত হওয়া। যে হাদীসের রাবীর মধ্যে দোষগুলো পাওয়া যায় সে হাদীসকে **حَدِيثٌ مَطْعُونٌ** বা অভিযুক্ত হাদীস বলে।

أَسْبَابُ طَعْن-এর সংখ্যা : **أَسْبَابُ طَعْن** বা দোষের কারণগুলো মোট দশটি। অর্থাৎ রাবী সাধারণত দশটি কারণে দোষী ও অভিযুক্ত হয়। এর মধ্য হতে কতক অপর কতক হতে গুরুতর। আর সে দশটি কারণ নিম্নরূপ :

১. **الْكَذِبُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ** : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর নামে অন্তত একটি হাদীস জাল করা।
২. **الْتِهْمَةُ بِالْكَذِبِ** : অর্থাৎ মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলা অথবা একক রাবীর বর্ণিত হাদীস শরিয়তের **قِيَاسٌ** কিংবা **سُنَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ** অথবা **قَوَاعِدُ مَعْلُومَةٍ**-এর খেলাপ হওয়া।
৩. **الْفِسْقُ** : অর্থাৎ রাবীর কবীরা গুনাহ করা অথবা সগীরা গুনাহ বারবার করা।
৪. **الْبِدْعَةُ** : অর্থাৎ রাবী বিদআতি হওয়া।
৫. **الْجَهْلُ** : অর্থাৎ রাবী **مَجْهُولٌ** বা অজ্ঞাত হওয়া।
৬. **فُتُحُ الْقَلْبِ** : অর্থাৎ রাবীর রেওয়ায়েতে প্রচুর ভুল হওয়া।
৭. **كَثْرَةُ الْغَفْلَةِ** : অর্থাৎ রাবীর উদাসীনতা বেশি হওয়া।
৮. **الْوَقْفُ** : অর্থাৎ রাবীর সংশয় ও দোদুল্যমানতার সাথে বর্ণনা করা।
৯. **مُخَالَفَةُ الْيَقَاةِ** : অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীর খেলাপ করা।
১০. **سُرُ الْخَفِظِ** : অর্থাৎ স্মরণশক্তি এত দুর্বল হওয়া যে, ভুলের চেয়ে সঠিকের সংখ্যা কম হয়।

এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি আদালাত তথা দীনদারি সম্পর্কিত আর শেষ পাঁচটি হলো **ضَبْط** তথা আয়ত্তশক্তি সম্পর্কিত। একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : সম্মানিত লেখক ... **وَلَمْ يَخْصُلِ الْإِعْتِنَاءُ...** বাক্যে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক আদালাত সংক্রান্ত **أَسْبَابُ طَعْن** এবং **ضَبْط** সংক্রান্ত **أَسْبَابُ طَعْن** পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ না করে এক প্রকারকে আরেক প্রকারের সাথে মিলিয়ে কেন উল্লেখ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর হিসেবে লেখক যা বলেছেন তার সারকথা হলো, **أَسْبَابُ طَعْن** উল্লেখের ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য হলো দশটি কারণের মধ্যে যেটি অভিযোগ বা দোষ হিসেবে অধিক গুরুতর সেটিকে প্রথমে উল্লেখ করা, এরপর যেটা অধিক দোষের সেটি উল্লেখ করা- এভাবে দোষের ক্রমানুসারে একটির পরে একটি উল্লেখ করা। যেহেতু এক এক শ্রেণিকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করতে গেলে এ লক্ষ্য ঠিক থাকে না, তাই শ্রেণিগতভাবে উল্লেখ করা হলো না। আর তা ঠিক না থাকার কারণ হলো, এক নম্বরে যেটি বেশি গুরুতর সেটি হয়তো আদালাত সংক্রান্ত; কিন্তু দ্বিতীয় নম্বরে যেটি বেশি গুরুতর সেটি হয়তো **ضَبْط** সংক্রান্ত- এভাবে অন্যগুলো দু প্রকারের মধ্যে মিশ্রিত আকারে রয়েছে।

لَاَنَّ الطَّغْنَ إِمَّا تَكُونُ لِكُذِبِ الرَّاَوِي فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ بِأَن يَرَوِي عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ أَوْ تَهَمَّتْ بِهِ بِذَلِكَ بِأَن لَا يَرَوِي ذَلِكَ الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكُذِبِ فِي كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ فُحْشِ غَلْطِهِ أَى كَثْرَتِهِ أَوْ غَفْلَتِهِ عَنِ الْإِتْقَانِ أَوْ فُسْقِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ مِمَّا لَمْ يَبْلُغِ الْكُفْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عُمُومٌ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الْأَوَّلُ لِكُونِ الْقَذَحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الْفَرْقِ وَأَمَّا الْفُسْقُ بِالْمُعْتَقَدِ فَسَبَابَتِي بَيَانُهُ أَوْ وَهْمُهُ بِأَن يَرَوِي عَلَى سَبِيلِ التَّوَهُّمِ أَوْ مُخَالِفَتِهِ أَى لِلشُّقَاتِ أَوْ جَهَالَتِهِ بِأَن لَا يَعْرِفُ فِيهِ تَغْيِيلٌ وَلَا تَجْرِئُحٌ مُعَيَّنٌ أَوْ يَدْعَتِهِ وَهِيَ إِعْتِقَادُ مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ الْمَعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْعَانِدَةَ بَلْ يَنْوَعُ شَبَهَةً أَوْ سُوءَ حِفْظِهِ وَهِيَ عِبَارَةٌ أَنَّ لَا يَكُونُ غَلْطُهُ أَقَلَّ مِنْ إِصَابَتِهِ .

অনুবাদ : কেননা, হয়তো অভিযোগটি হবে হাদীসে নববীর ব্যাপারে রাবীর মিথ্যাচারিতার কারণে । আর তা এভাবে যে, রাবী নবী করীম ﷺ থেকে ইচ্ছাপূর্বক এমন কথা রেওয়ায়েত করবে, যা তিনি বলেননি । অথবা (অভিযোগটা হবে) মিথ্যাবাদিতার সাথে তা অভিযুক্ত হওয়ার কারণে । আর তা এভাবে যে, সে একাই কোনো হাদীস বর্ণনা করবে, অথচ হাদীসটি (শরিয়তের) সর্বজনবিদিত মূলনীতির পরিপন্থি হবে । যেমনি কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ হয় যে, হাদীস বর্ণনায় তো তার মিথ্যাচারের প্রমাণ নেই, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলে থাকে বলে জানা যায় । এটি (দ্বিতীয় সূরতটি অর্থাৎ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা) প্রথমটি (সর্বজনবিদিত মূলনীতির পরিপন্থি হওয়া) অপেক্ষা কম গুরুতর । অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর অধিক ভুলের কারণে । অথবা সংরক্ষণে উদাসীনতার কারণে । অথবা কুফরির পর্যায়ে পৌঁছে না- এমন কাজে বা কথায় ফাসেকী করার কারণে । ফিসক এবং প্রথমটার (মিথ্যাবাদিতার) মধ্যে আম-খাস মুতলাকের সম্পর্ক । (ফিসক আম আর মিথ্যাচারিতা খাস ।) হাদীসশাস্ত্রে প্রথম অভিযোগটি সবচেয়ে মারাত্মক ও দৃশ্যীয় হওয়ায় তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । আর আকিদাগত ফিসকের আলোচনা অচিরেই সামনে আসবে । অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর সংশয়ের কারণে । অর্থাৎ সে হাদীস সংশয় ও দোদুল্যমানতার সাথে বর্ণনা করে । অথবা (অভিযোগটা হবে) ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা করার কারণে । অথবা তার অজ্ঞাত হওয়ার কারণে । অর্থাৎ তার সম্পর্কে সত্যায়ন (তা’দীল) কিংবা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ (জরাহ) কোনো কিছু জানা যায় না । অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর বিদআতি হবার কারণে । আর বিদআত হলো, নবী করীম ﷺ থেকে যা জানা গেছে তার বিপরীত উদ্ভাবিত বিষয়ের ব্যাপারে (শরিয়ত হওয়ার) বিশ্বাস স্থাপন করা । তবে তা বৈরিতা কিংবা হটকারিতার সাথে নয়; বরং একপ্রকার সন্দেহের মাধ্যমে (যা ভ্রান্ত দলিল হতে সৃষ্ট হয়েছে) । অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর শৃতিবিভ্রাটের কারণে । অর্থাৎ আর শৃতিবিভ্রাট হলো, তার ভুলটা সঠিকতার চেয়ে কম না হওয়া ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَذِبَ رَاوِي -এর মর্মার্থ : كَذِبَ رَاوِي -এর শাব্দিক অর্থ হলো- রাবীর মিথ্যা বলা। তবে এখানে যে কোনো মিথ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে এমন কথা রেওয়ায়েত করা, যা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেননি। চাই এটা যে কোনো একটি হাদীসের বেলায় হোক না কেন।

الْهَيْمَةُ بِالْكَذِبِ -এর মর্মার্থ : এ সূরতে রাবী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন না; বরং তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সন্দেহ করা হয়। আর তা দু কারণে। যথা-

১. এমন হাদীস রেওয়ায়েত করে, যা কুরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য মূলনীতির পরিপন্থি হয় এবং হাদীসটি কেবল সেই বর্ণনা করে।

২. হাদীসে নববীর বর্ণনায় মিথ্যা বলাটা প্রকাশ না পেলেও সাধারণ কথাবার্তা সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। এ দু সূরতের মধ্যে প্রথমটি অভিযোগ হিসেবে দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিক মারাত্মক।

نُحْشَ غُلَطٌ -এর মর্মার্থ : এর অর্থ হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করা। আর তা এভাবে যে, সঠিক হওয়ার চেয়ে ভুল হওয়াটাই বেশি হয় অথবা বরাবর হয়।

فَنَسَقَ رَاوِي -এর মর্মার্থ : فَنَسَقَ رَاوِي -এর অর্থ- রাবীর গুনাহগার হওয়া। এটা দুভাবে হতে পারে।

১. কাজে-কর্মে। যেমন- রাবী মদ পান করে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ইত্যাদি।

২. কথায়। যেমন- গিবত-শেকায়েত করা ইত্যাদি। তবে এ গুনাহের কথা বা কাজ এমন পর্যায়ে না হওয়া চাই, যা কুফর পর্যন্ত পৌছে দেয়। যদি তা কুফর পর্যন্ত পৌছে দেয়, তাহলে তার হাদীস অনিবার্যভাবে মারদূদ হবে।

كَذِبَ رَاوِي -কে পৃথকভাবে উল্লেখের কারণ : فَنَسَقَ رَاوِي টা কَذِبَ রَاوِي বা ব্যাপক। কারণ, كَذِبَ رَاوِي এটা কথার সাথে সীমিত। আর فَنَسَقَ টা কথায়, কাজে, বিশ্বাসে হতে পারে। এ ব্যাখ্যা হিসেবে যদিও كَذِبَ رَاوِي টা فَنَسَقَ রَاوِي -এর মধ্যে शामिल রয়েছে তথাপিও كَذِبَ রَاوِي -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, দোষের দিক দিয়ে মিথ্যাচারিতাটা فَنَسَقَ হতে অধিক মারাত্মক। এমনকি كَذِبَ رَاوِي -এর মধ্যে এটিই সবচেয়ে জঘন্য। অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যাচারীকে কাকিরও বলেছেন। মোটকথা, যেহেতু দোষ হিসেবে كَذِبَ রَاوِي সবচেয়ে জঘন্য এবং গুরুতর, এজন্য তার গুরুত্ব বুঝাতে তাকে স্বতন্ত্র শিরোনামে ও এক নম্বর দোষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَمَ رَاوِي -এর মর্মার্থ : وَقَمَ -এর অর্থ- ধারণা। এখানে উদ্দেশ্য হলো, রাবী ধারণার পন্থায় রেওয়ায়েত করেন। যেমন- কখনো حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ -কে مَرْفُوع মনে করে রেওয়ায়েত করেন ইত্যাদি।

جَهَّالَتِ رَاوِي -এর মর্মার্থ : جَهَّالَتِ -এর অর্থ- রাবী مَجْهُول তথা অজ্ঞাত হওয়া। আর এটা হয় তখন, যখন রাবীর আদালাত (আদিল হওয়া) সম্পর্কে জানা যায় না এবং তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো দোষও মেলে না।

سُرَّ حِفْظٌ -এর মর্মার্থ : سُرَّ حِفْظٌ তথা স্মৃতিবিভ্রাট বলে, রাবীর সঠিক থেকে ভুল কম না হওয়া। চাই ভুলটা সঠিকের বরাবর হোক কিংবা তার চেয়ে বেশি। কারণে ভুলটা সঠিকতা হতে কম হলে তার হাদীস মাকবুল হয়।

فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الطَّعْنُ بِكَذِبِ الرَّاَوِي فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ هُوَ الْمَوْضُوعُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَا بِالْقَطْعِ إِذْ قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوبُ لَكِنْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَلَكَ قُوَّةٌ يُمَيِّزُونَ بِهَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِطْلَاعُهُ تَامًا وَذِهْنُهُ ثَابِتًا وَفَهْمُهُ قَوِيًّا وَمَعْرِفَتُهُ بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُتَمَكِّنَةً وَقَدْ يُعْرِفُ الْوَضْعُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ بِذَلِكَ لِإِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كَذِبٌ فِي ذَلِكَ الْإِقْرَارِ إِنْتَهَى وَفِيهِمْ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارُ أَصْلًا لِكُونِهِ كَاذِبًا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ ، وَإِنَّمَا نَفَى الْقَطْعَ بِذَلِكَ وَلَا يَنْزِمُ مِنْ نَفْيِ الْقَطْعِ نَفْيُ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَقَعُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا سَأَغَ قَتْلُ الْمُقْرِ بِالْقَتْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزَّيْنِ لِإِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا كَاذِبَيْنِ فِيمَا اعْتَرَفَا بِهِ .

অনুবাদ : প্রথম প্রকারের অভিযোগ তথা হাদীসে নববীর মধ্যে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ থাকলে এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে বলে মাওযু' তথা বানোয়াট বা জাল হাদীস। এ হাদীসকে মাওযু' বলে সাব্যস্ত করা হয় প্রবলতার ধারণার ভিত্তিতে, নিশ্চয়তার সাথে নয়। কেননা, মিথ্যাবাদীও অনেক সময় সত্য কথা বলে। অবশ্য হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ এমন দৃঢ়বিচক্ষণতার অধিকারী হন যে, তারা তা পার্থক্য করতে পারেন।

কোনো হাদীসকে একমাত্র তিনিই মাওযু' সাব্যস্ত করতে পারেন, যিনি পূর্ণরূপে অবগতি রাখেন, যার মেধা স্বচ্ছ, বোধশক্তি সুদৃঢ় এবং এ বিষয়ে নির্দেশক আলামত সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন।

কখনো কখনো কোনো হাদীস মাওযু' বলে জানা যায় বানোয়াটকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন, 'তবে এতে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কেননা, সে এ স্বীকারোক্তিতেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে।' তাঁর এ বক্তব্য হতে অনেকেই বুঝেছেন যে, সে মিথ্যাবাদী হবার কারণে এ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, কিন্তু এটি তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি নাকচ করেছেন নিশ্চয়তাকে। আর নিশ্চয়তা নাকচ করার দ্বারা হুকুম বাতিল হয়ে যায় না। কেননা, প্রবলতার ধারণার ভিত্তিতেও হুকুম অবধারিত হয়। এখানেও অদ্রপ। যদি তা না হতো, তাহলে হত্যা স্বীকারকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া কিংবা জেনা স্বীকারকারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করার অবকাশ থাকত না। কেননা, তাদের স্বীকারোক্তিতে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসঙ্গ মাওযু' হাদীস : **أَسْبَابُ طَعْنٍ** -এর প্রথম প্রকারের নাম **حَدِيثُ مَوْضُوعٍ**। মাওযু' হাদীস প্রসঙ্গে ৬টি আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। যথা-

১. হাদীসে মাওযু'-এর সংজ্ঞা, ২. মাওযু' চেনার পদ্ধতি ও আলামত, ৩. মাওযু' বা জালকারীদের প্রকারভেদ, ৪. হাদীস জাল করার কারণ, ৫. হাদীস জাল করার হুকুম ও ৬. মাওযু' হাদীস বর্ণনা করার হুকুম। নিম্নে পরায়ক্রমে এ ৬টি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

১. হাদীসে মাওযু'-এর সংজ্ঞা : নিজের থেকে কোনো সনদ বানানো অথবা নিজে কোনো কথা বানিয়ে হাদীস বলে প্রচার করার নাম 'হাদীস তৈরি'। যে হাদীসের সনদ বা মতন এভাবে জাল করে তৈরি করা হয়, তাকে **حَدِيثُ مَوْضُوعٍ** বা জাল হাদীস বলে। যে এরূপ জাল হাদীস তৈরি করে, তাকে বলে **وَاضِعُ حَدِيثٍ** বা হাদীস জালকারী। **وَضَعَ** -এর আভিধানিক অর্থ- উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা।

حَدِيثُ مَوْضُوعٍ -এর উপরিউক্ত সংজ্ঞা হতে সহজেই অনুমিত হয় যে, মাওযু' দু' প্রকার। ১. নিজের পক্ষ হতে সনদ বানালে তাকে বলে **مَوْضُوعُ الْإِسْنَادِ** বা জাল সনদ, আর ২. নিজের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে হাদীস বলে প্রচার করলে তাকে বলে **مَوْضُوعُ الْمَتْنِ** বা জাল মতন (হাদীস)। কখনো একটি হাদীসের পুরো মতন তথা কথাই জাল হয় আবার কখনো অংশবিশেষ জাল হয়। এই জাল অংশটুকু হাদীসের শুরু, শেষ কিংবা মধ্যখান সব স্থানেই হতে পারে। সর্বপ্রথম হাদীস জাল করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। (লিসানুল মীযান)

আরবিতে **أَلْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ** -এর সংজ্ঞা হলো :

مَوَالِدُ الْحَدِيثِ الْمَخْتَلَفُ الْمَكْذُوبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থাৎ যে হাদীস রাসূলুল্লাহ **ﷺ** -এর নামে মিথ্যা করে রচনা করা হয়, তাকে **الحديث الموضوع** বলে।

২. মাওযু' চেনার পদ্ধতি ও আলামত : কোনো হাদীসের উপর 'জাল' হুকুম আরোপ করাটা নিশ্চয়তার সাথে হয় না; বরং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হয়। কারণ হলো, সত্যবাদী যেমন মিথ্যা বলতে পারে, তেমনি মিথ্যাবাদীও কখনো সত্য কথা বলে। তাই সম্ভব আছে, রাবী কোনো এক হাদীসের বেলায় মিথ্যার কারসাজি করলেও এ হাদীসে সে সত্যবাদী।

হাদীস মাওযু' তথা জাল কি জাল না- তা চেনার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

১- **لَا قَوْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَلَكَ قَوْلَهُ يَمَيِّزُنْ بِهَا ذَلِكَ** .

১. অর্থাৎ 'হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এমন দৃঢ়বিচক্ষণতার অধিকারী হন যে, তারা জাল হাদীসকে আসল হাদীস থেকে পৃথক করতে পারেন।' তবে এ পার্থক্য সবাই করতে পারে না; বরং যিনি হাদীস সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি রাখেন, যার মেধা স্বচ্ছ, বোধশক্তি সুদৃঢ় এবং এ বিষয়ে নির্দেশক আলামত সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন; তিনিই কেবল এ পার্থক্য করতে পারেন, মাওযু' হলে তা ধরতে পারেন।

ইমাম দারাকুতনী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাগদাদবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আপনারা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হন যে, যতদিন আমি জীবিত থাকবো, কেউ নবী করীম **ﷺ** -এর নামে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে পার পাবে না; আমার কাছে তা ধরা পড়বেই।

অনুরূপভাবে রবী ইবনে হায়ছাম বলেন, দিনের মতো হাদীসের একটি নূর আছে, যা আমি ভালোভাবেই চিনি। এমনভাবে রাতের মতো জাল হাদীসের একটি অন্ধকার আছে, যা সহজেই আমার চোখে ধরা পড়ে। অর্থাৎ হাদীস মাত্রই নূর যা চোখের সামনে জলজল করতে থাকে। পক্ষান্তরে হাদীসের সাথে অন্য কিছু মিশ্রণ ঘটলে তা অন্ধকারের ন্যায় চোখে ধরা পড়ে।

۲- وَكَذَّبُكَ الرَّسُولُ بِالْأَقْرَارِ وَأَضْمَعَهُ -

২. 'জাল' চেনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, জালকারীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি। যেমন- নূহ ইবনে আবী মারযাম মারওযী নিজে স্বীকার করেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কুরআনের ফজিলতের ব্যাপারে আপনি হযরত ইকরিমার সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেন, অথচ হযরত ইকরিমার অন্যান্য ছাত্ররা তো এ হাদীস রেওয়ায়েত করে না। জবাবে তিনি বলেন, যখন আমি দেখলাম মানুষ ফিক্‌হে আবী হানীফা এবং মাগাযীয়ে ইসহাক চর্চায় অধিক লিপ্ত, তখন আমি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে এ হাদীস জাল করি।

একটি আশ্চর্য ধারণার নিরসন : জালকারীর স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন, জালকারীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হাদীসের উপর 'জাল'-এর হুকুম দেওয়াটা একিনী (নিশ্চিতভাবে) নয়। কেননা, হতে পারে সে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিচ্ছে।

ইবনে দাকীকুল ঈদের কথা হতে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) এটা বুঝেছেন যে, জালকারীর স্বীকারোক্তির কোনো ধর্তব্য নেই এবং এ স্বীকারের ভিত্তিতে হাদীসকে 'জাল' বলা হবে না। কিন্তু বাস্তব তথ্য হলো, ইবনে জাওযী (র.) -এর এ ধারণা ও বুঝটা সঠিক নয়। কারণ, ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.) 'জাল'-এর **ظَنُّ غَالِبٍ** তথা অকাটা হওয়াকে নাকচ করেছেন মূল 'জাল' হওয়াকে নাকচ করেননি; বরং তা **ظَنُّ غَالِبٍ** -এর দ্বারা জাল হিসেবেই বাস্তু্য হবে এবং তার উপর 'জাল'-এর হুকুম আরোপিত হবে। যেমনিভাবে জালকারী ছাড়া অন্য কেউ 'জাল' হিসেবে সনাক্ত করলে সেটিও **ظَنُّ غَالِبٍ** -এর ভিত্তিতে হয়, অকাটাভাবে নয়।

শরিয়তের হুকুম অধিকাংশ **ظَنُّ غَالِبٍ** -এর ভিত্তিতে হয়। কারণ, যদি **ظَنُّ غَالِبٍ** -এর ধর্তব্য না হতো, তাহলে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যার কথা স্বীকার করে তাকে কিসাসের হুকুম দেওয়া জায়েজ হতো না। অনুরূপ যে ব্যক্তি নিজে জেনার কথা স্বীকার করে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা জায়েজ হতো না। কারণ, এখানে এ সম্ভাবনা থাকে যে, তারা নিজ স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ মিথ্যাভাবে নিজেকে খুনী ও ব্যভিচারী বলছে। সুতরাং এখানে তাদের নিজস্ব স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও যখন কিসাস এবং রজমের হুকুম দেওয়া হয়, তেমননি যে নিজে 'জাল' করেছে বলে স্বীকার করবে, তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ঐ হাদীসটিকে 'জাল' হিসেবে হুকুম দেওয়া হবে।

وَمِنَ الْقَرَأَيْنِ الَّتِي يُذَكِّرُ بِهَا الْوَضْعُ مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ الرَّأْيِ كَمَا وَقَعَ
لِمَاؤُنِ بْنِ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذُكِرَ بِحَضْرَتِهِ الْخِلَافُ فِي كَوْنِ الْحَسَنِ سَمِعَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَوْ لَا، فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَادًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَمَا
وَقَعَ لِغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ
فَسَاقَ فِي الْحَالِ إِسْنَادًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضْلِ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ فَزَادَ فِي
الْحَدِيثِ أَوْ جَنَاحٍ فَعَرَفَ الْمَهْدِيُّ أَنَّهُ كَذَبَ لِأَجْلِهِ فَأَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ
وَمِنْهَا مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ كَانَ يَكُونُ مُنَاقِضًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ أَوْ
السُّنَنِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْ صَرِيحِ الْعَقْلِ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ شَيْءٌ
مِنْ ذَلِكَ التَّوَاتُلِ ، ثُمَّ الْمَرْوِيُّ تَارَةً يَخْتَرِعُهُ الْوَاضِعُ وَتَارَةً يَأْخُذُ مِنْ كَلَامِ
غَيْرِهِ كَبَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَوْ قَدَمَاءِ الْحُكَمَاءِ أَوْ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ أَوْ
بِأَخْذِ حَدِيثًا ضَعِيفَ الْإِسْنَادِ فَيَرْكِبُ لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحًا لِيُرَوِّجَ .

অনুবাদ : আরো যেসব আলামত দ্বারা মাওযু' হাদীস চেনা যায় তার মধ্যে একটি হলো, রাবীর অবস্থা। মামুন ইবনে আহমাদ-এর বেলায় যেমন হয়েছিল। তার সামনে একদিন আলোচনা চলছিল হয়রত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হয়রত হাসান বসরী (র.) হাদীস শুনেছেন কিনা তা নিয়ে। তৎক্ষণাৎ সে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত একটি সনদ উল্লেখ করে বসল। যাতে তিনি ﷺ বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাসান বসরী শুনেছেন।

এমনভাবে গিয়াছ ইবনে ইবরাহীমের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত একটি সনদ সহকারে বর্ণনা করল— “নবী করীম ﷺ পর্যন্ত বলেছেন, প্রতিযোগিতায় বাজি ধরা বৈধ নয়— শুধুমাত্র তীরন্দাজি, উট চালনা, ঘোড়া চালনা ও কবুতর উড়ানো ব্যতীত।” হাদীসের মধ্যে সে (খলীফার তোষামোদ করতে গিয়ে) ‘কবুতর উড়ানোর’ কথাটি বাড়িয়ে বলেছে। মাহদী বুঝে ফেললেন যে, তাঁরই কারণে সে মিথ্যা বলেছে। তাই তিনি কবুতরটি জবাই করে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

মাওযু' হাদীসের আরেকটি আলামত হলো, খোদা হাদীসের অবস্থা। তা যদি কুরআন মাজীদের বর্ণনা, মুতাওয়াতিহ হাদীস, অকাটা ইজমা কিংবা সুস্পষ্ট জ্ঞানের এমন বিরোধী হয় যে, কোনো প্রকারেই ব্যাখ্যা মেনে নেয় না, তাহলে সে হাদীসও মাওযু' বলে গণ্য হতে বাধ্য।

মাওযু' হাদীস কখনো কখনো ব্যক্তি নিজেই তৈরি করে, আবার কখনো অন্যের কথা থেকে গ্রহণ করে যেমন— পূর্ববর্তী মনীষীগণ বা কোনো প্রাচীন দার্শনিক কিংবা ইসরাঈলীদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিকে মহানবী ﷺ -এর হাদীস বলে চালিয়ে দিল। আবার কখনো বা এমন হয় যে, একটি হাদীস বলল যার সনদ দুর্বল তারপর সেটিকে চালু করার জন্য তার জন্য একটি শক্তিশালী সনদ উদ্ভাবন করল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাওযু' হাদীস চেনার তৃতীয় পদ্ধতি হলো—

۳- يُدْرِكُ بِهَا الْوَضْعُ مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ الرَّاَوِي

৩. রাবীর অবস্থা দেখে জানা যায়। অর্থাৎ রাবীর অবস্থাই বলে দেয় যে, তার বর্ণিত হাদীসটি বানোয়াট ও জাল। এর দুটি ঘটনা নিম্নরূপ—

১. মামুন ইবনে আহমাদের ঘটনা : হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে হাদীস শুনেছেন কিনা তা নিয়ে একবার মামুন ইবনে আহমাদের সামনে লোকদের মতান্তর ঘটে। তিনি মতভেদ নিরসনার্থে তৎক্ষণাৎ একাট হাদীস তৈরি করেন, যার মধ্যে এ কথা বর্ণিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাসান বসরী আবু হুরায়রা হতে হাদীস শুনেছেন।

২. খলীফা মাহদীর দরবারে গিয়াছ ইবনে ইবরাহীমের ঘটনা : জগদ্বিখ্যাত খলীফা হারুনুর রশীদের পিতা মাহদীর দরবারে একবার গিয়াছ ইবনে ইবরাহীম নখরী এসে দেখেন খলীফা কবুতর নিয়ে খেলছেন। গিয়াছ তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ
গিয়াছ হাদীসটি বর্ণনায় খলীফাকে খুশি করতে হাদীসের শেষে جَنَاحٍ অর্থাৎ শব্দটুকু নিজের পক্ষ থেকে জুড়ে দেন, যা মূলত হাদীসের অংশ নয়। কিন্তু খলীফা বিষয়টি বুঝতে পারেন যে, সে তাকে খুশি ও তোষামোদ করতে এ অংশ হাদীসে যোগ করেছে। ফলে তিনি গিয়াছের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং কবুতর জবাই করার নির্দেশ দেন, যাতে আর কখনো কবুতর হাদীস জাল করার কারণ না হয়।

আলোচ্য দু ঘটনায় রাবীরা তাদের হাদীস জাল করেছে। তবে প্রথম ঘটনায় বর্ণিত পুরো হাদীসটি জাল বা বানোয়াট আর দ্বিতীয় ঘটনায় শেষ অংশটুকু জাল মাত্র। আর এগুলোর জাল হওয়া জানা গেছে রাবীর অবস্থা দ্বারা।

হাদীস জাল চেনার চতুর্থ পদ্ধতি হলো—

৪- مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ السَّوَرِي

৪. অর্থাৎ জাল চেনা যায় খোদ হাদীসের অবস্থা দেখে। অর্থাৎ হাদীসটি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও বিবেকের বিরোধী হয় যে, কোনো প্রকারেই ব্যাখ্যা মেনে নেয় না।

এর উদাহরণ হিসেবে হাফিজ যাহাবী (র.) মীযানে সূত্রে
عَمِدَ الرَّحْمَنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
إِنْ سَفِينَةَ تُرِجُ طَائِفَتْ بِالنَّبِيِّتِ وَصَلَتْ خَلْفَ الْمَقَامِ رُكْعَتَيْنِ
নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন—

অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) -এর নৌকা কা'বা শরীফ তওয়াফ করেছে এবং মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে দু রাকআত নামাজ পড়েছে।

যেহেতু নৌকা হয়ে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা ও মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়া অসম্ভব, তাই খোদ হাদীসটিই প্রমাণ করে যে, সেটি জাল।

মোটকথা, সম্মানিত লেখক এখানে মাওযু' বা জাল হাদীস চেনার ৪টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। ১. মুহাদ্দিসীনে কেরামের যোগ্যতা, ২. জালকারীর স্বীকারোক্তি, ৩. রাবীর অবস্থা এবং ৪. খোদ হাদীস। তবে অন্যান্য কিতাবে এ ৪টি ছাড়াও আরও অনেক নিদর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা মাওযু' হাদীস চেনা যায়।

৩. মাওযু' বা জালকারীদের প্রকারভেদ : মাওযু' বা হাদীস জালকারী তিন প্রকারের হয়। যথা—

১. কখনো নিজেই হাদীসটি তৈরি করে।

২. কখনো অন্যের কথাকে যেমন পূর্ববর্তী কোনো মনীষীর উক্তি, দার্শনিকের উক্তি, ইসরাঈলী রেওয়াজেতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি উল্লেখ করে।

৩. কেউ কেউ যাদুশক্তি হাদীসের সাথে সহীহ সনদ যোগ করে, যাতে হাদীসটি সনদের শক্তিতে সমাজে চালু হয়ে যায় এবং সবাই কবুল করে নেয়।

وَالْحَامِلُ لِلْوَضْعِ عَلَى الْوَضْعِ إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ كَالرَّزَادَقَةِ أَوْ غَلَبَةُ الْجَهْلِ
كَبَعْضِ الْمُتَعَبِّدِينَ أَوْ فَرَطُ الْعَصِيَّةِ كَبَعْضِ الْمُقْلِدِينَ أَوْ إِتِّبَاعُ هَوَى
بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ أَوْ الإِغْرَابُ لِقَصْدِ الإِسْتِهَارِ .

অনুবাদ : জালকারীকে হাদীস জাল করতে উদ্বুদ্ধ করে হয়তো দীনদারি না থাকাটা, যেমন- যিন্দীকরা অথবা অজ্ঞতা প্রবল হওয়া, যেমন- কতিপয় আবেদরা অথবা অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব, যেমন- কোনো কোনো মুকাল্লিদ অথবা কোনো শাসকের মনোবৃত্তি অনুসরণ অথবা খ্যাতি লাভ ও প্রশংসা হওয়ার ইচ্ছায় অভিনব হাদীস পেশ করা ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৪. হাদীস জাল করার কারণ : কয়েকটি কারণে মানুষ হাদীস জাল করে। যথা—

১. দীনহীনতা অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে বেদীনি দাখেল করে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা। যেমনটি যিন্দীক তথা বেদীন ও নাস্তিকরা করে থাকে।

হাফ্বাদ ইবনে যায়েদের বর্ণনামতে যিন্দীকরা চৌদ্দ হাজার হাদীস জাল করেছে। আব্দুল করীম আওয়া নিজেই স্বীকার করে যে, আমি চার হাজার হাদীস জাল করেছি। এর মধ্যে অনেক হালাল বস্তুকে হারাম এবং অনেক হারাম বস্তুকে হালাল করেছি। মোটকথা, এরূপভাবে অনেকে হাদীস জাল করেছে কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এ সকল জাল হাদীস চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে অনেকে স্বতন্ত্র কিতাবও লেখেছেন।

২. অজ্ঞতা প্রাধান্য পাওয়া। যেমন- অজ্ঞ সুফী-দরবেশ এবং মূর্খ আবেদরা তারগীব (আশামূলক) ও তারহীব (ভীতিমূলক) বিষয়ে হাদীস বানায়। যেমন- লাইলাতুল বরাত (শবে বরাত) সহ অন্যান্য বিশেষ রাতের নামাজ সম্পর্কীয় হাদীস।

হাদীস রচনাকারীদের মধ্যে অজ্ঞ সুফীরাই দীন ও তাদের নিজেদের জন্য বেশি ক্ষতিকর। কারণ, তারা হাদীস জাল করাকে দীনদারি মনে করে। তারা এতে ছুওয়াবেব ও আশা রাখে। ফলে তাদের পক্ষে জাল হাদীস পরিহার করা সম্ভব হয় না। সাধারণ মানুষ যেহেতু তাদেরকে দীনদার ও ধর্মপ্রাণ মনে করে তাদেরকে মান্য করে থাকে, তাই অতি সহজে মানুষ তাদের জাল হাদীস চক্রান্তের কবলে পড়ে যায়।

৩. অন্ধ পক্ষপাতিত্ব। অর্থাৎ স্বীয় মাযহাবের প্রতি অধিক দুর্বলতা ও পক্ষপাতহেতু নিজের মাযহাবের সমর্থন, প্রাধান্যদান কিংবা নিজের ইমামের মর্যাদা বর্ণনায় কখনো জাল হাদীস তৈরি করে। যেমন- মাযহাবলম্বীরা করে থাকে। মাযহাবের টানে হাদীস জালকারীদের মধ্যে একজন হলেন মামুন ইবনে আহমাদ হারকুবী। তার রচিত হাদীসের মধ্য হতে একটি হলো নিম্নরূপ—

يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَكُونُ آخِرَ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ .

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস নামে এক ব্যক্তির অবির্ভাব হবে, সে আমার উম্মতের জন্য ইবলিস অপেক্ষা অধিক ক্ষতির কারণ হবে।

মাযহাবী টানে জালকৃত আকেকটি হাদীসের নমুনা হলো- **أَبُو حَنِيفَةَ سُرِّجَ أُمِّي**

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবু হানীফা আমার উম্মতের সূর্য।

৪. শাসকের সন্তুষ্টি কামনা। অর্থাৎ শাসকের নৈকট্যার্জন বা তার প্রিয়পাত্র হতে তার কাজ বা অভিমতের স্বপক্ষে হাদীস বানানো। যেমনটি গিয়াছ ইবনে ইবরাহীম খলীফা মাহদীর জন্য জাল হাদীস বানিয়েছিল।

৫. অভিনব হাদীস বর্ণনা করা। অর্থাৎ বড় মুহাদিস, বড় আলিম বলে খ্যাতি লাভ এবং সন্তা জনপ্রিয়তা লাভের আশায় বানিয়ে বানিয়ে অভিনব হাদীস বয়ান করা।

সম্মানিত লেখক হাদীস জাল করার এ পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তবে এ ছাড়াও আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা-

৬. টাকা-পয়সা লাভ। অর্থাৎ হাদীস শুনিয়ে পুরস্কার লাভের আশায় হাদীস জাল করে। যেমনটি আবু সাঈদ মাদায়েনী করেছিল।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ তুয়ালিসী ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন মসজিদে রিসাফাতে নামাজ পড়েন। তাঁদের সামনে এক ব্যক্তি এসে এভাবে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করে যে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْبِيُّ بْنُ مَعِينٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخ

লোকটির হাদীস বর্ণনা করার মাঝে ইমাম আহমদ (র.) ইবনে মাস্নিনের দিকে তাকান অনুরূপ ইবনে মাস্নিনও ইমাম আহমদ (র.) -এর দিকে তাকান। ইমাম আহমদ (র.) ইবনে মাস্নিনকে বলেন, আপনি হাদীসটি তাকে বর্ণনা করেছেন? ইবনে মাস্নিন জবাবে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি হাদীসটি এইমাত্র তার মুখ থেকে শুনছি। লোকটি হাদীস বর্ণনা করা পর্যন্ত উভয় নীরব থাকেন। হাদীস বর্ণনা শেষ হলে ইবনে মাস্নিন তাকে কাছে আসতে বলেন। লোকটি পুরস্কার পাবার আশায় এগিয়ে যায়। ইবনে মাস্নিন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে হাদীসটি কে শুনিয়েছে? সে বলে, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে মাস্নিন। ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন বলেন, আমি হাম্বল ইয়াহইয়া আর ইনি হলেন আহমদ ইবনে হাম্বল। আমরা তো এমন হাদীস কখনো শুনিনি। যদি তোমার মিথ্যা বলার একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে আমাদের ছাড়া অন্যদের কাছে বলতে। লোকটি বলে, আমি এতদিন শুনে আসছিলাম যে, ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন বোকা। আজ বাস্তবে তার প্রমাণ পেলাম। ইবনে মাস্নিন জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে আমি বোকা হলাম? জবাবে সে বলে, পৃথিবীতে আপনারা ছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন এবং আহমদ ইবনে হাম্বল আর কেউ নেই? আমি আরও ১৭ আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে হাদীস লেখেছি। তার এ প্রলাপ শুনে ইমাম আহমদ (র.) ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন (র.)-কে বলেন, তাকে ছেড়ে দাও; চলে যাক। অতঃপর লোকটি তাঁদেরকে ব্যঙ্গ করতে করতে চলে যায়।

৭. স্বীয় অভিমত সমর্থন। অর্থাৎ নিজের রায় ও দাবির সমর্থন হিসেবেও হাদীস বানিয়ে থাকে। যেমন-
বিতর্কের সময় বিতর্ককারীরা অনেক সময় করে।

وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يَغْتَدِّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَغْضُ الْكَرَامِيَّةَ وَيَغْضُ
الْمُتَصَوِّفَةَ نُقِلَ عَنْهُمْ إِبَاحَةُ الْوَضْعِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَهُوَ خَطَأٌ
مِنْ فَاعِلِهِمْ نَشَأَ عَنْ جَهْلِ لَأَنَّ التَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيْبَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْكِذْبِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَى
إِلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ وَبَالِغٌ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْنِيُّ فَكَثُرَ مَنْ
تَعَمَّدَ الْكِذْبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

অনুবাদ : নির্ভরযোগ্য সকলেই এর প্রত্যেকটি হারাম হবার ব্যাপারে একমত। তবে কিছু সংখ্যক কাররামিয়া ও তথাকথিত সূফী সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা উৎসাহবাজক ও সতকীকরণ বিষয়ে হাদীস বানোয়াট করা জায়েজ মনে করে। এটি নিতান্তই ভুল। তাদের এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে মুর্থতা থেকে। কেননা, দীনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও আজাব থেকে সতকীকরণ শরয়ী আহকামেরই অন্তর্গত। উম্মতে মুহাম্মাদীয় অধিকাংশ এ ব্যাপারে একমত যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা কবীরা গুনাহ। ইমাম আবু মুহাম্মাদ জুওয়াইনী আরো কঠিন মন্তব্য করেন। 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যারোপ করে তিনি তাকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৫. হাদীস জাল করার হুকুম : হাদীস জাল করার হুকুম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ :

১. নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের অভিমত : তাঁদের সূচিস্তিত বাস্তব অভিমত হলো, যে কোনো উদ্দেশ্যে হাদীস বানানো হারাম এবং বড় বড় কবীরা গুনাহের অন্যতম।

২. আবু মুহাম্মাদ জুওয়াইনী-এর অভিমত : হাদীস বানানোর ব্যাপারে তাঁর অভিমত আরো কঠোর। স্বেচ্ছায় যারা হাদীস বানানোর মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে তিনি কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তবে শরয়ী হুকুমের দৃষ্টিতে তাঁর এ ফতোয়া ও অবস্থান সঠিক নয়। এমনকি তাঁর পুত্র ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী তাঁর পিতার এ ফতোয়া ও অবস্থানকে সঠিকতা বিচ্যুতি বলে অভিহিত করেছেন।

৩. কতিপয় কাররামিয়াদের অভিমত : কতিপয় কাররামিয়া ও কতক সূফীর অভিমত হলো, তারগীব-তারহীব তথা শরয়ী ব্যাপারে উৎসাহিত ও ভীতি প্রদর্শন সম্বলিত হাদীস বানানো জায়েজ; বরং এটা ছওয়াবেরও কাজ বটে।

কিন্তু তাদের এ মতামত সঠিক নয়; বরং ভুল। শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতাহেতু তাদের থেকে এ ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, তারা তারগীব-তারহীবকে শরয়ী আহকামের বাইরের বিষয় বলে মনে করেছে। অথচ বাস্তব কথা হলো, এগুলো শরয়ী আহকামেরই অন্তর্গত বিষয়। সুতরাং যেকোনভাবে শরিয়তের অন্যান্য আহকামের ব্যাপারে হাদীস বানানো জায়েজ নয়, তেমনি তারগীব-তারহীব বিষয়েও হাদীস বানানো বৈধ নয়। মোটকথা, হাদীস বানানোর ব্যাপারে তিন ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। ১. জায়েজ, ২. কুফর ৫ ৩. কবীরা গুনাহ। এর মধ্যে জায়েজ ও কুফর-এর উক্তি সঠিক নয়। এর বিপরীতে হারাম ও কবীরা গুনাহ- এই উক্তিটিই শরয়ী হুকুম হিসেবে সর্বোচ্চ সঠিক ও যথার্থ। আর এটিই হলো হাদীস জাল করার ব্যাপারে জুমহুরের অভিমত।

وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ رَوَايَةِ الْمَوْضُوعِ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْمَرْدُودِ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهْمَةِ الرَّائِي بِالْكَذِبِ هُوَ الْمَتْرُوكُ ، وَالثَّالِثُ الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْمُنْكَرِ قَبْلَ الْمُخَالَفَةِ ، وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ فَمَنْ فَحَشَ غُلْطَهُ أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ أَوْ ظَهَرَ فُسْهُ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ .

অনুবাদ : ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মাওযু' হাদীস বর্ণনা করাও হারাম। তবে যদি সাথে সাথে বলে দেওয়া হয় যে, এটি মাওযু' হাদীস, তাহলে বর্ণনা করা যাবে। (হারাম হওয়ার দলিল) কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন-

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ بَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ .

যে ব্যক্তি আমার বরাত দিয়ে এমন কোনো কথা বর্ণনা করবে যে সম্পর্কে তার ধারণা হলো, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে অন্যতম মিথ্যাবাদী। (মুসলিম শরীফ)

প্রত্যাখ্যাত হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রাবীর মিথ্যাচারে অভিযুক্ত (সন্দেহভাজন) হবার কারণে যা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাকে বলে মাতরুক। তৃতীয়টিকে বলে মুনকার। তবে তাদের মতে, যারা মুনকার হাদীসের সংজ্ঞায় বিরোধিতার শর্ত যোগ করেন না। তেমনি চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকারের নামও মুনকার। সুতরাং যার অধিক ভুল হবে কিংবা অধিক উদাসীনতা কিংবা যার দ্বারা ফাসেকী প্রকাশ পাবে, তার হাদীসকে বলা হবে মুনকার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৬. মাওযু' হাদীস বর্ণনা করার হুকুম : হাদীস বানানোর মতো বানানো হাদীস মানুষের মাঝে বর্ণনা করাও হারাম এবং মারাত্মক করীরা গুনাহ। দলিল হলো মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসটি-

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ بَرَأَ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

অবশ্য জাল হাদীস বর্ণনা করে সাথে সাথে যদি এ কথা বলে দেওয়া হয় যে, হাদীসটি কিন্তু জাল ও বানোয়াট তাহলে তখন এমন হাদীস বলা জায়েজ হবে এবং এভাবে সাথে সাথে জাল বলে দেওয়াটা ছুওয়াবের কারণ হবে।

اقسام طعن-এর দ্বিতীয় প্রকার হাদীসের নাম মাতরুক। এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ।

-এর -إِسْمٌ مِّنْعَمَلٍ ত্রিভাষ্যমূল হতে নির্গত শব্দটি اَلْمَعْرُوكُ : অর্থ-এর আভিধানিক -وَأَخَذَ مَذْكُرًا অর্থ-ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যাগ করা। এ হিসেবে اَلْمَعْرُوكُ অর্থ দাঁড়ায়- পরিত্যাজ্য, প্রত্যাহৃত।

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَأَى مِنْهُمْ بِالْكَذِبِ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় **الْمَتْرُوكُ** হলো,

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত কোনো রাবী থাকে, তাকে **الْحَدِيثُ الْمَتْرُوكُ** বলে।

বলা হয়- ১. এমন রাবীকে যিনি মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলেন অথবা ২. যে একক রাবীর বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ অথবা শরিয়তের সুবিদিত নীতির পরিপন্থি হয়।

এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার হাদীসের নাম মুনকার।

وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ -এর **إِسْمٌ مَفْعُولٌ** ক্রিয়ামূল হতে **الْإِنْكَارُ** শব্দটি **الْمُنْكَرُ** -এর আভিধানিক অর্থ : **الْمُنْكَرُ** অর্থ- অপরিস্ফুট, অপছন্দনীয় ইত্যাদি।

الْمُنْكَرُ -এর পারিভাষিক অর্থ : সম্মানিত লেখক **الْمُنْكَرُ** -এর সংজ্ঞা দুভাবে প্রদান করেছেন। এক স্থানে তিনি **الْمُنْكَرُ** -এর জন্য নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেছেন আর অপর স্থানে (আলোচ্যস্থলে) এ শর্ত করেননি।

যে স্থানে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেছেন সেখানে **الْمُنْكَرُ** -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- **هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَّةُ** অর্থাৎ ছিকাহ রাবীর খেলাপ যা **الْمُنْكَرُ** রাবীর রেওয়াজেতকে বলে।

আর যে স্থানে (যেমন- আলোচ্যস্থলে) রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেননি সে স্থানে প্রদত্ত সংজ্ঞার সারকথা হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَأَى نَحْشَ غَلَطٍ أَوْ كَثُرَتْ غَفَلَتُهُ أَوْ ظَهَرَ نَفْسُهُ مِمَّا لَمْ يَبْلُغِ الْكُفْرَ -এর

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে এমন কোনো রাবী থাকে যার মাঝে **نَحْشَ غَلَطٍ** অথবা **كَثُرَتْ غَفَلَتُهُ** -এর দোষ থাকে অথবা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোনো **قَوْلِي** অথবা **فِعْلِي** ফিসক প্রকাশ পায়, তাকে **الْحَدِيثُ الْمُنْكَرُ** বলে।

এ থেকে বুঝা যায় **مُنْكَرٌ** -এর সংজ্ঞায় মতভেদ আছে। কেউ তাতে ছিকাহ রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেন কেউ করেন না।

ثُمَّ الْوَهْمَ وَهُوَ الْقِسْمُ السَّادِسُ وَإِنَّمَا أَفْصَحَ بِهِ لَطُولُ الْفَضْلِ إِنْ أُطْلِعَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَهْمِ بِالنِّقَرَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَأْيِهِ مِنْ وَضْعِ مُرْسَلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْقَادِحَةِ وَيُخْصَلُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ وَجَمْعِ الطَّرِيقِ فَهَذَا هُوَ الْمَعْلَلُ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدْقُهَا وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَمَّا ثَابِتًا وَحِفْظًا وَإِسْعًا وَمَعْرِفَةً تَامَةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ وَمَلَكَةً قَوِيَّةً بِالْإِسَانِ وَالْمُتُونِ وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّانِ كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَالْبُخَارِيَّ وَيَعْقُوبَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ وَالدَّارِقُطَنِيَّ ، وَقَدْ يَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمَعْلَلِ عَنِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ كَالصَّبْرِ فِي نَقْدِ الدِّينَارِ وَالْدِرْهِمِ .

অনুবাদ : অভিযোগের ষষ্ঠ কারণ হলো ‘অহম’ বা সংশয়। যদি নিদর্শন দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, রাবী সংশয়ের সাথে মুরসাল কিংবা মুনকতি‘ হাদীসকে মুস্তাসিল করে বর্ণনা করেছে, অথবা এক হাদীসের সাথে অন্য হাদীসে যোগ করেছে, অথবা এরূপ কোনো দৃশ্যীয় কাজ করেছে; তাহলে সে হাদীসকে বলে মু‘আত্তাল। এটি চেনা যায় অধিক অনুসন্ধান ও সনদসমূহ একত্রিতকরণের মাধ্যমে।

মু'আল্লাহ ইলমে হাদীসের একটি সূক্ষ্মতম বিষয়। তাই তা সনাক্ত করতে পারেন কেবলমাত্র তিনি, যাকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন স্বচ্ছ বোধশক্তি, ব্যাপক স্মৃতিশক্তি, রাবীদের স্তরসমূহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য। সে জন্যই এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন এ শাস্ত্রের কয়েকজন মনীষী মাত্র। যেমন- আলী ইবনুল মাদানী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইয়াকুব ইবনে আবু শায়বা, আবু হাতেম রাযী, আবু যুরআ, দারাকুতনী প্রমুখ। কখনো কখনো মু'আল্লাহ সনাক্তকারীর ভাষা তার দাবির পক্ষে দলিল পেশ করতে অক্ষম থেকে যায়- দিনার-দিরহাম পরীক্ষকের যেমন হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : **وَلَيْسَ أَفْصَحَ بِهِ لَطَوِيلُ الْفَضْلِ** - এ বাক্যে সম্ব্যনিত লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক **طَعْنٌ** -এর অন্যান্য প্রকারের আলোচনায় প্রথম প্রকার, দ্বিতীয় প্রকার- এভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু **وَقَم** -এর বর্ণনায় প্রকারের কথা উল্লেখ না করে সম্পূর্ণভাবে নাম উচ্চারণ করলেন কেন?

লেখক এ প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেছেন তার সারকথা হলো, **وَقُمْ** -এর আলোচনা দীর্ঘ, যা **وَقُمْ** -এর উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে হওয়ার দাবি করে। বস্তুত এ কারণে তিনি এখানে 'ওয়াও' বাদ দিয়ে **قُمْ** হরফে আতফের মাধ্যমে পর্বের বাক্যের উপর আতফ করেছেন, যা বিলম্বতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

مُعَلَّلٌ । নিম্নে مُعَلَّلٌ । এ দোষে দোষী হাদীসকে বলে وَمُفْعَلٌ । এর ৬ষ্ঠ প্রকারের নাম اسْبَابٌ طَفْنٌ ।
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

এর- إِسْم مَفْعُولُ التَّغْيِيلِ শব্দটি ক্রিয়ামূল হতে নির্গত -এর- مُعَلِّلٌ এর আন্তিধানিক অর্থ : وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ । এর শাব্দিক অর্থ- مَا فِيهِ عِلَّةٌ অর্থাৎ যার মধ্যে দোষ আছে।

مُعَلَّلٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : উসুলুল হাদীসের পরিভাষায় المَعْلَلُ হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوَى عَلَى سَبِيلِ التَّوَهُّمِ بِرَفْعِ مَوْقُوفٍ أَوْ وَجَلِ مُنْقَطِعٍ أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ آخَرَ .

অর্থাৎ যে হাদীস বর্ণনায় রাবীর وَفَع হয় যে, রাবী مَوْقُوف হাদীসকে مَرْفُوع হিসেবে, مُنْقَطِع হাদীসকে مُتَّصِل হিসেবে অথবা এক মতন-এর স্থলে অন্য মতন রেওয়ায়েত করেন কিংবা এক মতন-এর মাঝে অন্য মতন প্রবিষ্ট করেন।

مُعَلَّلٌ فِي -এর প্রকারভেদ ও উদাহরণ : مُعَلَّلٌ দু প্রকার। ১. السَّنَدِ এবং ২. مُعَلَّلٌ فِي -এর অর্থ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো التَّحْنِ। নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

مُعَلَّلٌ فِي السَّنَدِ -এর অর্থ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُرْسَل বা مُنْقَطِع কে- হিসেবে রেওয়ায়েত করা। অথবা এক রাবীর স্থলে অন্য রাবীর নাম উল্লেখ করা।

مُعَلَّلٌ فِي السَّنَدِ -এর উদাহরণ : এর দুটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

এক. নিম্নের হাদীসটি السَّنَدِ -এর উদাহরণ-

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ الْخ

এ হাদীসটি যদিও আদিল রাবী আদিল রাবী হতে রেওয়ায়েত করেছেন তথাপি এ সনদে عَلَيْهِ তথা সূক্ষ্ম দোষ রয়েছে। কেননা, এ হাদীসের রাবী আমার ইবনে দীনার নয়; বরং আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার। কিন্তু রাবী ইয়া'লা ইবনে উবাইদ وَفَع তথা সংশয় হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারের স্থলে আমার ইবনে দীনারের নাম উল্লেখ করেছেন। এর প্রমাণ হলো, সুফিয়ানের অন্যান্য ছাত্ররা এ হাদীসটি عَنْ سُفْيَانَ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

এ হাদীসের সনদ مُعَلَّل হলেও মতন সহীহ এবং মাকবুল।

দুই. مُعَلَّلٌ فِي السَّنَدِ -এর দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ নিম্নের হাদীসটি।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

এ হাদীসটি যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ রেওয়ায়েত করেছেন। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) বলেন, এ হাদীসটি তিন কারণে مُعَلَّل। যথা-

১. ওসমান হলেন আবু সুলাইমান; ইবনে সুলাইমান নন।

২. ওসমান এ হাদীসটি عَنْ أَبِيهِ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন, আবু সুলাইমান তথা সুলাইমানের পিতা থেকে নয়।

৩. আবু সুলাইমান রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেনওনি আবার তাঁর থেকে হাদীসও শুনেনি।

مُعَلَّلٌ فِي السَّنَدِ -এর হুকুম : যে হাদীসের মধ্যে السَّنَدِ হয় তার সনদ مُعَلَّل হলেও মতন সহীহ ও মাকবুল হয়।

২. مُعَلَّلٌ فِي الْمَتْنِ -এর অর্থ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এক মতনের স্থলে অন্য মতন রেওয়ায়েত করা কিংবা এক মতনের মাঝে অন্য মতন প্রবিষ্ট করা।

مُعَلَّلٌ فِي الْمَتْنِ -এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি مُعَلَّلٌ فِي الْمَتْنِ -এর উদাহরণ।

لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا .

আবু সাঈদ ইবনে আবী মারইয়াম এ হাদীসটি عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ সূত্রে মারফু'ভাবে রেওয়ায়েত করেন। এ হাদীসটি مَعْلُومٌ فِي النَّحْلِ হওয়ার কারণ হলো, হাদীসোক্ত تَنَاسَلُوا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ অংশটুকু মূলত আরেকটি হাদীসের অংশ, যা مَرْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ সূত্রে মারফু'ভাবে বর্ণিত। পুরো হাদীসটি এরূপ—

إِيَّائِمُ وَالطَّنَّ فَإِنَّ الطَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَعَاذُوا وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَنَاسَلُوا وَلَا تَعَاذُوا .

কিন্তু রাবী আবু সাঈদ এ হাদীসের ইবারতকে পূর্বের হাদীসের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। আর একেই বলে عَلَّتْ فِي النَّحْلِ ।

عَلَّتْ বা দোষ জানার উপায় : عَلَّتْ ইলমে হাদীসের একটি সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিষয়। মাত্র তিন উপায়ে এটা জানা যেতে পারে। যথা—

১. তা সনাক্ত করতে পারে কেবলমাত্র তিনি, যাকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন স্বচ্ছ বোধশক্তি, ব্যাপক শ্রুতিশক্তি, রাবীদের স্তরসমূহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য।
বস্তুর এ কারণেই عَلَّتْ সম্পর্কে হাতে-গোনা কয়েকজন মুহাদ্দিস ছাড়া এ ব্যাপারে কেউ মুখ খোলেননি।
عَلَّتْ জানা যে একটি ইলহামী ব্যাপার নিম্নের ঘটনাটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এক ব্যক্তি মুহাদ্দিস আবু যুরআকে বলে, আপনারা যে হাদীসকে مَعْلُومٌ বলেন এর স্বপক্ষে আপনাদের দলিল কি? জবাবে তিনি বলেন, এর দলিল এটাই যে, তুমি আমার সামনে এমন কোনো হাদীস পেশ কর, যার মধ্যে কোনো عَلَّتْ আছে, তাহলে আমি ঐ عَلَّتْ সম্পর্কে তোমাকে বলে দেবো। অতঃপর তুমি এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম-এর কাছে উল্লেখ করে তার থেকে عَلَّتْ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে তোমাকে عَلَّتْ সম্পর্কে জানিয়ে দেবে। এরপর তুমি হাদীসটি পেশ করবে আবু হাতিমের কাছে। তাকে عَلَّتْ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। যদি আমাদের তিনজনের জবাব ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে বুঝবে আমাদের কথা ঠিক নয়। আর যদি আমাদের কথা এক রকম হয় অর্থাৎ সবাই একই عَلَّتْ সম্পর্কে জানায়, তবে বুঝবে এটি বাস্তব ব্যাপার। সকলের পক্ষে যা সম্ভব নয়। অতঃপর লোকটি তাই করে। দেখা গেল তিনজনের কথার মধ্যে মিল রয়েছে অর্থাৎ সকলে একই عَلَّتْ সনাক্ত করেছেন। তখন গিয়ে লোকটি বলে هَذَا الْعِلْمُ إِلَهُائِمْ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই (عَلَّتْ) জ্ঞানটি সম্পূর্ণ কুদরতী ও ইলহামী জ্ঞান।

২. কখনো দীর্ঘ অনুসন্ধান এবং সমস্ত সনদ তন্ন তন্ন করে খোঁজ করার মাধ্যমে এ عَلَّتْ সম্পর্কে জানা যায়।

৩. কখনো রাবীর এক হওয়া এবং নির্ভরযোগ্য রাবীদের খেলাপ করা থেকেও জানা যায়। তবে শর্ত হলো তার সাথে নিদর্শন যুক্ত থাকতে হবে।

وَقَدْ يَنْصُرُ عِبَارَةُ الْمَعْلُومِ : এ বাক্যে সম্মানিত লেখক একটি তথ্য জানাতে চেয়েছেন। আর তা হলো, مَعْلُومٌ হাদীসের দোষ সম্পর্কে অবহিত করলেও অনেক সময় তিনি নিজের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারেন না। তাঁকে যদি বলা হয়, আপনি যে عَلَّتْ -এর কথা বললেন, তার দলিল কি?

তখন তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল বলতে ব্যর্থ হন। কিন্তু তার এই দলিল বলতে না পারাটা হাদীসটি مَعْلُومٌ হওয়ার বিরোধী হয় না। হাদীসটি ঠিকই مَعْلُومٌ তথা দোষযুক্ত থাকে। مَعْلُومٌ -কে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে صَبْرَيْنِ তথা স্বর্ণ-রৌপ্য যাচাইকারীর সাথে। صَبْرَيْنِ কোন স্বর্ণ-রৌপ্য খাঁটি আর কোনটি ভেজাল তা স্বর্ণ-রৌপ্য হাতে নিয়েই বলতে পারে। কিন্তু তার কাছে তার দাবির স্বপক্ষে দলিল চাইলে অনেক সময় সে দেখাতে পারে না। ঠিক তেমনি مَعْلُومٌ -এ যুক্ত হাদীসের عَلَّتْ বা দোষ ঠিকই ধরে দিতে পারেন; কিন্তু অনেক সময় তার উপর দলিল দিতে পারেন না।

ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ وَهُوَ الْقِسْمُ السَّابِعُ إِنْ كَانَتْ وَاقِعَةً بِسَبَبِ تَغْيِيرِ السِّيَاقِ
أَيَّ سِيَاقِ الْإِسْنَادِ فَالْوَاقِعُ فِيهِ ذَلِكَ التَّغْيِيرُ مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ أَقْسَامُ
الْأَوَّلُ أَنْ يَرَوِيَ جَمَاعَةُ الْحَدِيثِ بِأَسَانِيدٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيَرَوِيهِ عَنْهُمْ رَاوٍ
فَيَجْمَعُ الْكُلَّ عَلَى إِسْنَادٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسَانِيدِ وَلَا يَبَيِّنُ الْإِخْتِلَافَ
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ عِنْدَ رَاوٍ إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ
فَيَرَوِيهِ عَنْهُ رَاوٍ تَامًا بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ
إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ فَيَسْمَعُهُ عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ فَيَرَوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًا بِحَدِّثِ
الْوَاسِطَةِ وَالثَّلَاثُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّاوِي مَتْنَانِ مُخْتَلِفَانِ بِإِسْنَادَيْنِ
مُخْتَلِفَيْنِ فَيَرَوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ مُقْصِرًا عَلَى أَحَدِ الْإِسْنَادَيْنِ أَوْ يَرَوِي أَحَدَ
الْحَدِيثَيْنِ بِإِسْنَادِهِ الْخَاصِّ بِهِ لَكِنْ يَزِيدُ فِيهِ مِنَ الْمَتْنِ الْآخَرَ مَا لَيْسَ
فِي الْأَوَّلِ الرَّابِعُ أَنْ يَسُوْقَ الْإِسْنَادَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ عَارِضٌ فَيَقُولُ كَلَامًا مِنْ
قَبْلِ نَفْسِهِ فَيُظَنُّ بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ هُوَ مَتْنُ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ
فَيَرَوِيهِ عَنْهُ كَذَلِكَ هَذِهِ أَقْسَامُ مُدْرَجِ الْإِسْنَادِ .

অনুবাদ : সপ্তম অভিযোগ হলো নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা। এটি যদি সনদের পরিক্রমায় পরিবর্তন সাধনের কারণে হয়, তাহলে যাতে এ পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে বলে মুদরাজুল ইসনাদ। এটি কয়েক প্রকার। যথা—

১. একদল রাবী হাদীসটিকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাদের বরাত দিয়ে উক্ত অভিযুক্ত রাবী যখন সেটি বর্ণনা করেন, তখন তিনি সবগুলোকে একটি মাত্র সনদে একত্রিত করে দেন—বিভিন্ন সনদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বলেন না।
২. হাদীসের মতনটি একজন রাবীর নিকটে ছিল। কিন্তু এর একটি অংশ তার নিকট ছিল অন্য সনদে। তিনি উক্ত মতনটি পূর্ণরূপে প্রথম সনদেই বর্ণনা করলেন।
৩. শেণির আরেকটি ধরন হলো, কোনো রাবী নিজ শায়খ থেকে একটি হাদীস শুনলেন। কিন্তু তার একটি অংশ উক্ত শায়খ থেকে জানতে পারলেন অন্যের মাধ্যমে। তিনি নিজ শায়খের বরাত দিয়ে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন, মাধ্যমটি উহ্য রেখে।
৪. একজন রাবীর নিকট দুটি ভিন্ন ভিন্ন মতন ছিল ভিন্ন ভিন্ন দুটি সনদে। অতঃপর তার নিকট থেকে একজন রাবী মতন দুটিকে একটি মাত্র সনদে বর্ণনা করলেন। অথবা একটি হাদীসই সংশ্লিষ্ট সনদে বর্ণনা করলেন; কিন্তু তাতে অপর মতন থেকে এমন একটি অংশ সংযোজন করে দিলেন যা প্রথমটির অংশ নয়।
৫. রাবী সনদ বর্ণনা করছিলেন; কিন্তু মাঝখানে একটি অবস্থার সম্মুখীন হলেন, তাই নিজের পক্ষ থেকে একটি কথা বললেন। তখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মনে করল, উক্ত কথাই হচ্ছে এ সনদের মতন। সুতরাং তার বরাত দিয়ে সেরূপ বর্ণনা করলেন। এগুলো হচ্ছে মুদরাজুল ইসনাদের প্রকারসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَنَامَ طَعْن -এর সপ্তম প্রকারের নাম মুখালাফাত। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা করা। এ মুখালাফাত বা বিরোধিতা দুভাবে হয়।

১. রাবীর দিক দিয়ে। এটা আবার ৪ প্রকার। ১. زِيَادَةٌ فِي السَّنَدِ ২. زِيَادَةٌ فِي الْمَتْنِ ৩. نَقْصٌ فِي السَّنَدِ ৪. نَقْصٌ فِي الْمَتْنِ। এর বিস্তারিত আলোচনা 'রাবীর বৃদ্ধি' পর্বে চলে গেছে।

২. কারণের দিক দিয়ে। এটা কয়েক প্রকার। যথা-

১. বিরোধিতা হবে শব্দের মধ্যে পরিবর্তনের কারণে। ২. অথবা, আগে-পিছের কারণে। ৩. অথবা, সনদের মাঝে রাবীর বৃদ্ধির কারণে। ৪. অথবা, রাবীর পরিবর্তন করার কারণে। ৫. অথবা, এক অক্ষর কিংবা বিভিন্ন অক্ষরের মাঝে নুকতা পরিবর্তন করার কারণে। ৬. অথবা, আকৃতি পরিবর্তনের কারণে। ৭. মোটকথা, বিরোধিতা যদি কারণগত হয়, তাহলে তা মোট ৬ প্রকার হয়। ১. مُدْرَجٌ ২. مُقْلَبٌ ৩. مُعَرَّفٌ ৪. مُزِيدٌ فِي مُتَصِلِ الْأَسَانِيدِ ৫. مُضْطَرَبٌ ৬. مُصَحَّفٌ ৭. مُعَرَّفٌ। নিম্নে প্রত্যেকটি প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

إِسْمٌ مَفْعُولٌ الْإِدْرَاجُ মাসদার হতে مُدْرَجٌ -এর আভিধানিক অর্থ: الْمُدْرَجُ (আল-মুদরাজ) শব্দটি مُدْرَجٌ -এর অর্থ- প্রবিষ্ট করা, অন্তর্ভুক্ত করা। এ হিসেবে الْمُدْرَجُ অর্থ- প্রবিষ্ট, অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদি।

مُدْرَجٌ -এর পান্নিভাষিক অর্থ: পরিভাষায় مُدْرَجٌ বলে প্রত্যেক ঐ হাদীসকে যার সনদ অথবা মতনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যার কারণে রেওয়ায়েতটি নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধী হয়।

مُدْرَجٌ -এর নামকরণ: مُدْرَجٌ অর্থ- প্রবিষ্ট। حَدِيثٌ مُدْرَجٌ -এ যেহেতু এক সনদ অপর সনদের মধ্যে অথবা এক মতন অপর মতনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায়, তাই তাকে مُدْرَجٌ (প্রবিষ্ট) বলে।

مُدْرَجٌ -এর হুকুম: সনদ অথবা মতনে ইচ্ছাপূর্বক إدراج করা হারাম এবং মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

مُدْرَجٌ -এর প্রকারভেদ: مُدْرَجٌ দু প্রকার। ১. مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ ২. مُدْرَجُ الْمَتْنِ। নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ -এর সংজ্ঞা: উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ فِيهِ مُخَالَفَةُ الرَّاَوِي لِلثَّقَاتِ أَوْ الْأَوْثَقِ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ سِيَاقِ الْإِسْنَادِ .

অর্থাৎ সনদ বর্ণনায় পরিবর্তন করার কারণে যে হাদীসের রাবী নির্ভরযোগ্য রাবীগণের খেলাপ করেন, সেই হাদীসকে مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ বলে।

مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ -এর প্রকারভেদ: مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ মোট ৪ প্রকার। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের উল্লেখ করা হলো।

১. কোনো রাবী একাধিক শাযখ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে একটি হাদীস শুনেছেন; কিন্তু তিনি হাদীসটি রেওয়ায়েত করার সময় এক সনদেই সকলকে উল্লেখ করেন এবং শাযখদের সনদের পাম্পরিক ভিন্নতাকে উল্লেখ করেন না।

এর উদাহরণ হলো নিম্নরূপ-

حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ بَنْدَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَاصِلٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْحَبِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟

এ হাদীসের মধ্যে রাবী হলেন সুফিয়ান ছাওরী। আর তার শায়খ হলেন তিনজন- ১. **وَاصِلٌ** ২. **مَنْصُورٌ** ও ৩. **أَعْمَشٌ** এ তিন শায়খের সনদ ভিন্ন ভিন্ন দুটি। এর মধ্যে **وَاصِلٌ** -এর সনদ হলো-
عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَبْدِ اللَّهِ -এর সনদ হলো-

عَنْ مَنْصُورٍ وَأَعْمَشٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -
 কিন্তু রাবী অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী হাদীসটি রেওয়ায়েত করার সময় এক সনদেই তার তিন শায়খকে উল্লেখ করেন এবং তিরমিযী শরীফে যেভাবে রেওয়ায়াতটি এসেছে সেভাবে বর্ণনা করেন। তিন শায়খের ভিন্ন ভিন্ন দুই সনদের কথা সনদে **عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ** নেই। **مَنْصُورٌ** ও **أَعْمَشٌ** -এর সনদে আছেন। মোটকথা রাবী এটা বর্ণনা করেন না যে, তার শায়খদের সনদ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন; বরং এক সনদেই সকল শায়খকে উল্লেখ করেন।

২. এর দুটি সূরত হতে পারে। যথা-

ক. রাবী দুই সনদে একটি হাদীস শুনেছেন। ১ম সনদে হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ নয়; একাংশ কম। কিন্তু ২য় সনদে হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। এখন রাবী রেওয়ায়েত করার সময় ১ম সনদে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।

খ. রাবী একটি হাদীস তার শায়খ থেকে নিজে শুনেছেন। ঐ হাদীসটিই পরে তিনি তার শায়খ থেকে একটি **وَاصِلٌ** -এর মাধ্যমে শুনে। নিজে শুনা হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ নয়- একাংশ কম; কিন্তু **وَاصِلٌ** -এর মাধ্যমে শুনা হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। এখন রাবী হাদীসটি রেওয়ায়েত করার সময় **وَاصِلٌ** -কে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি নিজে শুনেছেন এমনভাবে রেওয়ায়েত করেন।

৩. এরও দুটি সূরত হতে পারে। যথা-

ক. রাবী ভিন্ন ভিন্ন দুটি সনদে উভয় হাদীস শুনেছেন; কিন্তু তিনি রেওয়ায়েত করার সময় এক সনদে উভয় হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

খ. দু হাদীসের একটিকে রাবী তার নিজস্ব সনদেই রেওয়ায়েত করেন; কিন্তু তাতে অপর সনদের কিছু মতন বৃদ্ধি করেন, যে মতন এ সনদের নয়।

৪. মুহাদ্দিস অথবা শায়খ ছাত্রদের সামনে হাদীস রেওয়ায়েত করছেন। রেওয়ায়েতের মাঝখানে হঠাৎ করে কোনো কারণে তিনি নিজের পক্ষ থেকে হাদীসের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোনো শব্দ বা বাক্য বলেছেন; কিন্তু ছাত্রদের কেউ এটাকে ঐ সনদের মতনের অংশ মনে করেছেন এবং সেভাবে তিনি রেওয়ায়েত করেছেন।

বি. **دَرْجُ الْإِسْنَادِ** -এর প্রথম তিন প্রকারের মধ্যে সনদের অভ্যন্তরে পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। আর চতুর্থ প্রকারে পরিবর্তনের বিষয়টি সূক্ষ্ম। আর তা এভাবে হয়েছে যে, সনদ উল্লেখের চাওয়া বা দাবি হলো এর পরেই মতন আসা এবং মতনের পূর্বে ভিন্ন কোনো কথা না বলা। কিন্তু রাবী মাঝখানে ভিন্ন কথা বলে সনদের দাবিকে বাতিল করেছে। সুতরাং কেমন যেন তিনি এভাবে সনদকেই পরিবর্তন করে দিলেন

وَأَمَّا مُدْرَجُ الْمَتَنِ فَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَتَنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ فَتَارَةٌ يَكُونُ فِي
أَوَّلِهِ وَتَارَةٌ فِي آخِرِهِ وَتَارَةٌ فِي أَثْنَائِهِ لِأَنَّهُ يَقَعُ يَعْطِفُ جُمْلَةً
عَلَى جُمْلَةٍ أَوْ يَدْمِجُ مَوْقُوفٍ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ بِمَرْفُوعٍ
مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ فَضَّلِ
فَهَذَا هُوَ مُدْرَجُ الْمَتَنِ ، وَبِذَلِكَ الْإِذْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَايَةٍ مُفْصَلَةٍ لِلْقَدِيرِ الْمُدْرَجِ
مِمَّا أُدْرِجُ فِيهِ أَوْ بِالتَّنْصِصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاويِ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْأَثَمَةِ
الْمُطْلَعِينَ أَوْ بِاسْتِحَالَةٍ كَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ كِتَابًا وَلَخَصْتُهُ وَزِدْتُ
عَلَيْهِ قَدْرًا مَا ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

অনুবাদ : মুদরাজুল মতন হলো এই যে, মতনের মধ্যে এমন কিছু সংযোজিত হওয়া যা তার অংশ নয়। এটি কখনো মতনের শুরুতে, কখনো মাঝখানে আবার কখনো শেষপ্রান্তে হয়। তবে শেষপ্রান্তেই বেশি হয়ে থাকে। কেননা, এটি সংঘটিত হয় এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের সংযোগ স্থাপন অথবা মারফু' হাদীসের সাথে মাওকুফ বা মাকতু' হাদীসকে গুলিয়ে ফেলার কারণে। একে বলা হয় মুদরাজুল মতন।

ইদরাজ ল.না যায় এমন রেওয়াজে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা, যা মুদরাজ হাদীস থেকে মুদরাজ পরিমাণকে পৃথক করে দেয় অথবা রাবী নিজে সেটা বলে দিলে অথবা কোনো হাদীস বিশারদ তা সনাক্ত করলে অথবা নবী করীম ﷺ -এর পক্ষে সরুপ কথা বলা অসম্ভব হলে।

মুদরাজ সম্পর্কে খতীবে বাগদাদী একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। (ইবনে হাজার (র.) বলেন,) আমি তার সারসংক্ষেপ করেছি এবং তার সাথে আরো অনেক বিষয় সংযোজন করেছি যার পরিমাণ মূল গ্রন্থের দ্বিগুণ বা তারও বেশি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর সংজ্ঞা : مُدْرَجُ الْمَتَنِ -এর সংজ্ঞা : -এর সংজ্ঞা :

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَقَعُ فِي مَتْنِهِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ فَتَارَةٌ يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ وَتَارَةٌ فِي أَثْنَائِهِ وَتَارَةٌ فِي آخِرِهِ .
অর্থাৎ যে হাদীসের মতনের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্যের কলাম পতিত হয়, তাকে مُدْرَجُ الْمَتَنِ বলে। চাই অন্যের কলাম -এর সংযোগটা মতনের শুরু, মধ্যখান, শেষ যেখানেই হোক না কেন।

এর প্রকারভেদ : এটি দু প্রকার। যথা-

১. হাদীসের মতনে এমন কথা প্রবিষ্ট হওয়া, যা মতনের অংশ নয়। এই প্রবিষ্ট হওয়ার তিন সুরত। যথা-

ক. মতনের শুরুতে প্রবিষ্ট হবে। খ. মতনের মাঝখানে প্রবিষ্ট হবে। গ. মতনের শেষে প্রবিষ্ট হবে।

হাদীসের ক্ষেত্রে এই শেষ সূরতটিই বেশির ভাগ ঘটে থাকে বলে লেখক সহ অনেকের অভিমত। তবে কতকের অভিমত হলো প্রথম সূরতটি বেশির ভাগ ঘটে।

২. হাদীসে মাওকুফ বা মাওকুফ 'কে হাদীসে মারফু'-এর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেওয়া। অথবা মাওকুফ ও মাওকুফ 'কে পার্থক্য না করে মারফু'-এর সাথে গুলিয়ে ফেলা।

إِدْرَاجُ জ্ঞানার উপায় : إِدْرَاجُ কয়েকভাবে জানা যায়। যথা—

ক. إِدْرَاجُ বিশিষ্ট হাদীস অন্য সনদে إِدْرَاجُ বিহীন অবস্থায় বর্ণিত হওয়া। এর উদাহরণ—
أَبِي قُطَيْبٍ وَشَبَابَةَ عَنْ (র.) এ হাদীসটি খতীব (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের
سُئِلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ
إِدْرَاجُ (إِدْرَاجُ) কেননা, ইমাম
بُخَارِي (ر.) هَادِيَسَاتِي عَنْ أَبِي مُرَّةٍ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنْ
এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

عَنْ أَبِي مُرَّةٍ (رَضِيَ) قَالَ أَسْفِرُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: وَنِلَّ لِلْعَقَابِ مِنَ الشَّارِ.

খ. রাবী নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, হাদীসের এ অংশটুকু مُدْرَجٌ বা প্রবিষ্ট।

এর উদাহরণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ لَا
يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য শরিক স্থির করবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য শরিক স্থির না করে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে।

রাবী ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, উল্লিখিত হাদীসের শেষ অংশটুকু অর্থাৎ ... وَمَنْ لَا থেকে শেষ পর্যন্ত আমি নবী করীম ﷺ থেকে বলতে শুনি। অতএব এটা مُدْرَجٌ হবে।

গ. হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, হাদীসের এ অংশটুকু مُدْرَجٌ।

এর উদাহরণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْرَةُ يَشْرِكُ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْكُرُهُ بِالْتَّوَكُّلِ.

ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীস রেওয়ায়েত করে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র.) বলেছেন, ... وَمَا مِنَّا হতে শেষ পর্যন্ত— এটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি। ইমাম বুখারী (র.) একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। অতএব তাঁর এই إِدْرَاجُ বর্ণনা করার দ্বারা হাদীসটি مُدْرَجٌ হবে।

ঘ. হাদীস নিজেই বলে দেবে যে, তা مُدْرَجٌ। আর তা এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য এমন কথা বলা অসম্ভব হবে।

এর উদাহরণ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَعْبُدَ الْمَمْلُوكُ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ مِنِّي
سَبِيلُ اللَّهِ وَبِرَأْسِي لَا حَبِيبَ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মালিকানাভুক্ত দাসের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব। আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি গোলাম হয়ে ইস্তেকাল করাকে শ্রেয় জ্ঞান করতাম।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) রেওয়ায়েত করেছেন। এর মধ্যে وَالَّذِي نَفْسِي হতে শেষ পর্যন্ত কথটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি হতে পারে না। কারণ, এ হাদীস বলার সময় পর্যন্ত তাঁর মাতা জীবিতই ছিলেন না; বরং এটুকু হলো হযরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর উক্তি। যার প্রমাণ হলো, নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনায় হাদীসটি এসেছে— وَالَّذِي نَفْسِي أَيْ مُرَّةٍ بَيْدٍ ।

খতীবের কিতাব : مُنْزَج-এর উপর খতীবে বাগদাদী (র.) একটি কিতাব লেখেছেন। কিতাবটির নাম : الْفَصْلُ لِلْوَصْلِ الْمُنْزَجِ فِي الْفَعْلِ। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ কিতাবের সারসংক্ষেপ লেখেছেন এবং এর সাথে কিছু বিষয় নিজে বৃদ্ধিও করেছেন। তিনি কিতাবের নাম রেখেছেন— تَقْرِيبُ الْمَنْهَجِ بِتَرْيِيبٍ لِلْمُنْزَجِ

إِذْراج করার কারণ : হাদীসের মধ্যে إِذْراج তথা বাইরে থেকে অন্যের কালাম প্রবিশ্ট করার একাধিক কারণ হতে পারে। যথা—

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো হুকুম বের করা।

২. কোনো শরয়ী হুকুমকে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা।

৩. হাদীসের দুর্বল ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করা। যেমনটি ইমাম জুহরী প্রমুখ করেছেন।

إِذْراج -এর এই তিন কারণের মধ্যে শেষোক্ত কারণে কেবল إِذْراج করা যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য কারণে إِذْراج করা হারাম। (أَطِيبُ الْمَنْهَجِ فِي عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ)

أَوْ إِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بِتَقْدِيرِهِمْ وَتَاخِيرِ أَى فِى الْأَسْمَاءِ كَمُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ
وَكَعْبٍ بِنِ مُرَّةٍ لِأَنَّ إِسْمَ أَحَدِهِمَا إِسْمُ أَبِى الْأَخْرِ فَهَذَا هُوَ الْمَقْلُوبُ
وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ كِتَابٌ رَافِعُ الْإِرْتِبَابِ وَقَدْ يَقَعُ الْقَلْبُ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا
كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي السَّيِّعَةِ الَّذِينَ
يُظْلِمُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ فَفِيهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا
تَعْلَمَ بَيِّنَتُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ فَهَذَا مِمَّا انْقَلَبَ عَلَى أَحَدِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ
حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بَيِّنَتُهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ .

অনুবাদ : (নির্ভরযোগ্য রাবীর) বিরোধিতা যদি নামের মধ্যে আগপিছ করার দিক দিয়ে হয়, যেমন- মুররা ইবনে কা'ব-কে কা'ব ইবনে মুররা বলা, তাহলে তাকে মাকলুব বলে। খতীবে বাগদাদীর এ সম্পর্কিত কিতাবের নাম 'রাফিউল ইরতিয়াব'।

ওলট-পালট কখনো মতনেও হয়। যেমন- মুসলিম শরীফে এক স্থানে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আরাশের ছায়ায় যে সাত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে একজন হলেন, “যে ব্যক্তি এমন গোপনীয়ভাবে সদকা করে যে, বাম হাতে কি সদকা করল ডান হাত তা জানে না।” হাদীসটি কোনো এক রাবী পাল্টে ফেলেছেন। আসলে ছিল “ডান হাতে কি সদকা করল বাম তা জানে না।” বুখারী শরীফের সকল সনদে এবং মুসলিম শরীফের কোনো কোনো স্থানে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِحْدُ -এর- إِسْمُ مَفْعُولُ الْقَلْبُ মাসদার হতে الْمَقْلُوبُ -এর আভিধানিক অর্থ : الْمَقْلُوبُ -এর অর্থ- উল্টানো, ঘুরানো, দিক পরিবর্তন করা ইত্যাদি। এ হিসেবে الْمَقْلُوبُ অর্থ- যার মধ্যে ওলট-পালট করা হয়েছে।

إِحْدُ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় الْمَقْلُوبُ বলা হয়-

هُوَ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ فِيهِ مُخَالَفَةُ الرَّاَوِي لِلثَّقَاتِ أَوْ الْاَوْتَقِي بِتَقْدِيرِهِمْ أَوْ تَاخِيرِ فِي الْأَسْمَاءِ مِنَ السَّنَدِ أَوْ فِي الْمَتْنِ .

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী সনদের শায়খদের নামের মাঝে অথবা মতনের মাঝে আগপিছ করার মাধ্যমে اَلْحَدِيثُ الثَّابِتُ অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েতের খেলাপ করেন, তাকে الْمَقْلُوبُ বলা হয়।

إِحْدُ -এর প্রকারভেদ : সনদ অথবা মতনে এ ধরনের আগপিছ করাকে قَلْبُ বলা হয়। মোট দু প্রকার। ১. قَلْبُ فِي السَّنَدِ ও ২. قَلْبُ فِي الْمَتْنِ । নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

قَلْبُ فِي السَّنَدِ -এর সংজ্ঞা : قَلْبُ তথা ওলট-পালট যদি সনদের নামের মাঝে হয়, তাহলে তাকে قَلْبُ فِي السَّنَدِ বলা হয়। এ ধরনের قَلْبُ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

قَلْبٌ فِي السَّنَدِ -এর উদাহরণ : সনদে নাম আছে মুররা ইবনে কা'ব, যা নির্ভরযোগ্য রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু রাবী তাতে পরিবর্তন করে বলেন কা'ব ইবনে মুররা।

এ ধরনের قَلْب সম্পর্কে খতীবের বাগদাদী (র.) وَالْإِتْسَابِ مِنَ الْمَقْلُوبِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْإِتْسَابِ নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন।

قَلْبٌ فِي -এর সংজ্ঞা : قَلْب তথা ওলট-পালট যদি খোদ মতনে হয়, তাহলে তাকে قَلْبٌ فِي الْمَنْعِ বলে।

এর উদাহরণ : সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ।

سَمِعْتُ بَظُلْمِ اللَّهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابَّ نَسَاءً فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعْلَقٌ بِالسَّاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَعَابَا فِي اللَّهِ اجْتِمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَنَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِمِثْنِهِ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

অর্থাৎ যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়া দান করবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. যে যুবক তার যৌবনকাল ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। ৩. যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে জুড়ে থাকে। সে মসজিদ থেকে বের হলে আবার ফিরার উদ্দেশ্যেই বের হয়। ৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসায় একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫. যে ব্যক্তি নিরিবিলি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ৬. বংশীয় ও সুন্দরী নারী যে ব্যক্তিকে (জেনার প্রতি) আহ্বান করলে, সে জানায় আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. যে ব্যক্তি এমন গোপনভাবে দান-সদকা করে যে, তার দান হাতও জানতে পারে না যে, বাম হাত কি খরচ করল।

এ হাদীসে قَلْبٌ فِي الْمَنْعِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِمِثْنِهِ مَا تُنْفِقُ শিমালু তথা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারণ, এটা আসলে হবে এমন-

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِمِثْنِهِ.

আর এভাবে বুখারীর রেওয়ায়েতে এমনকি খোদ মুসলিমের অপর রেওয়ায়েতে আছে।

أَوْ إِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بَرِيَادَةً رَأَوْ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ وَمَنْ لَمْ يَزِدْهَا أَتَقَنُ
مِمَّنْ زَادَهَا فَهَذَا هُوَ الْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَقَعَ
التَّضَرُّعُ بِالسَّمَاعِ فِي مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَمَتَى كَانَ مُعْنَعًا مَثَلًا
تُرْجِعَتِ الزِّيَادَةُ.

অনুবাদ : সনদের মাঝে রাবী বৃদ্ধি পাবার দরুন যদি বিরোধিতা হয়, আর যিনি বৃদ্ধি করেছেন তার চেয়ে যিনি বৃদ্ধি করেননি তিনি অধিক নির্ভরযোগ্য হন, তাহলে তাকে বলে 'আল-মাহীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ'। এটি যথার্থ সাব্যস্ত করার জন্য শর্ত হলো, অতিরিক্ত রাবীর স্থানে শোনার কথাটি স্পষ্টভাবে বলতে হবে। যদি তা না হয়; বরং 'মুআনআন' হয়, তাহলে যেটিতে অতিরিক্ত আছে সেটিই প্রাধান্য পাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল-মাহীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ -এর সংজ্ঞা : পরিভাষায় তার সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي ثَبَّتَ فِيهِ مُخَالَفَةُ الرَّابِعِ لِلثَّلَاثِ أَوْ الْأَوْتَقِ بِزِيَادَةِ رَأَوْ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ طَاهِرُ الْإِتِّصَالِ .
দৃশ্যত মুত্তাসিল হাদীসের সনদের মাঝে কোনো রাবী বৃদ্ধি করার মাধ্যমে যে রাবী অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়াজেতের খেলাপ রেওয়ায়েত করেন সেই রাবীর হাদীসকে 'لَمْ يَزِدْ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ' বলে।

আল-মাহীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ -এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ-

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبْرِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا .

অর্থাৎ তোমরা কবরের উপর গিয়ে বসবে না এবং সেখানে নামাজ পড়বে না।

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) ও ইমাম তিরমিযী (র.)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ النَّخْلَانِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مُرَيْدٍ الْغَنَوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

-সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, এ হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) একজন রাবীকে বৃদ্ধি করেছেন। আর তিনি হলেন আবু ইদরীস খাওলানী (র.)।

আল-মাহীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ -এর শর্ত : এটি যথার্থ সাব্যস্ত করার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা-

১. বৃদ্ধির স্থলে বৃদ্ধি যিনি করেননি তার থেকে শোনার কথাটি স্পষ্টভাবে থাকতে হবে। যদি সুস্পষ্ট শোনার কথা না থাকে; বরং মুআনআন (عَنْ ثُلَاثٍ عَنْ ثُلَاثٍ) অথবা এমন শব্দে বর্ণিত হয় য মুত্তাসিল না হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তাহলে এ সময় বৃদ্ধি সম্বলিত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। আর যিনি বৃদ্ধি করেননি তার হাদীস 'مُنْقَطِعٌ' বলে গণ্য হবে।
২. বৃদ্ধিকারী রাবীর তুলনায় যিনি বৃদ্ধি করেননি তিনি অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য হবেন।
৩. এমন নিদর্শন সেখানে থাকতে হবে, যা প্রমাণ করে যে, রাবী ভুল বা ধারণাবশত সনদে বৃদ্ধি করেছেন। যদি এমন নিদর্শন না থাকে, তাহলে এ বৃদ্ধিটা আল-মাহীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ হবে না; বরং উভয় সনদ সহীহ বলে বিবেচ্য হবে।

أَوْ إِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بِإِبْدَالِهِ أَيْ الرَّاَوِي وَلَا مُرْجِعَ لِأَحَدِ الرَّوَايَتَيْنِ عَلَى
الْأُخْرَى فَهَذَا هُوَ الْمُضْطَرَبُّ وَهُوَ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ غَالِبًا وَقَدْ يَقَعُ فِي
الْمَتْنِ لَكِنْ قَلَّ أَنْ يُحْكِمَ الْمُحَدِّثُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالِاضْطِرَابِ بِالنِّسْبَةِ
إِلَى الْإِخْتِلَافِ فِي الْمَتْنِ دُونَ الْإِسْنَادِ .

অনুবাদ : যদি এক রাবীর স্থানে অন্য রাবীর নাম আসার কারণে বিরোধিতা সৃষ্টি হয় এবং দুটি
বর্ণনার কোনো একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার যুক্তি না থাকে, তাহলে তাকে বলে
'মুযতারিব'। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদেই হয়ে থাকে। কখনো কখনো মতনেও হয়। তবে সনদ
ব্যতীত মতনের গড়মিলের কারণে কোনো হাদীসকে খুব কমই 'মুযতারিব' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمُضْطَرَبُّ -এর আভিধানিক অর্থ : الْمُضْطَرَبُّ শব্দটি الْإِضْطِرَابُ মূলধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ-
অস্থিরতা, অশান্তি, গগণোল, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি। এ হিসেবে الْمُضْطَرَبُّ অর্থ- অস্থির, অশান্ত।

الْمُضْطَرَبُّ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় الْمُضْطَرَبُّ হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ بِإِبْدَالِ الرَّاَوِي أَوْ بِإِبْدَالِ الْمَتْنِ أَوْ بِإِبْدَالِهَا وَلَا مُرْجِعَ
لِأَحَدِ الرَّوَايَتَيْنِ عَلَى الْاُخْرَى .

অর্থাৎ যে হাদীসের মাঝে রাবীর পরিবর্তন নিয়ে (অর্থাৎ সনদের এ স্তরে প্রকৃত রাবী কে তা নিয়ে)
অথবা মতন নিয়ে (যে, প্রকৃত মতন কোনটি) অথবা রাবী ও মতন উভয়ের পরিবর্তন নিয়ে মতভেদ হয়
এবং এ ব্যাপারে কোনো একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না- এমন হাদীসকে
الْمُضْطَرَبُّ বলে।

যদি কোনো একটিকে অপরটির উপর تَرْجِيح -এর কোনো পছন্দের আলোকে দেওয়া হয়, তবে
আর الْمَرْجُوحُ থাকবে না; বরং যাকে تَرْجِيح দেওয়া হবে তাকে الرَّاجِحُ আর অপরটিকে
বলে গণ্য করা হবে।

الْمُضْطَرَبُّ -এর প্রকারভেদ : হাদীসের সনদ ও মতনে এভাবে পরিবর্তন নিয়ে মতভেদ হওয়াকে
الْمُضْطَرَبُّ বলে। মোট তিন প্রকার। যথা-

۱. إِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ . ۲. إِضْطِرَابٌ فِي الْمَتْنِ . ۳. إِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ .

নিম্নে এ তিন প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

۱. إِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ -এর সংজ্ঞা : إِضْطِرَابٌ যদি মতনে না হয়ে সনদে হয়, তাহলে তাকে
إِضْطِرَابٌ বলে। এই إِضْطِرَابٌ ই সাধারণত বেশি হয়।

إِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ -এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ-

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْثٍ عَنْ جَدِّهِ
حَرْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ
شِبْثًا تَلْفًا وَجَنِّهِ .

অর্থাৎ আবু দাউদ (র.) ও ইবনে মাজাহ (র.) এক দীর্ঘসূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে নবী করীম ﷺ-এর এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন- তোমাদের কেউ নামাজ পড়লে সে যেন তার সামনে কোনো কিছু (সুতরা হিসেবে) স্থাপন করে।

এ হাদীসের সনদে মারাত্মক **إِضْطِرَابٌ** রয়েছে। আর তা হলো-

ক. সুফিয়ান ছাওরী (র.) এ হাদীস রেওয়ায়েত করেন নিম্নোক্ত সূত্রে-

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَرْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

খ. উহাইব ও আব্দুল ওয়ারেস (র.) রিওয়াযাত করেন-

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَرْثٍ عَنْ جَدِّهِ حَرْثٍ -

গ. ইবনে জুরাইজ (র.) রেওয়ায়েত করেন-

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ حَرْثِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

২. **إِضْطِرَابٌ** যদি সনদে না হয়ে মতনে হয়, তাহলে তাকে **إِضْطِرَابٌ فِي الْمَتْنِ** বলে।

إِضْطِرَابٌ এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীস এর উদাহরণ-

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَبِيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَيَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزُّكُوفِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزُّكُوفِ -

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী (র.) দীর্ঘসূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাকাত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও আরো হক রয়েছে।

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْ نَفْسِ الطَّرِيقِ : لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزُّكُوفِ -

অর্থাৎ আর ইবনে মাজাহ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়া আর কোনো হক নেই।

হাফিজ ইরাকী (র.) বলেন, উপরের দু হাদীসের মতনে **إِضْطِرَابٌ** রয়েছে। এদের মাঝে ব্যাখ্যা বা সমন্বয় সাধনের অবকাশ নেই।

৩. **إِضْطِرَابٌ** যদি সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রেই হয়, তাহলে তাকে **إِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ** বলে।

إِضْطِرَابٌ এর উদাহরণ : সনদ ও মতনে একসাথে **إِضْطِرَابٌ** হওয়ার উদাহরণ নিম্নের হাদীসটি-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ فُلْتَيْنِ لَمْ يَحْبِلِ الْخَبْثُ -

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে সে নাপাক বহন করতে পারে না।

এ হাদীসের সনদে **إِضْطِرَابٌ** এভাবে রয়েছে যে, এ হাদীসের সনদের মূল স্থান (مَدَارُ) হলো রাবী ওলীদ ইবনে কাছীর। তিনি কখনো হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর ইবনে যুবাইর থেকে, আবার কখনো মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর থেকে, আবার কখনো উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে, আবার কখনো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে।

আর মতনে **إِضْطِرَابٌ** এভাবে যে, কোনো রেওয়ায়েত এসেছে **فُلْتَيْنِ**, কোনো রেওয়ায়েত এসেছে **أَتَبَعَيْنِ فُلَّةً**, কোনো রেওয়ায়েত এসেছে **فُلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ**।

إِضْطِرَابٌ যথার্থভাবে হওয়ার শর্ত : **إِضْطِرَابٌ** যথার্থভাবে হওয়ার শর্ত দুটি।

১. দুই রিওয়ায়াত মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হওয়া।

২. একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হওয়া।

إِضْطِرَابٌ-এর হুকুম : **إِضْطِرَابٌ**-কে যদি দূর করা সম্ভব হয়, তাহলে তা দূর হওয়ার পরে **حَدِيثُ** **مُضْطَرَّبٌ** টা সহীহ হয়ে যায়। আর **إِضْطِرَابٌ** যদি দূর না করা যায়, তাহলে হাদীসটি যা'সিফ এবং দলিলের অযোগ্য হয়ে যায়।

إِضْطِرَابٌ দূর করার উপায় : **إِضْطِرَابٌ** দুভাবে দূর করা যায়। যথা-

১. দু রেওয়ায়েতের মধ্যে সম্ভব হলে সমন্বয় সাধন করা।

২. নতুবা প্রাধান্য দানকারী বিষয়ের দ্বারা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া।

আল্লামা সুহূতী (র:) তাদরীবুর রাবী গ্রন্থে **إِضْطِرَابٌ** দূর করার আরেকটি পদ্ধতি সম্পর্কে লেখেছেন যে, যে দুই হাদীসের মধ্যে **إِضْطِرَابٌ** হয়েছে, যদি তাদের এক রেওয়ায়েতের রাবী **أَخْضَطُ** হয় কিংবা শায়খের সাথে তার দীর্ঘ সোহবত থাকে, তাহলে তার ভিত্তিতেও প্রাধান্য দেওয়া গেলে **إِضْطِرَابٌ** দূর হওয়া সম্ভব। এ সময় **رَاجِعٌ** হাদীসটি আমলযোগ্য হবে আর **مَرْجُوعٌ** টি বর্জিত হবে।

وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا لِمَنْ يُرَادُ اخْتِبَارُ حِفْظِهِ امْتِحَانًا مِنْ فَاعِلِهِ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ بَلْ يَنْتَهِيَ بِانْتِهَاءِ الْحَاجَةِ فَلَوْ وَقَعَ الْإِبْدَالُ عَمْدًا لَا لِمَصْلَحَةٍ بَلْ لِلْإِغْرَابِ مَثَلًا فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَوْضُوعِ وَلَوْ وَقَعَ غَلَطًا فَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوبِ أَوْ الْمُعْلَلِ ، أَوْ أَنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بِتَغْيِيرِ حَرْفٍ أَوْ حُرُوفٍ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْخَطِّ فِي السِّيَاقِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النُّقْطِ فَالْمُصَحَّفُ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّكْلِ فَالْمُحَرَّفُ وَمَعْرِفَةُ هَذَا التَّنَوُّعِ مُهِمَّةٌ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْعَسْكَرِيُّ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَكَثُرَ مَا يَقَعُ فِي الْمُتُونِ وَقَدْ يَقَعُ فِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي الْأَسَانِيدِ .

অনুবাদ : কখনো কখনো কারো মেধা যাচাই করার জন্য পরীক্ষামূলক ইচ্ছাপূর্বক পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমনটি ইমাম বুখারী ও ইমাম উকাইলীর ক্ষেত্রে হয়েছিল।

কোনো কল্যাণ চিন্তা ব্যতীত নিছক চমক সৃষ্টি করার জন্য হাদীসকে বিকৃত করা হলে তা মাওযু' শ্রেণির অন্তর্গত হবে। আর যদি ভুলক্রমে এরূপ ঘটে যায়, তাহলে তাকে বলা হবে মাকলূব কিংবা মু'আল্লাল। অথবা বিরোধিতা যদি সংঘটিত হয় লিপির আকৃতি ঠিক রেখে এক বা একাধিক অক্ষর পরিবর্তনের কারণে, তাহলে নুকতার দিক দিয়ে এ পরিবর্তন হলে তাকে বলে 'মুসাহহাফ', আর আকৃতির দিক দিয়ে হলে তার নাম 'মুহাররফ'। এ শ্রেণির সাথে পরিচয় লাভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আসকারী, দারাকুতনী (র.) প্রমুখ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা বেশি হয়ে থাকে মতনের ক্ষেত্রে। তবে কখনো কখনো সনদের মধ্যকার নামের বেলাও হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সনদ বা মতনে পরিবর্তনের হুকুম : সনদ বা মতনে পরিবর্তন সাধন বৈধ কিনা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আর তা হলো, পরিবর্তন শরয়ী প্রয়োজন ও স্বার্থে হবে অথবা এমনটি হবে না। যদি পরিবর্তন শরয়ী প্রয়োজনের স্বার্থে না হয়, তাহলে তা আবার দু প্রকার। ১. ইচ্ছাপূর্বক হবে, অথবা ২. ভুলক্রমে হবে। যদি ইচ্ছাপূর্বক হয়, তাহলে হাদীস মাওযু' -এর অন্তর্গত হবে। আর যদি ভুলক্রমে হয়, তাহলে মাকলূব বা মু'আল্লাল -এর শ্রেণিভুক্ত হবে। আর যদি পরিবর্তনটা শরয়ী প্রয়োজনের স্বার্থে হয়- যেমন কোনো মুহাদ্দিসের স্মৃতিশক্তি ও মেধা যাচাই করার জন্য, তাহলে এমন পরিবর্তনের অনুমতি রয়েছে। তবে এটা সাময়িকের জন্য মাত্র। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই সনদ ও মতন সহীহ অবস্থায় এনে দিতে হবে। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম উকাইলী (র.) -এর ক্ষেত্রে এমন পরীক্ষার ঘটনা ঘটেছিল। নিম্নে তাঁদের ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

ইমাম বুখারী (র.)-এর পরীক্ষার ঘটনা : ইমাম বুখারী (র.) বাগদাদে সফরে এলে এখানকার হাদীসবেত্তাগণ তাঁর মেধা ও যোগ্যতা পরীক্ষা করতে চাইলেন। কেননা, পূর্ব থেকেই তারা ইমাম বুখারী (র.) -এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও যোগ্যতার কথা শুনেছিলেন। তাই তারা একশটি হাদীস বাছাই

করলেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ ও মতন পাণ্টে ফেললেন। এক সনদের সাথে অন্য মতন জুড়ে দিলেন; এক মতনের পূর্বে অন্য সনদ যোগ করলেন। দশজন লোককে নিযুক্ত করা হলো। প্রত্যেককে দশটি বিকৃত হাদীস মুখস্থ করানো হলো। মজলিস শুরু হলো। বাগদাদের স্থানীয় আলিম এবং খোরাসান ও অন্যান্য স্থানের আলিমগণ সমবেত হলেন। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে নির্বাচিত দশজনের একজন এগিয়ে গেলেন এবং এক এক করে দশটি হাদীস তাঁকে শুনিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি এটি জানেন কিনা। প্রতিবারেই তিনি জবাব দিচ্ছিলেন, আমি জানি না। অতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে দশজন ব্যক্তি হাদীস শুনােলেন। তিনি প্রতিবার শুধু বলছিলেন, আমি জানি না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অনেকে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আবার অনেকেই না বুঝে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহান হয়ে পড়ল। ইমাম বুখারী যখন অবস্থা থেকে বুঝলেন যে, তাদের প্রশ্ন শেষ হয়েছে, তখন তিনি প্রথম ব্যক্তির দিকে ফিরলেন এবং বললেন, আপনি তো এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। আসলে ওটি হবে এরূপ। এভাবে পুরো একশটি হাদীস তিনি বলে দিলেন। প্রত্যেকটি হাদীস প্রথমে তার নিকটে যেভাবে পেশ করা হয়েছিল, তিনি হুবহু সেভাবে বিবৃত করলেন। অতঃপর শুদ্ধটি বলে দিলেন। তখন সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও হাদীস জ্ঞানে অনন্যতার কথা স্বীকার করে নিল।

ইমাম উকাইলী (র.) -এর পরীক্ষার ঘটনা : সালামা ইবনে কাসেম বর্ণনা করেন, ইমাম উকাইলী (র.) সবসময় মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁর মূল কপিটি বের করতেন না। এক সময়ে আমরা বলাবলি করলাম, ইনি হয়তো অত্যন্ত মেধাবী নতুবা ডাহা মিথ্যাবাদী। তাই আমরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর ইতঃপূর্বে বর্ণিত কিছু হাদীস বিকৃত করে লেখলাম। অতঃপর তাঁর নিকট গিয়ে হাদীসগুলো তাঁর মুখে পুনরায় শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন, তুমি পাঠ কর। আমি পাঠ করতে করতে যেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে সেখানে পৌছলে তিনি আমার কাছ থেকে খাটাটি চেয়ে নিলেন এবং যেখানে যা সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছিল তা সংশোধন করে দিলেন। এ থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম যে, সত্যিই তিনি অসাধারণ মেধাবী।

এ-এর আভিধানিক অর্থ : **التَّضْعِيفُ** শব্দটি **الْمُضَعَّفُ** মূলধাতু হতে **مَفْعُول** -এর **إِسْم مَفْعُول** -এর আভিধানিক অর্থ : **التَّضْعِيفُ** -এর অর্থ - লেখা কিংবা পড়ায় বিকৃতি করা, উচ্চারণ বিকৃতি করা ইত্যাদি। এ হিসেবে **الْمُضَعَّفُ** অর্থ - বিকৃত।

এ-এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় **الْمُضَعَّفُ** হলো-

مَرَّ الْعَدِيبُ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ مُخَالَفَةُ الرَّأْيِ لِلْحَقِّاتِ أَوِ الْآرَاقِ بِتَغْيِيرِ حَرْفٍ أَوْ حُرُوفٍ فِي السِّيَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّنْقِطِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْخَطِّ وَتَغْيِيرِ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ .

অর্থঃ মুসাহহাফ প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার সনদ এবং মতন বহাল তবিয়েত বাকি থাকে; কিন্তু এক বা একাধিক অক্ষরের নুকতা পরিবর্তিত হয়ে যায়। (চাই নুকতার সাথে ই'রাবেও পরিবর্তন হোক বা না হোক।) নুকতার মধ্যে এভাবে পরিবর্তন করাকে তাসহীফ বলে। এ তাসহীফ সনদ এবং মতন উভয় স্থানেই হয়। তবে মতনে বেশি এবং সনদ কম হয়।

এ-এর সংজ্ঞা : রেওয়াজেতে নুকতার পরিবর্তন যদি সনদের মধ্যে কোথাও হয়, তাহলে তাকে **التَّضْعِيفُ فِي السَّنَدِ** বলে।

এ-এর উদাহরণ : নিম্নোক্ত হাদীসটি এর উদাহরণ-

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْمَرَامِ عَنْ مَرَّاجِمَ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا.

অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.) বর্ণনা করেন; নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা পাওনাদারদের হক আদায় করবে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) আলোচ্য হাদীসটিকে **الْمُصَحَّفُ** হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি সনদের **الْعَوَامُّ بْنُ مَرَّاحِمَ** -এর স্থলে **الْعَوَامُّ بْنُ مَرَّاحِمَ** রেওয়ায়েত করেছেন।

التَّضْعِيفُ فِي الْمَتْنِ -এর সংজ্ঞা : রেওয়ায়েতে নুকতার পরিবর্তন যদি মতনের মধ্যে হয়, তাহলে তাকে **التَّضْعِيفُ فِي الْمَتْنِ** বলে।

التَّضْعِيفُ فِي الْمَتْنِ -এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَوَصِياعِ الدَّعْوَى.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখার পরে শাওয়াল মাসে ৬টি রোজা রাখে, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।

আবু বকর আসসুলী (র.) এ হাদীসটি **الْمُصَحَّفُ** হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। কেননা, তিনি **سِتًّا** -এর স্থলে **شِبًّا** বলেছেন।

إِسْمُ مَفْعُولٍ -এর আভিধানিক অর্থ : **التَّحْرِيفُ** শব্দটি **الْمُحَرَّرُ** মাসদার হতে নির্গত **الْمُحَرَّرُ** -এর অর্থ- **التَّحْرِيفُ** -এর অর্থ- বিকৃত করা, পরিবর্তন করা ইত্যাদি। এ হিসেবে **الْمُحَرَّرُ** -এর পরিবর্তিত, বিকৃত।

الْمُحَرَّرُ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় **الْمُحَرَّرُ** হলো-

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَّعَتْ فِيهِ مُخَالَفَةُ الرَّائِي لِلثِّقَاتِ بِتَغْيِيرِ حَرْفٍ أَوْ حُرُوفٍ فِي السِّبَاقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّكْلِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْخَطِّ.

অর্থাৎ 'এ হাদীসকে বলে যার মধ্যে লেখার রূপ বহাল রেখে এক বা একাধিক অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তন করার মাধ্যমে রাবী নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করেন। এভাবে অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তন করাকে তাহরীফ বলে।' এই তাহরীফ অধিকাংশ মতনে হয়, তবে কখনো সনদের নামের মধ্যেও হয়।

التَّحْرِيفُ فِي السَّنَدِ -এর উদাহরণ : সনদের মধ্যে **عُقَيْل** (আইন বর্ণে যবর এবং কুফ বর্ণে যের) -কে **عُقَيْل** (আইন বর্ণে পেশ ও কুফ বর্ণে যবর) -এ পরিবর্তন করে ফেলা ইত্যাদি।

التَّحْرِيفُ فِي الْمَتْنِ -এর উদাহরণ : এর উদাহরণ হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি- **رَأَى أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ فِي أَكْحَلِهِمْ ...**

রাবী গুন্দর এ হাদীসে তাহরীফ করে **أَبِي** -কে **أَبْنِي** বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ তা ভুল। কেননা, হযরত জাবির (রা.) -এর পিতা খন্দক যুদ্ধের পূর্বেই উহুদে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। হাদীসোক্ত **أَبْنِي** শব্দ মূলত **أَبْنِي** (উবাই); **أَبْنِي** (আবী) নয়।

وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ صُورَةِ الْمَثْنِ مُطْلَقًا وَلَا الْإِخْتِصَارَ مِنْهُ بِالنَّقْصِ
وَلَا إِبْدَالَ اللَّفْظِ الْمُرَادِ بِاللَّفْظِ الْمُرَادِ لَهُ إِلَّا لِعَالِمٍ بِمَذْلُولَاتِ
الْأَلْفَاظِ وَمِمَّا يُحْبِلُ الْمَعَانِي عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَسْتَلْتَبِنِ أَمَّا
إِخْتِصَارُ الْحَدِيثِ فَلَا كَثْرُونَ عَلَى جَوَازِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَخْتَصِرُهُ
عَالِمًا لِأَنَّ الْعَالِمَ لَا يَنْقُصُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا تَعْلُقُ لَهُ بِمَا بَقِيَ
مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ وَلَا يَخْتَلُ الْبَيَانُ حَتَّى يَكُونَ الْمَذْكُورُ
وَالْمَحْذُوفُ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ أَوْ يَدُلُّ مَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا حَذَفَهُ بِخِلَافِ
الْجَاهِلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَنْقُصُ مَالَهُ تَعْلُقُ كَثْرُكَ الْإِسْتِثْنَاءِ .

অনুবাদ : হাদীসের মতনে শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তন বা তা থেকে কমিয়ে সংক্ষেপ করা কিংবা একটি শব্দের পরিবর্তে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা কেবলমাত্র তার জন্য জায়েজ, যিনি শব্দাবলির অর্থসমূহ ও অর্থ পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে অবগত। উভয় ক্ষেত্রে এটিই সঠিক অভিমত।

হাদীস সংক্ষিপ্তকরণ সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম জায়েজ হবার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে শর্ত থাকে যে, যিনি সংক্ষেপ করবেন, তাকে প্রকৃত আলিম হতে হবে। কেননা, আলিম ব্যক্তিই হাদীস থেকে এমন অংশ কমাবেন, অবশিষ্ট অংশের সাথে যার সম্পর্ক নেই। তাহলে অর্থের যেমন কোনো বিকৃতি ঘটবে না, তেমনি বর্ণনাধারাও ব্যাহত হবে না। ফলে উল্লিখিত ও উহা অংশ দুটি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে বিবেচিত হবে। অথবা উল্লিখিত অংশই উহা অংশকে নির্দেশ করবে। পক্ষান্তরে যিনি আলিম নন, তিনি এরূপ করতে পারবেন না; বরং অনেক সময় তিনি এমন অংশ বাদ দেবেন যা উল্লিখিত অংশের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন— “ইসতিছনা”। (এটা বাদ দিলে অর্থ সম্পূর্ণ পাটে যায়।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মতনে পরিবর্তন সাধন : মতনে ইচ্ছাপূর্বক পরিবর্তন করা চাই তা একক শব্দে হোক কিংবা যৌগিক শব্দে— তা মাটেও জায়েজ নেই।

إِخْتِصَارُ حَدِيثٍ -এর সংজ্ঞা : হাদীসের একাংশ উল্লেখ না করে আরেক অংশ উল্লেখ করাকে **إِخْتِصَارُ حَدِيثٍ** বা হাদীস সংক্ষেপকরণ বলে।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ও হাদীস সংকলক একটি দীর্ঘ হাদীসের ঐ অংশ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, **تَرْجُمَةُ الْبَابِ** -এর সাথে যেই অংশটুকুর সংশ্লিষ্টতা আছে— একেও **إِخْتِصَارُ حَدِيثٍ** বলে।

إِخْتِصَارُ حَدِيثٍ -এর কারণ : মানুষের হৃদয়ে সব সময় আনন্দ-উৎফুল্লাতা থাকে না। হাদীস প্রচার ও প্রসারের যুগে মুহাদ্দিসগণের কাজই ছিল হাদীস সংগ্রহ করা ও শিক্ষা দেওয়া। সাধারণত হাদীস রেওয়ায়েত করার সময় মুহাদ্দিস ও রাবীর মনে আনন্দ-উৎফুল্লাতা থাকত। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে এমনকি তার হাদীস শ্রবণের অবস্থাসহ উল্লেখ করতেন। অনেক সময় এমনও হতো যে, রাবীর মনে আনন্দ-উৎফুল্লাতা নেই কিংবা স্থান-কাল-পাত্র অনুকূল নয় কিংবা হাদীস হতে শরয়ী মাসআলা বের করার স্বার্থে তিনি হাদীসটিকে সংক্ষেপ করেন অর্থাৎ বর্তমানে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করে বাকি অংশ অনুল্লেখ রেখে রেওয়ায়েত করতেন।

إِخْتِصَارُ حَدِيثٍ -এর হুকুম : মুহাদ্দিসগণের মাঝে **إِخْتِصَارُ حَدِيثٍ** -এর হুকুম নিয়ে মতবিরোধ আছে। এ ব্যাপারে চারটি মতামত প্রণিধাণযোগ্য। যথা—

১. **اَلْتَمَنَ مُطْلَقًا** অর্থাৎ কোনোভাবেই জায়েজ নেই।
২. **اَلْجَرَارُ مُطْلَقًا** অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য জায়েজ। চাই তিনি মুহাদ্দিস হন অথবা মুহাদ্দিস না হন। রাবী পূর্ণ হাদীসটি পূর্বে উল্লেখ করুক অথবা না করুক।
৩. যে রাবী হাদীস **اِخْتِصَار** করেছেন তিনি অথবা অন্য আরেকজন রাবী যদি অন্তত একবার পূর্ণ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন, তবে **اِخْتِصَارُ الْحَدِيثِ** জায়েজ। নতুবা জায়েজ নেই।
৪. এটি জমহুর মুহাদ্দিসীদের অভিমত। আর এ অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। আল্লামা ইবনুস সালাহ ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ অভিমত অবলম্বন করেছেন। আর তা হলো নিম্নরূপ—
اِخْتِصَارُ حَدِيثٍ এ আলিম ও মুহাদ্দিসের জন্য জায়েজ যিনি হাদীসের **مَعْنَى وَفَهْمُ** ভালোভাবে বুঝেন। কারণ, তিনি যখন **اِخْتِصَار** করবেন, বুঝে-গুনেই করবেন। যে অংশ তিনি উল্লেখ করবেন না তার সাথে উল্লেখ করা অংশের সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। ফলে হাদীসের মূল বক্তব্য ও ভাব বিকৃত হবে না। যদি কোনো জাহিল বা অজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ করে, তবে সে তা না বুঝেই করবে। এতে হাদীসের মূল বক্তব্য ও ভাব বিকৃত হয়ে যেতে পারে। উদাহরণত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস—
لَا تَبَاعُ الذُّعْبُ بِالذُّعْبِ إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ .

অর্থাৎ তোমরা সমান সমান ছাড়া স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ বিক্রয় করো না।
এখানে যদি **اِخْتِصَار** করতে গিয়ে **سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ** -কে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে হাদীসের মূল বক্তব্য ও ভাব সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। যেখানে সমান সমান হলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রিকে জায়েজ বলা হয়েছে সেখানে অর্থ পাল্টে হয়ে যাবে— কোনো অবস্থাতেই স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই।
অনুরূপভাবে যদি **غَابَةِ** -কে বাদ দেওয়া হয়, তাহলেও অর্থ পাল্টে যাবে। যেমন— রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস—
لَا تَبَاعُ الْفَسْرَةُ حَتَّى تَزُومَ .

অর্থাৎ তোমরা ফল না পাকা পর্যন্ত বিক্রয় করবে না।
এ হাদীসে **اِخْتِصَار** তথা সংক্ষেপ করতে গিয়ে যদি **حَتَّى تَزُومَ** -কে বাদ দেওয়া হয়, তবে যেখানে হাদীসের মূল বক্তব্য ছিল— ‘পরিপক্ব হলে ফল বিক্রি জায়েজ’ তা পাল্টে হয়ে যাবে— ‘কোনো অবস্থাতেই ফল বিক্রি জায়েজ নেই।’
তাই জমহুর মুহাদ্দিসগণ **اِخْتِصَارُ حَدِيثٍ** জায়েজ হবার জন্য রাবীর আলিম-মুহাদ্দিস হওয়ার শর্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, শুধু আলিম-মুহাদ্দিস হলে হবে না; বরং এমন আলিম-মুহাদ্দিস হতে হবে, যিনি **نَهْنَه** (সন্দেহভাজন)-এর উর্ধ্বে হবেন। যদি এমন হয় যে, একবার রাবী পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি রেওয়ায়েত করার পর দ্বিতীয়বার যদি **اِخْتِصَار** করেন, তাহলে তার উপর **نَلَّةُ ضَبْطٍ** (কম আয়ত্তশক্তি), **غَفْلَةٌ** (উদাসীনতা), **نِسْيَان** (ভুল) অথবা **زِيَادَةٌ** (বৃদ্ধি) -এর তোহমত উঠে, তাহলে এমন আলিম-মুহাদ্দিসের জন্য **اِخْتِصَارُ حَدِيثٍ** জায়েজ নেই।

হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে বর্ণনা করার হুকুম : হাদীসের আলোকে মাসআলা ইস্তিহাত ও আহরণের জন্য হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে রেওয়ায়েত করা জায়েজ কিনা— এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা—

১. ইমাম নববী ও হাফিজ সুযুতীর অভিমত : তাঁদের মতে মাসআলা আহরণের জন্য হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে বর্ণনা করা জায়েজ।
২. ইবনুস সালাহ -এর অভিমত : তাঁর মতে এটাও কারাহাতমুক্ত নয়। অর্থাৎ এমনটি করা মাকরুহ হবে। তবে এ ব্যাপারে ইমাম নববী ও হাফিজ সুযুতী (র.) -এর অভিমত সর্বোচ্চ সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা, জমহুর মুহাদ্দিসগণের অভিমত হলো, যদি কোনো হাদীস-সংকলক মুহাদ্দিস একটি দীর্ঘ হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে একাধিক **بَاب** -এর অধীনে **تَرْجَمَةُ الْبَابِ** (অধ্যায়ের শিরোনাম) প্রমাণের জন্য আনেন, তবে তা জায়েজ আছে। ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ সহ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তাঁদের নিজ নিজ কিতাবে এমনটি অনেক করেছেন।

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى فَالْخِلَافُ فِيهِ شَهِيرٌ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ أَيْضًا
وَمِنْ أَقْوَى حُجَجِهِمُ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ
لِلْعَرَبِ بِهِ فَإِذَا جَازَ الْإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى فَجَوَازُهُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوَّلَى ،
وَقِيلَ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْمُفْرَدَاتِ دُونَ الْمُرْغَبَاتِ ، وَقِيلَ إِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ
يَسْتَحْضِرُ اللَّفْظَ لِيَتِمَّكَنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَقِيلَ إِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ
يَحْفَظُ الْحَدِيثَ فَتَنَسَّى لَفْظَهُ وَبَقِيَ مَعْنَاهُ مُرْتَسِمًا فِي ذَهْنِهِ فَلَهُ أَنْ
يُرْوِيَهُ بِالْمَعْنَى لِمَصْلَحَةِ تَحْصِيلِ الْحُكْمِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ
مُسْتَحْضِرًا لِلْفِظِهِ ، وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ
الْأَوَّلَى إِبْرَاءُ الْحَدِيثِ بِالْفَظِ دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ
بَنَبَغِي سُدَّ بَابُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى لِثَلَا يَتَسَلَّطُ مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ
أَنَّهُ يُحْسِنُ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنَ الرُّوَاةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَاللَّهُ الْمَوْقُ .

অনুবাদ : অর্থ ঠিক রেখে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন করা সম্পর্কে মতপার্থক্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এক্ষেত্রেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস বেধতার পক্ষপাতী। তাদের একটি মজবুত দলিল হলো, অনারবদের নিকট তাদেরই ভাষায় শরিয়তের বিধান ব্যাখ্যা করা 'বিষয় ও উভয় ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ' ব্যক্তির জন্য বেধ। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং পুরো ভাষা যেখানে পরিবর্তন করা জায়েজ, সেখানে আরবি ভাষায় পরিবর্তন করা জায়েজ হবে অতি উত্তমভাবে।

অনেকের মতে, এ পরিবর্তন শুধুমাত্র শব্দের ক্ষেত্রে জায়েজ, বাক্যের ক্ষেত্রে নয়। আবার কারো কারো মতে, যিনি হাদীসের মূল শব্দসমূহ মনে রেখেছেন তার জন্য জায়েজ। কেননা, মূলশব্দ মনে থাকলেই তর্জি তাতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। ঠিক এর বিপরীত মত পোষণ করেন অনেকে। তারা বলেন, যিনি হাদীসটি মনে রেখেছেন কিন্তু হুবহু শব্দ ভুলে গেছেন আর অর্থটি তার মনে গাঁথা আছে, তার জন্য প্রতিশব্দে হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ।

এ মতপার্থক্য হলো জায়েজ কিনা তা নিয়ে। কিন্তু হুবহু শব্দে হাদীস বর্ণনা উত্তম হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কাজি ইয়ায (র.) বলেন, হাদীসের অর্থগত বর্ণনার দ্বার বন্ধ রাখা উচিত, যাতে করে যে ব্যক্তি আসলেই ভালোভাবে জানে না অর্থাৎ ভালো আলিম না অথচ মনে করে আমি ভালো জানি (আলিম), সে যেন এমনটি করার দুঃসাহস না করতে পারে। যেমনটি প্রাচীন ও আধুনিককালের অনেক রাবী করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রেওয়ায়েতের দু পন্থা : হাদীস রেওয়ায়েত করার পন্থা দুটি। ১. رَوَايَةً بِاللَّفْظِ তথা শব্দগত রেওয়ায়েত ও ২. رَوَايَةً بِالْمَعْنَى তথা অর্থগত রেওয়ায়েত। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. رَوَايَةً بِاللَّفْظِ -এর সংজ্ঞা : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে শব্দে হাদীস বর্ণিত হয়েছে হুবহু এ শব্দে হাদীস রেওয়ায়েত করার নাম رَوَايَةً بِاللَّفْظِ।

رَوَايَةً بِاللَّفْظِ -এর হুকুম : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) সহ সকলের অভিমত হলো, রেওয়ায়েতের দু পন্থার মধ্যে رَوَايَةً بِاللَّفْظِ -ই আসল ও সর্বোচ্চ সঠিক পন্থা। তাই সর্বসম্মতিভাবে এভাবে রেওয়ায়েত করা জায়েজ।

২. رَوَايَةً بِالْمَعْنَى -এর সংজ্ঞা : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস বর্ণনায় যে لَفْظ বলেছেন সে لَفْظ না বলে তার مَعْنَى তথা মূলভাবকে مُرَادُف তথা প্রতিশব্দে রেওয়ায়েত করাকে رَوَايَةً بِالْمَعْنَى বলে।

رَوَايَةً بِالْمَعْنَى -এর হুকুম : رَوَايَةً بِالْمَعْنَى তথা অর্থগত বর্ণনা জায়েজ কি জায়েজ নয়- তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. জুমহুরের অভিমত : চার ইমাম, অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং উসুলীনদের অভিমত হলো, رَوَايَةً بِالْمَعْنَى শর্তের সাথে জায়েজ। আর সে শর্ত হলো, যিনি رَوَايَةً بِالْمَعْنَى করবেন তাকে আলিম-মুহাদ্দিস হতে হবে। (সাধারণ ও মুখলোকদের জন্য এটা জায়েজ নেই।) তাঁদের অভিমতের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় দলিল হলো, অনারবদের কাছে তাদের ভাষায় ইসলাম ও শরিয়ত সম্পর্কে তুলে ধরা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। অতএব যখন অনারবদের ভাষায় হাদীসের ভাষান্তর জায়েজ, তখন আরবি ভাষায় প্রতিশব্দ দ্বারা হাদীসের মূলভাব রেওয়ায়েত করা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জায়েজ হবে।

আর এটার ত্রুণমতির স্বপক্ষে একটি হাদীসও রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে যেভাবে (যে শব্দে) হাদীস শুনি সেভাবে (সে শব্দে) অন্যের কাছে রেওয়ায়েত করতে পারি না- শব্দের কমবেশি করে ফেলি। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি তুমি হাদীসের মূলভাব ঠিক রাখ এবং হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম না কর, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। ওলামায়ে কেরামের মতে رَوَايَةً بِالْمَعْنَى তথা অর্থগত রেওয়ায়েত জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে এ হাদীস অন্যতম প্রমাণ।

২. কারো কারো অভিমত : رَوَايَةً بِالْمَعْنَى শব্দের মধ্যে জায়েজ; বাক্যের মধ্যে জায়েজ নয়। যেমন- হাদীসে আগত لَيْت শব্দের স্থানে آسَد বলা ইত্যাদি।

৩. কতিপয়ের অভিমত : رَوَايَةً بِالْمَعْنَى কেবল সেই ব্যক্তির জন্য জায়েজ, হাদীসের শব্দ যার মুখস্থ থাকে। যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে হাদীসের হুবহু শব্দ বলতে পারে।

৪. অনেকের অভিমত : যে ব্যক্তি হাদীসের শব্দ মুখস্থ করেছিল কিন্তু পরে শব্দ ভুলে গিয়েছে এবং অর্থ ভালোভাবে মনে আছে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য رَوَايَةً بِالْمَعْنَى জায়েজ। শুধু অর্থ যে জানে তার জন্য জায়েজ নেই।

৫. আল্লামা কাজি ইয়ায (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে رَوَايَةً بِالْمَعْنَى -এর দ্বার চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে কোনো অবস্থায় যে কারো জন্য এর অনুমতি না থাকা উচিত। যাতে করে আলিমদের দেখাদেখি যারা আলিম নয় কিন্তু নিজেদের আলিম বলে ভাবে, তারা যেন এর সুযোগ নিয়ে رَوَايَةً بِالْمَعْنَى করার দুঃসাহস না করে। কেননা, অতীতে এবং পরে অনেকে এমনটি করেছে।

رَوَايَةً بِاللَّفْظِ - ই সর্বোত্তম : বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ওলামায়ে কেরাম رَوَايَةً بِاللَّفْظِ জায়েজ হওয়ার পক্ষপাতী হলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত এবং কোনো সন্দেহ নেই যে, رَوَايَةً بِاللَّفْظِ তথা রাসূলের হুবহু শব্দ হাদীস রেওয়ায়েত করাই সর্বোত্তম। একটি হাদীস থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে। হাদীসটি হলো- نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَلَقَهُ كَمَا سَمِعَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ রাকুল আলামীন ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার থেকে কোনো হাদীস শুনেছে অতঃপর তা যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى بِأَنَّ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِقِلَّةِ أَحْتِجَاجٍ إِلَى الْكُتُبِ
الْمُصَنَّفَةِ فِي شَرْحِ الْغَرِيبِ كَكِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَهُوَ غَيْرُ
مُرْتَبٍ وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَقِّقُ الدِّينِ ابْنُ قَدَامَةَ عَلَى الْحُرُوفِ وَاجْمَعُ مِنْهُ
كِتَابُ أَبِي عُبَيْدٍ الْهَرَوِيِّ وَقَدْ اعْتَنَى بِهِ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ
فَتَعَقَّبَ عَلَيْهِ وَاسْتَذْرَكَ وَلِلزَّمَخْشَرِيِّ كِتَابٌ إِسْمُهُ الْفَائِزُ حَسَنُ
التَّرْتِيبِ ثُمَّ جَمَعَ الْجَمِيعُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَكِتَابُهُ أَسْهَلُ الْكُتُبِ
تَنَاوَلًا مَعَ أَغَوَازٍ قَلِيلٍ فِيهِ .

অনুবাদ : হাদীসের অর্থ যদি অস্পষ্ট হয়, যেমন কোনো শব্দ অপ্রচলিত হবার কারণে হয়ে থাকে; তাহলে প্রয়োজন পড়বে ‘শরহুল গরীব’ বা অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাবের। এ বিষয়ে আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সালামের একখানা গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু তা সুবিন্যস্ত নয়। পরবর্তীকালে শায়খ মুওফফাকুদ্দীন ইবনে কাদামা এটিকে বর্ণ-ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। তবে এর চেয়ে অধিক তথ্যসমৃদ্ধ হলো আবু উবাইদ হারভীর কিতাব। হাফিজ আবু মূসা মাদীনী এর উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থের কোথাও কোথাও সমালোচনা করেছেন, আবার কোথাও নতুন বিষয় সংযোজন করে দিয়েছেন। আল্লামা যামাখশারীর এ বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রয়েছে যার নাম ‘আল-ফায়িক’। এটি সুবিন্যস্ত। আর এগুলোকে একত্রিত করেছেন ইবনুল আছীর তাঁর ‘নিহায়া’ গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থটিই সবচেয়ে সহজবোধ্য। অবশ্য সামান্য কয়েক জায়গায় কিছুটা জড়তা আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى : এখান থেকে সম্মানিত লেখক যে আলোচনাটি করেছেন তা উদ্দেশ্যগত নয়; বরং প্রাসঙ্গিক। পূর্বের সাথে দূর-সম্পর্ক থাকায় এ আলোচনার অবতারণা করেছেন।

حَدِيثُ غَرِيبٍ -এর সংজ্ঞা : কোনো শব্দের ব্যবহার যদি কম হয়, তাহলে সে শব্দকে বলে গَرِيب। এই حَدِيثُ غَرِيبٍ শব্দ যে হাদীসে আসে সে হাদীসকে বলে حَدِيثُ غَرِيبٍ।

আরবিতে হাদীসে গরীবের সংজ্ঞা এরূপ—

هُوَ مَا جَاءَ فِي الْمَثْنِ مِنْ لَفْظٍ غَامِضٍ بَعِيدٍ عَنِ الْقَوْمِ لِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهِ .

অর্থাৎ যার মতনে দুর্বোধ্য কোনো শব্দ থাকে, কম ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যার অর্থ সহজে বুঝা যায় না।

وَأِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِكَثْرَةٍ لِّكِنْ فِي مَذْلُوبِهِ دَقَّةٌ أَحْتَبِجَ إِلَى
الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْهَا وَقَدْ
أَكْثَرَ الْأَيِّمَةُ مِنَ التَّصَانِيفِ فِي ذَلِكَ كَالطَّحَاوِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ وَابْنِ عَبْدِ
النَّبَرِّ وَغَيْرِهِمْ -

অনুবাদ : আর যদি খোদ শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও সংশ্লিষ্ট হাদীসে তার নির্দেশিত অর্থ সূক্ষ্ম হয়, তাহলে প্রয়োজন পড়বে ‘শরহ মা’আনিল আখবার’ বা হাদীসের অর্থ বিশ্লেষণ ও জটিল হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাবের। এ বিষয়ে ইমামগণের প্রচুর রচনা রয়েছে। যেমন- ইমাম ডাহাবী, খাতাবী, ইবনে আদিল বার প্রমুখ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيثٌ مُشْكِلٌ -এর সংজ্ঞা : যে শব্দের ব্যবহার বেশি কিন্তু তার অর্থ ও মর্ম হয় সূক্ষ্ম, তাহলে সে শব্দকে বলে মুশ্কিল। যে হাদীসের মধ্যে এই মুশ্কিল শব্দ থাকে সে হাদীসকে বলা হয় حَدِيثٌ مُشْكِلٌ।

আরবিতে الْحَدِيثِ الْمُشْكِلِ -এর সংজ্ঞা :

هُوَ مَا جَاءَ فِي الْمَنْعِ مِنْ لَفْظٍ مُسْتَعْمَلٍ بِكَثْرَةٍ لِّكِنْ فِي مَذْلُوبِهِ دَقَّةٌ -

অর্থাৎ الْحَدِيثِ الْمُشْكِلِ বলা হয় ঐ হাদীসকে যার মতনে এমন কোনো শব্দ থাকে যা প্রচুর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইবারতের মাঝে তা এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তার মতলব ও মূল বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

হাদীসের অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার কারণ : দু কারণে হাদীসের অর্থ অস্পষ্ট হয়। যথা-

১. হাদীসে غَرِيب শব্দ ব্যবহার হওয়ার কারণে। অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহার হওয়ার কারণে যার ব্যবহার হয় কম।

২. হাদীসের শব্দের ব্যবহার বেশি হলেও তার অর্থ সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে।

হাদীসে ‘গরীব’ শব্দ আসলে করণীয় : হাদীসে যদি ‘গরীব’ শব্দ আসে এবং সে কারণে হাদীসের অর্থ অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন হাদীসের অর্থ বুঝতে এবং পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে গরীব শব্দের ব্যাখ্যায় যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হয়েছে তা অধ্যয়ন করতে হবে।

হাদীসে ‘মুশকিল’ শব্দ আসলে করণীয় : হাদীসের অর্থ যদি অস্পষ্ট হয় তাতে ‘মুশকিল’ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যার ব্যবহার বেশি হলেও তার অর্থ ও মর্ম সূক্ষ্ম হয়, তাহলে এমতাবস্থায় হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে ঐ সমস্ত কিতাবের শরণাপন্ন হতে হবে যা মুশকিলুল হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে।

ثُمَّ الْجَهَالَةُ بِالرَّأَوَى وَهِيَ السَّبَبُ الثَّامِنُ فِي الطَّعْنِ وَسَبَبُهَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الرَّأَوَى قَدْ تَكَثَّرَ نَعْوَتُهُ مِنْ إِسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حَرْفَةٍ أَوْ نَسَبٍ فَيَشْتَهَرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَيُذَكَّرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لِعَرَضٍ مِنَ الْأَعْرَاضِ فَيُظَنُّ أَنَّهُ آخَرُ فَيَحْصُلُ الْجَهْلُ بِحَالِهِ وَصَنَّفُوا فِيهِ آثِي فِي هَذَا النَّوعِ الْمَوْضِعِ لِأَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ أَجَادَ فِيهِ الْخَطِيبُ وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْغَنِيِّ ثُمَّ الصَّوْرِيُّ وَمِنْ أَمْثَلَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنُ بِشْرِ الْكَلْبِيِّ نَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى جَدِّهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَسَمَاءُ بَعْضُهُمْ حَمَّادُ بْنُ السَّائِبِ وَكَتَّاهُ بَعْضُهُمْ أَبَا النَّضْرِ وَبَعْضُهُمْ أَبَا سَعِيدٍ وَبَعْضُهُمْ أَبَا هِشَامٍ فَصَارَ يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فِيهِ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

অনুবাদ : অতঃপর রাবীর অজ্ঞাত হওয়া। এটি রাবী সংক্রান্ত অষ্টম অভিযোগ। এরূপ হয় দু কারণে। একটি হলো, কোনো রাবীর অনেক পরিচয় থাকে। যেমন- নাম, উপনাম, উপাধি, পেশা, দক্ষতা, বংশ ইত্যাদি। তিনি হয়তো কোনো একদিক দিয়ে পরিচিত। কিন্তু কোথাও কারণবশত তাকে উল্লেখ করা হলো এমন এক পরিচয়ে যাতে তিনি প্রসিদ্ধ নন। ফলে ধারণা হতে পারে যে, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। এভাবে তিনি অপরিচিত হয়ে যাবেন। এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদির নাম 'আল-মুযীহ লিআওহামিল জাময়ি ওয়াত তাফরীক'। খতীবে বাগদাদী এ সম্পর্কে সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তার পূর্বে আব্দুল গনী ও আসসূরী এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এর উদাহরণ মুহাম্মদ ইবনুস সায়েব ইবনে বিশর কালবী। অনেকে তাকে উল্লেখ করেন দাদার সাথে সম্পৃক্ত করে মুহাম্মদ ইবনে বিশর নামে। কেউ বলেছেন তার নাম হাম্মাদ ইবনে সায়েব। তার কুনিয়াত বা উপনাম কেউ বলেছেন আবু নয়র, আবার কেউ বলেন আবু সাঈদ, আবার কেউ বলেন আবু হিশাম। ফলে ধারণা জন্মায় যে এরা একদল লোক। অথচ তিনি একজনই। যিনি প্রকৃত ঘটনা জানেন না তিনি কিছুই বুঝতে পারবেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَهَالَةُ الرَّأَوَى -এর সংজ্ঞা : কোনো রাবীর **ذَاتٌ** কিংবা **صِفَتْ** অজ্ঞাত থাকাকে **جَهَالَةُ الرَّأَوَى** বলা হয়।

جَهَالَةُ ذَاتٍ -এর অর্থ হলো, তিনি কে? সুস্পষ্টভাবে তা চিহ্নিত ও সনাক্ত করা যায় না।

جَهَالَةُ صِفَتْ -এর অর্থ হলো, তিনি কোন ধরনের রাবী, ছিকাহ- না যাঈফ? তা নির্দিষ্ট করা যায় না।

جَهَّالَةُ الرَّأْيِ -এর কারণ : جَهَّالَةُ الرَّأْيِ তথা রাবী অজ্ঞাত হয় দুটি কারণে। ১. রাবীর পরিচয়সূত্র অনেক হওয়া ও ২. রাবীর হাদীস ও ছাড়া কম হওয়া। নিজে উভয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ : রাবীর অজ্ঞাত হওয়ার দুটি কারণের মধ্যে প্রথমটি হলো, রাবীর পরিচয়সূত্র অনেক হওয়া। যেমন- নাম, উপনাম, উপাধি, বংশ, আঞ্চলিক সম্বন্ধ, পেশা ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে একটিতে তিনি প্রসিদ্ধ হন আর বাকিগুলো অপ্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী তার অপ্রসিদ্ধ কোনো বিশেষণ বা পরিচয় উল্লেখ করে, যার দরুন তার প্রকৃত পরিচিতি জানা যায় না; বরং ধারণা হয় তিনি অন্য কোনো ব্যক্তি হবেন। সুতরাং এভাবে একজন পরিচিত রাবী অনেক সময় **مَنْزُول** বা অজ্ঞাত-অপরিচিত হয়ে যায়।

পরিচয়সূত্র অনেক হওয়ার ভিত্তিতে রাবী অজ্ঞাত হওয়ার উদাহরণ : মুহাম্মদ ইবনুস সায়েব ইবনে বিশর কালবী একজন রাবী। তার নাম মুহাম্মদ, উপাধি হাম্মাদ, উপনাম আবু নয়র, আবু সাঈদ এবং আবু হিশাম। এখন কেউ তাকে দাদার দিকে সম্বন্ধ করে মুহাম্মদ ইবনে বিশর, কেউ তাকে হাম্মাদ ইবনুস সায়েব, কেউ তাকে কুনিয়াত হিসেবে আবু নয়র, কেউ আবু সাঈদ আবার কেউ আবু হিশাম পরিচয়ে উল্লেখ করে। যার কারণে আসল ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় না ; বরং ধারণা হয় যে, তারা এক রাবী- না একাধিক রাবী। অথচ বাস্তবে তিনি একজনই।

এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলি : পরিচয়সূত্র একাধিক হওয়ার কারণে যে সমস্ত রাবীর ক্ষেত্রে অজ্ঞাত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ যে সমস্ত রাবী **مَنْزُول** হয়েছেন তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে মুহাদ্দিসগণ অনেক কিতাব লেখেছেন। তাদের মধ্যে প্রথমে যার নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন শায়খ আব্দুল গনী (র.), এরপরে রয়েছেন শায়খ আসসুরী (র.)। খতীবে বাগদাদী (র.)ও এ বিষয়ে কিতাব লেখেছেন। এর মধ্যে খতীবে বাগদাদী (র.) লিখিত কিতাবটিই সবচেয়ে ভালো। যদি এ সকল কিতাবের সাহায্যে অজ্ঞাত রাবীর পরিচয় জানা যায় অর্থাৎ তাকে সনাক্ত করা যায়, তাহলে এবার দেখতে হবে তিনি নির্ভরযোগ্য কিনা। নির্ভরযোগ্য হলে তার হাদীস মাকবুল হবে; আর নির্ভরযোগ্য না হলে তার হাদীস মাকবুল হবে না। আর যদি এ সকল কিতাবের সাহায্যেও অজ্ঞাত রাবীকে সনাক্ত করা না যায়, তাহলে তার হাদীসও মাকবুল হবে না। কারণ, হতে পারে তিনি যাঈফ তথা নির্ভরযোগ্য নন।

وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّ الرَّاَوِيَّ قَدْ يَكُونُ مُقْلًا مِنَ الْحَدِيثِ فَلَا يَكْثُرُ الْأَخْذُ عَنْهُ وَقَدْ صَنَّفُوا فِيهِ الْوَحْدَانَ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَرَوْ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدًا وَلَوْ سَمِيَ وَمِمَّنْ جَمَعَهُ مُسْلِمٌ وَالْحَسَنُ بْنُ سَفْيَانَ وَغَيْرُهُمَا أَوْ لَا يَسْمَى الرَّاَوِيَّ اخْتِصَارًا مِنَ الرَّاَوِيَّ عَنْهُ كَقَوْلِهِ أَخْبَرَنِي فَلَانَ أَوْ شَيْخٌ أَوْ رَجُلٌ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ ابْنُ فَلَانَ وَنُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ الْمُتَّبِعِ بِوُجُودِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُسَمًّى وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُتَّبِعَاتِ .

অনুবাদ : অপরিচিতির (অজ্ঞাত হওয়ার) দ্বিতীয় কারণ হলো, রাবী হয়তো খুব স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তার নিকট থেকে তেমন বেশি কেউ তা শিক্ষা করেনি। এ ধরনের ব্যক্তিদের পরিচয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ রচনা করেছেন ‘উহদান’ কিতাব। এর অর্থ হলো, যার থেকে মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার নাম উল্লেখ করা হলেও তিনি অপরিচিতই থেকে যান। ইমাম মুসলিম, হাসান ইবনে সুফিয়ান প্রমুখ এরাণ রাবীদের নাম সংকলন করেছেন।

কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে রাবী তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন না। যেমন- তিনি বলেন, আমাকে জানিয়েছেন জনৈক শায়খ বা জনৈক ব্যক্তি বা অমূকের পুত্র। এতেও সে ব্যক্তি অপরিচিত থেকে যান। এই সম্প্রদায় রাবীর নাম যদি অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়, তাহলে তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। এ বিষয়ে লিখিত কিতাবের নাম ‘মুবহামাত’।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকারের বিবরণ : রাবী অজ্ঞাত বা অপরিচিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, রাবী **قَلِيلٌ** তথা রাবীর ছাত্র ও বর্ণিত হাদীস কম হওয়া। এটা আবার দু প্রকার। যথা-

১. রাবী থেকে রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা কম; মাত্র একজন। ঐ একজন যখন রেওয়ায়েত করেন তাকে তার নামেই উল্লেখ করেন। কিন্তু তার সূত্রে রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা কম হেতু তিনি মুহাদ্দিসগণের মাঝে পরিচিত নন। ফলে তার **حَال** অজ্ঞাত থেকে যায়। তিনি নির্ভরযোগ্য, নাকি নির্ভরযোগ্য নয় এটা অজ্ঞাত থেকে যায়।

এমন অজ্ঞাত রাবীদের পরিচিতি তুলে ধরতে ইমাম মুসলিম (র.), হাসান ইবনে সুফিয়ান (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ‘উহদান’ (যার ছাত্র একজন বা যার বর্ণিত হাদীস মাত্র একটি) নামে কিতাব রচনা করেছেন। এ সকল কিতাবে যাদের ছাত্র একজন কিংবা বর্ণিত হাদীস একটি তাদের একত্রিত করা হয়েছে। এমন **مَجْمُوعُ رَاوِيٍّ** (অজ্ঞাত রাবী) আবার দু প্রকার। ১. **مَجْمُوعُ الْعَيْنِ** ও ২. **مَجْمُوعُ الْحَالِ**। পরে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

২. রাবী থেকে রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা কম; মাত্র একজন। আবার সংক্ষেপার্থে ঐ একজন রাবীর নামও উল্লেখ করেননি; বরং মুবহামভাবে বলেছেন। যেমন- **أَخْبَرَنِي فَلَانٌ** তথা আমাকে অমুক সংবাদ দিয়েছে, **أَخْبَرَنِي شَيْخٌ** তথা আমাকে শায়খ সংবাদ দিয়েছেন, **أَخْبَرَنِي رَجُلٌ** তথা এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দিয়েছে, **أَخْبَرَنِي بَعْضُهُمْ** তথা এক লোক আমাকে সংবাদ দিয়েছে, **أَخْبَرَنِي ابْنُ** তথা অমূকের পুত্র আমাকে সংবাদ দিয়েছে ইত্যাদি। ফলে তিনি অজ্ঞাত হয়ে গিয়েছেন। কেননা, এভাবে বর্ণনা করার দ্বারা রাবী প্রকৃত কে? তার অবস্থা কি? তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। অবশ্য যদি অন্য সনদে তার নাম উল্লেখ হয়, তাহলে তার মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, রাবী কে? তিনি নির্ভরযোগ্য কিনা। এজন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম ‘মুবহামাত’ নামে কিতাব লেখেছেন। যার মধ্যে এমন অজ্ঞাত রাবীদের জমা করা হয়েছে।

وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ الْمُبْهَمِ مَا لَمْ يُسَمَّ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الْخَبَرِ عَدَالَةُ رَاوِيهِ
وَمَنْ أَبْهَمَ اسْمَهُ لَا تَعْرِفُ عَيْنُهُ فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ وَكَذَا لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ لَوْ
أَبْهَمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ كَانَ يَقُولُ الرَّاَوِيُّ عَنْهُ أَخْبَرَنِي الْحَقُّهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ
ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوحًا عِنْدَ غَيْرِهِ وَهَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمُسْنَدَةِ وَلِهَذَا
النُّكْتَةُ لَمْ يُقْبَلِ الْمُرْسَلُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ الْعَدْلُ جَازِمًا بِهِ لِهَذَا الْأَخْتِمَالِ
بِعَيْنِهِ وَقِيلَ يُقْبَلُ تَمَسُّكًا بِالظَّاهِرِ إِذَا الْجَرُّ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَقِيلَ
إِنْ كَانَ الْقَائِلُ عَالِمًا أَجْزَأُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ وَهَذَا لَيْسَ
مِنْ مَبَاحِثِ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ ، فَإِنَّ سُمِّيَ الرَّاَوِيَّ وَأَنْفَرَدَ رَاوٍ
وَاحِدٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ فَهُوَ مَجْهُولُ الْعَيْنِ كَالْمُبْهَمِ إِلَّا أَنْ يُوثِّقَهُ غَيْرُ مَنْ
أَنْفَرَدَ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا مَنْ أَنْفَرَدَ عَنْهُ إِذَا كَانَ مُتَاهِلًا لِذَلِكَ أَوْ إِنْ
رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يُوثِّقْ فَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ وَهُوَ الْمُسْتَوْرُ
وَقَدْ قِيلَ رِوَايَتُهُ جَمَاعَةً بِغَيْرِ قَيْدٍ وَرَدَّهَا الْجُمْهُورُ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ
رِوَايَةَ الْمُسْتَوْرِ وَنَحْوِهِ عَمَّا فِيهِ الْإِخْتِمَالُ لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا
بِقَبُولِهَا بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبَانَةِ حَالِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ
وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ فَيَمْنُ جُرْحٍ بِجُرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ -

অনুবাদ : অপরিচিত রাবীর নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হওয়া পর্যন্ত তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কোনো হাদীস গ্রহণযোগ্য হবার জন্য শর্ত হলো, রাবীর আদিল হওয়া। যার নামই অস্পষ্ট তাকে তো চেনা যায় না। সুতরাং তাকে কিভাবে আদিল সাব্যস্ত করা যাবে ?

যদি অস্পষ্টভাবে কাউকে আদিল বলা হয়ে থাকে, যেমন- বলা হলো, আমাকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জানিয়েছেন, তবুও তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হতে পারে তিনি তার নিকট নির্ভরযোগ্য কিন্তু অন্যের মতে অভিযুক্ত। এটি বিশুদ্ধতর মত। এই রহস্যের কারণেই মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো আদিল ব্যক্তি জোরালো ভাষায় মুরসাল হাদীস বর্ণনা করলেও ঠিক এই সম্ভাবনা থেকে যাবার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকের মতে তা গ্রহণযোগ্য। তারা জাহেীরী দিকটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। কেননা, অভিযোগ হলো ব্যতিক্রম। আর আদিল হওয়াই আসল অবস্থা। আবার অনেকের মতে উক্ত ব্যক্তি যদি আলিম হন, তাহলে তার মাযহাবের অনুসারীর জন্য তা চলবে। অবশ্য (তখন) এটি ইলমে হাদীসের কোনো বিষয় হবে না।

রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু তার নিকট থেকে মাত্র একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন- ইনিও অস্পষ্ট ব্যক্তির মতোই অপরিচিত। তবে হ্যাঁ, এরূপ যার নিকট থেকে মাত্র একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেননি; বরং একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেন,

তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। তেমনি কারো থেকে মাত্র একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করলেও তিনি যদি যোগ্য ব্যক্তি হন, তাহলেও চলবে।

হয়তো তার নিকট থেকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে বর্ণনা করেননি। এরূপ ব্যক্তির সত্তা পরিচিত হলেও অবস্থা অপরিচিত। এর নাম “মাসতুর”, এক দল মুহাদ্দিস এরূপ ব্যক্তির হাদীস অবোধে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুত মাসতুর এবং এ জাতীয় যাদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তাদের হাদীস গ্রহণ কিংবা বর্জন কোনোটাই অবোধে হবার কথা বলা সম্ভব নয়; বরং তার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাওয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। ইমামুল হারামাইন বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। কারো উপর অভিযোগ আনা হলেও তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয়, তাহলে সে ব্যক্তির ব্যাপারেও ইবনুস সালাহ -এর অভিমত এ রকমই :

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُبْتَنٍ رَاوٍ -এর সংজ্ঞা : রাবী যদি তার পূর্বের রাবীর নাম উল্লেখ না করে এবং পূর্ব রাবীর ছাত্র মাত্র একজন কিংবা তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা একটি হয়, তাহলে তাকে (পূর্ববর্তী রাবীকে) **مُبْتَنٍ رَاوٍ** বলে।

مُبْتَنٍ رَاوٍ -এর হাদীসের হুকুম : যতক্ষণ অন্য সনদে মুবহাম রাবীর নাম উল্লিখিত না হবে ততক্ষণ তার হাদীস মাকবুল হবে না। কেননা, হাদীস মাকবুল হওয়ার জন্য রাবী আদিল হওয়া শর্ত। সুতরাং মুবহাম রাবীর নাম-ই যদি না জানা যায়, তাহলে কিভাবে জানা যাবে যে, তিনি আদিল ছিলেন কিনা? হ্যাঁ যদি অন্য সনদে তার নাম আসে এবং এভাবে তার সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি আদিল ছিলেন, তাহলে তার হাদীস মাকবুল হবে নতুবা মাকবুল হবে না।

تَغْيِيلُ مَبْتَنٍ -এর সংজ্ঞা : **تَغْيِيلُ مَبْتَنٍ** বা পরোক্ষ তা'দীল বলা হয় রাবীর নাম উল্লেখ না করে তার আদালাত বা ন্যায্যপরায়ণতা বর্ণনা করা অথবা নামের স্থানে এমন শব্দ উল্লেখ করা যাতে বুঝা যায় যে, রাবী আদিল ছিলেন। যেমন- এভাবে হাদীস বর্ণনা করা যে, **أَخْبَرَنِي الْحَفَظُ** অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী আমাকে জানিয়েছে।

تَغْيِيلُ مَبْتَنٍ -এর হুকুম : **تَغْيِيلُ مَبْتَنٍ** -এর হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে। যথা-

১. অনুল্লেখ রাবীর নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত এমন পরোক্ষ তা'দীল গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন রাবীর হাদীস মাকবুলও নয়। কারণ, হতে পারে রাবী তার (যিনি মুবহাম করেছেন) দৃষ্টিতে আদিল হলেও প্রকৃত বিচারে তিনি আদিল নন। অবশ্য ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক প্রমুখ হাদীসের ইমাম ও হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস যদি **تَغْيِيلُ مَبْتَنٍ** করেন, তাহলে তাঁদের তা'দীল গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে রেওয়ায়েতও মাকবুল হবে। যেমন- **تَغْلِيْفَاتُ بَغَارِي** -কে সবাই কবুল করে নিয়েছেন।

২. কারো কারো অভিমত হলো, **تَغْيِيلُ مَبْتَنٍ** গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মানুষের ক্ষেত্রে আসল হলো 'আদালাত'। আর জরুর তথ্য অভিযোগ হলো আসলের বিপরীত। অতএব, যতক্ষণ আসলের বিপরীত অবস্থাটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ আসল অবস্থাটাই সাব্যস্ত হবে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, **تَغْيِيلُ مَبْتَنٍ** কারী যদি আলিম হন, তাহলে তার তা'দীল কেবলমাত্র সে গ্রহণ করতে পারে যে তার অনুসারী। এ উক্তিটি মূলত তাকলীদের অন্তর্গত এবং ইলমে হাদীসের আলোচনা বহির্ভূত।

قَلِيلُ الْعِدَّةِ তথা যে রাবীর থেকে রেওয়ায়েত কম সেই রাবীর নাম যদি উল্লেখ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা আবার দু প্রকার। ১. **مَجْهُولُ الْعَالِ** ও ২. **مَجْهُولُ الْعَيْنِ** আর তা দু প্রকার হওয়ার কারণ

হলো, قَلِيلُ الْعَدِيثِ হতে রেওয়ায়েতকারী একজন হবে বা একাধিক হবে। যদি একজন হয়, তাহলে সেটি হলো مَجْهُولُ الْعَيْنِ। আর যদি একাধিক হয়, তাহলে সেটি হলো مَجْهُولُ الْحَالِ। এর অপর নাম مَجْهُولُ الرِّصْفِ। তবে এরই প্রসিদ্ধ নাম হলো মাসতূর।

هُوَ مَنْ لَمْ يَرَوْعَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ -এর সংজ্ঞা : পরিভাষায় مَجْهُولُ الْعَيْنِ বলা হয়-
অর্থাৎ ঐ রাবীকে مَجْهُولُ الْعَيْنِ বলে যার সূত্রে রেওয়ায়েতকারী মাত্র একজন।

প্রকাশ থাকে যে, مَجْهُولُ অর্থ- অজ্ঞাত আর الْعَيْنُ অর্থ- সত্তা। যেহেতু এরূপ রাবী হতে মাত্র একজন রেওয়ায়েত করার ব্যক্তি হিসেবে সে অজ্ঞাত থেকে যায়, তাই তাকে مَجْهُولُ الْعَيْنِ বলা হয়।

مَجْهُولُ الْعَيْنِ -এর হুকুম : مَجْهُولُ الْعَيْنِ রাবীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তাকে কোনো ইমামে হাদীস যদি تَوْثِيق করেন, (রাবীকে নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করেন) তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। তার সূত্রে রেওয়ায়েতকারী যদি ইমামে হাদীস হন, তবে তার تَوْثِيق -ও গ্রহণযোগ্য।

مَجْهُولُ الْحَالِ -এর সংজ্ঞা : পরিভাষায় مَجْهُولُ الْحَالِ বলা হয়-

هُوَ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ -

অর্থাৎ যে রাবী থেকে রেওয়ায়েতকারী একাধিক কিন্তু কোনো ইমামে হাদীসের পক্ষ থেকে তাকে تَوْثِيق করা হয়নি।।

مَجْهُولُ الْحَالِ -এর হুকুম : যে রাবী مَجْهُولُ الْحَالِ তার রেওয়ায়েতের হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. ইমাম আবু হানীফা (র.) সহ একদল মুহাদ্দিসের অভিমত হলো, مَجْهُولُ الْحَالِ রাবীর হাদীস নির্বিচারে মাকবূল।

২. জুমহুরের অভিমত হলো, তা নির্বিচারে মারদূদ (অগ্রহণযোগ্য)।

৩. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, বিশুদ্ধ কথা হলো, اَلْمَسْتُورُ এবং অনুরূপ রাবী (যেমন-مُبْنِي রাবী) যাদের নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য উভয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়- এ কথা যেমন ঠিক নয়, তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য- তেমন এ কথাও ঠিক নয়; বরং আসল কথা হলো, তাদের হাদীস তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত মওকুফ (স্থগিত) থাকবে। যদি কোনোভাবে তাদের অবস্থা জানা যায়, তবে তদনুযায়ী তাদের হাদীসের হুকুম হবে। যদি তাদের মাঝে مَقْبُول হাদীসের সিফাত পাওয়া যায়, তাহলে মাকবূল হবে। যদি মারদূদ -এর সিফাত পাওয়া যায়, তাহলে মারদূদ হবে।

মোটকথা, তাহলে جَهْلٌ বা অজ্ঞতা-অপরিচিতির কারণ মোট ৪টি হলো। ১. পরিচয়সূত্র অনেক হওয়া, ২. রাবীর হাদীস কম হওয়া, ৩. রাবীর নাম উল্লেখ না করা ও ৪. রাবী মাসতূর হওয়া।

ثُمَّ الْبِدْعَةُ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّغْيَانِ فِي الرَّأْيِ وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمُكْفِرٍ كَانَ يَتَقَدُّ مَا يَسْتَلْزِمُ الْكُفْرَ أَوْ بِمُفْسِقٍ فَلَاوَلَّ لَا يَقْبَلُ صَاحِبُهَا الْجُمْهُورُ وَقَبِلَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَبِلَ إِنْ كَانَ لَا يَتَقَدُّ جَلَّ الْكِذْبُ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قَبْلَ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ كُلُّ مُكْفِرٍ بِدْعَةً لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدْعِي أَنَّ مُخَالِفَتَهَا مُبْتَدِعَةٌ وَقَدْ تَبَالُغَ فَتُكْفِرُ مُخَالِفَتُهَا فَلَوْ أَخَذَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَأَسْتَلْزِمَ تَكْفِيرُ جَمِيعِ الطَّائِفِ الْمَعْتَمِدِ عَلَى الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا مَنْ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَانْتَضَمَ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَرُونَهُ مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ .

অনুবাদ : রাবীর উপর অভিযোগের নবম কারণ তার বিদআতী হওয়া। বিদআত দু প্রকার। যথা— ১. তিনি এমন আকিদা পোষণ করেন যাতে কুফরি অবধারিত হয়। ২. যাতে তাকে ফাসিক সাব্যস্ত করা যায়। প্রথম প্রকারের বিদআতি রাবীর হাদীস অধিকাংশই গ্রহণ করেন না। আবার অনেকে বলেন, নির্বিচারেই গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু অনেকে বলেন, উক্ত রাবী যদি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে মিথ্যা কথা বলা হালাল বলে বিশ্বাস না করেন, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে বিদআতের কারণে কাফির সাব্যস্তকৃত প্রত্যেক রাবীরই হাদীস প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কেননা, প্রত্যেক দলই দাবি করে যে, তাদের বিপক্ষ দল বিদআতি। কখনো কখনো এক্ষেত্রে অতিরী ত করে বিরোধী পক্ষকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়। তাই এটি যদি নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সকল দলকেই কাফির সাব্যস্ত করতে হবে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য মত হলো, কেবলমাত্র এমন বিদআতি রাবীর হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে, যিনি শরিয়তের কোনো ‘মুতাওয়াতির’ ও দীনের অবধারিতরূপে সুলিদ্দিত কোনো বিষয় অস্বীকার করেন, তেমনি যিনি এর বিপরীতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু যিনি এরূপ নন, সাথে সাথে তিনি যা বর্ণনা করছেন, তাতে তার আয়ত্তশক্তি এবং জীবনাচারে তাকওয়া ও সাবধানতা পরিলক্ষিত হয়— এমন রাবীর হাদীস গ্রহণ করায় কোনো বাধা নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَسْبَابُ طُغْيَانٍ -এর নবম প্রকারের নাম বিদআত। খাইরুল কুরূন তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীদের যুগে যে সকল বিষয় দীন হিসেবে স্বীকৃত ছিল না তাকে দীন মনে করাই বিদআত। নিম্নে বিদআতের সংজ্ঞা, প্রকরণ ও হুকুম নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

الْإِنْبِغَادُ ২. উদ্ভাবন করা ১. -এর অভিধানিক অর্থ : الْبِدْعَةُ শব্দের অর্থ— ১. -এর আভিধানিক অর্থ : ابْتِدَاعُ فِي الدِّينِ ৩. আবিষ্কার করা ৩. -এর পারিভাষিক অর্থ : ওলামায়ে কেরাম বিদআতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে সংজ্ঞাপূর্বক মর্মার্থ কাছাকাছি এবং প্রায় এক ও অভিন্ন।

১. কামূসের ভাষ্য : কামূসে লেখা হয়েছে, الْبِدْعَةُ হলো— اُخْرَاقُ مَا أُخْرِجَ عَلَى غَيْرِ مَا سَابَقَ ১. অর্থাৎ পূর্বের নমুনা ছাড়া নতুন কিছু আবিষ্কার করা।

২. ইমাম নববী (র.) : তিনি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন নিম্নরূপ- **الْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مَثَالِ سَابِقٍ**

অর্থাৎ বিদআত প্রত্যেক ঐ নতুন জিনিস যা নমুনা ছাড়া তৈরি করা হয়।

৩. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) : তিনি বিদআতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন-

الْبِدْعَةُ مَا أُخْدِتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ

অর্থাৎ বিদআত হলো, যা নতুন শুরু করা হয়েছে এবং শরিয়তে যার কোনো অসল (দলিল) নেই।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র.) : তিনি বিদআতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

مَا أُخْدِتَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إجماعًا .

অর্থাৎ যে নবসৃষ্ট জিনিস কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল, আছারে সাহাবা এবং ইজমায়ে উম্মতের খেলাপ, তাই বিদআত।

بِدْعَةٌ -এর প্রকরণ : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বিদআত দু প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন।

১. **بِدْعَةُ مُكْفِرَةٍ** অর্থাৎ কাফিরকারী বিদআত। ২. **بِدْعَةُ مُفْسِدَةٍ** অর্থাৎ ফাসিককারী বিদআত। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

১. **بِدْعَةُ مُكْفِرَةٍ** -এর সংজ্ঞা : যে বিদআত করার কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায়, তাকে **بِدْعَةُ مُكْفِرَةٍ** বলে। যেমন- খাতাবিয়াপন্থিরা হযরত আলী (রা.) -কে ইলাহে আকবর (বড় খোদা) এবং হযরত জা'ফর সাদিক (র.) -কে ইলাহে আসগর (ছোট খোদা) বলে কাফির হয়েছে।

আবুল খাতাব এক ব্যক্তির নাম। তার বাড়ি ছিল কূফা। সে এই আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করত যে, হযরত আলী (রা.) ইলাহে আকবর আর হযরত জা'ফর সাদিক (র.) ইলাহে আসগর। আবুল খাতাবের অনুসারীদের বলা হয় খাতাবিয়া।

بِدْعَةُ مُكْفِرَةٍ -এর হুকুম : যদি বিদআতি সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়, যেমন খাতাবিয়া সম্প্রদায়, তাহলে তার হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত)।

আর যদি বিদআতি সর্বসম্মতিক্রমে কাফির না হয়, যেমন- কুরআন মাখলুক হওয়ার প্রবক্তরা, তাহলে এ ধরনের বিদআতির হাদীস **مَقْبُول** না **مَرْدُود** তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ-

১. জুমহুরের অভিমত : জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে নির্বিচারে মারদূদ।

২. কারো কারো অভিমত : তাদের মতে নির্বিচারে মাকবুল। চাই সে মিথ্যা বলাকে হালাল মনে করুক বা না করুক।

৩. ইমাম রায়ী (র) -এর অভিমত : তাঁর মতে বিদআতি যদি তার মতবাদের সমর্থনে মিথ্যা বলাকে হালাল মনে না করে, তবে মাকবুল। আর যদি হালাল মনে করে, তাহলে মারদূদ।

৪. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে বিদআতির হাদীস নির্বিচারে মারদূদ হবে না। কারণ, প্রত্যেক দল তার প্রতিপক্ষ দলকে বিদআতি মনে করে; বরং অনেক সময় কুফরেরও ফতোয়া দেয়। সুতরাং যদি সকল দলের দাবি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো কারো হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই বিশুদ্ধ মায়হাব হলো, যে বিদআতি শরিয়তের অংশরূপে মুতাওয়াতিরভাবে স্বীকৃত এবং অকাটাভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যেমন- রাজা, নামাজ ইত্যাদিকে অস্বীকার করে অথবা মুতাওয়াতিরভাবে স্বীকৃত গায়ের দীন, যেমন- মূর্তির সিজদা দেওয়াকে দীনের কাজ বলে মনে করে, তাহলে তার হাদীস মারদূদ হবে।

যে বিদআতি এরূপ নয় এবং তার মাঝে **تَفَرُّقٌ** এবং **عَدَالَةٌ** এবং **صَبْطٌ** মওজুদ থাকে, তাহলে তার হাদীস **مَقْبُول** হওয়াতে কোনো বাধা নেই।

وَالثَّانِي وَهُوَ مَنْ لَا يَقْتَضِي بَدْعُهُ التَّكْفِيرَ أَصْلًا وَقَدْ اخْتَلَفَ ابْنُ
 فِي قَبُولِهِ وَرَدَّ فَقِيلَ يَرُدُّ مُطْلَقًا وَهُوَ بَعِيدٌ وَكَثُرَ مَا عُلِّلَ بِهِ أَنَّ فِي
 الرُّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجًا لِأَمْرِهِ وَتَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُرْوَى
 عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْئًا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ وَقِيلَ يَقْبَلُ مُطْلَقًا إِلَّا إِنْ
 اعْتَقَدَ حِلًّا لِلْكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ يَقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَى بَدْعِهِ
 لِأَنَّ تَرْوِيجَ بَدْعِهِ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى تَحْرِيفِ الرُّوَايَاتِ وَتَسْوِيطِهَا عَلَى مَا
 يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُ وَهَذَا فِي الْأَصَحِّ وَآغْرَبَ ابْنُ حِبَّانٍ فَادَّعَى الْإِتِّفَاقَ عَلَى
 قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ نَعَمْ الْأَكْثَرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ
 الدَّاعِيَةِ إِلَّا إِنْ رَوَى مَا يَقْوِي بَدْعَهُ فَيَرُدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ وَبِهِ
 صَرَحَ الْجَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوَزْجَانِي شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ
 وَالنَّسَائِي فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ فَقَالَ فِي وَصْفِ الرُّوَاةِ وَمِنْهُمْ زَائِعٌ
 عَنِ الْحَقِّ أَيْ أَنَّ السُّنَّةَ صَادِقُ اللَّهْجَةِ فَلَيْسَ فِيهِ حِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ
 حَدِيثِهِ مَا لَا يَكُونُ مُنْكَرًا إِذَا لَمْ يَقْوِ بِهِ بَدْعُهُ إِنْتَهَى وَمَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ
 لِأَنَّ الْوَعْلَةَ الَّتِي بِهَا يَرُدُّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ فِيمَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الْمَرْوِيِّ
 يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُبْتَدِعِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : দ্বিতীয় শ্রেণির অর্থাৎ যিনি এমন বিদআতি নন যাতে আদৌ তাকে কান্ধির সাব্যস্ত করা যায়, তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা না করার ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, একেবারেই পরিত্যাজ্য। এ অভিমতটি কোনো যুক্তিরই আওতায় পড়ে না। তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় তার মতটি প্রসার পাবে এবং তার সম্মান বাড়বে। যদি এ যুক্তি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো এমন কোনো বিদআতির হাদীসও গ্রহণ করা উচিত হবে না যার বর্ণনায় একজন অবিদআতী ব্যক্তিও জড়িত রয়েছেন।

আবার অনেকের মতে, এরূপ বিদআতপন্থি রাবীর হাদীস অবাধে গ্রহণ করা যাবে। অবশ্য তিনি যদি মিথ্যাবাদিতা হালাল বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে ভিন্ন করা, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে।

অনেকের মতে এমন ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে যিনি নিজ বিদআত আকিদার প্রতি আহ্বানকারী নন। কেননা, তার বিদআত আকিদাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনার তাগিদ তাকে হাদীসসমূহ বিকৃত করতে ও নিজ মাযহাবের চাহিদা মোতাবেক করতে কখনো কখনো উৎসাহিত করে থাকে। শেখোক্ত মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ইবনে হিব্বান এ ব্যাপারে এক অভিনব উক্তি করেছেন। তিনি দাবি করেছেন নিজ মতের পক্ষে আহ্বানকারী নন— এরূপ বিদআতি রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে— এ ব্যাপারে কোনো বিশ্লেষণ নেই।

হ্যাঁ অধিকাংশই অনাহ্বানকারী বিদআতির বর্ণনা গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তবে এ ব্যক্তি যদি এমন হাদীস বর্ণনা করেন, যাতে তার বিদআত আকিদায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহলে নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী সে বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে। এ অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবু দাউদের ওস্তাদ হাফিজ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব জাওজাযানী ও ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁর 'মা'রিফাতুর রিজাল' গ্রন্থে। রাবীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "অনেকেই রয়েছেন সত্য অর্থাৎ সুন্নত থেকে বিচ্যুত কিন্তু সত্যবাদী। তার যে হাদীসটি মুনকার নয়- তা গ্রহণ না করার কোনো উপায় নেই, যদি তা দ্বারা তার বিদআতে শক্তি সঞ্চারিত না হয়।"

ইমাম নাসায়ী (র.) -এর বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, নিজ মতের প্রতি আহ্বানকারীর বর্ণনা যে কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়, তা সেক্ষেত্রেও বর্তমান যখন বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ বিদআতির মতের অনুকূলে হবে, যদিও তিনি নিজ মতের প্রতি আহ্বানকারী নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِدْعَةٌ مُنْفَرَّةٌ -এর সংজ্ঞা : যে বিদআতের দ্বারা বিদআতী কাফির হয় না; বরং ফাসিক হয়, তাকে **بِدْعَةٌ مُنْفَرَّةٌ** বলে। যেমন- রাফেযী, খারেজী এবং মু'তামিলাদের বিদআত।

بِدْعَةٌ مُنْفَرَّةٌ -এর **হুকুম** : যে বিদআতের কারণে বিদআতি কাফির হয় না বরং ফাসিক হয় এমন বিদআতির হাদীস মাকবুল না মারদূদ- এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে তা সবিস্তারে পেশ করা হলো।

১. ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত : ইমাম মালিক (র.) সহ অন্য অনেকের মতে এমন বিদআতির হাদীস অবাদে মারদূদ। চাই সে **دَاعَى إِلَى الْبِدْعَةِ** তথা বিদআতের প্রতি আহ্বায়ক হোক বা না হোক। মিথ্যা বলা হালাল মনে করুক বা না করুক।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ অভিমত **يُغَيِّدُ عَنِ الْحَقِّ** তথা সত্য হতে দূরবর্তী। কারণ, এ মতামতের পক্ষে দলিল হিসেবে বলা হয়, এমন বিদআতির হাদীসকে কবুল করা হলে তাকে সম্মান দেওয়া হবে এবং তার বিদআতের প্রচার-প্রসার করা হবে।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ যুক্তিকে সঠিক মেনে নেওয়া হলে বিদআতির ঐ সকল হাদীসও মারদূদ হয়ে যায় যা বিদআতি নয়- এমন ব্যক্তি থেকেও বর্ণিত হয়। অথচ তা মারদূদ।

২. কারো কারো অভিমত : কেউ কেউ বলেছেন, বিদআতি যদি নিজ মায়হাবের সমর্থনে মিথ্যা বলাকে হালাল মনে না করে তবে তার হাদীস মাকবুল, তা না হলে মারদূদ।

৩. কিছু লোকের অভিমত : কেউ কেউ বলেছেন, বিদআতি যদি প্রকাশ্যভাবে তার বিদআতের দিকে লোকদের দাওয়াত না দেয় (অর্থাৎ বিদআতের প্রতি আহ্বায়ক না হয়) এবং দলিল দ্বারা তা প্রমাণ না করে, তবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। যদি সে বিদআতের প্রতি আহ্বায়ক হয়, তাহলে বিদআতকে আকর্ষণীয় করার মানসে যেহেতু তার হাদীস জাল করার সম্ভাবনা থাকে, তাই তার হাদীস মাকবুল নয়।

জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে এ মতামতটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

৪. ইবনে হিব্বান (র.) -এর অভিমত : তিনি বিদআতের দিকে আহ্বায়ক নয়- এমন যে কোনো বিদআতির হাদীস অবাদে মাকবুল- এর উপর ইজমা (ঐকমত্য) দাবি করেছেন। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা দাবি করা ঠিক নয়; বরং তা সিংহভাগ মুহাদ্দিসের অভিমত। তবে শর্ত হলো, তার হাদীস তার বিদআতের সমর্থনকারী না হতে হবে। যদি তার বর্ণিত হাদীস তার বিদআতের সমর্থনকারী হয়, তবে তা মারদূদ হবে।

ইমাম আবু দাউদ (র.) -এর ওস্তাদ হাফিজ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব জাওজাযানী (র.) এবং ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁর **مَعْرِفَةُ الرَّجَالِ** গ্রন্থে এ মতামতকেই জোরালোভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ثُمَّ سَوَّاهُ الْحِفْظَ وَهُوَ السَّبَبُ الْعَاشِرُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّغْيِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ جَانِبَ إِصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خَطَايِهِ وَهُوَ عَلَى يَسْمِينِ إِنْ كَانَ لَا زِمًا لِلرَّأْيِ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ فَهُوَ الشَّاذُّ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ إِنْ كَانَ سَوَّاهُ الْحِفْظَ طَارِئًا عَلَى الرَّأْيِ إِمَّا لِكِبَرِهِ أَوْ لِيَذْهَابِ بَصَرِهِ أَوْ لِإِخْتِرَاقِ كُتُبِهِ أَوْ عَدَمِهَا بِأَنَّ كَانَ يَعْتَمِدُهَا فَرَجَعَ إِلَى حِفْظِهِ فَسَاءَ قَهْدًا هُوَ الْمُخْتَلَطُ وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ إِذَا تَمَيَّزَ قُبْلَ وَإِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ تَوَقَّفَ فِيهِ وَكَذَا مَنْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِإِعْتِبَارِ الْأَخِذِينَ عَنْهُ .

অনুবাদ : অভিযোগের দশম কারণ রাবীর স্মৃতিদুর্বলতা। এখানে উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তি যার শুদ্ধতার দিকটি ভুলের দিকের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। এটি দু প্রকার। যথা- ১. যদি এ দুর্বলতা উক্ত রাবীর গোটা জীবন তথা সর্বাবস্থায় থাকে, তাহলে কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে তার বর্ণিত হাদীসকে বলে শায। ২. যদি রাবীর স্মৃতিবিভ্রাট আপতিত হয় বাদ্যর্থ্য, দৃষ্টিশক্তি রহিত হওয়া, খাতাপত্র পুড়ে কিংবা অন্যকোনোভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে। তিনি হয়তো খাতার উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করতেন; কিন্তু তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে স্মৃতির উপর নির্ভর করতে লাগলেন। এতে ভুল হতে লাগল। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় ‘মুখতালিত’। এক্ষেত্রে হুকুম হলো, তার বিভ্রাটের পূর্বে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা যদি পার্থক্য করা যায়, তাহলে গ্রহণ করা যাবে। আর যদি পার্থক্য করা না যায়, তাহলে বিরত থাকতে হবে। তেমনি যার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, তিনি মুখতালিত কিনা, তার হাদীসও গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীদের বিচারেই তা নির্ণয় করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَيِّءُ الْحِفْظِ -এর সংজ্ঞা : سَيِّءُ الْحِفْظِ শব্দের অর্থ- স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা। سَيِّءُ الْحِفْظِ এমন রাবীর ক্ষেত্রে বলা হয় যার রেওয়ায়েতে শুদ্ধের চেয়ে ভুলের সংখ্যা বেশি; কমপক্ষে সমান সমান।

لَا زِمٌ -এর প্রকারভেদ : سَيِّءُ الْحِفْظِ তথা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা দু প্রকার- ১. لَا زِمٌ তথা জন্মগত ও ২. طَارِئٌ তথা পরবর্তীতে আপতিত। নিম্নে প্রত্যেকটার বিবরণ পেশ করা হলো।

১. لَا زِمٌ -এর বিবরণ : যে রাবীর জন্ম থেকেই স্মৃতিশক্তি দুর্বল, ধীশক্তি কম এবং তা সর্বাবস্থায় এক রকম। এরূপ রাবীর হাদীসকে কেউ কেউ শায বলেছেন।

২. طَارِئٌ -এর বিবরণ : যে রাবীর স্মৃতিশক্তি ঠিকমতোই ছিল; কিন্তু নিম্নলিখিত কোনো একটি বিষয়ের ফলে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, ফলে তার রেওয়ায়েতে তিনি ভুল করেন। বিষয়গুলো হলো :

ক. বাদ্যর্থ্য তথা বয়স বেশি হওয়া।

খ. দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া। দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার কারণে রাবী তার হাদীসের খাতা না দেখেই কিংবা দেখে হাদীস রেওয়ায়েত করেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কম হওয়ার দরুন ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না, ফলে তিনি রেওয়ায়েত ভুল করেন।

গ. হাদীসের খাতা আঙনে পুড়ে যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া। ঘরে আগুন লেগেছে, এতে তার খাতাও পুড়ে গেছে অথবা কোনোভাবে হারিয়ে গেছে। তাই রাবী নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ফলে তিনি রেওয়ায়েতে ভুল করেন। রাবীর এরূপ অবস্থাকে **إِخْلَاطٌ** বলা হয়। তার বর্ণিত হাদীসকে মুখতালাত বলা হয়। যে রাবীর এরূপ হয়, তাকে মুখতালিত বলা হয়।

مُخْتَلَطٌ -এর হাদীসের **হুকুম** : **مُخْتَلَطٌ** -এর হাদীস চার প্রকার হতে পারে।

১. শুধু **إِخْلَاطٌ** -এর পূর্বে তিনি রেওয়ায়েত করবেন। এ সময় তার হাদীস মাকবুল হবে।
২. শুধু **إِخْلَاطٌ** -এর পরে তিনি রেওয়ায়েত করবেন। এ সময় তার হাদীস মারদূদ হবে।
৩. **إِخْلَاطٌ** -এর পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায় রেওয়ায়েত করবেন, তবে কোনগুলো **إِخْلَاطٌ** -এর পূর্বের আর কোনগুলো **إِخْلَاطٌ** -এর পরের তা জানা বা নির্ণয় করা যায়। এমতাবস্থায় **إِخْلَاطٌ** -এর পূর্বের হাদীসগুলো মাকবুল হবে, আর **إِخْلَاطٌ** -এর পরের হাদীসগুলো মারদূদ হবে। আর যদি এমন নির্ণয় বা পৃথক করা না যায়, তাহলে নির্ণয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার সকল হাদীস মওকুফ থাকবে।
৪. যদি রেওয়ায়েত করার সময়ের কথা মনে না থাকে কিংবা এ সন্দেহ হয় যে, তিনি **إِخْلَاطٌ** -এর পূর্বে রেওয়ায়েত করেছেন নাকি **إِخْلَاطٌ** -এর পরে, তাহলে এমতাবস্থায় তার হাদীস মওকুফ থাকবে।

মুখতালিত -এর রেওয়ায়েতটি **إِخْلَاطٌ** -এর পূর্বের না পরের তা জানা যায় মুখতালিত রাবী হতে হাদীস গ্রহণকারীর মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ আতা (عطاء) একজন রাবীর নাম। শেষ বয়সে এসে তার **إِخْلَاطٌ** বা স্মৃতিভ্রম হয়। **إِخْلَاطٌ** -এর পূর্বে তার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন শো'বা ও সুফিয়ান ছাওরী। **إِখْلَاطٌ** -এর পরে রেওয়ায়েত করেছেন জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ। আর উভয় অবস্থায় তার থেকে হাদীস শুনেছেন আবু আওয়ানা। সুতরাং **إِخْلَاطٌ** -এর হুকুম অনুযায়ী তার থেকে শো'বা ও সুফিয়ান ছাওরী যা রেওয়ায়েত করেন তা মাকবুল, জারীর যা রেওয়ায়েত করেন তা মারদূদ আর আবু আওয়ানা -এর হাদীসের মধ্যে **إِখْلَاطٌ** -এর পূর্বকার কোনগুলো- তা যদি নির্ণয় করা যায়, তাহলে সেগুলো মাকবুল হবে। আর এরূপ নির্ণয় না করা গেলে তা মারদূদ হবে।

مُخْتَلَطٌ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য : **شَاذٌ** -এর সংজ্ঞা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে এখানকার বর্ণনানুযায়ী কতিপয়ের মতে **شَاذٌ** প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার রাবীর মধ্যে জন্মগতভাবে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা থাকে।

পক্ষান্তরে মুখতালাত প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার রাবীর মধ্যে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা পরবর্তী কোনো কারণে হয়েছে।

وَمَتَى تُزَيِّعُ السَّيِّئُ الْخَفِظُ بِمُعْتَبَرٍ كَانَ يَكُونُ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَادُونَهُ وَكَذَا
الْمُخْتَلِطُ الَّذِي لَا يَتَمَيَّزُ وَالْمُسْتَوْرُ وَالْإِسْنَادُ الْمُرْسَلُ وَكَذَا الْمُدْلَسُ إِذَا لَمْ
يَعْرِفُ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ بَلْ وَضَعَهُ بِذَلِكَ بِاعْتِبَارِ
الْمَجْمُوعِ مِنَ الْمُتَابِعِ وَالْمُتَابِعِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاحْتِمَالٍ كَوْنِ رِوَايَتِهِ
صَوَابًا أَوْ غَيْرِ صَوَابٍ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ
لِأَحَدِهِمْ رُجِّعَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ مِنَ الْإِحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ
الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ فَارْتَقَى مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُّفِ إِلَى دَرَجَةِ الْقَبُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَمَعَ ارْتِقَائِهِ إِلَى دَرَجَةِ الْقَبُولِ فَهُوَ مُنْحَطٌّ عَنْ رُتَبَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ وَرُبَّمَا
تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ وَقَدْ انْقَضَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَتْنِ
مِنْ حَيْثُ الْقَبُولِ وَالرَّوِّ .

অনুবাদ : স্মৃতিবিভ্রাটপূর্ণ রাবীর বর্ণিত হাদীসের, তেমনি যে মুখতালিলের বর্ণনাকে পার্থক্য করা যায় না, মাসতুর ব্যক্তির, মুরসাল সনদের, তেমনি যে মুদাল্লাস সনদের উহ্য ব্যক্তি চেনা যায় না—এসবের যদি এমন মুতাবি' পাওয়া যায় যা তার চেয়ে উঁচু বা সমান স্তরের—নিম্নস্তরের নয়, তাহলে তাদের হাদীসটি হাসান লিগায়রিহী বলে বিবেচিত হবে। এই বিশেষণ মুতাবি' ও মুতাবা' উভয়ের সমষ্টি বিচারে প্রযোজ্য হবে। কেননা, এদের প্রত্যেকেই তার হাদীস শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হবার সম্ভাবনার দিক দিয়ে সমান পর্যায়ে। অনুসন্ধানকারীদের পক্ষ থেকে তাদের যে কোনো একজনের অনুকূলে কোনো বর্ণনা পাওয়া গেলে দু সম্ভাবনার একটি দিক প্রাধান্য পাবে এবং প্রমাণিত হবে যে, হাদীসটি শায় নয়, মাহফূয। ফলে তা বিরতির পর্যায় থেকে গ্রহণীয়তার স্তরে উন্নীত হবে। অবশ্য গ্রহণীয়তার স্তরে উন্নীত হলেও সেটি হাসান লিয়াতিহী—এর স্তর অপেক্ষা নিচে থাকবে। অনেকে এরপ হাদীসের ক্ষেত্রে 'হাসান' শব্দটি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন।

গ্রহণ ও বর্জনের দিক দিয়ে মতনের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা এখানে এসে শেষ হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَفِظُ তথা শায়, মুখতালিল, মাসতুর, মুদাল্লাস অথবা সাহেবে মুরসাল—এর এমন কোনো গ্রহণযোগ্য মুতাবি' পাওয়া যায় যা তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ে কিংবা বরাবর, তাহলে তাদের হাদীসকে হাসান বলা হয়। তবে তা লিয়াতিহী নয়; লিগায়রিহী তথা মুতাবি' পাওয়া যাওয়ার কারণে। কারণ, মুতাবি' পাওয়া যাওয়ার পূর্বে তাদের হাদীস সঠিক-ভুল উভয়ের সম্ভাবনা ছিল। এরপর যখন গ্রহণযোগ্য মুতাবি' পাওয়া গেছে তখন তার সঠিক হওয়ার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। যার ফলে হাদীস মওকুফের স্তর থেকে কবুলের স্তরে উন্নীত হয়েছে। অবশ্য অনেকে মুতাবি' পাওয়া যাওয়ার পরেও এমন হাদীসের উপর হাসান শব্দ ব্যবহার হতে বিরত থাকার পক্ষপাতী।

হাসান লিগায়রিহী হাদীসের হুকুম হলো, তার মর্যাদা ও স্তর হাসান লিয়াতিহী হতে নিম্নপর্যায়ের।

তারপরেও জুমহুরের মতে তা মাকবুল।

এ আলোচনা হতে জানা যায় যে, মোট চার প্রকার হাদীসকে হাসান লিগায়রিহী বলে। আর তা হলো—

১. যে হাদীসের কোনো রাবী **سَيِّئُ الْحِفْظِ** হয়। ২. যে হাদীসের কোনো রাবী **مُسْتَوْر** হয়।

৩. যে হাদীসের সনদ মুরসাল হয়।

৪. যে হাদীসের সনদে তাদলীস পতিত হয়।

যখন এ চার প্রকার হাদীসের মুতাবা' আত গ্রহণযোগ্য রাবী কর্তৃক পাওয়া যাবে, তখন তা হাসান লিগায়রিহী হবে।

ثُمَّ الْإِسْنَادُ وَهُوَ الطَّرِيقُ الْمَوْصَلَةُ إِلَى الْمُخْبِرِ وَالْمَنْنُ هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ مِنَ الْكَلَامِ وَهُوَ أَمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَضِي تَلَفُّظَهُ أَمَّا تَضَرُّعًا أَوْ حُكْمًا أَنْ الْمَنْقُولُ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ مِنْ تَقْرِيرِهِ مِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْقَوْلِ تَضَرُّعًا أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا أَوْ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَوْ يَقُولُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْفِعْلِ تَضَرُّعًا أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَا أَوْ يَقُولُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ التَّقْرِيرِ تَضَرُّعًا أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ يَقُولُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَعَلَ فَلَانٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَلَا يَذْكُرُ إِنْكَارَهُ لِذَلِكَ .

অনুবাদ : মতন পর্যন্ত পৌছানোর পথকে বলা হয় ইসনাদ। আর সনদ শেষে যা আসে অর্থাৎ বক্তব্যকে বলা হয় মতন।

সনদ যদি নবী করীম ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, সে সনদ মুত্তাসিল হোক বা না হোক এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় কিংবা আইনত (হুকুমীভাবে) সাব্যস্ত হয় যে, এ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়টি হযরত নবী করীম ﷺ -এর উক্তি (قَوْل) , কর্ম (فِعْل) কিংবা তাঁর অনুমোদন (تَقْرِير) , তাহলে তাকে বলে মারফু হাদীস।

সুস্পষ্ট উক্তিগত মারফু* (مَرْفُوعٌ قَوْلِي تَضَرُّعِي) হাদীসের উদাহরণ- কোনো সাহাবী বললেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি। অথবা তিনি কিংবা অন্য কেউ বললেন, নবী করীম ﷺ এরূপ বলেছেন ইত্যাদি।

সুস্পষ্ট কর্মগত মারফু* (مَرْفُوعٌ فِعْلِي تَضَرُّعِي) হাদীসের উদাহরণ- কোনো সাহাবী বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি। অথবা তিনি কিংবা অন্য কেউ বললেন, হযরত নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন বা করেছেন।

সুস্পষ্ট অনুমোদনীয় মারফ্‌ (مَرْفُوعٌ تَقْدِيرِي تَصْدِيقِي) হাদীসের উদাহরণ- কোনো সাহাবী বললেন, আমি মহানবী ﷺ -এর সামনে এরূপ করেছি। অথবা তিনি কিংবা অন্য কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে এরূপ করেছিল। তিনি এরূপ উল্লেখ করলেন না যে, নবী করীম ﷺ এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মতন সংশ্লিষ্ট আলোচনা থেকে ফারেগ হয়ে সম্মানিত লেখক **الامناء** বলে সনদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা শুরু করছেন। মতন ও সনদের মধ্যে সনদের স্থান আগে হলেও যেহেতু মতন-ই মূল লক্ষ্য আর সনদটা হলো ঐ মতন পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম, তাই সম্মানিত লেখক মতন সংশ্লিষ্ট আলোচনা পূর্বে করেছেন।

সনদের শেষখণ্ড বিচারে হাদীসের শ্রেণিবিভাগ : হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌছানোর দিক তথা সনদের রাবীর সংখ্যার কমবেশির দিক দিয়ে হাদীস মোট চার প্রকার । ১. মুতাওয়াতির, ২. মশহূর, ৩. আযীয, ৪. গরীব । এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিতাবের শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে ।

সনদের শেষপ্রান্তের বিচারে হাদীস আবার তিন প্রকার। ১. মারফু', ২. মাওকুফ ও ৩. মাকতু'। হাদীস এ তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, সনদের শেষপ্রান্ত হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে অথবা কোনো সাহাবী পর্যন্ত অথবা এর পরের স্তরের কোনো লোক তথা তাবেয়ী, তাবয়ে-তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। অর্থাৎ উক্তি (قَوْل), কর্ম (فِعْل) এবং অনুমোদন (تَفْظِير) হয়তো সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হবে অথবা কোনো সাহাবীর হবে অথবা সাহাবীর স্তরের পরের কোনো লোকের হবে। قَوْل, فِعْل, تَفْظِير রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হলে তাকে হাদীসে মারফু' বলে, সাহাবীর হলে তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে, সাহাবীর পরের তথা তাবেয়ী বা তাবয়ে-তাবেয়ীর হলে তাকে হাদীসে মাকতু' বলে।

وَاجِدٌ -এর إِسْمٌ مَفْعُولٌ الرَّفْعُ মূলধাতু হতে নির্গত। -এর আউধানিক অর্থ: الرَّفْعُ শব্দটি তোলো, উর্ধ্বে উঠানো, উত্তোলন করা ইত্যাদি। এ হিসেবে الرَّفْعُ অর্থ হালো, যাকে উপরে তোলা হয়েছে, উন্নীত ইত্যাদি।

الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ -এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো-

هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ صَرِيحًا أَوْ حُكْمًا .

الْعِدَّةُ - (মৌন অনুমোদন) تقرير (কাজ) فعل (কথা) قول -এর রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্থাৎ বলা হয়।

এ সংজ্ঞা হতে জানা যায় যে, হাদীসে মারফু' প্রথমত দু' প্রকার। যথা—

১. **صَرِيح** : **صَرِيح** মানে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন।

২. **حَكِيمٌ**: **حَكِيمٌ** মানে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন নয়; বরং সাহাবীর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন। কিন্তু তা কিয়াসী না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে করতে দেখে তিনি এরূপ বলেছেন বা এরূপ করেছেন এটাই প্রবল ধারণা।

এই **صَرِيحٌ** ও **حُكْمِيٌّ** প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার। ১. **قَوْلِيٌّ** ২. **فِعْلِيٌّ** ৩. **تَقْرِيرِيٌّ** ; সুতরাং হাদীসে মারফ' মোট ছয় প্রকারে গিয়ে দাঁড়াল। আর তা হলো—

۱. الْمَرْفُوعُ الْقَوْلُ صَرِيحًا (‘मारफू’ का०नी सरीह)

২. الْمَرْفُوعُ الْفَاعِلُ صَرِيحًا (মারফু' ফে'লী সরীহ)

৩. الْمَرْفُوعُ التَّقْرِيرِيُّ صَرِيحًا (মারফু' তাকরীরী সরীহ)

৪. الْمَرْفُوعُ الْقَوْلِيُّ حُكْمًا (মারফু' কাওলী-হুকমী)

৫. الْمَرْفُوعُ الْفِعْلِيُّ حُكْمًا (মারফু' ফে'লী হুকমী)

৬. الْمَرْفُوعُ التَّقْرِيرِيُّ حُكْمًا (মারফু' তাকরীরী হুকমী)

নিম্নে উল্লিখিত ৬ প্রকারের الْمَرْفُوعُ -এর সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো-

১. الْمَرْفُوعُ الْقَوْلِيُّ صَرِيحًا : মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا . হলো, সাহাবীর এ কথা বলা যে, অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ -কে এমন বলতে শুনেছি।

অথবা, এভাবে বলা যে, حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ বলেছেন।

অথবা, সাহাবী বা পরবর্তীদের কারো এ কথা বলা যে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন।

অথবা, এ কথা বলা যে, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا .

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এমনটি বলেছেন।

২. الْمَرْفُوعُ الْفِعْلِيُّ صَرِيحًا : মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَا . হলো, সাহাবীর এ কথা বলা যে, অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

অথবা, সাহাবী বা পরবর্তীদের কারো এ কথা বলা যে, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

৩. الْمَرْفُوعُ التَّقْرِيرِيُّ : মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا . হলো, সাহাবীর এ কথা বলা যে, অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ -এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছি।

অথবা, সাহাবী বা পরবর্তী কারো এ কথা বলা যে,

فَعَلَ فُلَانٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ انْكَارَهُ لِذَلِكَ .

অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছে আর তিনি এ ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অস্বীকারের কথা উল্লেখ করেননি।

উল্লেখ্য যে, تَفَرُّيْر -এর অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে সাহাবী কোনো কাজ করেছেন

অথবা অনুপস্থিতিতে করেছেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনেছেন অথচ তিনি তা নিষেধ করেননি। এটা

প্রমাণ করে যে, সাহাবীর ঐ কাজ বৈধ। কেননা, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমোদন রয়েছে।

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْقَوْلِ حُكْمًا لَا تَصْرِيحًا مَا يَقُولُ الصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ عَنِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ مَا لَا مَجَالَ لِلْإِجْتِهَادِ فِيهِ وَلَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لُغَةٍ أَوْ شَرْحِ غَرِيبٍ كَالْإِخْبَارِ عَنِ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ وَالْإِخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْأَتِيَّةِ كَالْمَلَا حِمِّ وَالْفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَذَا الْإِخْبَارُ عَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ يَفْتَضِي مُخِيرًا لَهُ وَمَا لَا مَجَالَ لِلْإِجْتِهَادِ فِيهِ يَفْتَضِي مُوقِفًا لِلْقَائِلِ بِهِ وَلَا مُوقِفَ لِلصَّحَابَةِ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضُ مَنْ يُخِيرُ عَنِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ فَلِهَذَا وَقَعَ الْإِخْتِرَازُ عَنِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَرْفُوعٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ سَمِعَهُ مِنْهُ أَوْ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْفِعْلِ حُكْمًا أَنْ يَفْعَلَ الصَّحَابِيُّ مَا لَا مَجَالَ لِلْإِجْتِهَادِ فِيهِ فَيَنْزِلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) فِي صَلَوةٍ عَلَيْهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْكُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرُ مِنْ رُكُوعَيْنِ -

অনুবাদ : আইনত উক্তিগত মারফু' (مَرْفُوعٌ قَوْلِي حُكْمِي) হাদীসের উদাহরণ যে সাহাবী ইসরাঈলী গ্রন্থসমূহ থেকে কোনো কিছু শিক্ষা করেননি, তিনি এমন কথা বললেন যাতে ইজতিহাদ বা গবেষণার কোনো অবকাশ নেই, তেমনি ভাষাগত বিবরণ কিংবা জটিল শব্দের ব্যাখ্যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন- সৃষ্টির সূচনা, পূর্ববর্তী আখিয়ায়ে কেরাম ইত্যাদি অতীতকালের ঘটনাবলি অথবা যুদ্ধবিগ্রহ, বিপর্যয়, কিয়ামতের দিনের অবস্থা ইত্যাদি ভবিষ্যৎকালীন ঘটনাবলি। তেমনি কোনো কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছওয়াব কিংবা আজাব হওয়ার কথা বর্ণনা করা। এগুলো আইনত মারফু' বলে সাব্যস্ত করার কারণ হলো- বিষয়টি যিনি বর্ণনা করেন, তাকে অবশ্যই কেউ জানিয়ে থাকবে। যে বিষয়ে গবেষণার কোনো অবকাশ নেই, বর্ণনাকারীর জন্য তার একজন অবহিতকারী চাই-ই। আর সাহাবায়ে কেরামকে অবহিতকারী হতে পারেন একমাত্র হযরত নবী করীম ﷺ অথবা পূর্ববর্তী আসমাঈ কিতাবসমূহের জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি। এ কারণে আগেই বলা হয়েছে, যে সাহাবী পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের থেকে জ্ঞান লাভ করেননি।

সুতরাং উপরিউক্তরূপ বর্ণিত হলে সেটি সন্দেহে আইনত মেনে নিতে হবে যে, হযরত নবী করীম ﷺ -ই বলেছেন। এটি মারফু' বলে গণ্য হবে। নবী করীম ﷺ থেকে সরাসরি কিংবা কারো মাধ্যমে শুনলে যেমনটি হয়ে থাকে।

আইনত কর্মগত মারফু' (مَرْفُوعٌ وَيُقَالُ حُكْمٌ) হাদীসের উদাহরণ- কোনো সাহাবী এমন এক আমল করলেন যে বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। মনে করতে হবে যে, উক্ত সাহাবী নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ থেকে এটি শিক্ষালাভ করেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাজের প্রতি রাকাতে হযরত আলী (রা.) -এর দুইয়ের অধিক রুকু করা সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) যেমন বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرْفُوعٌ الْقَوْلِيُّ حُكْمًا -এর সংজ্ঞা : এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

مَرَّ مَا يَقُولُ الصَّحَابِيُّ غَيْرَ الْمَرْفُوعِ بِالْأَخْذِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَوْلًا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ فِيهِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِبَيِّنٍ غَرِيبٍ أَوْ شَرْحٍ مُشْكِلٍ.

অর্থাৎ সাহাবী যিনি আহলে কিতাবদের সূত্রে তাওরাত, যাবুর্ ও ইঞ্জিলের কোনো ভাষ্য শ্রবণ ও রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নন তার এমন উক্তিকে مَرْفُوعٌ الْقَوْلِيُّ বলা হয় যা ইজতিহাদ বা গবেষণা করে বলার অবকাশ রাখে না এবং যার সাথে হাদীসের কোনো غَرِيب বা مُشْكِل শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সম্পর্ক নেই। যেমন-

ক. সৃষ্টির সূচনা বা অনুরূপ বিষয়ের বর্ণনা।

খ. অথবা ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ের যেমন মুসলিম উম্মাহর উপর আগত ফিতনা ও বিপদ-মসিবত এবং কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কিত বর্ণনা।

গ. কোনো আমলের নির্দিষ্ট ফাযায়েলের বর্ণনা।

ঘ. কোনো কাজের নির্দিষ্ট শাস্তির বর্ণনা।

এ ধরনের সকল বিবরণ مَرْفُوعٌ حُكْمٌ। কেননা, সাহাবীর এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি কারো থেকে শুনেই বলেছেন। কারণ, কোন আমলের কি ছওয়াব, কোন কাজের কি শাস্তি, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কি কি ঘটবে- এগুলো এমন বিষয় যে, এগুলো নিজ থেকে বলা যায় না। সাহাবী এমন কারো কাছ থেকে শুনেছেন যিনি এসব বিষয়ে অবহিত। আর ওহীর মাধ্যমে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই তা অবহিত হতে পারেন।

জানার একটি সূত্র হলো, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ। এজন্যই শর্ত হলো, সাহাবী সেসব গ্রন্থের কোনো ভাষ্য নিজে কিংবা কোনো কিতাবীর মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন এবং তা রেওয়ায়েত করেছেন এমন না হতে হবে।

مَرْفُوعٌ الْقَوْلِيُّ حُكْمًا -এর সংজ্ঞা : এটা হলো সাহাবীর ঐ فِعْل যাতে ইজতিহাদ চলে না। তিনি ইজতিহাদ করে ঐ فِعْل করেছেন এমন সম্ভাবনা যেখানে থাকে না সেক্ষেত্রে এটাই সম্ভব যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছেন। যেমন- হযরত আলী (রা.) সালাতুল কুসূফ -এর প্রতি রাকাতে দুয়ের অধিক রুকু করেছেন। নামাজের প্রতি রাকাতে কতটি রুকু হবে এটা ইজতিহাদ করে বলার কোনো অবকাশ নেই।

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ التَّفْرِيرِ حُكْمًا أَنْ يُخْبِرَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الظَّاهِرَ إِطْلَاعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِتَوْفُرِ دَوَائِعِهِمْ عَلَى سُؤَالِهِ عَنْ أُمُورٍ دَيْنِهِمْ وَلَآنَ ذَلِكَ الزَّمَانِ زَمَانُ نَزُولِ الْوَحْيِ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَعْمِرُونَ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعِ الْفِعْلِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَى عَنْهُ الْقُرْآنُ.

অনুবাদ : আইনত অনুমোদনীয় মারফু' (مَرْفُوعٌ تَفْرِيرِي حُكْمِي) হাদীসের উদাহরণ- কোনো সাহাবী বর্ণনা করলেন যে, তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর সময়ে এরূপ করতেন। এটি আইনত মারফু' বলে গণ্য হবার কারণ দৃশ্যত হযরত নবী করীম ﷺ -এর অবগতি। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের দীন ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -কে প্রশ্ন করার যথেষ্ট কারণ ছিল। সময়টি ছিল ওহী নাজিলের সময়। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা কেবলমাত্র এমন কাজই সংঘটিত হতে পারে এবং তা তাঁরা অব্যাহত রাখতে পারেন যা নিষিদ্ধ নয়। হযরত জাবির (রা.) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) যেমন আযলের বৈধতা সম্পর্কে দলিল দিতে গিয়ে বলেছিলেন, কুরআন যখন নাজিল হচ্ছিল তখন আমরা এরূপ করেছি। এটি যদি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কুরআন অবশ্যই নিষেধ করত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

السَّارِفُ التَّفْرِيرِي حُكْمًا -এর সংজ্ঞা : এর সংজ্ঞা হলো, সাহাবীর এ ধরনের খবর দেওয়া যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এরূপ করতেন অথচ তাদেরকে তা করতে বারণ করা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কৃত সাহাবীদের فِعْلُ টা مَرْفُوع -এর হুকুম রাখে। কারণ-

এক. তখন ছিল ওহী অবতীর্ণের সময়। সাহাবীগণ কোনো নিষিদ্ধ ও নাজাজেজ فِعْل করবেন আর আল্লাহ তা নিষিদ্ধ করবেন না, আল্লাহর রাসূলকে তা অবগত করাবেন না এটা হতে পারে না। তাই তো হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) عَزَلَ -এর পক্ষে এভাবে দলিল পেশ করেছিলেন-كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণের কালে আমরা আযল করতাম।

সুতরাং আযল নিষিদ্ধ হলে ওহীর মাধ্যমে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সতর্ক করা হতো।

দুই. সাহাবীগণ দীন সকল বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর যুগে তাদের فِعْل (তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মতিদানের প্রেক্ষিতেই হয়েছিল এটাই স্বাভাবিক।

وَلْتَحِقْ بِقَوْلِي حُكْمًا مَا وَرَدَ بِصِنْفَةِ الْكِتَابَةِ فِي مَوْضِعِ الصَّبْحِ
الصَّرِيحَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ
التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَوْ يَرْوِيهِ أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ رَوَايَةً أَوْ
يَبْلُغُ بِهِ أَوْ رَوَاهُ وَقَدْ يَفْتَصِرُونَ عَلَى الْقَوْلِ مَعَ حَذْفِ الْقَائِلِ وَكَرِهُدُونَ بِهِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ تَقَاتِلُونَ قَوْمًا الْحَدِيثَ وَفِي كَلَامِ الْخَطِيبِ أَنَّهُ
إِصْطِلَاحٌ خَاصٌّ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ.

অনুবাদ : নবী করীম ﷺ -এর বরাত দিতে গিয়ে যেখানে সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করার কথা,
সেখানে যদি ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটিও আইনত (حُكْمِي) শ্রেণির অন্তর্গত। যেমন-
সাহাবীর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করার সময় তাবেয়ী যদি বলেন-

يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَوْ يَرْوِيهِ أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ رَوَايَةً أَوْ يَبْلُغُ بِهِ أَوْ رَوَاهُ.

কখনো কখনো তারা 'বলেছেন' বলেই ক্ষান্ত হন, 'কে' বলেছেন তা উল্লেখ করেন না। অথচ তাদের
উদ্দেশ্য থাকে নবী করীম ﷺ। যেমন হযরত ইবনে সিরীন (র.) বর্ণনা করেন হযরত আবু হুরায়রা
(রা.) থেকে- তিনি বলেন, তোমরা ছোট চোখবিশিষ্ট এক সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করবে! খতীবে
বাগদাদীর কথা থেকে অনুমিত হয় যে, এটি বসরীদের বিশেষ পরিভাষা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرْفُوع -এর প্রকার : مَرْفُوع -এর শব্দ দু প্রকার। ১. প্রকাশ্য বা ইঙ্গিতমূলক ও ২. নিশ্চিত বা
সম্ভাবনামূলক।

صَرِيح বা প্রকাশ্য শব্দের বিবরণ : রাবী কখনো এমন শব্দ উল্লেখ করেন, যার নিসবত রাসূলুল্লাহ ﷺ
-এর প্রতি প্রকাশ্যভাবে হয়। যেমন- كَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ অথবা كَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ইত্যাদি। এগুলো
হলো প্রকাশ্য শব্দ।

كِتَابَةٍ বা ইঙ্গিতমূলক শব্দের বিবরণ : কখনো রাবী প্রকাশ্য শব্দের পরিবর্তে এমন শব্দ ব্যবহার
করেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিতমূলক নিসবত হয়। এগুলো হয় ইঙ্গিতমূলক শব্দ।
যেমন- সাহাবী থেকে নকল করে তাবেয়ী বলেন, يَرْفَعُ الْحَدِيثَ, يَرْوِيهِ, يُنْمِيهِ, قَالَ رَوَايَةً, يَبْلُغُ, قَالَ رَوَاهُ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দও হাদীসে মারফু'-এর হুকুমে। অর্থাৎ এ সমস্ত ইঙ্গিতবাক্য
শব্দে যে হাদীস বর্ণিত হবে তাও حَدِيثٌ مَرْفُوع হবে।

ইসিতমূলক শব্দে বর্ণিত হাদীসের উদাহরণ : এর উদাহরণ নিম্নরূপ-

১. رَفَعَ الْعَدِيثُ বা يَرْفَعُ الْعَدِيثُ -এর উদাহরণ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইরের হাদীস-

السَّيْفُ فِي ثَلَاثَةِ شُرُوعٍ عَسَلٍ وَشُرُوعٍ مَحْجَمٍ وَكَبَيْتٍ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَيَّةَ عَنِ الْكَيْ رَفَعَ الْعَدِيثُ .

২. يَنْبِغُ -এর উদাহরণ :

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُزَمُّونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يُنْتَهَى ذَلِكَ .

৩. رَوَايَةً -এর উদাহরণ :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفَطْرَةِ خَمْسٌ .

৪. يَبْلُغُ بِهِ -এর উদাহরণ :

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّاسُ تَبَعٌ لِثُرَيْسٍ .

উক্তিকারককে বিলোপ করে উক্তি বর্ণনা : কখনো কখনো এমনও হয় যে, সাহাবায়ে কেবলমাত্র উক্তিকারকের কথা উল্লেখ না করে শুধু উক্তি উল্লেখ করেন। তবে এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি। যেমন- ইবনে সিরীন (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন-

تَقَاتِلُونَ قَوْمًا صَغَارَ الْأَعْيُنِ الْحَدِيثُ .

অর্থাৎ তোমরা ছোট চোখবিশিষ্ট এক সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করবে....।

সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর এ হাদীস মারফু'। অবশ্য খতীবের উক্তি হতে জানা যায় যে, বিলোপের এ পরিভাষা বসরীদের বিশেষ পরিভাষা। অর্থাৎ তাড়াই কেবল উক্তিকারককে বিলোপ করে উক্তিটুকু উল্লেখ করেন।

وَمِنَ الصَّيَغِ الْمُحْتَمَلَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا فَلَا كَثْرَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ الْإِتِّفَاقَ قَالَ وَإِذَا قَالَهَا غَيْرُ الصَّحَابِيِّ فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يُضَفَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا كُسْنَةُ الْعُمَرَيْنِ وَفِي نَقْلِ الْإِتِّفَاقِ نَظَرُ فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي أَصْلِ الْمَسْئَلَةِ قَوْلَانِ وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ السُّنَّةَ تَرَدَّدُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَأُجِيبُوا بِأَنَّ إِحْتِمَالَ إِرَادَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعِيدٌ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّتِهِ مَعَ الْحَجَّاجِ حِينَ قَالَ لَهُ إِنْ كُنْتُ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِرْ بِالصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَعَلَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ فَنَقَلَ سَالِمٌ وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَاحِدُ الْحَفَاطِ مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا السُّنَّةَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

অনুবাদ : ইঙ্গিতমূলক একটি শব্দ হলো- কোনো সাহাবীর এরূপ বলা যে, এটি সুন্নত। অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে এটি মারফু'। ইবনে আব্দুল বার এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাহাবী ব্যতীত অন্য কেউ বললেও এমনটিই হবে। অবশ্য অন্য কারো সাথে সম্পর্কিত করলে ভিন্ন কথা। যেমন কেউ বলল, হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর সুন্নত। ঐকমত্য থাকার বিষয়টি পর্যালোচনার যোগ্য। কেননা, মূল বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দু' ধরনের উক্তি রয়েছে। তা ছাড়া এটি মারফু' নয় বলে যারা মত পোষণ করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন শাফেয়ী মাযহাবের আবু বকর সয়রফী (র.), হানাফী মাযহাবের আবু বকর রাযী (র.), জাহেরী মাযহাবের ইবনে হাযম (র.) প্রমুখ। তারা এ মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, সুন্নত শব্দটি যেমন নবী করীম ﷺ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও। তাঁদের কথার জবাবে বলা হয়, নবী করীম ﷺ ব্যতীত অন্য কেউ উদ্দেশ্য হওয়া অযৌক্তিক। বিশেষত কোনো লক্ষণ না থাকলে। ইমাম বুখারী (র.) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কিত ইবনে শিহাবের হাদীস সংকলন করেছেন যা সালিম থেকে বর্ণিত। তাতে রয়েছে, সালিম (র.) হাজ্জাজকে বললেন, তুমি যদি সুন্নত অনুসরণ করতে চাও তাহলে সময় হলেই নামাজ আদায় করো। ইবনে শিহাব বলেন, আমি সালিমকে প্রশ্ন করলাম, নবী করীম ﷺ কি এরূপ করতেন। জবাবে সালিম বললেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সুন্নত বলতে নবী করীম ﷺ ব্যতীত অন্য কারো কথা উদ্দেশ্য করতেন কি? সালিম ছিলেন মদীনার বিশিষ্ট সাতজন ফকীহের অন্যতম এবং হাফিজুল হাদীস। তিনি সাহাবায়ে কেরামের রীতি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা যখন সুন্নত শব্দটির সাধারণভাবে ব্যবহার করতেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য নবী করীম ﷺ-এর সুন্নত ব্যতীত অন্য কিছু থাকত না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرْفُوع -এর قَطْمِيْن শব্দ : কিছু শব্দ এমন আছে যার مَرْفُوع হওয়াটা قَطْمِيْن এবং নিশ্চিত। আর তার مَرْفُوع হওয়ার মধ্যে কারো কোনো মতভেদ নেই। যেমন- قَالِ رَسُولُ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ অথবা قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ইত্যাদি।

مَرْفُوع -এর اِخْتِصَالِي শব্দ : আর কিছু শব্দ এমন রয়েছে যার مَرْفُوع হওয়াটা اِخْتِصَالِي তথা সম্ভাবনামূলক। এ ধরনের শব্দ চার প্রকার। যথা-

১. সাহাবীর উক্তি : مِنْ السَّنَةِ كَذَا। যেমন- নিম্নের হাদীসে হযরত আলী (রা.) বলেন,

۱. مِنَ السَّنَةِ وَضَعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ.

۲. قَوْلُ أَبِي ثَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا تَوَضَّعَ الْفُكْرَ عَلَى الْفُكْرِ أَقَامَ عِنْدَنَا سَبْعًا

مَرْفُوع -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? শব্দাবলি যোগে বর্ণিত হাদীসটি

মَرْفُوع -এর অন্তর্গত হবে কিনা- এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ-

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পুরাতন অভিমত হলো, সাহাবী বা তাবেয়ী হতে مِنْ السَّنَةِ كَذَا প্রকাশ পেলে তা মারফু' হবে। তবে এ ব্যাপারে তাঁর নতুন অভিমত হলো, তা মারফু' হবে না।

২. প্রমুখের অভিমত : ইমাম আবু বকর সয়রাফী শাফেয়ী, ইমাম আবু বকর রাযী হানাফী এবং ইবনে হাযম জাহেয়ী (র.) -এর মতে সাহাবী বা তাবেয়ী مِنْ السَّنَةِ كَذَا বললে তা মারফু' হবে না।

কারণ, সুন্নত অর্থ আদর্শ, পথ। সুন্নত বলতে যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত বুঝায়, তেমনি খোলাফায়ে রাশেদীন প্রমুখের আদর্শকেও সুন্নত বলা হয়। যেমন, এক হাদীস এসেছে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِيِّينَ.

অর্থাৎ তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ আঁকড়ে ধরবে।

সুতরাং مِنْ السَّنَةِ كَذَا মূলতাকভাবে বলা হলে যেহেতু রাসুলুল্লাহ ﷺ বা তিনি ব্যতীত অন্যের সুন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই مِنْ السَّنَةِ كَذَا বললে তা مَرْفُوع হবে না।

৩. জুমহুরে মুহাদ্দিসীনের অভিমত : সাহাবায়ে কেরাম مِنْ السَّنَةِ كَذَا বললে তা مَرْفُوع হবে।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) -এর উপর ইজমা দাবি করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, সাহাবী ব্যতীতও যদি مِنْ السَّنَةِ كَذَا বলে এবং সুন্নতকে কোনো কিছুর দিকে নিসবত না করে অর্থাৎ سُنَّةُ السَّعَابَةِ (আবু বকর ও ওমরের সুন্নত), سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ (খলিফাদের সুন্নত),

সাহাবীদের সুন্নত) না বলেন, তাহলে এটাও হুকমীভাবে মারফু' হবে।

ইবনে আব্দুল বার (র.) যে ইজমার দাবি করেছেন তা বাস্তবতার বিপরীত। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নতুন অভিমত এবং অন্যান্য আলিমগণের মতে مِنْ السَّنَةِ كَذَا টা مَرْفُوع নয়। তাহলে

তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কিভাবে তিনি مَرْفُوع হওয়ার উপর ইজমা (ঐকমত্য) দাবি করলেন?

সর্বাধিক সঠিক অভিমত নির্ণয় : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ ব্যাপারে সর্বশেষ উক্তি

তথা জুমহুরের অভিমত সর্বোচ্চ সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এটিকেই رَاجِع সাব্যস্ত

করেছেন। তিনি দলিল হিসেবে হযরত সালিম (র.) -এর নিম্নোক্ত قَوْل উল্লেখ করেছেন।

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ وَبِهِ ... قَالَ

(أَيُّ سَالِمٍ) لَمْ (أَيُّ لِلْعَبَّاحِ) إِنْ كُنْتُ تُرِيدُ السَّنَةَ فَهَجِّرِ الصَّلَاةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ

أَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ يَعْتَدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ.

উপরিউক্ত ভাষ্যে হযরত সালিম (র.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম السَّنَةُ বলতে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নতকেই বুঝতেন।

সুতরাং مِنْ السَّنَةِ كَذَا শব্দাবলি যোগে বর্ণিত হাদীস مَرْفُوع হুকমী হবে।

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَلَيْمَ لَا يَقُولُونَ فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَجَوَابُهُ أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْجَزْمَ بِذَلِكَ تَوَرُّعًا وَإِخْتِيَاطًا وَمِنْ هَذَا قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ (رض) مِنَ السُّنَنِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنْ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى الثَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَيْ لَوْ قُلْتُ لَمْ أَكْذِبْ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنَ السُّنَنِ هَذَا مَعْنَاهُ لَكِنَّ إِيْرَادَهُ بِالصَّيْغَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّحَابِيُّ أَوَّلَى .

অনুবাদ : কেউ কেউ এ মর্মে প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি তা মারফু' হয়ে থাকে তাহলে তারা এরূপ কেন বললেন না যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ? এর জবাব হলো, তারা এটি জোর দিয়ে বলা থেকে বিরত থেকেছেন সাবধানতা ও সংযমের কারণে। উদাহরণস্বরূপ তাবেয়ী আবু কিলাবার উক্তি উল্লেখযোগ্য। হযরত আনাস (রা.) থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, সুন্নত হলো একজন ছায়াবা স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে কোনো কুমারী বিবাহ করলে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করা। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। আবু কিলাবা বলেন, আমি চাইলে বলতে পারি, হযরত আনাস (রা.) এটি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আমি যদি এরূপ বলি তাহলে তা মিথ্যা হবে না। কেননা, 'সুন্নত হলো' কথার এ-ই মর্ম। তথাপি স্বয়ং সাহাবী যে শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুবহু সেভাবে উপস্থাপন করা উত্তম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : **وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ** দ্বারা লেখক একটি উহা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নের সারকথা হলো, **مِنَ السُّنَنِ كَذَا** শব্দ দ্বারা যখন উদ্দেশ্য হাদীসে মারফু', তখন তাবেয়ীগণ এটা না বলে সরাসরি কেন বলেন না **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বলেছেন ?

এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা হলো, তাবেয়ীগণ এরূপ করে থাকেন দু কারণে। যথা—

১. সতর্কতা ও সংযম হিসেবে তারা এমনটি সরাসরি বলেন না যে,
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
২. তাবেয়ীগণ নিজেদের পক্ষ হতে **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ** না বলে হুবহু সাহাবায়ে কেরামের শব্দে হাদীস বর্ণনা করাকে ভালো মনে করেন। এর প্রমাণ আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস—
مِنَ السُّنَنِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا .

এ হাদীস হযরত আনাস (রা.) থেকে তিনি বর্ণনা করে বলেন, হযরত আনাস (রা.) এটি মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাহলে আমি মিথ্যুক হবো না। কেননা, **مِنَ السُّنَنِ** দ্বারা **مَرْفُوع** -ই উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু হযরত আনাস (রা.) যেহেতু এ হাদীস আমাদের কাছে **مِنَ السُّنَنِ** শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন, তাই আমি হুবহু সেভাবে বর্ণনা করেছি।

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَمَرْنَا بِكَذَا أَوْ نَهَيْجْنَا عَنْ كَذَا فَالْخِلَافُ فِيهِ
كَالْخِلَافِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ
الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَهُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ وَتَمَسَّكُوا بِإِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ غَيْرَهُ كَأَمْرِ
الْقُرْآنِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ أَوْ الْإِسْتِنْبَاطِ وَأُجِيبُوا بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ
الْأَوَّلُ وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمَلٌ لِكُنْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَرْجُوحٌ وَأَيْضًا فَمَنْ كَانَ فِي
طَاعَةِ رَئِيسٍ إِذَا قَالَ أَمَرْتُ لَا يُفْهَمُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَهُ إِلَّا رِئِيسُهُ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ
قَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا فَلَا إِخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ الْمَسْئَلَةِ
بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ فِيمَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَهُوَ إِحْتِمَالٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدَلَ
عَارِفٌ بِاللِّسَانِ فَلَا يُطْلَقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّحْقِيقِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ كُنَّا
نَفْعَلُ كَذَا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُنْحَكِمَ
الصَّحَابِيُّ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ بِأَنَّهُ طَاعَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَغْصِبَةٌ
كَقَوْلِ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ أَيْضًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ
عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

অনুবাদ : আইনত মারফু' (মَرْفُوعُ حُكْمِي) -এর একটি ধরন হলো, কোনো সাহাবীর এরূপ বলা যে, আমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিংবা এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। পরবর্তীটির মতোই এতে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে বলা হলে এর মর্ম দাঁড়াবে- যার আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তিনি হলেন নবী করীম ﷺ ।

একদল আলাম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের যুক্তি হলো, এখানে তো অন্যটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন- কুরআনের নির্দেশ, কিংবা ইজমা-এর, কিংবা কোনো খলিফার, কিংবা ইজতিহাদের। তাদের জবাবে বলা হয়, প্রথমটিই (নবী করীম ﷺ) আসল- অন্যসব সজাব্য। প্রথমটির তুলনায় অন্যগুলো গৌণ। তা ছাড়া কেউ যখন কোনো নেতার অধীনে থাকে, তখন সে যদি বলে- আমাকে আদেশ করা হয়েছে, তাহলে তার আদেশকারী হিসেবে উক্ত নেতা ব্যতীত আর কাউকে বুঝা যায় না।

যদি কেউ বলেন- যেটি আসলে কোনো আদেশ ছিল না উক্ত সাহাবী সেটি আদেশ বলে ভাবার সম্ভাবনা রয়েছে। জবাবে বলতে হবে, এটি শুধুমাত্র এক্ষেত্রেই নয়; বরং যদি স্পষ্ট শব্দ বলেন যে, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে এরূপ আদেশ করেছেন, তাহলেও তা এরূপ সম্ভাবনা থেকে যাবে। আর এ সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম হলেন নির্ভরযোগ্য, ভাষাও তাদের জানা। সুতরাং আদেশ শব্দটি তাঁরা যাচাই না করে ব্যবহার করেননি।

আইনত মারফু' -এর আরেকটি প্রকার হলো, কোনো সাহাবীর বলা যে, আমরা এরূপ করতাম। এটিও আইনত মারফু' বলে গণ্য। কেননা, দৃশ্যত তিনি নবী করীম ﷺ -এর সময়কার কথা বলছেন। তেমনি কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে সাহাবী যদি বলেন যে, এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাধ্যচরণ কিংবা এটি তাদের অবাধ্যচরণ, তাহলেও সেটি আইনত মারফু' বলে গণ্য। যেমন- হযরত আত্মার (রা.) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (শাবান মাসের ত্রিশ তারিখে রমজান হবার আশঙ্কায়) রোজা রাখল, সে মহানবী ﷺ -এর অবাধ্যচরণ করল। এটি আইনত মারফু' বলে গণ্য হবার কারণ- দৃশ্যত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে এটি জানতে পেরেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. সাহাবীর উক্তি : **أَمَرْنَا بِكَذَا** অর্থাৎ আমাদের এভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে অথবা **نُهِينَا عَنْ كَذَا** অর্থাৎ আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

أَمَرْنَا بِكَذَا এটা **مَرْفُوع** -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? এটা **مَرْفُوع** -এর অন্তর্গত কিনা- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. জুমহরের অভিমত : এ ব্যাপারে জুমহরের অভিমত হলো, এটা **مَرْفُوع**।

২. ইসমাইল প্রমুখের অভিমত : তাদের মতে এটা **مَرْفُوع** নয়। কারণ, হতে পারে **أَمَر** ও **نَهَى** টা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নয়; বরং কুরআন, ইজমা কিংবা কোনো খলিফার **أَمَر** ও **نَهَى** হবে। অতএব, এটা **مَرْفُوع** হবে না।

সঠিক অভিমত ও প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তর : আলাচ্য বিষয়ে জুমহরের অভিমতই হলো সর্বোচ্চ সঠিক অভিমত। জুমহরের পক্ষ হতে ইসমাইল প্রমুখদের দলিলের জবাব দুভাবে দেওয়া হয়।

১. **أَمَر** ও **نَهَى** টা মূলতাকভাবে বলা হলে তার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর **أَمَر** -এর **نَهَى** হওয়াটাই অগ্রগণ্য। এর বিপরীতে অন্যের **أَمَر** -এর **نَهَى** হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা অগ্রগণ্য নয় বিধায় তার কোনো ধর্তব্য নেই।

২. যারা কোনো নেতার অধীনে থাকে, তারা যখন **أَمَرْنَا**, **نُهِينَا**, **أَمَرْتُ** বলে, তখন সামাজিকভাবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, এটা ঐ নেতার নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা। এ হিসেবে সাহাবীর উক্তি **أَمَرْنَا** -এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই **أَمَر** উদ্দেশ্য হবে। কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধীনে ছিলেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : **وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ يَغْتَمِلُ ...** বাক্যটি সম্মানিত লেখক একটি প্রশ্নের জবাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নটি হলো, এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না যে, সাহাবী যে **نَهَى**

نَهْنِي وَ أَمَرَ نَهْنِي ও أَمَرَ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে নয়; বরং তিনি নিজের ধারণা অনুসারে أَمَرَ نَهْنِي বলেছেন। সুতরাং এটা مَرْفُوعُ حُكْمِي কিভাবে হতে পারে ?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, এ সম্ভাবনা কেবল نَهْنِي عَنْ كَذَا أَمَرَ بِكَذَا কিংবা نَهْنِي عَنْ كَذَا এর মধ্যে সীমিত নয়; বরং তা أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ এবং نَهْنِي عَنْ كَذَا এর মধ্যেও এ সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর সাহাবী যেহেতু আদিল, আকিল এবং ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন, তাই এ ধরনের সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। অতএব, প্রবল ধারণা এটাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা أَمَرَ نَهْنِي করলেই কেবল সাহাবী أَمَرَ نَهْنِي বা نَهْنِي বলে থাকেন।

৩. সাহাবীর উক্তি : كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا : অর্থাৎ আমরা এরূপ করতাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় ওহী নাজিল হওয়ার সময়কালে সাহাবায়ে কেরাম কোনো নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ কাজ করবেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -সে বিষয়ে অনবহিত থাকবেন- এটা হতে পারে না।

مَرْفُوعُ حُكْمِي এটা كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا -এর অন্তর্গত কিনা? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. হাকিম ও ফখরুদ্দীন রাযী -এর অভিমত : তাঁদের মতে সাহাবী كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا বললে তা مَرْفُوعُ হবে।

২. জুমহুরের অভিমত : জুমহুরে মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা এবং উসূলীনদের অভিমত হলো, সাহাবী كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا বললে তা مَرْفُوعُ হবে না; বরং مَوْقُوفُ হবে। ইবনুস সালাহ এবং খতীবে বাগদাদীরও মত তাই।

৪. সাহাবীর উক্তি : إِنَّهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ : অর্থাৎ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যমূলক কাজ। অথবা إِنَّهُ مَعْصِيَةُ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ : অর্থাৎ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবাধ্যতা। কেননা, এটাই স্বাভাবিক যে, বিশেষ কাজ আনুগত্য কিংবা নাফরমানি হওয়ার হুকুম প্রদানটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই সংগৃহীত। আর যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে গৃহীত হয় তা مَرْفُوعُ -ই হয়। যেমন- হযরত আযার ইবনে ইয়াসার (রা.) -এর উক্তি-

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোজা রাখবে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবাধ্যতা করল।

أَوْ يَنْتَهِي غَايَةَ الْإِنْسَادِ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ أَى مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ فِى كَوْنِ
الْلَفْظِ يَفْتَضِى التَّضَرُّعَ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْ مِنْ
فِعْلِهِ أَوْ مِنْ تَفْرِيرِهِ وَلَا يَجْبِىُّ فِيهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ بَلْ مَعْظَمُهُ
وَالْتَّشْبِيهُ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَلَكِنَّا كَانَ هَذَا
الْمُخْتَصَرُّ شَامِلًا لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ اسْتَطَرَدَّتْهُ إِلَى تَعْرِيفِ
الصَّحَابِيِّ مَنْ هُوَ ، فَقُلْتُ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
إِلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِى
الْأَصَحِّ وَالْمُرَادُ بِاللِّقَاءِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَجَالَسَةِ وَالْمُشَاوَةِ وَوُصُولِ
أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَكْلَمْهُ وَيَدْخُلْ فِيهِ رُؤْيَا أَحَدِهِمَا الْآخَرَ سِوَاءَ
كَانَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَالتَّغْيِيرُ بِاللِّقَاءِ أَوَّلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ
الصَّحَابِيُّ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ
يَخْرُجُ حِينَئِذٍ إِنْ أُمِّ مَكْتُومٍ وَنَحْوَهُ مِنَ الْعُمَيَّانِ وَهُمْ صَحَابَةٌ بِلَا تَرَدُّدٍ .

অনুবাদ : যে হাদীসের শেষপ্রান্ত সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, তাকে বলে মাওকুফ হাদীস। মারফু' হাদীসের ন্যায় এখানেও সাহাবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে পারে, আবার কোথাও কোথাও আইনত (হুকুমীভাবে) মেনে নিতে হয় যে, উক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসটি সাহাবীর উক্তি, কর্ম কিংবা অনুমোদন। মারফু' হাদীসের সকল শ্রেণি ও বিভাগ মাওকুফ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। তবে অধিকাংশই হয়ে থাকে।

যেহেতু এ গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে উল্মুল হাদীসের সকল বিভাগ আলোচিত হয়েছে, তাই প্রসঙ্গক্রমে সাহাবীর সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

(আমি বলছি,) যিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন, তিনিই সাহাবী। আল্লাহ না করুন তিনি মাঝখানে যদি মুরতাদও হয়ে যান, তবু পরবর্তীকালে আবার ইসলাম গ্রহণ করে সে অবস্থায় ইন্তেকাল করলে তাকে সাহাবীই গণ্য করা হবে। এটিই অধিক বিস্তৃত মত। সাক্ষাতের বিষয়টি ব্যাপক। একসাথে উঠাবসা, চলাফেরা, একের নিকট অন্যের গমন সবই উদ্দেশ্য। এমনকি কথাবার্তা না হলেও চলবে। একজনকে অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে দেখলেও সাক্ষাৎ বলেই গণ্য হবে। অনেকেই এ মর্মে সংজ্ঞা দিয়েছেন- যিনি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছেন, তিনি সাহাবী। 'দেখা' শব্দের তুলনায় 'সাক্ষাৎ' শব্দ ব্যবহার করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেননা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) এবং আরো যেসব অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা তো নবী করীম ﷺ -কে দেখেননি। অথচ তাদের সাহাবী হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। (কিন্তু দেখা শব্দ ব্যবহার করলে তাঁরা বাদ পড়ে যান।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্মানিত লেখক **مَرْفُوع** -এর আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আর তা হলো-
১. মাওকুফ -এর সংজ্ঞা, ২. মাওকুফ -এর প্রকারভেদ, ৩. সাহাবীর সংজ্ঞা, ৪. **قَوَائِدُ نُبُور** ও ৫. দুটি বিশেষ দৃষ্টব্য।

১. **مَرْفُوع** -এর সংজ্ঞা : মুহাদ্দিসীনে কেরাম **الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ** -এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন-
هُوَ مَا أُصْنِفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ -
অর্থাৎ সাহাবীর **قَوْل**, **فِعْل**, **تَقْرِير** ও **قَوْل** বলে।

এ সংজ্ঞা অন্য ভাষায় এভাবে প্রদান করা যায় যে, যে হাদীসের সনদ কোনো সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় এবং ঐ সনদের মাধ্যমে যেটা বর্ণিত হয় তা কোনো সাহাবীর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন হয়, তাহলে তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে।

২. **مَرْفُوع** -এর প্রকারভেদ : **مَرْفُوع** মোট তিন প্রকার। ১. **قَوْلِي**, ২. **فِعْلِي** ও ৩. **تَقْرِيرِي**।
তাবেয়ীর যে উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন কিয়াসী এবং যা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত নয় তা **مَرْفُوع حُكْمِي** -এর অন্তর্গত ; **مَرْفُوع** নয়। এ কারণে **حُكْمِي** -এর তিন প্রকার **حَدِيث**
مَرْفُوع -এর মধ্যে সাব্যস্ত হয় না; কেবল **صَرِيح** -এর তিন প্রকার সাব্যস্ত হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : **وَالشَّيْبَةُ لَا يَشْتَرُطُ ...** বাক্যটিতে সম্মানিত লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। উহ্য প্রশ্নটি হলো, **كَذَلِكَ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ** শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় যে, **حَدِيث مَرْفُوع** যেমন ছয় প্রকারে বিভক্ত হয় তেমনি **مَرْفُوع** -ও ছয় প্রকার হবে। অথচ বাস্তবে **مَرْفُوع** হলো তিন প্রকার, তাহলে **كَذَلِكَ** বলার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক বলেন, **كَذَلِكَ** শব্দের মাধ্যমে **مَرْفُوع** কে **مَرْفُوع** -এর সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হলেও এর দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, **مَرْفُوع** টা সমস্ত দিক দিয়ে **مَرْفُوع** -এর মত হবে; বরং সাদৃশ্যের জন্য একটু মিল হলেই যথেষ্ট।

... وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمُخْتَصَرُ ... : এ বাক্যটি সম্মানিত লেখক আগত আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। একটু পরেই যেহেতু সাহাবীর সংজ্ঞা বর্ণিত হবে, তাই এখানে তার দুটি কারণ তুলে ধরেছেন। যথা-

১. এ গ্রন্থটির উল্লেখ্য হাদীসের সমস্ত বিষয় সম্বলিত হওয়া।

২. **حَدِيث مَرْفُوع** -এর প্রাণ ও ভিত্তি সাহাবায়ে কেরাম হওয়া। বস্তুত এ দু কারণকে সামনে রেখে লেখক এবার সাহাবীর সংজ্ঞা তুলে ধরছেন।

৩. সাহাবী -এর সংজ্ঞা : অভিধানে **صَحَابِي** শব্দটি **جَمْع** বা বহুবচন হলো **أَصْحَابٌ**। অর্থ-
সাধি, সঙ্গী ইত্যাদি।

পরিভাষায় সাহাবীর সংজ্ঞা নির্ণয়ে মতভেদ হয়েছে। আর তা হলো-

১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস 'সাহাবী'র সংজ্ঞা বলেছেন—

مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন এবং ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেছেন তিনি সাহাবী।

তবে এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ নয়। কেননা, এখানে রَأَى তথা দেখা -এর শর্তারোপ করায় সাহাবীর সংজ্ঞা হতে ঐ সমস্ত লোক বাদ পড়েছেন যারা অন্ধ হওয়ায় নবী করীম ﷺ -কে দেখতে পারেননি। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) প্রমুখ। অথচ সন্দেহাতীতভাবে তাঁরা সাহাবী।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে সাহাবীর সংজ্ঞা হলো—

هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ.

অর্থাৎ যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ঈমানের অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন; রাসূলের সাক্ষাৎ ও ইন্তেকালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকলেও। সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞাটি সমর্থন করেছেন এবং তাঁর এ কিতাবে এ সংজ্ঞাটিই উল্লেখ করে তার বিশ্লেষণও করেছেন।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত : তাঁদের মতে সাহাবী তিনি, যিনি ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। ঈমান আনার পরে মুরতাদ হয়ে গেলে তার সাহাবিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর আবার সাক্ষাৎ করা সাহাবিয়্যাতের জন্য শর্ত। আবার সাক্ষাৎ না হলে তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَاللُّقَىٰ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ كَالْجَنَسِ وَقَوْلِي مُؤْمِنًا كَالْفَصْلِ يَخْرُجُ مَنْ حَصَلَ لَهُ الْإِقْلَاءُ الْمَذْكُورُ لَكِنْ فِي حَالِ كَوْنِهِ كَافِرًا وَقَوْلِي بِهِ فَصْلٌ ثَانٍ يَخْرُجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا لَكِنْ يَغْيِرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَكِنْ هَلْ يَخْرُجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِأَنَّهُ سَيَبْعُثُ وَلَمْ يُدْرِكِ الْبَعْثُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلِي وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَصْلٌ ثَالِثٌ يَخْرُجُ مَنْ ارْتَدَّ بَعْدَ أَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الرَّدِّ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وَابْنِ خَطْلٍ وَقَوْلِي وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رَدَّةٌ أَيْ بَيْنَ لَقِيَهُ لَهُ مُؤْمِنًا بِهِ وَبَيْنَ مَوْتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّ اسْمَ الصُّحْبَةِ بَاقٍ لَهُ سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ أَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ لَقِيَهُ ثَانِيًا أَمْ لَا وَقَوْلِي فِي الْأَصَحِّ إِشَارَةً إِلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْئَلَةِ وَيَدُلُّ عَلَى رُجْعَانِ الْأَوَّلِ قِصَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ ارْتَدَّ وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رض) أَسِيرًا فَعَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ وَزَوْجَهُ أُخْتَهُ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَلَا عَنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِمْ فِي الْمَسَائِدِ وَغَيْرِهَا .

অনুবাদ : এ সংজ্ঞায় লُقَى তথা সাক্ষাৎ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। 'ইমান অবস্থায়' একটি বিভাজন। এটা দ্বারা সেসব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবে, যারা কান্ধির অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করে মহানবী ﷺ -এর ইত্তেকালের পরে মুসলমান হয়েছে। তথা তার প্রতি আরেকটি বিভাজন। তাই কেউ যদি অন্য নবীর প্রতি ইমান রেখে শেষ নবী ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তিনিও সাহাবী নন। অবশ্য যিনি নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তখন এ মর্মে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ইনি অবশ্যই নবী হবেন অথচ তাঁর নবুয়তকাল পাননি, তিনি সাহাবী হবেন কিনা? তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। 'মুসলমান অবস্থায় ইত্তেকাল করা' আরেকটি বিভাজন। সুতরাং কেউ যদি ইমান সহকারে মহানবী ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পরে মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকে এবং মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তাকে আর সাহাবী বলা যাবে না। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও ইবনে খাতাল।

(ইমানের সাথে নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ ও মুসলমান অবস্থায় ইত্তেকালে এতদুভয় অবস্থার) মাঝখানে যদি মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলেও তিনি সাহাবী বলেই গণ্য হবেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশাতেই ফিরে আসুন কিংবা তাঁর ইত্তেকালের পরে এবং দ্বিতীয়বার মহানবী ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করুন বা না করুন। এটিই বিশুদ্ধতর মত। এ ব্যাপারে ভিন্নমতও রয়েছে। আশআহ ইবনে কায়স -এর ঘটনা প্রথম মতটিকে সমর্থন করে। তিনি মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -এর নিকট তাঁকে বন্দি করে আনা হলে তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণকে মেনে নেন এবং তাঁর সাথে নিজ বোনের বিয়ে দেন। ঐতিহাসিকদের কেউই তাঁকে সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেননি। তাঁর হাসীস মুসনাদ কিতাবসমূহে উল্লেখ করা থেকেও কেউ ক্ষান্ত হননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৪. فَوَائِدُ مُبْرَدٌ বা সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) সাহাবীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন

নিম্নোক্ত ভাষায়-

الصَّحَابِيُّ: هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رَدَّةٌ.

এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

مَنْ رَأَى النَّبِيَّ : যিনি (রাসূলের) সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনি সাহাবী। কেউ কেউ বলেছেন-مَنْ لَقِيَ অর্থাৎ যিনি রাসূলুল্লাহকে দেখেছেন তিনি সাহাবী। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) ও তাঁর মতো অন্ধ সাহাবী যারা দেখতে পেতেন না তাঁরা সাহাবীর সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যান। তাই مَنْ رَأَى -এর পরিবর্তে مَنْ لَقِيَ হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : যিনি রাসূলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সুতরাং কেউ অন্য কোনো নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাননি- তিনি সাহাবী নন।

مُؤْمِنًا : মু'মিন অবস্থায়। সুতরাং যারা কাফির অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করে মহানবী ﷺ -এর ইত্তেকালের পরে মুসলমান হয়েছে তারা সাহাবী হবে না।

بِهِ : তাঁর প্রতি। সুতরাং কেউ যদি অন্য নবীর প্রতি ঈমান রেখে শেষনবী ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তিনিও সাহাবী নন।

অবশ্য যিনি নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তখন তার এ মর্মে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ইনি অবশ্যই নবী হবেন অথচ তাঁর নবুয়তকাল পাননি, তিনি সাহাবী হবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে।

مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ : ঈমান অবস্থায় সাক্ষাৎ পেয়েছেন, ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি সাহাবী। সুতরাং মুরতাদ অবস্থায় যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি সাহাবী নন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ প্রমুখ।

وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ : এ প্রসঙ্গে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। যথা- -

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত : ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এরপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় ইত্তেকাল করেছেন তিনিও সাহাবী।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী তাই তিনি এ মতামতকে বিতর্ক বলেছেন।

শাফেয়ীদের দলিল : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) হযরত আশআছ ইবনে কায়েস (রা.)-এর ঘটনাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হযরত আশআছ ইবনে কায়েস (রা.) সাহাবী ছিলেন। তিনি মুরতাদ হয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.) -এর শাসনামলে তাঁকে খেফতার করে তাঁর সম্মুখে আনা হলে তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ইসলাম কবুল করে নেন এবং তাঁর সাথে নিজের বোনের বিবাহ দেন। পরে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁকে সাহাবীদের মাঝে গণ্য করেছেন এবং তাদের মাসানিদে তাঁর সূত্রে হাদীস এনেছেন। সুতরাং হাফিজ ইবনে হাজার (র.) সহ শাফেয়ীদের মত হলো, মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় ঈমানের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ সাহাবিয়ারতের জন্য শর্ত নয়।

২. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) -এর মত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভের পর মুরতাদ হয়ে গেলে তার সাহাবিয়ারত বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় সাক্ষাৎ লাভ সাহাবিয়ারতের জন্য শর্ত। তা না হলে তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

শাফেয়ীদের দলিলের জবাব : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর দলিল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, যে সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম হযরত আশআছকে সাহাবীদের মাঝে গণ্য করেছেন সম্ভবত তাঁর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে পৌঁছেন।

আর যারা আশআছ থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তারা ১. সম্ভবত তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ২. অথবা, তারা আশআছ থেকে ঐ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন যা তিনি কোনো সাহাবী থেকে শুনেছেন। ৩. অথবা, তারা তাদের মাযহাবের ভিত্তিতে রেওয়ায়েত করেছেন, যারা কুফর অবস্থায় হাদীস শুনে সে হাদীস ঈমান অবস্থায় বর্ণনা করাকে জায়েজ মনে করেন।

تَنْبِيْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا خَفَاءَ فِي رُجْعَانِ رُتْبَةٍ مَنْ لَزِمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَقَاتَلَ مَعَهُ أَوْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَتِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلِزِمَهُ
أَوْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُ مَشْهُدًا أَوْ عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ قَلِيلًا أَوْ رَأَى
عَلَى بَعْدٍ أَوْ فِي حَالِ الطُّفُولِيَّةِ وَإِنْ كَانَ شَرَفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلًا لِلْجَمِيعِ
وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ سَمَاعٌ مِنْهُ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ وَهُمْ مَعَ
ذَلِكَ مَعْدُودُونَ فِي الصَّحَابَةِ لِمَا نَالُوهُ مِنْ شَرَفِ الرُّوْيَةِ .

ثَانِيَهُمَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّا بِالتَّوَاتُرِ أَوْ الْإِسْتِفَاضَةِ أَوْ الشُّهُرَةِ أَوْ
بِإِخْبَارِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَوْ بَعْضِ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ أَوْ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ
بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ إِذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ ذَلِكَ تَدْخُلُ تَحْتَ الْإِمْكَانِ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ
هَذَا الْأَخِيرَ جَمَاعَةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ نَظِيرُ دَعْوَى مَنْ قَالَ أَنَا عَدْلٌ
وَيَحْتَاجُ إِلَى تَأْمِيلٍ .

অনুবাদ : বিশেষ দ্রষ্টব্য- ১ : যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন, তাঁর সাথে জিহাদে শরিক হয়েছেন কিংবা তাঁর পতাকার নিচে থেকে জিহাদ করেছেন, এমন ব্যক্তির মর্যাদা যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে বেশি দিন কাটাননি, তাঁর সাথে কোনো জিহাদেও শরিক হননি, অথবা তাঁর সাথে অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন মাত্র, অথবা অল্প কিছু দূর একসাথে পথ চলেছেন, অথবা দূর থেকে তাঁকে দেখেছেন, কিংবা শৈশবকালে দেখেছেন- এমন ব্যক্তির চেয়ে বেশি হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য সবাইকে সাহাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন, বর্ণনার দিক দিয়ে তার হাদীস মুরসাল বলে গণ্য হবে। এতদসত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে সাহাবী বলা হয়। কেননা, তাঁরা মহানবী ﷺ -কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য- ২ : কোনো ব্যক্তিকে সাহাবী সাব্যস্ত করা যায় মুতাওয়াতির, মুস্তাফীয, মাশহূর কিংবা কোনো সাহাবীর বর্ণনা, কোনো নির্ভরযোগ্য তাবয়ীর বর্ণনা কিংবা সে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে এ মর্মে বর্ণনার ভিত্তিতে যে, তিনি সাহাবী। অবশ্য তার দাবির সম্ভাব্যতা বিবেচনা করতে হবে। সর্বশেষ ভিত্তি সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা, এ হলো তেমন যে, কোনো ব্যক্তি এরূপ দাবি করে যে, আমি নির্ভরযোগ্য। বিষয়টি চিন্তার অবকাশ রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাহাবিয়্যাতে প্রশ্নে সকল সাহাবী বরাবর ও সমান হলেও তাদের মধ্যে মর্যাদাগত স্তরভেদ রয়েছে। সুতরাং যিনি দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্নিধ্যে রয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জিহাদ শরিক হয়েছেন অথবা তাঁর নেতৃত্বাধীন জিহাদে শহীদ হয়েছেন তার মর্যাদা ঐ সাহাবী হতে অনেক উর্ধ্বে যার মাঝে এ সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য নেই।

শুধু তাই নয়, এমন সাহাবীর মর্যাদা তাঁর থেকেও বেশি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কম কথা বলেছেন, একসাথে কম হাঁটা-চলা করেছেন অথবা দূর থেকে কিংবা শেষবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছেন।

যে সাহাবীর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস শ্রবণ সাবেত নেই, তিনি যদি মাধ্যমকে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস রেওয়ায়েত করেন, তাহলে তার হাদীস বর্ণনাগত দিক দিয়ে মুরসাল হলেও হুকুমগত দিক দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে মাকবুল। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সোহবত লাভে ধন্য হওয়ার কারণে তিনিও একজন গর্বিত সাহাবী।

সাহাবী হওয়া জানানোর উপায় : কে সাহাবী তা জানানোর উপায় ছয়টি। যথা-

১. **الْخَيْرُ الْمُنْتَرِ** তথা খবরে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে। যেমন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) প্রমুখ আশারায় মোবাম্বাশরাহ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। এর মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহাবিয়্যাত অস্বীকারকারী কাফির হবে। কারণ, তাঁর সাহাবী হওয়া কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنَنَّ الرَّاءَ اللَّهُ مَعَنَا .

অর্থাৎ স্বরণ করুন, যখন তিনি তাঁর সাথি (আবু বকর)-কে বলেছিলেন- আপনি ঘাবড়াবেন না, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ছাড়া অন্যান্য সাহাবীদের সাহাবিয়্যাতকে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হবে না।

২. **الْخَيْرُ الْمُسْتَفِيضُ** তথা খবরে মুস্তাফীযের মাধ্যমে।

৩. **الْخَيْرُ الْمَشْهُورُ** তথা খবরে মাশহুরের মাধ্যমে।

৪. এক সাহাবীর অপর সাহাবির ব্যাপারে সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে।

৫. নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর জানানোর মাধ্যমে।

৬. সাহাবীর নিজের দাবির মাধ্যমে যে, তিনি সাহাবী, যদি তার দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোনো সাহাবীর নিজের ব্যাপারে সাহাবী হওয়ার দাবি ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সাধারণ ও শরয়ী দৃষ্টিতে সম্ভাব্য হবে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের একশ বছর পর সাহাবী হওয়ার দাবি করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম ﷺ জীবনের শেষ দিকে এসে বলেন, আজ যারা পৃথিবীতে জীবিত আছে একশ বছর পরে তাদের কেউ আর জীবিত থাকবে না।

সাহাবী হওয়ার দাবি করলে তার হুকুম : কেউ নিজেকে সাহাবী হওয়ার দাবি করলে সে দাবি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয়ের মত হলো, এমন ব্যক্তি সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হবেন না। কেননা, কেউ নিজেকে আদিল বলে দাবি করলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হয় না। তেমনিভাবে কেউ নিজেকে সাহাবী বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. জুমহুরের অভিমত : তাঁদের মতে এমন ব্যক্তি সাহাবী হবেন। কারণ, আদিল ব্যক্তির খবর তার রেওয়ায়েতের ব্যাপারে গৃহীত হয়। এমনিভাবে তার এই মর্মে খবর প্রদান করা যে, 'রাসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে'- এটিও গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রথম দলের দলিলের জবাব : মোল্লা আলী কারী (র.) প্রথম দলের দলিলের জবাবে বলেন যে, নিজেকে আদিলের দাবিদার যদি **مَجْهُولُ الْحَالِ** হয়, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হয়। আর যদি তিনি **ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ** তথা তার আদিল হওয়াটা যদি মশহুর হয়, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে আদিল বলে দাবি করে তার সাথে নিজেকে সাহাবী দাবিকারী ব্যক্তিকে কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, আদিল ব্যক্তির আদালাত যদি মশহুর হয়, তাহলে তার আদিল হওয়ার সংবাদ প্রদানটা গ্রহণযোগ্য হয়। তেমনি কোনো ব্যক্তি নিজেকে সাহাবী বলে সংবাদ দিলে যদি সেটা সম্ভাব্য হয়, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে।

أَوْ يَنْتَهِي غَايَةَ الْإِسْنَادِ إِلَى التَّابِعِي وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِي كَذَلِكَ
وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْقُلِيِّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ إِلَّا قَبْدَ الْإِيمَانِ بِهِ وَذَلِكَ خَاصٌّ
بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ خِلَافًا
لِمَنْ اشْتَرَطَ فِي التَّابِعِي طَوْلَ الْمُلَازِمَةِ أَوْ صِحَّةَ السَّمَاعِ أَوْ التَّحْمِيْزِ .

অনুবাদ : যে হাদীসের শেষপ্রান্ত কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে তার নাম মাকতূ' হাদীস। তাবেয়ী হলেন- যিনি কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। সাহাবীর সংজ্ঞায় যেসব শর্ত ছিল এখানেও তা রয়েছে। তবে সাহাবী হবার জন্য মহানবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান থাকা শর্ত ছিল, তাবেয়ীর ব্যাপারে তা নেই। ঈমানের ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট। এখানে তাবেয়ীর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো, সেটিই আমার মতে পছন্দনীয় মত। কেউ কেউ অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা তাবেয়ীর জন্য শর্ত করেছেন- কোনো সাহাবীর সাথে দীর্ঘকাল অবস্থানকে, কেউ শর্ত করেছেন- সাহাবী থেকে কোনো হাদীস শোনার, আবার কেউ বলেছেন- কমপক্ষে এতটুকু বয়স হওয়া চাই যখন সে সাবালক না হলেও ভালো-মন্দ বুঝতে সক্ষম হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْطُوع -এর সংজ্ঞা: ২. তাবেয়ী -এর সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় প্রবিধানযোগ্য। ১. حَدِيثُ مَنْطُوع -এর সংজ্ঞা ও ৩. মুখাযরামীন -এর সংজ্ঞা। নিম্নে এ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

১. الْحَدِيثُ الْمَنْطُوع -এর সংজ্ঞা : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো-

مَوْمًا أَخْبَرَ إِلَى التَّابِعِي أَوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .

অর্থাৎ তাবেয়ী বা তাদের পরের স্তরের সলফদের উক্তি এবং কর্মকে الْحَدِيثُ الْمَنْطُوع বলা।

২. তাবেয়ী -এর সংজ্ঞা : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাহযাব অনুযায়ী তাবেয়ী -এর সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ-

التَّابِعِيُّ : هُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ .

অর্থাৎ তাবেয়ী তিনি যিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমানের অবস্থায় কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ঈমানের অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন- মধ্যবর্তী সময়ে মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকলেও।

মুরতাদ হওয়ার পর সাহাবিয়ারতের জন্য পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ শর্ত কিনা- এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাঝে যে মতভেদ সাহাবীর সংজ্ঞায় উল্লিখিত হয়েছে অনুরূপ মতভেদ তাবেয়ী -এর সংজ্ঞাতেও রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কাছে পুনরায় সাক্ষাৎ শর্ত না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তাবেয়ী হওয়ার জন্য মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া শর্ত।

খতীবে বাগদাদী (র.) তাবেয়ী হওয়ার জন্য সাহাবীর সংস্পর্শে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার শর্ত করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে হিব্বান (র.) তাবেয়ী হওয়ার জন্য তার এমন বয়সী হওয়া শর্ত করেছেন, যে বয়সে একজন মানুষ হাদীস শুনে মুখস্থ রাখতে পারে। অর্থাৎ তিনি صَحَّتْ سَمَاع -এর শর্ত করেছেন। আরেক রেওয়াজে মতে ইবনে হিব্বান (র.) تَحْمِيْز -এর শর্ত করেছেন। অর্থাৎ

তাবেয়ী -এর এমন বয়সে সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, যে বয়সে তিনি ভালো-মন্দ বুঝতে পারেন। আর তা হলো চার কিংবা পাঁচ বছর বয়স। তবে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, তাবেয়ী হওয়ার জন্য এ সমস্ত শর্ত জরুরি নয়; বরং এমন শর্ত না হওয়াটাই চাই। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) যেহেতু হযরত আনাস (রা.) -কে দেখেছেন তাই তিনি তাবেয়ী; যদিও তিনি দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে থাকেননি।

وَبَقِيَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ طَبَقَةٌ اخْتَلَفَ فِي الْحَاقِيقِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ وَهُمْ الْمُخَضَّرُونَ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ وَلَمْ يَرَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَعَدَّهُمْ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الصَّحَابَةِ وَادَّعى عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ يَقُولُ إِنَّهُمْ صَحَابَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ أَفْصَحَ فِي خُطْبَةٍ كِتَابِهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْرَدَهُمْ لِيَكُونَ كِتَابُهُ جَامِعًا مُسْتَوْعِبًا لِأَهْلِ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَالصَّحِيحِ أَنَّهُمْ مَعْدُودُونَ فِي كِتَابِ التَّابِعِينَ سَوَاءٌ عُرِفَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَ مُسْلِمًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَالنَّجَاشِيِّ أَوْ لَا لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ كُشِفَ لَهُ عَنْ جَمِيعِ مَنْ فِي الْأَرْضِ فَرَأَهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِهِ فِي حَيَاتِهِ إِذْ ذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُلَاقِهِ فِي الصَّحَابَةِ لِحُضُولِ الرُّؤْيَا مِنْ جَانِبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

অনুবাদ : সাহাবী ও তাবয়ী- এ দু শ্রেণির মাঝখানে এমন একদল ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে কোন দলভুক্ত করা হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এরা হচ্ছেন মুখাযরাম। অর্থাৎ যারা জাহেলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন; কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। ইবনে আব্দুল বার তাদেরকে সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। কাজি ইয়ায দাবি করেছেন যে, ইবনে আব্দুল বার তাদেরকে সাহাবী বলে গণ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা, তিনি তার কিতাবের ভূমিকায় পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেছেন প্রথম যুগের সকল ব্যক্তির নাম একত্রিত করার উদ্দেশ্যে।

বিশুদ্ধ মত হলো, এ শ্রেণির ব্যক্তির প্রবীণ তাবয়ীদের মধ্যে গণ্য। তাদের কেউ নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় মুসলমান ছিলেন বলে জানা যাক বা না যাক। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

এ মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মিরাজ রজনীতে নবী করীম ﷺ -এর সামনে তৎকালীন পৃথিবীর সকল মুসলমানকে পেশ করা হয়েছিল। যদি এ বর্ণনা শুদ্ধ হয়, তাহলে তারা নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ না করলেও যেহেতু তিনি তাদেরকে দেখেছিলেন, তাই তাঁর জীবদ্দশায় যারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখত তাদেরকে সাহাবী বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمُخَضَّرُ -এর সংজ্ঞা : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে الْمُخَضَّرُ হলো-
مُمُّ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ وَلَمْ يَرَوْا النَّبِيَّ ﷺ سَوَاءً أَسْلَمُوا فِي زَمَنِهِ أَوْ بَعْدَهُ.

অর্থাৎ মুখায়রাম তারা যারা জাহিলিয়া যুগে পেয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে পেয়েছিলেন; কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাননি। চাই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করে থাকুন কিংবা পরে ইসলাম গ্রহণ করুন।

خَضَرُمْ -এর নামকরণ : اِسْمٌ مَفْعُولٌ خَضَرُمْ মাসদার হতে اَلْمُخَضَّرُ -এর সীগাহ। خَضَرُمْ অর্থ- কর্তন করা, বাদ দেওয়া ইত্যাদি। যেহেতু তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের স্তর হতে বাদ দিয়ে পৃথক নামে উল্লেখ করা হয়, তাই তাদেরকে মুখায়রাম বলে।

মুখায়রাম-এর সংখ্যা ও উদাহরণ : ইমাম মুসলিম (র.) এদের সংখ্যা বিশ উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী (র.) বলেন, এদের সংখ্যা আরো বেশি। নিম্নে কয়েকজন মুখায়রামের নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো-

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ১. আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশী। | ২. আহনাফ ইবনে কায়েস। |
| ৩. আবু মুসলিম খাওলানী। | ৪. আবু রজা আতারিদী। |
| ৫. আবু ওসমান আন-নাহদী। | ৬. যুবাইর ইবনে নুফাইর। |
| ৭. য়ায়েদ ইবনে ওয়াহাব। | ৮. কায়েস ইবনে আবু হাযিম। |
| ৯. আবু আব্দুল্লাহ সনাবিহী। | ১০. সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ। |

মুখায়রামদের হুকুম : মুখায়রামরা সাহাবী না তাবেয়ী- তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ-

১. আল্লামা ইবনুল বার যেহেতু মুখায়রামদেরকে সাহাবীদের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু আল্লামা কাজি ইয়ায প্রমুখ দাবি করেছেন যে, ইবনুল বারের মতে মুখায়রামরা সাহাবী; কিন্তু এ দাবি যথার্থ নয়। কেননা, ইবনুল বার তার কিতাবের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি তাদেরকে সাহাবীদের সাথে উল্লেখ করেছি তাদের সাহাবী হওয়ার কারণে নয়; বরং প্রথম যুগের লোকদেরকে একসাথে উল্লেখ করার জন্য। চাই তারা সাহাবী হন বা না হন।

২. জুহুরের মতে মুখায়রামরা كِبَارُ تَابِعِينَ -এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মুসলমান হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মশহুর হোক অথবা না হোক।

অবশ্য যদি এ হাদীস সহীহ হয় যে, মি'রাজের রাতে সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে হাজির করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে দেখেছেন, তাহলে এ সময় যে মুখায়রামরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের সাহাবী হওয়াটা নিশ্চিত। কেননা, যদিও তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেননি; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তো তাঁদের দেখেছেন। আর সাহাবিয়্যাতের জন্য যে কোনো এক পক্ষ হতে দর্শনই যথেষ্ট।

৩. মুখায়রামদের স্তর যেহেতু সাহাবী হতে নিম্ন এবং তাবেয়ী হতে উর্ধ্ব, তাই তাঁদেরকে সাহাবী বা তাবেয়ী -এর অন্তর্ভুক্ত না করে; বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 'মুখায়রাম' স্তর নির্ধারণ করে তাঁদেরকে সেই স্তরেই গণ্য করা উচিত।

فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ غَايَةَ الْإِسْنَادِ وَهُوَ الْمَرْفُوعُ سِوَاهُ كَانَ ذَلِكَ الْإِنْتِهَاءُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لَا وَالثَّانِي الْمَوْقُوفُ وَهُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَى الصَّحَابِيِّ وَالثَّالِثُ الْمَقْطُوعُ وَهُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَى التَّابِعِيِّ وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيهِ أَى فِي التَّسْمِيَةِ وَمِثْلَهُ أَى مِثْلَ مَا يَنْتَهِي إِلَى التَّابِعِيِّ فِي تَسْمِيَةِ جَمِيعِ ذَلِكَ مَقْطُوعًا وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ مَوْقُوفٌ عَلَى فَلَانٍ فَحَصَلَتِ التَّفْرِيقَةُ فِي الْأَصْطِلَاحِ بَيْنَ الْمَقْطُوعِ وَالْمُنْقَطِعِ فَالْمُنْقَطِعُ مِنْ مَبَاحِثِ الْإِسْنَادِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَقْطُوعُ مِنْ مَبَاحِثِ الثَّمَنِ كَمَا تَرَى وَقَدْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ هَذَا فِي مَوْضِعٍ هَذَا وَبِالْعَكْسِ تَجَوُّزًا عَنِ الْأَصْطِلَاحِ وَيُقَالُ لِلْآخِرِينَ أَى الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ الْآثَرُ.

অনুবাদ : উল্লিখিত তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের নাম মারফু'। আর তা হলো, ঐ হাদীস, যার সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। চাই তা মুত্তাসিল সনদে হোক বা না হোক। দ্বিতীয় প্রকারের নাম মাওকুফ। আর তা হলো ঐ হাদীস যার সনদ সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। তৃতীয়টি হলো মাকতু'। আর তা হলো, ঐ হাদীস যার সনদ তাবেয়ী বা তাবয়ে-তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এরপরের লোকদের পর্যন্ত যে হাদীসের সনদ গিয়ে শেষ হয় তাকেও মাকতু' বলে। চাইলে তুমি একে (তাবেয়ী ও তাবয়ে-তাবেয়ী -এর হাদীসকে) অমুকের মাওকুফও বলতে পার। এখান থেকে পরিষ্কার হয় যে, মাকতু' ও মুনকাতি' এক নয়। মুনকাতি' হলো সনদের বিষয় আর মাকতু' হলো মতনের বিষয়। তবে কেউ কেউ পরিভাষা ডিসিয়ে একটির স্থানে অপরটি ব্যবহার করেছেন। মাওকুফ ও মাকতু' হাদীসের অপর নাম আছার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرْفُوعٌ ও **مُتَّصِلٌ** -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে **وَجُعِدَ** -এর নিসবত। হাদীসে মারফু' হলো, যার সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে। চাই তা ধারাবাহিক সূত্রে হোক কিংবা সনদের মাঝ থেকে রাবীর পতনের মাধ্যমে হোক। আর হাদীসে মুত্তাসিল হলো, যার সনদ থেকে রাবীর পতন হয় না। চাই সে সনদ রাসূল, সাহাবী, তাবেয়ী যেখানেই গিয়ে শেষ হোক না কেন।

مَوْقُوفٌ এবং **مَقْطُوعٌ** -এর মধ্যে পার্থক্য : হাদীসে মাকতু' -এর উপর কখনো কখনো মাওকুফও ব্যবহার হয়। যদিও মূলত মাওকুফ হলো সাহাবীর খবর, আর মাকতু' হলো তাবেয়ীর খবর।

مَنْقَطِعٌ এবং مَنْقَطِعٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের পূর্ববর্তী সংজ্ঞা হতে সহজেই জানা গেছে যে, এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, مَنْقَطِعٌ প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। চাই সে সনদ হতে কোনো রাবীর পতন হোক বা না হোক। আর مَنْقَطِعٌ ঐ হাদীসকে বলে, যার সনদ থেকে কোনো রাবী পড়ে যায়। চাই সে সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হোক বা না হোক।

এ সংজ্ঞা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, مَنْقَطِعٌ -এর সম্পর্ক হাদীসের মতনের সাথে আর مَنْقَطِعٌ -এর সম্পর্ক হাদীসের সনদের সাথে। আর উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হলো عَامٌ خَاصٍّ مِنْ وَجْهِ -এর। তবে مَنْقَطِعٌ ও مَنْقَطِعٌ উভয় যেহেতু قَطْعٌ (কর্তন করা) মাসদার হতে নির্গত, তাই কেউ কেউ পরিভাষা ডিসিয়ে আভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে مَنْقَطِعٌ -এর স্থলে مَنْقَطِعٌ এবং مَنْقَطِعٌ -এর স্থলে مَنْقَطِعٌ ব্যবহার করেন।

أَثَرٌ -এর সংজ্ঞা : অভিধানে أَثَرُ অর্থ بَقِيَّةُ الشَّيْءِ বা অবশিষ্টাংশ। তবে পরিভাষায় اثر -এর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তা হলো-

ক. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে أَثَرٌ হলো-

أَلَاثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ.

অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কর্ম ও বাণীকে أَثَرٌ বলে।

খ. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয়ের অভিমত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা বর্ণিত হয় অর্থাৎ হাদীসে মারফূ'কে খবর ও হাদীস বলে। আর أَثَرٌ টা হলো عَامٌ বা ব্যাপক অর্থাৎ أَثَرٌ টা مَرْفُوعٌ, مَرْفُوعٌ -এর সমার্থক হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে أَثَرٌ টা حَدِيثٌ -এর সমার্থক হয়।

وَالْمُسْنَدُ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْحَدِيثِ هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ هُوَ مَرْفُوعٌ صَحَابِيٌّ
يَسْنَدُ ظَاهِرُهُ الْإِتِّصَالُ فَقَوْلِي مَرْفُوعٌ كَالْجَنَسِ وَقَوْلِي صَحَابِيٌّ كَالْفَضْلِ
يَخْرُجُ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ فَإِنَّهُ مَرْسَلٌ أَوْ مِنْ دُونِهِ فَإِنَّهُ مُعْضَلٌ أَوْ مُعَلَّقٌ
وَقَوْلِي ظَاهِرُهُ الْإِتِّصَالُ يَخْرُجُ مَا ظَاهِرُهُ الْإِنْقِطَاعُ وَيَدْخُلُ مَا فِيهِ
الِإِخْتِمَالُ وَمَا يُوْجَدُ فِيهِ حَقِيقَةُ الْإِتِّصَالِ مِنْ بَابِ الْأَوَّلَى وَيُفْهَمُ مِنَ
التَّفْقِيدِ بِالظُّهْرِ أَنَّ الْإِنْقِطَاعَ الْخَفِيَّ كَعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ وَالْمُعَاصِرِ
الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ لِقَبِهِ لَا يَخْرُجُ الْحَدِيثُ عَنْ كَوْنِهِ مُسْنَدًا لِإِطْبَاقِ الْأَيْمَةِ
الَّذِينَ خَرَجُوا الْمَسَانِيدَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا التَّعْرِيفُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْحَاكِمِ
الْمُسْنَدُ مَا رَوَاهُ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ
شَيْخِهِ مُتَّصِلًا إِلَى صَحَابِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْخَطِيبُ فَقَالَ الْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ فَعَلَى هَذَا
الْمَوْقُوفُ إِذَا جَاءَ بِسْنَدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّى عَنْدهُ مُسْنَدًا لَكِنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ
قَدْ بَاتِيَ بِقَلَّةٍ وَأَبْعَدُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَيْثُ قَالَ الْمُسْنَدُ الْمَرْفُوعُ وَلَمْ
يَتَعَرَّضْ لِلِاسْتِنَادِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَرْسَلِ وَالْمُفْضَلِ وَالْمُنْقَطِعِ إِذَا
كَانَ الْمَتْنُ مَرْفُوعًا وَلَا قَائِلَ بِهِ .

অনুবাদ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম যখন কোনো হাদীস সম্পর্কে বলেন, এটি একটি মুসনাদ হাদীস, তখন তার অর্থ দাঁড়ায়- কোনো সাহাবী বর্ণিত এমন মারফূ' হাদীস দৃশ্যত যার সনদ মুত্তাসিল।

কোনো তাবেয়ীর বর্ণিত মারফূ' হাদীসকে বলা হয় মুরসাল এবং তার চেয়ে নিম্নস্তরের কারো বর্ণিত মারফূ' হাদীস হবে মু'যাল বা মু'আল্লাক। (এগুলোকে মুসনাদ বলা যাবে না।)

আমার উক্তি 'দৃশ্যত যার সনদ মুত্তাসিল', সুতরা যার সনদ দৃশ্যত মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) সেটি এ সংজ্ঞা থেকে বাইরে থাকবে। তবে যদি মুত্তাসিল হবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলেও সেটি এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর বক্তৃত মুত্তাসিল হলে তো ভালোভাবেই তাকে মুসনাদ বলা যাবে।

'দৃশ্যত' কথাটি যোগ করার ফলে অনুমিত হয় যে, যেখানে প্রচ্ছন্ন বিচ্ছিন্নতা থাকে, যেমন মুদাল্লিস ব্যক্তি ও যে সমসাময়িক ব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়নি এমন ব্যক্তিদের 'আনআন' হাদীস, তা মুসনাদ-এর আওতা বহির্ভূত হবে না। মুসনাদ হাদীসের সংকলনকারী ইমামগণ সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এখানে মুসনাদ-এর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো, তা হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, “মুসনাদ হলো সেই হাদীস যা কোনো মুহাদ্দিস এমন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন দৃশ্যত যার নিকট থেকে তিনি শুনেছেন, তেমনি উক্ত শায়খ বর্ণনা করেন নিজ শায়খ থেকে— এভাবে অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় সাহাবী থেকে এবং তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।” কিন্তু খতীব বাগদাদী বলেন, “মুসনাদ হলো মুত্তাসিল” সে অনুযায়ী কোনো মাওকুফ হাদীসও যদি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়, তাহলে তা-ও তার মতে মুসনাদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য তিনি বলেছেন, মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত মাওকুফ হাদীসকে খুব কমই মুসনাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইবনে আব্দুল বার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অভিনব মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘মুসনাদ হলো মারফু’। তিনি সনদের দিক উপেক্ষা করেছেন। সে মতে যে হাদীসের মতনটি মারফু’ অথচ সনদের দিক দিয়ে মুরসাল, মু’যাল বা মুনকাতি’- তার ক্ষেত্রেও এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অথচ এমনটি আর কেউ বলেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُسْنَدٌ -এর সংজ্ঞা: المُسْنَدُ শব্দটি অভিধানে مَسْنَدٌ মাসদার হতে مَفْعُول -এর সীগাহ। অর্থ- সনদিত, যার সনদ রয়েছে। উসুলুল হাদীসের পরিভাষায় المُسْنَد -এর সংজ্ঞায় মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. হাকিম ইবনে হাজার (র.) -এর অভিমত : তিনি মুসনাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করেছেন-

المُسْنَدُ هُوَ مَرْفُوعٌ صَحَابِيٌّ يَسْتَدِرُّ ظَاهِرَهُ الْإِتِّصَالُ.

অর্থাৎ কোনো সাহাবীর বর্ণিত এমন মারফু’ হাদীস দৃশ্যত যার সনদ মুত্তাসিল।

এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : এখানে مَرْفُوعٌ শব্দটি جَنْس বা ব্যাপক। অন্যান্য শর্তগুলো فَضْل তথা বিভাজন। ‘صَحَابِيٌّ’ এটা প্রথম শর্ত। এ শর্তারোপের কারণে তাবেয়ীর মারফু’ যাকে মুরসাল বলে এবং তাবয়ে-তাবেয়ীর মারফু’ যাকে মু’যাল বা মু’আল্লাক বলে, সব বাদ পড়েছে।

‘يَسْتَدِرُّ ظَاهِرَهُ الْإِتِّصَالُ’ এটা দ্বিতীয় শর্ত। এ শর্তারোপের কারণে প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে দৃশ্যত যার সনদ মুনকাতি’ বা বিচ্ছিন্ন। যেমন- মুরসালে জলী। অবশ্য যে হাদীসের সনদ দৃশ্যত মুত্তাসিল; কিন্তু মুনকাতি’ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যেমন মুরসালে খফী- সবই মুসনাদ হবে। সুতরাং যে হাদীস বাস্তবে মুত্তাসিল তা অবশ্যই মুসনাদ হবে।

إِتِّصَالُ -কে ظَاهِرٌ বা দৃশ্যত -এর সাথে শর্তারোপ করার কারণে জানা যায় যে, যার بَاطِنٌ তথা যা প্রচ্ছন্নভাবে ইনকিতায়ে খফী হয় যেমন- মুদাল্লিসের হাদীসে মুআনআন এবং সমসাময়িকের হাদীসে মুআনআন, যার সাক্ষাৎ তার শায়খের সাথে হয় না, তাকেও মুসনাদ বলে। কারণ, যে ইমামরা মুসনাদ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তারা সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের হাদীসও রেওয়ায়েত করেছেন।

২. হাকিমে মুত্তাদরাক -এর অভিমত : তিনি মুসনাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করেছেন-

المُسْنَدُ مَا رَوَاهُ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ مُتَّصِلًا إِلَى صَحَابِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ মুসনাদ হলো সেই হাদীস যা কোনো মুহাদ্দিস এমন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন দৃশ্যত যার নিকট থেকে তিনি শুনেছেন, তেমনি উক্ত শায়খ বর্ণনা করেন নিজ শায়খ থেকে— এভাবে অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় সাহাবী থেকে এবং তিনি নবী করীম ﷺ -থেকে বর্ণনা করেন।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞার ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, এ সংজ্ঞা ও পূর্ববর্তী সংজ্ঞার মাঝে মৌলিক কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং দৃশ্যত বিরোধ মাত্র। নতুবা উভয় সংজ্ঞার পরিণতি তথা সারকথা একই।

৩. খতীবী বাগদাদীর অভিমত : তিনি মুসনাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ— **الْمُسْنَدُ الْمُسْتَمِلُ**

অর্থাৎ 'মুসনাদ হলো মুত্তাসিল'। চাই তা মারফু' হোক কিংবা মাওকুফ হোক কিংবা মাকতূ'। অবশ্য মারফু' এ তুলনায় মাওকুফ এবং মাকতূ' -এর উপর 'মুসনাদ' -এর প্রয়োগ খুব কম হয়।

৪. আল্লামা ইবনু আদিল বার-এর অভিমত : এ ব্যাপারে তিনি এক অভিনব মত পোষণ করেছেন।

তিনি বলেন— **الْمُسْنَدُ الْمَرْفُوعُ** অর্থাৎ মুসনাদ হলো মারফু'।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন, ইবনে আব্দুল বার সনদের দিক উপেক্ষা করে এ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার সংজ্ঞা মতে যে হাদীসের মতনটি মারফু' অথচ সনদের দিক দিয়ে সেটি মুরসাল, মু'যাল বা মুনকাতি'- তার ক্ষেত্রেও এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। যেহেতু তিনি ছাড়া এমনটি আর কেউ বলেন না, সেজন্য হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞাটিকে 'অভিনব' আখ্যা দিয়েছেন।

মোটকথা **الْمُسْنَدُ** শব্দটির প্রয়োগ কখনো নির্দিষ্ট হাদীসের উপর হয়। যেমন, এভাবে বলা হয়— **هَذَا مُسْنَدٌ** অর্থাৎ 'এটি মুসনাদ হাদীস'। আবার কখনো শব্দটি বিশেষ কিতাব বুঝাতেও ব্যবহার হয়, যাতে এক সাহাবীর সকল রেওয়ায়েত জমা করা হয় অথবা কয়েকজন সাহাবীর সমস্ত হাদীস পৃথক পৃথকভাবে জমা করা হয়। যেমন— মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা ইত্যাদি।

তাদরীব গ্রন্থে আছে যে, মুসনাদ দ্বারা কখনো ইসনাদও উদ্দেশ্য হয়। যেমন— বলা হয় **مُسْنَدُ الصَّهَابِ**।
مُسْنَدُ الْفِرْدَوْسِ ইত্যাদি।

فَإِنْ قُلَّ عَدَدُهُ أَوْ عَدَدُ رَجَالِ السَّنَدِ فِيمَا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ آخَرَ يَرُدُّ بِهِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِعَدَدٍ كَثِيرٍ أَوْ يَنْتَهِيَ إِلَى إِمَامٍ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ ذِي صِفَةٍ عُلِّيَّةٍ كَالْحِفْظِ وَالْفَقْهِ وَالضَّبْطِ وَالتَّصْنِيفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الْمُفْتَضِلَةِ لِلتَّرْجِيحِ كَشُعْبَةِ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ خَالٍ وَمُسْلِمٍ وَنَحْوِهِمْ فَلَا أَوْلَ وَهُوَ مَا يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوُّ الْمَطْلُوقُ فَإِنْ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ صَحِيحًا كَانَ الْغَايَةُ الْقَضْوَى وَالْأَفْضَلُ فَصُورَةُ الْعُلُوِّ فِيهِ مَوْجُودَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا فَهُوَ كَالْعَدَمِ .

অনুবাদ : যদি একই হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং কোনো একটি সনদে মাধ্যম সংখ্যা কম থাকে, তাহলে তাকে বলে সনদে আলী বা উচ্চ সনদ। আর যে সনদে তুলনামূলকভাবে অধিক মাধ্যম তার নাম সনদে সাফিল বা নিম্ন সনদ।

উচ্চ সনদ দু প্রকার। যদি নবী করীম ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে সনদের মধ্যে ব্যক্তি সংখ্যা কম হয়, তাহলে তার নাম আলীয়ে মুতলাক বা সাধারণ উচ্চ। আর যদি হাদীসের ইমামগণের কোনো একজন যিনি মেধা, ফিকহ, জ্ঞান, আয়ত্তশক্তি, লেখনি ইত্যাদি প্রাধান্য প্রদায়ক উচ্চগুণের অধিকারী যেমন- শুবা (র.), ইমাম মালিক (র.), সুফিয়ান ছাওরী (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.) প্রমুখ-সে পর্যন্ত পৌছতে এরূপ কম সংখ্যক ব্যক্তির মাধ্যম থাকে, তাহলে তার নাম আলীয়ে নিসবী বা আপেক্ষিক উচ্চ।

সাধারণ উচ্চ সনদের সাথে সাথে যদি সেটি সহীহও হয়, তাহলে তা হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উচ্চ। আর যদি তা না হয়, তাহলে যতক্ষণ তা মাওযু' না হয়, ততক্ষণ এ উচ্চতা বিবেচ্য হবে। মাওযু' হলে উচ্চতার কোনো মূল্য নেই। কেননা, সেটি তো হাদীসই নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

‘সনদ’ উষ্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য : নবী করীম ﷺ পর্যন্ত সনদে মুত্তাসিল বা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরা এ উষ্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মহানবী ﷺ -এর সকল হাদীস সনদ পরম্পরায় আমাদের কাছে সংরক্ষিত। এটি দীন হেফাজতের অন্যতম মাধ্যম। এর মাধ্যমে দীনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে হাতিম বলেন, ইসনাদের মাধ্যমে উষ্মতকে সম্মানিত করা হয়েছে। অন্য কোনো উষ্মত এ সনদ লাভ করেনি; বরং তাদের কাছে সহীফা এসেছে মাত্র; যা তারা নিজেদের কথার সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। যার ফলে বর্তমানে এটা নির্ণয় অসম্ভব হয়ে গেছে যে, কোনটি আসমানী গ্রন্থ-তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল- আর কোনটি তাদের নিজেদের উক্তি।

সনদের গুরুত্ব ও মর্যাদা : সনদের গুরুত্ব অপরিমীম। প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরামের কণ্ঠেই তা স্বীকৃত হয়েছে। যেমন-

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.)-এর উক্তি : প্রখ্যাত এ মুহাদ্দিস বলেন-

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ .

অর্থাৎ সনদ দীনের অংশ। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তা বলত।

২. হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর উক্তি : তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন-

الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

অর্থাৎ সনদে মুত্তাসিল মু'মিনের হাতিয়ার।

হাতিয়ার না থাকলে যেমন যুদ্ধ করা যায় না, তেমনি সনদ না থাকলে দীনকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ইসনাদের হুকুম : عُلُوٌّ سَنَدٌ তথা উচ্চ সনদের গুরুত্ব বর্ণনায্যে। এটি দীনের একটি প্রয়োজনীয় দিক। উচ্চ সনদ অর্জন করা দীনের ঈজিত বিষয় এবং একান্ত কাম্য। সনদের হুকুম সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত নিম্নরূপ।

১. হাকিমে মুত্তাদরাক বলেন : طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ

অর্থাৎ উচ্চ সনদ অর্জন করা দীনের প্রাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন : উচ্চ সনদ অর্জন করা পূর্বসূরি অনুসরণীয় ওলামায়ে কেরামের নীতি ও আদর্শ।

এ উক্তিসমূহের আলোকে বলা যায়, ইসনাদ হলো সুনতে মুয়াক্কাদা; বরং ফরজে কেফায়া।

الْعُلُوُّ وَ النُّزُولُ -এর সংজ্ঞা : এ দুটি সনদের সীফাত। নিম্নে এদের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

عَالِيٌّ হলো إِسْمٌ فَاعِلٌ থেকে الْعُلُوُّ। উচ্চতা, উচ্চ মর্যাদা, মহত্ত্ব।

الْعُلُوُّ عِبَارَةٌ عَنْ قِلَّةِ رِجَالِ السَّنَدِ -এর সংজ্ঞা হলো- الْعُلُوُّ

অর্থাৎ সনদের রিজাল অর্থাৎ সনদের মাঝে وَاسِطَةٌ (মাধ্যম) কম হওয়া।

النَّازِلُ হলো إِسْمٌ فَاعِلٌ থেকে النُّزُولُ। অবতরণ, আগমন, পতন, হ্রাস ইত্যাদি।

النُّزُولُ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ رِجَالِ السَّنَدِ -এর সংজ্ঞা হলো- النُّزُولُ

অর্থাৎ সনদের মাঝে وَاسِطَةٌ বেশি হওয়া অর্থাৎ সনদের রিজালের সংখ্যা বেশি হওয়া।

এ পরিভাষার প্রয়োগ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম একই হাদীসের দুটি সনদের মাঝে وَاسِطَةٌ কমবেশি হলে الْعُلُوُّ ও النُّزُولُ পরিভাষা ব্যবহার করেন। ভিন্ন ভিন্ন দুই হাদীসের সনদের মাঝে وَاسِطَةٌ কমবেশি হলে এ পরিভাষা ব্যবহার করেন না।

সনদের প্রকারভেদ : রাবীর সংখ্যার স্বল্পতা ও বৃদ্ধির দিক দিয়ে সনদ দু প্রকার। ১. সনদে আলী ও ২. সনদে নাযিল। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হলো-

১. السَّنَدُ الْعَالِي : একই হাদীসের যে সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয়, তাকে السَّنَدُ الْعَالِي বা উচ্চ সনদ বলে।

২. السَّنَدُ النَّازِل : আর যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি থাকে, তাকে السَّنَدُ النَّازِل বা নিম্ন সনদ বলে।

রাবীর সংখ্যার কমবেশির দিক দিয়ে হাদীসও তেমনভাবে দু প্রকার। ১. আলী ও ২. নাযিল। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. حَدِيثٌ عَالِي -এর সংজ্ঞা : যে হাদীসের সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয়, তাকে حَدِيثٌ عَالِي বলে।

২. حَدِيثٌ نَازِل -এর সংজ্ঞা : আর যে হাদীসের সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি হয়, তাকে حَدِيثٌ نَازِل বলে।

مُطْلَقُ ও نَسِيئُ -এর পুনঃ প্রকরণ : اَلْعُلُوُّ এবং اَلنُّزُولُ উভয়টি আবার দু প্রকার। مُطْلَقُ ও نَسِيئُ। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. مُطْلَقُ -এর সংজ্ঞা : রাবীর কমবেশি হওয়াটা যদি প্রথম রাবী হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত হিসেবে হয়, তাহলে তাকে مُطْلَقُ বলে।

২. نَسِيئُ -এর সংজ্ঞা : রাবীর কমবেশি হওয়াটা যদি প্রথম রাবী হতে কোনো নিদৃষ্ট ইমামুল মুহাদ্দিস পর্যন্ত হিসেবে হয়, তাহলে তাকে نَسِيئُ বলে। সুতরাং عُلُوُّ এবং نُّزُولُ মোট ৪ প্রকার হলো। যথা-

১. اَلْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয় এবং এই কম হওয়াটা প্রথম রাবী হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ বলে।

২. اَلْعُلُوُّ النَّسِيئُ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয় এবং এই কম হওয়াটা প্রথম রাবী হতে নিদৃষ্ট ইমামুল মুহাদ্দিস পর্যন্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلْعُلُوُّ النَّسِيئُ বলে।

৩. اَلنُّزُولُ الْمُطْلَقُ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি হয় এবং এই বেশি হওয়াটা প্রথম রাবী হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلنُّزُولُ الْمُطْلَقُ বলে।

৪. اَلنُّزُولُ النَّسِيئُ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি হয় এবং এই বেশি হওয়াটা প্রথম রাবী হতে নিদৃষ্ট কোনো ইমামুল মুহাদ্দিস পর্যন্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلنُّزُولُ النَّسِيئُ বলে।

عُلُوُّ مُطْلَقُ ও نُّزُولُ مُطْلَقُ -এর উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস দুই সনদে বর্ণিত। উভয় সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছে। এক সনদে রাবীর সংখ্যা ছয়, আর অপর সনদে রাবীর সংখ্যা সাত। তাহলে ছয় রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে عُلُوُّ مُطْلَقُ আর সাত রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে نُّزُولُ مُطْلَقُ।

نُّزُولُ نَسِيئُ ও عُلُوُّ نَسِيئُ -এর উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস দুই সনদে বর্ণিত। উভয় সনদ ইমাম বুখারী (র.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছে; কিন্তু একটি সনদে রাবীর সংখ্যা ছয় আর অপর সনদে রাবীর সংখ্যা সাত। তাহলে ছয় রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে عُلُوُّ نَسِيئُ আর সাত রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে نُّزُولُ نَسِيئُ।

عُلُوُّ سَنَدُ -এর হুকুম : عُلُوُّ سَنَدُ -এর দ্বারা সনদের মান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোনো হাদীসের সনদ উচ্চ হওয়ার সাথে সাথে যদি সহীহও হয়, তাহলে হাদীসটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। আর যদি হাদীসটি সহীহ না হয়, তাহলে আলী সনদের কারণে সেটিও মর্যাদাবিশিষ্ট হয়। তবে শর্ত হলো, হাদীসটি মাওযু' বা জাল, অপর মতে যাঈফ না হওয়া চাই।

وَالثَّانِي الْعُلُوُّ النَّسَبِيُّ وَهُوَ مَا يَقُلُّ الْعَدَدُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ الْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ
الْعَدَدُ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ إِلَى مُنْتَهَاهُ كَثِيرًا وَقَدْ عَظُمَتْ رُغْبَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ
فِيهِ حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ بِحَيْثُ أَهْمَلُوا الْإِسْتِغَالَ بِمَا هُوَ
أَهَمُّ مِنْهُ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الْعُلُوُّ مَرْغُوبًا فِيهِ لِكُونِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَّةِ
وَقَلَّتِ الْخَطَا لِأَنَّهُ مَا مِنْ رَأْيٍ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ إِلَّا وَالْخَطَا جَائِزٌ عَلَيْهِ
فَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ كَثُرَتْ مَظَانُ التَّجْوِيزِ وَكُلَّمَا قَلَّتْ
قَلَّتْ فَإِنْ كَانَ فِي التَّنْزِيلِ مَزِيَّةٌ لَبَسَتْ فِي الْعُلُوِّ كَانَ يَكُونُ رِجَالُهُ أَوْثَقَ
مِنْهُ أَوْ أَحْفَظَ أَوْ أَفْقَهُ أَوْ الْإِتِّصَالُ فِيهِ أَظْهَرَ فَلَا تَرَدُّدٌ فِي أَنَّ التَّنْزِيلَ حِ
أَوَّلَى وَأَمَّا مَنْ رَجَعَ التَّنْزِيلُ مُطْلَقًا وَاحْتِجَّ بِأَنَّ كَثْرَةَ الْبَحْثِ يَفْتَضِي
الْمُشَقَّةَ فَيَعْظُمُ الْأَجْرُ فَذَلِكَ تَرْجِيحٌ بِأَمْرِ أَجْنَبِيٍّ عَمَّا يَتَعَلَّقُ
بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ .

অনুবাদ : আর দ্বিতীয়টি হলো **عُلُوُّ نَسَبِيٍّ**। আর তা হলো, যে সনদে ইমাম পর্যন্ত রাবীর সংখ্যা কম হয়। যদিও ঐ ইমামের পর হতে শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ রাসূল পর্যন্ত) রাবীর সংখ্যা বেশি হয়। পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে উচ্চ সনদ সংগ্রহের দারুণ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অনেকেই এতে এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছেন যে, এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গোণ হয়ে গেছে। উচ্চ সনদ সংগ্রহের প্রতি উৎসাহিত হবার কারণ হলো, তাতে শুদ্ধতার সম্ভাবনা অধিক আর ভুলের সম্ভাবনা কম। কেননা, সনদভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যে কোনো রাবীর ক্ষেত্রেই ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মাধ্যম যতই বেশি হবে এবং সনদ (যত) দীর্ঘ হবে, ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা ততই বাড়বে। পক্ষান্তরে মাধ্যম যতই কম হবে, ভুলের সম্ভাবনাও ততই কমে যাবে। অবশ্য নিম্ন সনদে যদি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে যা উচ্চ সনদে নেই, যেমন- নিম্ন সনদের ব্যক্তির তুলনামূলক অধিক নির্ভরযোগ্য, অধিক স্মৃতিধর, অধিক ফিকহজ্ঞানসম্পন্ন হন কিংবা তাতে ইত্তিসালের (নিরবচ্ছিন্নতার) দিকটি অধিক স্পষ্ট হয়, তাহলে উচ্চ সনদই যে প্রাধান্য পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেই নিম্ন সনদকে নির্বিচারে প্রাধান্য দিয়েছেন এই যুক্তিতে যে, অধিক ব্যক্তির নাম চর্চায় পরিশ্রম বেশি হয়, সুতরাং তাতে ছওয়াবও বেশি হবে। প্রাধান্য প্রদানের এ যুক্তি হাদীসকে শুদ্ধ কিংবা দুর্বল সাব্যস্ত করার সাথে সম্পর্কিত বিষয় থেকে ভিন্ন বা অভিন্ন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোন সনদ উত্তম ? সাধারণভাবে **السُّنَدُ الْعَالِي** -ই উত্তম। তবে তার মাঝে যদি এমন কোনো রাবী থাকেন যিনি দুর্বল কিংবা মিথ্যাবাদী কিংবা মিথ্যার সাথে সন্দেহপরায়ণ অথবা অন্য কোনো অভিযোগের

কারণ তার মাঝে পাওয়া যায় অথচ **السُّنْدُ النَّزُولُ** -এর মাঝে এ ধরনের কোনো রাবী নেই এবং তা অন্য সকল দোষ থেকে মুক্ত, তার রাবীগণ অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভরযোগ্য, স্থিতিধর এবং তার সনদের ধারাবাহিক হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট, সেক্ষেত্রে **السُّنْدُ النَّازِلُ** -ই উত্তম হবে।

السُّنْدُ الْعَالِي কেন উত্তম? আল্লামা ইবনুস সালাহ (র.) বলেন, **السُّنْدُ النَّازِلُ** -এর মাঝে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ, সনদের প্রত্যেক রাবীর ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা আছে যে, তার কারণে হাদীসের মাঝে ভুল সৃষ্টি হবে। যদি রাবীর সংখ্যা কম হয়, তবে এই ত্রুটির সম্ভাবনাও কম হবে।

السُّنْدُ الْعَالِي -এর প্রতি আগ্রহ : মুতাআখখিরীন হাদীস চর্চাকারীদের মাঝে **السُّنْدُ الْعَالِي** -এর ব্যাপারে আগ্রহ বেশি। তাতে শুদ্ধতার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। সনদে আলীতে মুতাআখখিরীন হাদীস চর্চাকারীগণ গৌরববোধ করেন।

سُنْدُ نَزُول -কে প্রাধান্য দান : সাধারণত যদিও উচ্চ সনদই উত্তম এবং এটাই জমহুরের অভিমত, কিন্তু ইবনে খাল্লাদ কতিপয় আহলে নয়র থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তারা **سُنْدُ عَلُو** -এর পরিবর্তে **سُنْدُ نَزُول** -কেই প্রাধান্য দান করে থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো, **سُنْدُ نَزُول** -এ রাবীর সংখ্যা বেশি হয়। যার ফলে তাদের রাবীদের অবস্থা যাচাই করতে কষ্ট ও মেহনত বেশি হয়। আর যাতে কষ্ট বেশি হয়, তাতে ছওয়াব বেশি হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- **أَجْرُكُمْ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكُمْ** অর্থাৎ প্রতিদান দেওয়া হবে মেহনত অনুপাতে।

সুতরাং **سُنْدُ عَلُو** -এর তুলনায় **سُنْدُ نَزُول** -এ যেহেতু ছওয়াব বেশি হয়, তাই সেটিই প্রাধান্য পাবে। দলিলের জবাব : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) এ পক্ষের দলিলের জবাবে বলেন যে, হাদীসের আসল সম্পর্ক হচ্ছে বিশ্বুদ্ধ ও দুর্বলতার সাথে; ছওয়াব ও প্রতিদানের সাথে নয়। এজন্য বেশি ছওয়াবের ভিত্তিতে **سُنْدُ نَزُول** -কে প্রাধান্য দেওয়াটা হবে হাদীসের বহির্গত বিষয় দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া; আর এর কোনো ধর্তব্য নেই। এ কারণে ইবনুস সালাহ (র.) এ মাযহাবের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- **هُوَ مَذْهَبُ ضَعِيفِ الْعُجَّةِ** অর্থাৎ এটা এমন মাযহাব যার ভিত্তি নড়বড়ে।

وَفِيهِ أَيْ فِي الْعُلُوِّ النَّسَبِيِّ الْمُوَافَقَةُ وَهِيَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخٍ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ أَيْ الظَّرِيقَةِ الَّتِي تَصِلُ إِلَى ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ الْمُعَيَّنِ مِثَالُهُ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ حَدِيثًا فَلَوْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ ثَمَانِيَةٌ وَلَوْ رَوَيْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَيْبَةَ مِثْلًا لَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ فِيهِ سَبْعَةٌ فَقَدْ حَصَلَتِ الْمُوَافَقَةُ مَعَ الْبُخَارِيِّ فِي شَيْخِهِ بِعَيْنِهِ مَعَ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ عَلَى الْإِسْنَادِ إِلَيْهِ.

অনুবাদ : সনদ কয়েক প্রকার। এক নম্বর মুওয়াফাকা। অর্থাৎ হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের কোনো একটির লেখকের শায়খ পর্যন্ত উক্ত লেখকের মাধ্যম ছাড়াই পৌছানো। যেমন—ইমাম বুখারী (র.) তাঁর কিতাবে কুতায়বার মাধ্যমে ইমাম মালিক (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি (ইবনে হাজার) যদি ইমাম বুখারীর সূত্রে এটি বর্ণনা করি, তাহলে আমার ও কুতাইবার মাঝখানে মাধ্যম হবে আটজন। কিন্তু ঠিক এই হাদীসটি যদি আমি আবুল আক্বাস সাররাজের সূত্রে কুতাইবা থেকে বর্ণনা করি, তাহলে মাধ্যম হবে সাতজন। এখানে ইমাম বুখারীর সাথে তাঁর শায়খের বেলায় আমার মিল আছে। সাথে সাথে তাঁর পর্যন্ত আমার পৌছনের সনদ উচ্চ। এরই নাম মুওয়াফাকা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৪. ও الْكُسَاوَا ۃ. الْبَدَلُ ۲. الْمُوَافَقَةُ ۱. এর প্রকার : এটা মোট ৪ প্রকার। -عُلُوُّ نِسْبَةٍ الْمُصَنِّعَةِ। নিম্নে ৪ প্রকারের আলোচনা করা হলো।

-এর আভিধানিক অর্থ : الْمُوَافَقَةُ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অর্থ—অনুরূপ হওয়া, একমত হওয়া।

-এর পারিভাষিক অর্থ : উসুলুল হাদীসের পরিভাষায় الْمُوَافَقَةُ হলো -

وَمَوْأَنَ يَصِلُ الرَّاَوِيُّ إِلَى شَيْخٍ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ كَالْبُخَارِيِّ مِثْلًا مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ مَعَ عُلُوِّ إِسْنَادِهِ عَلَى إِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ .

অর্থাৎ হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের কোনো একটির লেখকদের শায়খ পর্যন্ত উক্ত লেখকদের মাধ্যম ছাড়াই পৌছানো। তবে শর্ত হলো, লেখকের মাধ্যমে তার শায়খ পর্যন্ত পৌছতে যত মাধ্যম লাগত তা অপেক্ষা কম মাধ্যম হতে হবে। অর্থাৎ সনদ عَالِي হতে হবে।

-এর উদাহরণ : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর শায়খ কুতাইবার সূত্রে ইমাম মালিক (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে হাজার (র.) বলেন, আমি যদি ঐ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) -এর সূত্রে বর্ণনা করি, তাহলে আমার ও কুতাইবার মাঝখানে মাধ্যম হবে আটজন। কিন্তু ঠিক এই হাদীসটি যদি আমি আবুল আক্বাস সাররাজের সূত্রে কুতাইবা হতে বর্ণনা করি, তাহলে মাধ্যম হবে সাতজন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর সাথে আমার مُوَافَقَةٌ আছে। কেননা, তিনিও কুতাইবা থেকে রেওয়ায়েত করেন, আমিও কুতাইবা হতে রেওয়ায়েত করি। সাথে সাথে আমার সনদ عَالِي তথা উচ্চ। কারণ, এতে মাধ্যম কম।

وَفِيهِ أَيْ الْعُلُوِّ النَّسْبِيَّ الْبَدَلَ وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخٍ شَبِيحِهِ كَذَلِكَ كَانَ يَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الْإِسْنَادُ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إِلَى الْقَتَنِبِيِّ عَنْ مَالِكٍ فَيَكُونُ الْقَتَنِبِيُّ بَدَلًا فِيهِ مِنْ قُتَيْبَةَ وَأَكْثَرُ مَا يَغْتَبِرُونَ الْمُوَافَقَةَ وَالْبَدَلَ إِذَا قَارَنَا الْعُلُوَّ وَلَا فَاسِمُ الْمُوَافَقَةِ وَالْبَدَلَ وَقَعَ بِذَوْنِهِ.

অনুবাদ : -এর আরেক প্রকারের নাম বদল। এর অর্থ সিহাহ সিত্তার কোনো একটির লেখকের শিক্ষকের শিক্ষক পর্যন্ত তার মাধ্যম ব্যতীত পৌছানো পূর্ববর্তীটির ন্যায়। যেমন- আমি (ইবনে হাজার) যদি কা'নাবীর মাধ্যমে ইমাম মালিক পর্যন্ত অন্য সনদ পরম্পরায় (ইমাম বুখারীর মাধ্যম ব্যতীত) পৌছতে পারি, তাহলে তাকে বলা হবে বদল। এখানে কুতাইবার স্থানে এসেছে কা'নাবী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কেরাম উচ্চতার দিক তুলনা করেই 'মুওয়াফাকা' ও 'বদল' সাব্যস্ত করেন। যদিও নাম হিসেবে এ দুটি শব্দ উচ্চতা ছাড়াই প্রযোজ্য হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْبَدْلُ -এর আভিধানিক অর্থ : الْبَدْلُ শব্দটি মাসদার। অর্থ- বদল করা, পরিবর্তন করা।

الْبَدْلُ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় بَدَلَ বলা হয়-

وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخٍ شَبِيحٍ أَحَدِ الْمُصَنِّفَيْنِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ مَعَ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ عَلَى الْإِسْنَادِ الْإِبْنِ - অর্থাৎ হাদীসের প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থের লেখকের শায়খের শায়খ পর্যন্ত উক্ত লেখকের মাধ্যম ছাড়া পৌছ। শর্ত হলো, উক্ত লেখকের মাধ্যমসহ পৌছলে যত মাধ্যম লাগত তার চেয়ে কম মাধ্যম হতে হবে। অর্থাৎ সনদ عَالِي হতে হবে।

الْبَدْلُ -এর উদাহরণ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, পূর্বের (মুওয়াফাকা -এর) উদাহরণে উল্লিখিত হাদীসটি (উদাহরণস্বরূপ) যদি আমি ইমাম বুখারীর মাধ্যমসহ বর্ণনা করি, তাহলে মোট মাধ্যম হবে নয়জন। আর যদি ইমাম বুখারীর মাধ্যম ছাড়া অন্য কারো সনদে কা'নাবীর সূত্রে ইমাম বুখারীর শায়খের শায়খ ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করি, তাহলে মাধ্যম হবে আটজন। এক্ষেত্রে কা'নাবী হবে কুতাইবার বদল। সাথে সাথে কা'নাবীর সনদটি عَالِي।

الْمُوَافَقَةُ ও الْبَدْلُ -এর মধ্যে পার্থক্য : الْمُوَافَقَةُ -এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই বললেই চলে। তবে একটি স্থানে একটু ব্যতিক্রম। আর তা হলো, الْمُوَافَقَةُ -এর মধ্যে দ্বিতীয় সনদটি লেখকের শায়খ পর্যন্ত গিয়ে মিলে, আর الْبَدْلُ -এর মধ্যে লেখকের শায়খের শায়খ পর্যন্ত গিয়ে মিলে।

وَفِيهِ أَىٰ فِي الْعُلُوِّ النَّسَبِيِّ الْمُسَاوَاةُ وَهِيَ اسْتَوَاءُ عَدَدِ الْإِسْنَادِ مِنْ الرَّاَوِي إِلَىٰ آخِرِهِ أَىٰ إِسْنَادِ الْعُلُوِّ النَّسَبِيِّ مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ كَانَ يَرَوِي النَّسَائِيُّ مَثَلًا حَدِيثًا يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَحَدٌ عَشَرَ نَفْسًا فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقَعُ بَيْنَنَا فِيهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ عَشَرَ نَفْسًا فَتَسَاوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُلَاحَظَةِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ الْخَاصِّ.

অনুবাদ : **عُلُوْنَسَبِي** -এর তৃতীয় প্রকারের নাম মুসাওয়াত বা সমতা। এর অর্থ, কোনো সনদের মাধ্যম সংখ্যা রাবী থেকে শেষ পর্যন্ত সিহাহ সিত্তার কোনো লেখকের সনদের সমান হওয়া। যেমন- ইমাম নাসায়ী (র.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তার থেকে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত এগারজন ব্যক্তি রয়েছে। আমি (ইবনে হাজার) ঠিক সেই হাদীসটি অপর এক সনদে বর্ণনা করি। তাতেও আমা হতে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত এগারজন ব্যক্তি রয়েছে। সুতরাং সংখ্যার দিক দিয়ে আমার ও ইমাম নাসায়ী (র.)-এর মধ্যে সমতা রয়েছে। এরই নাম মুসাওয়াত। অবশ্য ইমাম নাসায়ী (র.)-এর সনদে যদি কোনো বিশেষত্ব থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। সেটি আমাদের লক্ষণীয় বিষয় নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُسَاوَاةُ -এর আভিধানিক অর্থ : **بَابُ مَفَاعَلَةٍ اَلْمُسَاوَاةُ** -এর মাসদার। অর্থ- সমতা, সমান-সমান হওয়া ইত্যাদি।

اَلْمُسَاوَاةُ -এর পারিভাষিক অর্থ : উসুল হাদীসের পরিভাষায় **اَلْمُسَاوَاةُ** হলো-

وَهِيَ اَنْ يَسْتَوِيَ عَدَدُ رِجَالِ سَنَدِ الرَّاَوِي مَعَ سَنَدِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ .

অর্থাৎ হাদীস সংকলনকারী কোনো মুহাদ্দিস (যেমন- ইমাম নাসায়ী) একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত মোট মাধ্যম যত জন, ঠিক ঐ হাদীসটি যদি অন্য কোনো রাবী তত মাধ্যমে রেওয়ায়েত করেন, তবে তাকে **اَلْمُسَاوَاةُ** বলে।

اَلْمُسَاوَاةُ -এর উদাহরণ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, ইমাম নাসায়ী (র.) নিম্নোক্ত হাদীসটি **كِتَابُ الصَّلَاةِ** -এ মোট দশ মাধ্যমে রেওয়ায়েত করেন।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعَدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ .

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, আমিও এ হাদীসটি মোট দশ মাধ্যমে রেওয়ায়েত করি। সুতরাং মোট মাধ্যমের ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী (র.) -এর সাথে আমার **مُسَاوَاة** তথা সমতা রয়েছে।

اَلْمُسَاوَاةُ **اَلْمُسَاوَاةُ** টা **عُلُوْمُ مَطْلُق** এবং **عُلُوْنَسَبِي** উভয়ের মাঝে পাওয়া যাওয়া সম্ভব। এ হিসেবে **اَلْمُسَاوَاةُ** টা যেমনিভাবে **عُلُوْنَسَبِي** -এর প্রকার, তেমনিভাবে **عُلُوْمُ مَطْلُق** -এরও প্রকার। আর পূর্বে **اَلْمُسَاوَاةُ** ও **اَلْعِلْد** -এর যে উদাহরণ অভিহিত হয়েছে তা **عُلُوْمُ مَطْلُق** -এরই। তাই **عُلُوْنَسَبِي** -এর প্রকার উল্লেখ করে তার উদাহরণ হিসেবে তা উল্লেখ করাটা লেখকের একপ্রকার ভুল। [রাওয়াতুল আছর : ১০২]

وَفِيهِ أَى الْعُلُوِّ النَّسْبِيَّ أَيْضًا الْمَصَافَحَةُ وَهِيَ الْإِسْتِوَاءُ مَعَ تَلْمِيزِ ذَلِكَ
الْمُصَنَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَوَّلًا وَسُوِّبَتِ الْمَصَافَحَةُ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ
فِي الْغَالِبِ بِالْمَصَافَحَةِ بَيْنَ مَنْ تَلَاكَبَا وَنَحْنُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَأَنَّا
لَقَيْنَا النَّسَائِيَّ فَكَأَنَّا صَافَحْنَاهُ وَيُقَابِلُ الْعُلُوُّ بِأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ
النُّزُولِ فَيَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ يُقَابِلُهُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ
خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُلُوَّ قَدْ يَقَعُ غَيْرَ تَابِعِ النُّزُولِ.

অনুবাদ : عُلوٌّ نِسْبِيٌّ : -এর চতুর্থ প্রকার মুসাফাহা। এর অর্থ, উক্ত লেখকের কোনো ছাত্রের সাথে সমতা থাকা। এরূপ নামকরণের কারণ হলো, সাক্ষাৎ হলে সাধারণত মুসাফাহা করা হয়ে থাকে। আমি (ইবনে হাজার) যেন ইমাম নাসায়ী (র.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং তাঁর সাথে মুসাফাহা করেছি। উচ্চতার যেসব প্রকারের কথা উল্লেখ করা হলো, তার বিপরীতে রয়েছে নিম্নতার প্রকারসমূহ। উচ্চতার প্রতিটি প্রকারের বিপরীতে নিম্নতার একটি করে প্রকার রয়েছে। অনেকেই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, উচ্চতা অনেক সময় নিম্নতার অনুসারী হওয়া ছাড়াও সংঘটিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَابُ مَفَاعَلَةِ الْمَصَافَحَةِ : -এর আভিধানিক অর্থ : الْمَصَافَحَةُ শব্দটি الْمَفَاعَلَةُ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অর্থ- দুজনের সাক্ষাতে মুসাফাহা করা।

الْمَصَافَحَةُ -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় হলো-

وَهِيَ أَنْ يَسْتَوِيَ إِسْنَادُ الرَّأْيِ عَدَدًا مَعَ إِسْنَادِ تَلْمِيزِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ.

অর্থাৎ হাদীস সংকলনকারী কোনো মুহাদ্দিসের ছাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মোট যত মাধ্যমে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন ঠিক তত মাধ্যমে ঐ হাদীসটি অন্যকোনো রাবীর রেওয়ায়েত করাকে الْمَصَافَحَةُ বলে। মোট মাধ্যম সমানহেতু যেন রাবী ঐ ছাত্রের শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন।

فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّوِيُّ وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّوَاةِ
مِثْلَ السِّنِّ وَاللِّقَى وَهُوَ الْأَخْذُ عَنِ الْمَشَائِخِ فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ
رَوَايَةُ الْأَقْرَانِ لِأَنَّهُ جَ يَكُونُ رَاوِيًا عَنْ قَرِينِهِ وَإِنْ رَوَى كُلُّ مِنْهُمَا أَيْ
الْقَرِينَيْنِ عَنِ الْآخِرِ فَهُوَ الْمُدْبِجُ وَهُوَ أَخْصُ مِنَ الْأَوَّلِ فَكُلُّ مُدْبِجٍ أَقْرَانٌ
وَلَيْسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدْبِجًا وَقَدْ صَنَّفَ الدَّارُ قُطْنِي فِي ذَلِكَ وَصَنَّفَ أَبُو
الشَّيْخِ الْأَضْبَهَائِي فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تَلْمِيزِهِ صَدَقَ أَنَّ
كُلَّ مِنْهُمَا يَرَوِي عَنِ الْآخِرِ فَهَلْ يُسَمَّى مُدْبِجًا فِيهِ بَحْثٌ وَالظَّاهِرُ لَا
لِأَنَّهُ مِنْ رَوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ وَالتَّدْبِيجُ مَاخُودٌ مِنْ دِيبَاجَتِي الْوَجُو
فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْتَوِيًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يَجْنَى فِيهِ هَذَا .

অনুবাদ : রাবী এবং তিনি যার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে যদি রেওয়াজে সৎক্রান্ত কোনো বিষয়ে শরিক হন, যেমন- বয়স কিংবা কোনো শাযখ থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করায়, তাহলে এরূপ ব্যক্তির বর্ণনাকে বলা হয় রেওয়াজেতুল আকরান বা সাখিদের বর্ণনা। কেননা, এক্ষেত্রে একজন রাবী তার সাখি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

দুজন সাথি যদি প্রত্যেকেই একে অপরের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে এর নাম হয় মুদাব্বাজ। রেওয়াজেতুল আকরান হলো ব্যাপক আর এটা সীমিত। প্রতিটি মুদাব্বাজই আকরানের অন্তর্গত, কিন্তু সকল আকরান মুদাব্বাজ নয়। ইমাম দারাকুতনী (র.) এ সম্পর্কে একখানা কিতাব রচনা করেছেন। আর আবু শায়খ ইম্পাহানী রচনা করেছেন রেওয়াজেতুল আকরান সম্পর্কে।

শাখ্য যদি নিজ শিষ্য থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে একে অপর থেকে বর্ণনা করার অর্থ পাওয়া যায়। এটিকে মুদাৰ্বাজ বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে দৃশ্যত এরূপ বলা না যাওয়াই সঙ্গত। কেননা, সেটি হলো রেওয়ায়েতুল আকাবির আনিল আসাগির বা ছোটদের নিকট থেকে বড়দের বর্ণনা শ্রেণির অন্তর্গত।

মুদান্নরাজ শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে দিবাজা থেকে। যার অর্থ- মুখমণ্ডলের দুদিক। সুতরাং এখানে উভয় দিক সমান হওয়া প্রয়োজন। শিষ্য থেকে শায়খের বর্ণনা এ শ্রেণিতে পড়ে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَوَايَةُ ٨. رَوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ ٩. مُدْبَجٌ ١٠. رَوَايَةُ الْأَقْرَانِ ١١. کয়েক प्रकार । رَوَايَةُ حَدِيثِ الْأَكَابِرِ ١٢. رَوَايَةُ الْأَصَاغِرِ عَنِ الْأَكَابِرِ ١٣. নিমে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

قَرْنٌ -এর মাসদার। আর اقْرَأْ শব্দটি -এর আভিধানিক অর্থ : رَوَاةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- সাথি, বন্ধু, সহচর, সহপাঠী, জ্ঞান ও বিদ্যা বা বয়সে সমতুল্য ইত্যাদি।

হলো- رَوَايَةُ الْاَقْرَانِ -এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায়

هِيَ أَنْ بَرَّوْىَ قَرْنَيْنِ عَنْ قَرْنَيْنِهِمْ كَرَوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنِ الثُّبُمِيِّ .

অর্থাৎ কোনো সহপাঠী (তথা স্বীয় শায়খের ছাত্র) থেকে, কিংবা জ্ঞান-বিদ্যায় সমতুল্য অথবা সমবয়স্ক কোনো ব্যক্তি থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করাকে **رَوَايَةُ الْأَقْرَانِ** বলা হয়। যেমন- ইমাম আমাশ (র.) হযরত তায়মী (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

নামকরণ : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, **قَرَّرُ** শব্দটি **قَرْنٌ** এর বহুবচন আর **قَرْنٌ** অর্থ- সাথি। যেহেতু এখানে বর্ণনাকারী আর **مَرْوِي عَنْهُ** করীন বা সাথি হন সেহেতু একে **رَوَايَةُ الْأَقْرَانِ** তথা সাথি হতে সাথির রেওয়ায়েত বলে।

تَنْبِيْهُ মূলধাতু হতে **وَاحِدٌ مُّذَكَّرٌ** এর **إِسْمٌ مَّفْعُولٌ** **الْمُدَّبِّعُ** শব্দটি **الْمُدَّبِّعُ** এর আভিধানিক অর্থ : নির্গত। এর অর্থ- রঞ্জিতকরণ, সজ্জিতকরণ, অলঙ্করণ।

الْمُدَّبِّعُ এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় **مُدَّبِّعٌ** বলা হয়- **أَنْ يَّرْوِيَ الْقَرْنَانِ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ** অর্থাৎ দুই সহপাঠী বা সমবয়স্ক বা সমতুল্য ব্যক্তির প্রত্যেকেই অপর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করা।

الْمُدَّبِّعُ এর উদাহরণ : যেমন- হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) উভয়ে একে অপর হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম মালিক ও ইমাম আওয়াযী (র.) উভয়ে একে অপর হতে, ইমাম আহমদ ও ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (র.) উভয়ে একে অপর হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

رَوَايَةُ এবং **أَقْرَانِ** এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে **مُطْلَقٌ** এর নিসবত রয়েছে। **رَوَايَةُ** টা **عَامٌ** আর **مُدَّبِّعٌ** টা **خَاصٌّ**। কেননা, **مُدَّبِّعٌ** এর মধ্যে উভয় পক্ষ হতে রেওয়ায়েত হওয়া জরুরি। কিন্তু **رَوَايَةُ الْأَقْرَانِ** এর মধ্যে এটি শর্ত নয়; বরং যে কোনো একদিক হতে রেওয়ায়েত হলেই যথেষ্ট।

رَوَايَةُ الشَّيْخِ عَنِ التَّلْمِيزِ এটা **مُدَّبِّعٌ** এর অন্তর্গত কিনা? যদি শায়খ তার ছাত্র হতে রেওয়ায়েত করেন, যাকে পরিভাষায় **رَوَايَةُ الشَّيْخِ عَنِ التَّلْمِيزِ** বলে, তা **مُدَّبِّعٌ** হবে না; বরং এটা **رَوَايَةُ الْأَكْبَارِ** এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, **مُدَّبِّعٌ** হওয়ার জন্য **رَاوِي** এবং **مَرْوِي عَنْهُ** সমসাময়িক হওয়া শর্ত। আর আলোচ্য সূরতে ছাত্র শায়খের সমসাময়িক নয়।

الْمُدَّبِّعُ এর নামকরণ : **الْمُدَّبِّعُ** শব্দটি **الْمُدَّبِّعُ** মাসদার হতে গঠিত **مَفْعُولٌ** এর সীগাহ। **تَنْبِيْهُ** শব্দ উৎসারিত হয়েছে **وَيْبَاجَتِي الرَّجُلِ** হতে। এর অর্থ- মুখের দুই গাল। সূতরাং যেমনিভাবে দুই গাল একে অপরের বরাবর হয়, তেমনিভাবে **مُدَّبِّعٌ** এর মধ্যে **رَاوِي** এবং **مَرْوِي عَنْهُ** একে অপর হতে রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে বরাবর হয়। এজন্য একে **مُدَّبِّعٌ** করে নাম রাখা হয়েছে।

مُدَّبِّعٌ জানার ফায়দা : **مُدَّبِّعٌ** জানার ফায়দা দুটি। যথা-

১. এতে করে সনদে বৃদ্ধির ধারণা দূরীভূত হয়।

২. **حَدِيثٌ مُّعْتَمَدٌ** এর মধ্যে **عَنْ** কে **وَأَوْ** দ্বারা পরিবর্তন করা হতে নিরাপত্তা লাভ হয়।

وَلَنْ رَوَى الرَّابِىَ عَنْ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي السِّنِّ أَوْ فِي اللَّقَاءِ أَوْ فِي الْمِقْدَارِ فَهَذَا النَّوعُ وَهُوَ رَوَايَةُ الْأَكْبَارِ عَنِ الْأَصَاغِرِ وَمِنْهُ أَى مِنْ جُمْلَةِ هَذَا النَّوعِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ رَوَايَةُ الْأَبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ وَالصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ وَالشَّبَّاحِ عَنِ تَلْمِيزِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَفِي عَكْسِهِ كَثَرَةٌ لِأَنَّهُ هُوَ الْجَادَةُ الْمَسْلُوكَةُ الْغَالِبَةُ وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَرَاتِبِهِمْ وَتَنْزِيلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطِيبُ فِي رَوَايَةِ الْأَبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ تَصْنِيفًا وَأَفْرَدَ جُزْءًا لَطِيفًا فِي رَوَايَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ .

অনুবাদ : রাবী যদি এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি বয়স, শিক্ষাগ্রহণ কিংবা হাদীসের পরিমাণের দিক দিয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের, তাহলে তার নাম রেওয়ায়েতুল আকাবির আনিল আসাগির বা ছোটদের থেকে বড়দের বর্ণনা। এ শ্রেণির মধ্যে রয়েছে পুত্র থেকে পিতার, তাবেয়ী থেকে সাহাবীর, শিষ্য থেকে শায়খের বর্ণনা ইত্যাদি। তবে এর উল্টোটি অনেক ব্যাপক। কেননা, সেটিই অধিক প্রচলিত ও সঠিক পদ্ধতি।

এসব জানার উপকারিতা হলো, এর ফলে রাবীদের স্তরসমূহ পার্থক্য করা যাবে এবং লোকদেরকে যথাস্থানে রাখা যাবে। খতীবে বাগদাদী (র.) 'পুত্র হতে পিতার বর্ণনা' বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং 'তাবেয়ী থেকে সাহাবীর বর্ণনা' বিষয়ে চমৎকার একটি পুস্তিকা লেখেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَوَايَةُ الْأَكْبَارِ : এর আভিধানিক অর্থ : **أَكْبَرُ** শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ- বড়, বৃহত্তম। আর **أَصَاغِرُ** শব্দটি **أَصْغَرُ** এর বহুবচন। এর অর্থ- ছোট, ক্ষুদ্রতম। সুতরাং **رَوَايَةُ الْأَكْبَارِ عَنِ الْأَصَاغِرِ** এর অর্থ হচ্ছে- বড় ব্যক্তির ছোট ব্যক্তি হতে রেওয়ায়েত করা।

رَوَايَةُ الْأَكْبَارِ عَنِ الْأَصَاغِرِ : এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো-

هِيَ رَوَايَةُ الشَّخْصِ عَنْ دُونِهِ فِي السِّنِّ أَوْ فِي الْعِلْمِ أَوْ فِي الْجَفْرِ .

অর্থাৎ কোনো রাবীর তার চেয়ে বয়সে কিংবা ইলমে কিংবা হাদীস মুখস্তের দিক থেকে নিম্নের কারো সূত্রে হাদীস রেওয়ায়েত করা।

رَوَايَةُ الْأَكْبَارِ عَنِ الْأَصَاغِرِ : এর প্রকারভেদ : এটা কয়েক প্রকার। যথা-

১. **رَوَايَةُ (রাবী) عَنْهُ مَرْوُى** হতে বয়সে বড় হবে এবং মর্যাদায় উচ্চ হবে। যেমন - ইবনে শিহাব যুহরী এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাসিদ-এর রেওয়ায়েত ইমাম মালিক (র.) থেকে।

২. শুধু মর্যাদাগত তথা মুখস্থ ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে বড় হবে। যেমন- ইমাম মালিক (র.) -এর রেওয়ায়েত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে এবং ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত ইবনে মুসা থেকে।

৩. উভয় দিক দিয়ে বড় হবে। যেমন- উবাদালাহ -এর রেওয়ায়েত হযরত কা'ব (রা.) হতে।

رَوَايَةُ الصَّحَابَةِ عَنِ رَوَايَةِ الْأَبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ তথা পিতা কর্তৃক পুত্র হতে রেওয়ায়েত, رَوَايَةُ التَّابِعِينَ عَنِ الْأَتْبَاعِ তথা সাহাবী কর্তৃক তাবেয়ী হতে রেওয়ায়েত, رَوَايَةُ الشَّبَّاحِ عَنِ التَّلْمِيزِ তথা ওস্তাদ কর্তৃক ছাত্র হতে রেওয়ায়েত এই **رَوَايَةُ الْأَكْبَارِ عَنِ الْأَصَاغِرِ** -এর অন্তর্গত।

وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَجَمَعَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَامِيُّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مُجَلِّدًا كَبِيرًا فِي مَعْرِفَةِ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَقَسَّمَهُ اقْسَامًا فَمِنْهُ مَا يَعُودُ الضَّعِيفُ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَى الرَّاَوِي وَمِنْهُ مَا يَعُودُ الضَّعِيفُ فِيهِ عَلَى أَبِيهِ وَبَيَّنَّ ذَلِكَ وَحَقَّقَهُ وَخَرَجَ فِي كُلِّ تَرْجَمَةٍ حَدِيثًا مِنْ مَرْوِيهِ وَقَدْ لَحَّضْتُ كِتَابَهُ الْمَذْكُورَ وَزِدْتُ عَلَيْهِ تَرَاجِمَ كَثِيرَةً جِدًّا وَكَثُرَ مَا وَقَعَ فِيهِ مَا تَسَلَّسَلَتْ فِيهِ الرَّوَايَةُ عَنِ الْأَبَاءِ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَبًا .

অনুবাদ : আরেকটি ধরন হলো- যিনি পিতা থেকে, পিতা দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালের মনীষীদের মধ্যে হাফিজ সালাহুদ্দীন আলামী বিরাট এক গ্রন্থ রচনা করেছেন যাতে তিনি যারা নিজ পিতা থেকে, পিতা দাদা থেকে একপে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের নাম সংকলন করেছেন। তিনি আবার তাদের শ্রেণিবিভাগও করেছেন। এক প্রকার হলো, যেখানে দাদা বলতে বুঝায় প্রথম রাবীর দাদা। আরেক প্রকার হলো, যেখানে দাদা বলতে পিতার দাদা উদ্দেশ্য। তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন, প্রমাণিত করেছেন এবং প্রত্যেক নামের সাথে তার বর্ণিত একটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন। আমি (ইবনে হাজার) উক্ত কিতাবটির সারসংক্ষেপ করেছি এবং তাতে আরো অনেক নাম সংযুক্ত করেছি। পিতৃপুরুষদের থেকে ধারাবাহিক বর্ণনার সর্বোচ্চ সংখ্যা যা পাওয়া গেছে তা হলো, চৌদ্দজন পিতার ক্রমধারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَوَايَةُ الْأَصَاغِرِ عَنِ الْأَكْبَرِ -এর অর্থ : এর শাদিক অর্থ- বড়দের থেকে ছোটদের হাদীস রেওয়ায়েত করা। পরিভাষায় **رَوَايَةُ الْأَصَاغِرِ عَنِ الْأَكْبَرِ** হলো-

هِيَ رَوَايَةُ الشَّيْخِ عَنْ قَوْلِهِ فِي السِّنِّ أَوْ فِي الْعِلْمِ أَوِ الْحِفْظِ

অর্থাৎ কোনো রাবীর তার চেয়ে ইলমে, বয়সে এবং হাদীস মুখস্থের দিক থেকে বড় কারো থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করা।

হাদীস রেওয়ায়েতের এটাই সাধারণ নিয়ম। কেননা, সাধারণত ছোট বড় হতে রেওয়ায়েত করে থাকে।

رَوَايَةُ الْأَصَاغِرِ عَنِ الْأَكْبَرِ -এর অন্তর্গত। এটা আবার দু প্রকার। যথা-

১. যার মধ্যে **جَدِّهِ** -এর **ضَعِيفُ** (সর্বনাম) রাবীর দিকে ফেরে। যেমন-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২. যার মধ্যে **جَدِّهِ** -এর **ضَعِيفُ** (সর্বনাম) রাবীর পিতার দিকে ফেরে। যেমন-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ধারাবাহিকভাবে পিতৃপুরুষদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এমন ননদে পূর্বপুরুষদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৪ জন পাওয়া যায়।

وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَهُوَ السَّابِقُ
وَالْآخِرُ وَأَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيْنَ الرَّائِسَيْنِ فِيهِ فِي الْوَفَاةِ
مِائَةً وَخَمْسُونَ سَنَةً وَذَلِكَ أَنَّ الْحَافِظَ السَّلَفِيَّ سَمِعَ مِنْهُ أَبُو عَلَى
الْبَرْدَانِيُّ أَحَدُ مَشَائِخِهِ حَدِيثًا وَرَوَاهُ عَنْهُ وَمَاتَ عَلَى رَأْسِ خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ
كَانَ آخِرُ أَصْحَابِ السَّلَفِيَّ بِالسَّمَاعِ سَبْطُهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ
مَكِّيٍّ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ وَمِنْ قَدِيمِ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ
حَدَّثَ عَنْ تَلْمِيزِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجَ أَشْبَاءَ فِي التَّارِيخِ وَغَيْرِهِ وَمَاتَ
سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ السَّرَّاجِ بِالسَّمَاعِ أَبُو
الْحُسَيْنِ الْخَفَّاءُ وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَغَالِبُ مَا يَقَعُ
مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَسْمُوعَ مِنْهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الرَّائِسَيْنِ عَنْهُ زَمَانًا
حَتَّى يَسْمَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْأَحْدَاثِ وَيَعْيِشُ بَعْدَ السَّمَاعِ مِنْهُ دَهْرًا طَوِيلًا
فَيَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ نَحْوُ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَاللَّهُ الْمَوْقُوفُ .

অনুবাদ : দুজন রাবী যদি একজন শায়খ থেকে হাদীস সংগ্রহের দিক দিয়ে শরিক থাকেন এবং তাদের একজনের মৃত্যু অপরজনের চেয়ে পূর্বে হয়, তাহলে যিনি পূর্বে ইস্তেকাল করেন তাকে 'সাবিক' এবং পরে ইস্তেকালকারীকে 'লাহিক' বলা হয়। দুজন রাবীর মৃত্যুর মাঝখানে সর্বোচ্চ যে ব্যবধান জানা যায়, তা হলো দেড়শো বছর। হাফিজ সিলারী (র.) থেকে তাঁরই অন্যতম শায়খ আবু আলী বারদানী একটি হাদীস শুনেছিলেন এবং তার বরাত দিয়ে সেটি বর্ণনা করতেন। তিনি ইস্তেকাল করেন ৫০০ হিজরিতে। অতঃপর হাফিজ সিলারীর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন তার পৌত্র আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে মাক্কী। তিনি ইস্তেকাল করেন ৬৫০ হিজরিতে।

এর পূর্বেও একটি ঘটনা রয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর ছাত্র আবুল আক্বাস সারবাজ থেকে ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কিছুই বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র.) ইস্তেকাল করেছেন ২৫৬ হিজরিতে। এদিকে আবুল আক্বাস সারবাজ-এর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন আবুল হুসাইন খাফাফাফ। তিনি ইস্তেকাল করেছেন ৩৯৩ হিজরিতে। সুতরাং দুজনের মধ্যে ব্যবধান হয়েছে ১৩৭ বছরের। এটি এ কারণে হয়ে থাকে যে, অনেক সময় শায়খ তার ছাত্রদের কারো ইস্তেকালের পরেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। তখন শেষকালে হয়তো তার নিকট কোনো অল্পবয়সী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন এবং তার নিকট হাদীস শোনার পর দীর্ঘকাল জীবনযাপন করেন। ফলে সব মিলিয়ে এরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর - السَّابِقُ وَ الرَّائِسُ -এর আভিধানিক অর্থ : উভয় শব্দ -إِسْمُ تَعْلِيلٍ -এর -الْأَجْلُ -এর -السَّابِقُ ও -الْأَجْلُ -এর অর্থ - সাবিক, পূর্ববর্তী, অগ্রবর্তী, বিজয়ী। তার -الْأَجْلُ -এর অর্থ - যুক্ত, মিলিত, সম্পৃক্ত, পরবর্তী ইত্যাদি।

اَللَّاحِقُ وَ اَلسَّابِقُ -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো-

هُوَ اَنْ يُّشْرِكَ رَاوِيَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَّخِرٌ مَوْتًا فِي الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّبَاعِدِ بَيْنَ وَفَاتِهِمَا .

অর্থাৎ দুজন রাবী যদি একজন শায়খ থেকে হাদীস আহরণ করেন এবং তাদের একজনের মৃত্যু অপরজনের পূর্বে হয়, তাহলে যিনি পূর্বে ইন্তেকাল করেন তাকে اَلسَّابِقُ এবং যিনি পরে ইন্তেকাল করেন তাকে اَللَّاحِقُ বলা হয়।

اَللَّاحِقُ ও اَلسَّابِقُ -এর উদাহরণ : এর তিনটি উদাহরণ নিম্নরূপ-

১. হাফিজ সিলাহী (র.) থেকে তাঁর শায়খ আবু আলী বারদানী (র.) একটি হাদীস শুনে এবং তাঁর সূত্রে তা রেওয়ায়েত করেন। তিনি [হাফিজ সিলাহী] ইন্তেকাল করেন ৫০০ হিজরিতে। হাফিজ সিলাহীর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন তাঁর পৌত্র আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে মাক্কী। তিনি ইন্তেকাল করেন ৬৫০ হিজরিতে। এখানে দুজনের ইন্তেকালের মাঝে ব্যবধান হলো ১৫০ বছর। আর এটাই হলো সর্বোচ্চ মেয়াদ।

২. আবুল আব্বাস আস সারবাজ (র.) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর ওস্তাদ। ইমাম বুখারী (র.) ও আবু হুসাইন খাফফাফ (র.) উভয়ে তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তাদের দুজনের মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান প্রায় ১৪০ বছর। কারণ, ইমাম বুখারী (র.) ইন্তেকাল করেছেন ২৫৬ হিজরিতে আর আবুল হুসাইন খাফফাফ (র.) ইন্তেকাল করেন ৩৯৩ হিজরিতে।

৩. ইমাম মালিক (র.) থেকে ইমাম যুহরী (র.) রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম যুহরী ইন্তেকাল করেন ১২৪ হিজরিতে। ইমাম মালিকের আরেকজন ছাত্র ইসমাঈল আসসাহমী ইন্তেকাল করেন ২৫৯ হিজরিতে। উভয়ের মাঝে ব্যবধান ১৩৫ বছর।

দীর্ঘকাল ব্যবধানের কারণ : اَللَّاحِقُ ও اَلسَّابِقُ -এর ইন্তেকালের মাঝে এ দীর্ঘকাল ব্যবধানের কারণ হলো, অনেক সময় শায়খ তার ছাত্রদের ইন্তেকালের পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকেন। আর তাঁর শেষ জীবনে অল্পবয়স্ক ছাত্ররা তাঁর থেকে হাদীস আহরণ করেন এবং তাঁদের কারো কারো মৃত্যু হয় দীর্ঘ ব্যবধানে।

اَللَّاحِقُ ও اَلسَّابِقُ জানার উপকারিতা : এর উপকারিতা তিনটি। যথা-

১. এর মাধ্যমে لَاحِقُ -এর সনদ হতে রাবীর পতনের ধারণা দূরীভূত হয়।

২. لَاحِقُ থেকে উক্ত সনদ লাভ করা যায়। কারণ, سَابِقُ থেকে রেওয়ায়েতে যে মাধ্যম হয়, তা لَاحِقُ থেকে রেওয়ায়েতে কম হয়ে যায়।

৩. এতে তাদলীসের সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

কয়েকটি নামের বিশ্লেষণ : তিনটি নামের বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হলো-

১. اَلسَّلَفِيُّ : এ শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আস-সিলাহী। সীন বর্ণে যের, লাম বর্ণে যবর এবং ফা বর্ণে যের যোগে। এটি একটি اِسْمٌ مُنْسَوْبٌ। এটি এসেছে عَبَّيٌّ -এর ওয়নে। سَلَفٌ হলো হাফিজ আবু তাহির সিলাহীর দাদার নাম।

২. اَلْبَرْدَانِيُّ : এ শব্দটির বিস্তৃত উচ্চারণ আল-বারদানী। 'বা' বর্ণে যবর, 'রা' বর্ণে সাকিন, দাল বর্ণে যবর এবং নুন বর্ণে যের যোগে। হাফিজ সিলাহী এবং আবু আলী বারদানী একে অপরের ছাত্র এবং শিক্ষকও বটে।

৩. اَلْحَمَّادِيُّ : শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আল-খাফফাফ। 'হামমাদ' -এর ওয়নে। 'খ' বর্ণে যবর যোগে। তিনি মোজা তৈরি করতেন অথবা মোজার ব্যবসা করতেন বলে তাঁকে حَمَّانٌ তথা মোজাওয়ালা বলা হয়।

وَلَا رَوَى الرَّأَوِيُّ عَنْ إِثْنَيْنِ مُتَّفَقِي الْأِسْمِ أَوْ مَعَ إِسْمِ الْجَدِّ
أَوْ مَعَ النَّسْبَةِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَا يُقْتَبَنِ لَمْ
يُضَرَّ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَحْمَدَ غَيْرَ مَنْسُوبٍ
عَنِ ابْنِ وَهَبٍ فَإِنَّهُ إِمَّا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ أَوْ أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى أَوْ عَنْ مُحَمَّدٍ
غَيْرَ مَنْسُوبٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَإِنَّهُ إِمَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى الذُّهَلِيُّ وَقَدْ اسْتَوْعَبْتُ ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَمَنْ أَرَادَ
لِذَلِكَ ضَائِعًا كُلِّيًّا يَمْتَّازُ بِهِ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَبِاخْتِصَاصِهِ آيَ الرَّأَوِيِّ
بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلُ وَمَتَى لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مُخْتَصًّا بِهِمَا
مَعًا فِاشْكَالُهُ شَدِيدٌ فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْقَرَائِنِ وَالظَّنِّ الْغَالِبِ .

অনুবাদ : কোনো রাবী যদি এমন দুজন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাদের উভয়ের নাম সমান, অথবা পিতার নামও সমান, অথবা দাদার নামও সমান, অথবা বংশ পরিচয়ও সমান এবং একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করার কোনো আলামত উল্লেখ না থাকে— যদি দুজনই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হন, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। বুখারী শরীফের এক রেওয়াজেতে রয়েছে— আহমাদ (বংশ পরিচয় উল্লেখ নেই) বর্ণনা করেন ইবনে ওয়াহাব থেকে। এখানে আহমাদ ইবনে সালিহ হবেন অথবা আহমাদ ইবনে ইসা হবেন। আরেক স্থানে রয়েছে মুহাম্মদ (বংশ পরিচয় উল্লেখ নেই) বর্ণনা করেন ইরাকবাসীদের থেকে। এখানে হয়তো মুহাম্মদ ইবনে সালাম উদ্দেশ্য হবেন নইলে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহালী। আমি বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীর ভূমিকায় এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। যদি কেউ এরূপ দুজনের মধ্যে পার্থক্য করতে চান, তাহলে এমন একটি বৈশিষ্ট্য বিচারে তা করতে হবে যা দুজনের মধ্যে যে কোনো একজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে কে উদ্দেশ্য আর কে নন তা সুস্পষ্ট হবে। যদি এরূপ না করা যায়; বরং উক্ত বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে জটিলতা খুব বেশি হবে। তখন অন্য কোনো আলামত কিংবা প্রবলতার ধারণার উপর নির্ভর করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَنَّ رَوَى الرَّأَوِيُّ عَنْ شَيْخَيْنِ مُتَّفَقَيْنِ فِي الْأِسْمِ أَوْ فِي الْإِسْمِ وَاسْمِ الْآبِ أَوْ فِي الْأِسْمِ وَاسْمِ الْآبِ وَالْجَدِّ مَعَ النَّسْبَةِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا بِمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

অর্থঃ রাবী সনদ বর্ণনার সময় তার যে শায়খের নাম উল্লেখ করেন এ নামে তার আরেকজন শায়খ আছে, তবে উভয়ের পিতার নাম ভিন্ন অথবা উভয়ের পিতার নামও এক অথবা পিতার নামের সাথে সাথে দাদার নামও এক অথবা নাম, পিতার নাম, দাদার নাম, বংশ পরিচয় ও নিসবত সব এক। আর

এখানে কোন জন রাবী, বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তা চিহ্নিত করেননি। ফলে প্রকৃত শায়খকে চিহ্নিত করতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যে শায়খের ব্যাপারে সন্দেহ লাগে, তাকে **الْمُهْمَلُ** বলে।

الْمُهْمَلُ জ্ঞানার ফায়দা : এ প্রকার সম্পর্কে ধারণা থাকলে একই নামের দুজনের মধ্যে কে উদ্দেশ্য তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

الْمُهْمَلُ -এর **হুকুম** : **مُهْمَلٌ** রেওয়ায়েতের উভয় শায়খ যদি নির্ভরযোগ্য হন, তবে হাদীস গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- সহীহ বুখারীতে এক স্থানে এভাবে ইমাম বুখারী (র.) সনদ বর্ণনা করেছেন যে : **عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ**

আহমাদ নামে তাঁর দুজন শায়খ আছেন। এক. আহমাদ ইবনে সালিহ দুই. আহমাদ ইবনে ঈসা। আর দুজনই নির্ভরযোগ্য। এখানে এ উদাহরণে আহমাদ হলেন **مُهْمَلٌ**।

আর যদি একজন নির্ভরযোগ্য হন এবং অন্যজন দুর্বল হন, তাহলে রেওয়ায়েতে কে উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে হবে। দুর্বল প্রতিপন্ন হলে মাকবুল হবে না, আর নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হলো হাদীস মাকবুল হবে। যেমন-

১. সুলাইমান ইবনে দাউদ (খাওলানী)।

২. সুলাইমান ইবনে দাউদ (ইয়ামানী)।

এদের প্রথমজন নির্ভরযোগ্য আর দ্বিতীয়জন দুর্বল।

রাবী নির্ণয়ের পদ্ধতি : এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, মুহাদ্দিসের যে রাবীর সাথে দীর্ঘ সংশ্রব, একই দেশীয় ইত্যাদি সম্পর্ক থাকবে, তার রেওয়ায়েত মনে করতে হবে। আর যদি এমন বিশেষ সম্পর্ক না থাকে অথবা থাকলেও সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দুজনই সমান হয়, তখন বিভিন্ন আলামত এবং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে।

الْمُهْمَلُ এবং **الْمُهْمَلُ** -এর মধ্যে পার্থক্য : **مُهْمَلٌ** -এর মধ্যে রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়; যদিও তা নির্ণয়ে সন্দেহ থাকে। পক্ষান্তরে **مُهْمَلٌ** -এর মধ্যে রাবীর নামই উল্লেখ করা হয় না।

وَلَا رَوَى عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا وَجَعَدَ الشَّيْخَ مَرْوِيًّا فَإِنْ كَانَ جَزْمًا كَانَ يَقُولُ كَذَبَ عَلَىٰ أَوْ مَا رَوَيْتُ لَهُ هَذَا وَتَخَوُّ ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ رَدُّ ذَلِكَ الْخَبَرِ لِكُذِّبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحًا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعَارُضِ أَوْ كَانَ جَعَدَهُ إِحْتِمَالًا كَانَ يَقُولُ مَا أَذْكَرُ هَذَا أَوْ لَا أَعْرِفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ عَلَىٰ نِسْبَانِ الشَّيْخِ وَقَبْلَ لَا يَقْبَلُ لِأَنَّ الْفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ فِي اثْبَاتِ الْحَدِيثِ بِحَيْثُ إِذَا اثْبَتَ الْأَصْلُ الْحَدِيثَ تَثَبُّتُ رَوَايَةُ الْفَرْعِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَيْهِ وَتَبَعًا لَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَهَذَا مُتَعَقِّبٌ بِأَنَّ عَدَالَةَ الْفَرْعِ يَفْتَضِي صِدْقَهُ وَعَدَمَ عِلْمِ الْأَصْلِ لَا يُنَافِيهِ فَالْمُثَبَّتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَا تُسْمَعُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فَافْتَرَقَا وَفِيهِ أَيْ وَفِي هَذَا التَّنَوُّعِ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ كِتَابَ مَنْ حَدَّثَ وَتَسَيَّ وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْوِيَةِ الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ لِكُونَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ حَدَّثُوا بِأَحَادِيثٍ فَلَمَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ يَتَذَكَّرُوها لِكِنَّهُمْ لِإِعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرُّوَاةِ عَنْهُمْ صَارُوا يَرَوُونَهَا عَنِ الَّذِينَ رَوَوْهَا عَنْهُمْ عَنِ أَنْفُسِهِمْ كَحَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ الشَّاهِدِ وَالْبَيِّنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَاوَزِيُّ حَدَّثَنِي بِهِ رِبْعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَقُلْتُ إِنَّ رِبْعَةَ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِكَذَا فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ حَدَّثَنِي رِبْعَةُ عَنِّي أَتَى حَدَّثْتُهُ عَنْ أَبِي بِهِ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ.

অনুবাদ : একজন শায়খের বরাত দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করা হলো; কিন্তু শায়খ তার বর্ণনাকে অস্বীকার করলেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি খুব জোরালো ভাষায় অস্বীকার করেন, যেমন- তিনি বললেন, সে আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে, অথবা আমি তার কাছে এরূপ বর্ণনা করিনি, ইত্যাদি তাহলে উক্ত হাদীস পরিত্যাজ্য হবে। কেননা, শায়খ ও তার ছাত্রের মধ্য থেকে কেউ একজন অবশ্যই মিথ্যাচার করেছেন। অবশ্য কে করলেন তা নির্ণয় করা যাচ্ছে না। তাই এ বৈপরীত্যের কারণে তাদের কারো নির্ভরযোগ্যতাই খর্ব হবে না। আর যদি তার অস্বীকার হয় সন্দেহমূলক, যেমন তিনি বললেন-

আমার স্বরণ নেই বা আমি জানি না, তাহলে অধিক বিশুদ্ধমত হলো, উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। মনে করতে হবে যে, শায়খ ভুলে গেছেন।

অনেকে বলেন, এ হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, হাদীসটি প্রমাণ করার ক্ষেত্রে শাখা অনুসরণ করে মূলের। মূল ব্যক্তি অর্থাৎ শায়খ যদি হাদীসটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহলেই তার শাখা বা ছাত্রের হাদীসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এ যুক্তির জবাবে বলা যায়, ছাত্র যেহেতু আদিল, নূতরাং এর দাবি হলো তিনি সত্য বলছেন। শায়খের না জানা এ বক্তব্যের বিপরীত নয়। কেননা, না-বাচকের চেয়ে হ্যাঁ-বাচকটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। যদি এটিকে সাক্ষ্য প্রদান/গ্রহণের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে তা সঠিক হবে না। কেননা, মূল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম থাকতে অধস্তন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে এরূপ নয়, তাই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম দারাকুতনী (র.) একথানা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম 'মান হাদাছা ওয়া নাসিয়া'। এতে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যা দ্বারা সঠিক মতটির পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। কেননা, তাদের মধ্যে অনেকেই বেশি কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে তাদের নিকট সেগুলো পেশ করা হলে তারা তা স্বরণ করতে পারেননি। কিন্তু তাদের ছাত্রদের উপর আস্থাশীলতার কারণে ছাত্রদেরই বরাত দিয়ে নিজ থেকে সেগুলো বর্ণনা করেছেন। যেমন- সুহাইল ইবনে আবু সালিহ (র.), পিতা আবু সালিহ হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে একটি মারফু' হাদীস বর্ণনা করেন সাক্ষী ও শপথ সংক্রান্ত।

আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দারায়রদী (র.) বলেন, হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন রাবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (র.) সুহাইল (র.) থেকে। পরে আমি সুহাইলের সাক্ষাৎ পেলাম এবং হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি জানেন না। আমি বললাম, রাবীয়া তো আপনার বরাত দিয়ে আমার নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে সুহাইল বলতেন, রাবীয়া আমার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাকি তার নিকট আমার পিতা থেকে এটি বর্ণনা করেছি। এরূপ অনেক উদাহরণ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভুলে যাওয়া মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। অনেক সময় মানুষ কারো কাছে কোনো কথা বলে। পরে কেউ তাকে স্বরণ করলে- তিনি এ ধরনের কোনো কথা বলেছিলেন কিনা মনে করতে পারেন না।

وَمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ -এর অর্থ : এর অর্থ হলো যিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন এবং (ঐ রেওয়ায়েতের কথা) ভুলে গেছেন।

أَنَّ يَنْكَرَ الشَّيْخُ رَوَايَةَ مَا حَدَّثَ بِهِ يَلْمِزُهُ عَنْهُ -হলো- مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় অর্থাৎ শায়খ তার বরাত দিয়ে বর্ণিত স্বীয় ছাত্রের হাদীসকে তিনি বর্ণনা করেছেন বলে স্বীকার না করা।

وَمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ -এর হুকুম : শায়খ যদি দৃঢ়তার সাথে এবং নিশ্চিতভাবে তার রেওয়ায়েত করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন, যেমন- তিনি বলেন, আমি এ হাদীস রেওয়ায়েত করিনি অথবা সে আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে ইত্যাদি, তাহলে উক্ত হাদীস মারদূদ হবে। কেননা, এখানে দুজনের একজন অনির্দিষ্টভাবে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদীর হাদীস মারদূদ হয়, মাকবুল হয় না।

তবে এতে রাবী ও শায়খ কারো عَمَلْتُ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিংবা তাদের অন্য রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যাত হবে না। কেননা, দুজনের প্রত্যেকেই একে অপরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আর কোনো একজনকে প্রাধান্য দেবারও উপায় নেই, তাই نَعَارَضًا تَسَاطُفًا এ নীতি অনুসারে উভয় মিথ্যারোপ পরিত্যক্ত হয়ে উভয়ে عَمَلُ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

আর যদি শায়খ প্রত্যাখ্যান করেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের সাথে। যেমন বলেন, আমার স্মরণ নেই বা আমি তা জানি না ইত্যাদি, তাহলে এমন হাদীসের হুকুম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আর তা হলো—

১. জুমহুরের অভিমত : জুমহুর মুহাদিস, জুমহুর ফুকাহা, জুমহুর মুতাকাল্লিম— প্রমুখের অভিমত হলো, এমতাবস্থায় হাদীস মাকবুল হবে। কেননা, রাবী শায়খ হতে দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করছে আর শায়খের অস্বীকার হলো সন্দেহপূর্ণ। তাই মনে করতে হবে যে, শায়খ ভুলে গেছেন। কারণ, নিয়ম আছে—
 اَلْمُتَّبِعُ اَلْعَاجِزُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّاسِ اَلْمُتَرَدِّدِ
 অর্থাৎ দৃঢ় ইতিবাচকতা দ্বিধান্বিত নেতিবাচকের উপর অগ্রগামী হয়।

২. কতিপয় আহনাফের অভিমত : তাদের মতে এমতাবস্থায়ও হাদীস মাকবুল হবে না। কারণ, হাদীস বর্ণনায় আসল হলো শায়খ আর রাবী হলো শাখা। শাখা সব সময় আসলের অনুগামী হয়। সুতরাং যখন আসল অর্থাৎ শায়খ হাদীস অস্বীকার করেছেন তখন শাখা তথা রাবী হতে কিভাবে হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে? সুতরাং এটা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্যের মতো হয়ে গেল। সুতরাং যেরূপভাবে আসল (প্রকৃত) সাক্ষী অস্বীকার করলে শাখা (সাক্ষীর সাক্ষী) -এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনিভাবে শায়খের অস্বীকারের দরুন ছাত্রের হাদীসও মাকবুল হবে না।

সঠিক অভিমত ও তার দলিল : উপরিউক্ত দু' অভিমতের মধ্যে সর্বাধিক সঠিক হলো জুমহুরের অভিমত। কারণ, রাবী দৃঢ়তার উপর আছে আর শায়খ সন্দেহের উপর। আর নীতি হলো—
 وَابْتِغِ الْوَقْفَ
 অর্থাৎ 'নিশ্চিত বিষয়টা সন্দেহের দ্বারা বাতিল হয় না।' অনুরূপভাবে নীতি আছে—
 اَلْمَحَقَّقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُطَنَّنِ

অর্থাৎ সাব্যস্তকৃত বিষয়টি অগ্রগামী হয় ধারণাকৃত বিষয়ের উপর।

কতিপয় আহনাফের কিয়াসের জবাব : কতিপয় আহনাফ তাদের দাবির স্বপক্ষে شَهَادَاتُ عَلَى كِيَاَسِ এর উপর কিয়াস করেছিলেন। তাদের কিয়াসের জবাবে বলা হয় যে, তাদের এই কিয়াস করাটা অযৌক্তিক এবং ভুল। আর তার কারণ কয়েকটি। যথা—

১. মূল সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না; কিন্তু রেওয়াজেতের ক্ষেত্রে শায়খ সমর্থ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রের রেওয়াজেত গ্রহণযোগ্য হয়।
২. সাক্ষ্য স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া দিতে পারবে না; পক্ষান্তরে গোলামও হাদীস রেওয়াজেত করতে পারে।
৩. সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষ্য এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমান; পক্ষান্তরে হাদীস রেওয়াজেতের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা বরাবর।
৪. দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া সাক্ষ্য গৃহীত হয় না; কিন্তু এক ব্যক্তির রেওয়াজেতও গৃহীত হয়।

যেহেতু কমপক্ষে উল্লিখিত চার দৃষ্টিকোণ থেকে রেওয়াজেত হাদীস শাহাদাতের চেয়ে ভিন্ন ও ব্যতিক্রম, তাই রেওয়াজেত হাদীসকে শাহাদাতের উপর কিয়াস করা অনুচিত এবং ভুল।

سَهْلٌ مِنْ اَبْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ شَرِيْفَةٍ -এর উদাহরণ : আবু দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো—
 اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بِالْبَيْتَيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الرَّاجِدِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম এবং এক সাক্ষীর মাধ্যমে ফয়সালা করেছেন।

এ হাদীসটি مِنْ حَدَّثِ وَنَسَى -এর উদাহরণ হওয়ার কারণ হলো, এ হাদীসটি রবীয়া ইবনে আব্দুর রহমান সুহাইল থেকে রেওয়াজেত করেন। কিন্তু আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ সুহাইলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে 'তিনি জানেন না' বলে জবাব দেন।

وَإِنْ اتَّفَقَ الرَّوَّاهُ فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الْأَسَانِيدِ فِي صِحِّهِ الْآدَاءِ كَسَمِعْتُ فُلَانًا
قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا أَوْ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الصِّيَغِ
أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحَالَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَسَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ
حَدَّثَنِي فُلَانٌ إِلَى آخِرِهِ أَوِ الْفِعْلِيَّةِ كَقَوْلِهِ دَخَلْنَا عَلَى فُلَانٍ فَأَطْعَمَنَا
تَمْرًا إِلَى آخِرِهِ أَوِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ مَعًا كَقَوْلِهِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَهُوَ أَخَذُ
بِلَحْيَتِهِ قَالَ أُمِنْتُ بِالْقَدْرِ إِلَى آخِرِهِ فَهُوَ الْمُسْتَلْسَلُ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ
الإِسْنَادِ وَقَدْ يَقَعُ التَّسْلُسُ فِي مَعْظَمِ الإِسْنَادِ كَحَدِيثِ الْمُسْتَلْسَلِ
بِالْأُولَى فَإِنَّ السِّلْسِلَةَ بِنْتَهَى فِيهِ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَطْ وَمَنْ
رَوَاهُ مُسْتَلْسَلًا إِلَى مُنْتَهَاهَا فَقَدْ وَهَمَ .

অনুবাদ : রাবীণ গ যদি কোনো একটি সনেদ হাদীস বর্ণনার সময়ে ভাষাগত দিক দিয়ে ঐক্য বজায় রাখেন, যেমন- প্রত্যেকেই বললেন, আমি 'তু বা হাদাছানা কিংবা অন্য কোনো শব্দ সকলেই ব্যবহার করলেন অথবা ঐক্য বজায় রাখেন অন্যদিক দিয়ে অর্থাৎ উক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে, যেমন- প্রত্যেকেই বললেন, আমি অমুককে বলতে শুনেছি- আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি- অমুকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন... এভাবে শেষ পর্যন্ত; কিংবা কর্মগত দিক দিয়ে, যেমন- প্রত্যেকেই বললেন, আমরা অমুকের নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে খেজুর খাওয়ালেন ... এভাবে শেষ পর্যন্ত, কিংবা উক্তি ও কর্ম উভয় অবস্থার দিক দিয়ে, যেমন- প্রত্যেকেই বললেন, অমুকে নিজ দাড়ি ধরে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এভাবে শেষ পর্যন্ত- তাহলে তার নাম মুসালাসাল (ধারাবাহিক)।

এটি মূলত সনদের একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় এই ধারাবাহিকতা সংঘটিত হয় সনদের বৃহত্তর অংশে (পুরো অংশে নয়)। যেমন- হাদীসে মুসালাসাল বিল আওওয়ালিয়া বা শায়খের সাথে ছাত্রের প্রথম সাক্ষাতের সময় যে হাদীসটি শিক্ষা দেওয়ার রীতি রয়েছে। ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পর্যন্তই এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। যারা এটিকে শেষ পর্যন্ত মুসালাসাল বলে বর্ণনা করেন তারা ভুল করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاحِدٌ -এর إِسْمٌ مَفْعُولٌ হতে بِأَبِ فَعْلَةٍ শব্দটি الْمُسْلِمُ -এর আভিধানিক অর্থ : الْمُسْلِمُ । এর অর্থ- ক্রমিক, ধারাবাহিক, পরস্পরায়ুক্ত ইত্যাদি ।

—الْمُسْلِمُ হলো—উসুলুল হাদীসের পরিভাষায় এর পারিভাষিক অর্থ—

هُوَ مَا اتَّفَقَ رَوَاتُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ عَلَى وَصْفٍ لِلرَّوَاةِ أَوْ الرِّوَايَةِ وَصِفَاتِ الرِّوَاةِ أَقْوَالُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ وَصِفَاتِ الرِّوَايَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِصَيْغِ الْإِدَاءِ أَوْ بِزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا .

অর্থাৎ কোনো একটি সনদের সকল রাবী যদি হাদীস বর্ণনার সময় একই শব্দ, একই উক্তি, অথবা কর্ম অথবা একই উক্তি ও কর্ম একসঙ্গে অথবা একই অবস্থার অবতারণা করেন, তাহলে তাকে বলে **الْمُسْنَدُ**।

এ সংজ্ঞাটিই সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, কোনো একটি সনদের রাবীগণ যদি হাদীস বর্ণনার সময় একই ভাষা কিংবা অবস্থার অবতারণা করেন, তাহলে তাকে বলে মুসালসাল।

এর কয়েকটি সূরত : **الْمُنَلَّ** -এর সংজ্ঞা হতে জানা যায় যে, তার কয়েকটি সূরত হতে পারে। যথা-

১. হাদীস বর্ণনার শব্দ সকলের এক ইওয়া। যেমন- সকলের حَدَّثَنَا, فَكَأَنَّ سَمِعْتُ, فَكَأَنَّ سَمِعْتُ ইত্যাদি বলা। যেমন- سَمِعْتُ فَلَمَّا فَكَأَنَّ سَمِعْتُ فَلَمَّا الْخ

২. কোনো উক্তি (قَوْل) -এর উপর রাবীদের এক হওয়া। যেমন-

ক. এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.) -কে বলেন,

إِنِّى أُجِبُّكَ فَقُلْ فِى دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ : اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি প্রতি নামাজের পরে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

হে আল্লাহ ! তোমার স্বরণ, কৃতজ্ঞতা এবং উত্তমরূপে ইবাদত করতে আমাকে সহযোগিতা করো।

এ হাদীস রেওয়ায়েত করতে প্রত্যেক রাবী তার ছাত্রকে **إِنِّي أُحِبُّكَ** তথা 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলেন।

খ. উদাহরণস্বরূপ এভাবে হাদীস বর্ণনা করা যে-

أَشْهَدُ بِاللَّهِ سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي فُلَانٌ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ ... الخ

৩. কোনো আমলের ব্যাপারে এক হওয়া। যেমন—

ক. এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন-

شَبَّكَ بِيَدَيَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাতের আঙ্গুলকে তাঁর আঙ্গুলের মধ্যে করেন এবং বলেন, আল্লাহ শনিবার দিন ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করেছেন।

এ হাদীস রেওয়ায়েত করতে প্রত্যেক রাবী তার ছাত্রের হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল পুরে বর্ণনা করেছেন।

খ. যেমন- دَخَلْنَا عَلَى فُلَانٍ فَاطْعَمُنَا ثَمْرًا وَحَدَّثُنِي قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فُلَانٍ فَاطْعَمُنَا ثَمْرًا

অর্থাৎ আমি অমুকের কাছে গেলে তিনি আমাকে খেজুর আহার করিয়েছেন।

৪. কোনো উক্তি ও কর্ম উভয়ের উপর এক হওয়া। যেমন—

قَالَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَهُوَ أَخَذَ بِيَحْيَيْهِمْ قَالَ أَمِنْتُ بِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرِّهِ وَحُلُوِّهِ وَمَرِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَهُوَ أَخَذَ بِيَحْيَيْهِمْ قَالَ أَمِنْتُ بِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرِّهِ وَحُلُوِّهِ وَمَرِّهِ -

৫. সকলের একই অবস্থা হওয়া। যেমন- مُسَلَّسٌ بِتَخْرِيكِ الشُّفْتَيْنِ

সহীহ বুখারীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে, নবুয়তের প্রাথমিক কালে ওহী অবতীর্ণের সময় কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ -যে কসরৎ করতেন আর তাতে দু'টাঁটের যে অবস্থা হতো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নিজের ঠোঁটে তা ছাত্রদেরকে দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে সকল রাবীই হাদীসটি রেওয়ায়েতকালে ঠোঁট নেড়ে ছাত্রদেরকে তা দেখাতেন। এটাই **مُسَلَّسٌ بِعَرْنِكَ الشَّفَتَيْنِ** নামে পরিচিত।

مُسَلَّلٌ কিসের সিফাত? مُسَلَّلٌ মূলত শুধু إِنْشَاء-এর সিফাত, হাদীসের সিফাত নয়। পক্ষান্তরে مُرْتَوِعٌ, مُرْتَوٍ এবং مُقَطَّعٌ এগুলো মতনের সিফাত। আর صَبِيعٌ, حَسَنٌ এগুলো হলো সনদ এবং মতন উভয়ের সিফাত। مُسَلَّلٌ যেহেতু শুধু সনদের সিফাত এ জন্য তাকে হাদীসে মুসালসাল না

বলে ইসনাদে মুসালসাল বলা উচিত।

تَسَنُّلُ এই । কোথায় সংঘটিত হয় ? মুসালমানভাবে হাদীস রেওয়ায়েত করার নাম

মূলত পুরো সনদের মাঝে সংঘটিত হয়; কিন্তু কখনো সনদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়। যেমন—মুন্সালসাল বিল আওওয়ালিয়াতে হাদীস। অর্থাৎ যে হাদীসে এটা উল্লেখ থাকে যে,

শায়খ ছাত্তের সাথে প্রথম সাক্ষাতে যে হাদীস বর্ণনা করেন।

জানার ফায়দা : এটা জানায় ফায়দা হলো, এটা রাবীদের অধিক সংরক্ষণের কথা জানায়।

وَصِيغُ الْأَدَاءِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا عَلَى ثَمَانِ مَرَاتِبٍ أُولَى سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي ثُمَّ
 أَخْبَرَنِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
 وَهِيَ الثَّالِثَةُ ثُمَّ أَنْبَأَنِي وَهِيَ الرَّابِعَةُ ثُمَّ نَاوَلَنِي وَهِيَ الْخَامِسَةُ ثُمَّ
 شَافَهَنِي أَيْ بِالْإِجَازَةِ وَهِيَ السَّادِسَةُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيَّ أَيْ بِالْإِجَازَةِ وَهِيَ
 السَّابِعَةُ ثُمَّ عَنَ وَنَحْوَهَا مِنَ الصِّيغِ الْمُحْتَمَلَةِ لِلسَّمَاعِ وَالْإِجَازَةِ وَلِعَدَمِ
 السَّمَاعِ ابْنًا وَهَذَا مِثْلُ قَالٍ وَذَكَرَ وَرَوَى فَالْإِظْطَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ صِيغِ
 الْأَدَاءِ وَهُمَا سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي صَالِحَانِ لِمَنْ سَمِعَ وَحَدَّاهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ
 وَتَخْصِيصُ التَّحْدِيثِ بِمَا سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ هُوَ الشَّائِعُ بَيْنَ أَهْلِ
 الْحَدِيثِ إِضْطِلَاحًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّحْدِيثِ وَالْإِخْبَارِ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ وَفِي
 إِدْعَاءِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا تَكْلُفٌ شَدِيدٌ لَكِنْ لَمَّا تَقَرَّرَ فِي الْإِضْطِلَاحِ صَارَ
 ذَلِكَ حَقِيقَةً عَرَفِيَّةً فَقُدِّمَ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ مَعَ أَنَّ هَذَا الْإِضْطِلَاحَ
 إِنَّمَا شَاعَ عِنْدَ الْمُشَارِقَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَأَمَّا غَالِبُ الْمُفَارِسَةِ فَلَمْ
 يَسْتَعْمِلُوا هَذَا الْإِضْطِلَاحَ بَلِ الْإِخْبَارُ وَالتَّحْدِيثُ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ
 فَإِنْ جَمَعَ الرَّاوي أَيْ أَتَى بِصِيغَةِ الْأُولَى جَمْعًا كَانَ يَقُولُ حَدَّثَنَا فَلَأَنْ أَوْ
 سَمِعْنَا فَلَأَنْ يَقُولُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ مَعَ غَيْرِهِ وَقَدْ يَكُونُ التَّنُونُ
 لِلْعَظْمَةِ لَكِنْ بِقِلَّةٍ وَأَوَّلُهَا أَيْ صِيغُ الْمَرَاتِبِ أَصْرَحُهَا أَيْ أَصْرَحُ صِيغِ
 الْأَدَاءِ فِي سَمَاعٍ قَائِلِهَا لِأَنَّهَا لَا يَحْتَمِلُ الْوَاسِطَةَ وَلِأَنَّ حَدَّثَنِي قَدْ يُطْلَقُ
 فِي الْإِجَازَةِ تَذْلِيلًا وَأَرْفَعُهَا مِقْدَارًا مَا يَقَعُ فِي الْإِمْلَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ
 التَّثَبُّتِ وَالتَّحْفُظِ .

অনুবাদ : হাদীস বর্ণনার শব্দ (যার দিকে পূর্বে) ইশারা করা হয়েছে তা আট শ্রেণিতে বিভক্ত ।

প্রথম : سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي (আমি শুনেছি ও তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন ।)

দ্বিতীয় : أَخْبَرَنِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (তিনি আমাকে জানিয়েছেন ও তার নিকট আমি পাঠ করেছি ।)

তৃতীয় : قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ (তার নিকট পাঠ করা হয়েছিল আর আমি শুনছিলাম ।)

চতুর্থ : أَنْبَأَنِي (তিনি আমাকে অবহিত করেছেন ।)

পঞ্চম : نَاوَلَنِي (তিনি আমাকে দান করেছেন ।)

ষষ্ঠ : شَافِهِي (তিনি আমার সামনেই অনুমতির কথা বলেছেন।)

সপ্তম : كُنَّ إِلَى (তিনি আমার নিকট অনুমতি লেখে পাঠিয়েছেন।)

অষ্টম : عَنْ (থেকে) অথবা এ জাতীয় কোনো শব্দ যাতে শোনা ও অনুমতি লাভ এবং না-শোনা উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। যেমন, ক্বা-লা, যুকিরা, রুবিয়া ইত্যাদি।

প্রথম শব্দ দুটি (সামি'তু ও হাদ্দাহানী) শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যিনি একাকী শায়খের শব্দ শুনেছেন। শায়খের শব্দ শোনার সাথে হাদ্দাহানী বা হাদ্দাহানী -এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ হবার বিষয়টি মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে একটি পরিভাষা হিসেবে প্রসিদ্ধ। অবশ্য আভিধানিকভাবে হাদ্দাহা ও আখবারা শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য দাবি করা নেহায়েত অহেতুক। কিন্তু পরিভাষায় এ পার্থক্যটি যেহেতু প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সুতরাং এটি হবে হাকীকতে উরফিয়া বা গোষ্ঠীগত প্রকৃত অর্থ। সে কারণে তাকে হাকীকতে লুগাবিয়া' বা আভিধানিক প্রকৃত অর্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। তা ছাড়া এ পরিভাষাটি (পার্থক্য) শুধুমাত্র পূর্ব এলাকার মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। পশ্চিম এলাকার অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ পরিভাষা ব্যবহার করেন না। তাদের মতে হাদ্দাহা ও আখবারা একই অর্থবোধক।

রাবী যদি প্রথম স্তরের শব্দ দুটিকে বহুবচনে ব্যবহার করেন যেমন- তিনি বললেন, হাদ্দাহানী ফুলানুন বা সামি'না ফুলানান ইয়াকূলু- তাহলে প্রমাণিত হবে যে, তিনি হাদীসটি একাকী নয়; বরং অন্যের সাথে শুনেছেন। কখনো কখনো বহুবচন ব্যবহার করা হয় মর্যাদার কারণে, তবে তা খুব কম।

হাদীস বর্ণনার শব্দাবলির মধ্যে প্রথম স্তরের হলো 'সামি'তু' যা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। অর্থাৎ রাবী কথটি বক্তার নিকট থেকে সরাসরি শুনেছেন- এ মর্মে 'সামি'তু শব্দটি সবচেয়ে বেশি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। কেননা, এতে আর কোনো মাধ্যম থাকার সম্ভাবনা থাকে না।

আর মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ হলো 'ইমলা'। কেননা, এতে শায়খের উচ্চারণ এবং রাবীর শোনা ও লেখার কথা প্রকাশ হয়। যার ফলে তাতে অধিক সংরক্ষণ ও আয়ত্তের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১. أَذَا -এর অর্থ হলো, শায়খ থেকে প্রাপ্ত হাদীস ছাত্রের কাছে বর্ণনা করা। যে সমস্ত শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে حَدِيثٌ أَذَا বলে। এর অপর নাম صَيَغَ أَذَا বা হাদীস বর্ণনার শব্দ। হাদীস বর্ণনা করার শব্দ অনেক। সম্মানিত লেখক হাদীস বর্ণনার শব্দগুলোকে আট প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এই আট প্রকারকে তিনি প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

رَوَى، دُكِّرَ، قَالَ -এর ব্যবহার : এ শব্দত্রয়ের ব্যবহার দুভাবে হয়-

১. হয়তো এগুলোর সাথে رَوَى অথবা لَنَا যুক্ত হবে, যেমন বলা হবে قَالَ لَنَا ইত্যাদি, তখন তা حَدَّثَنَا -এর মতো মুত্তাসিল হবে।

২. এ শব্দগুলোর সাথে رَوَى বা لَنَا যুক্ত হবে না, যেমন শুধু বলা হবে قَالَ فَلَانٌ তখন এটা عَنْ -এর মতো মুত্তাসিল ও গায়ের মুত্তাসিল উভয় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

سَمِعْتُ وَ سَمِعْتُ -এর ব্যবহার : سَمِعْتُ ও سَمِعْتُ কখনো একবচন হিসেবে (যেমন- سَمِعْتُ وَ سَمِعْتُ) ব্যবহার হয় আবার কখনো বহুবচন হিসেবেও (যেমন سَمِعْنَا وَ سَمِعْنَا) ব্যবহার হয়। একবচন ব্যবহার থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা-

ক. قَالَ الشَّيْخُ عَلَى التَّلْمِيزِ অর্থাৎ শায়খ হাদীস পড়েছেন আর রাবী তা শুনেছেন।

খ. রাবী একা শায়খ থেকে শুনেছেন। শুনার সময় তার অন্য কোনো সাথি ছিল না।

বহুবচন ব্যবহার থেকেও দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা—

ক. **قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التَّلْمِيزِ** অর্থাৎ শায়খ হাদীস পড়েছেন আর রাবী তা শুনেছেন।

খ. রাবী একা শুনে ননি; সাথীদের সাথে মিলে শুনেছেন।

অবশ্য একা শুনার ক্ষেত্রেও অনেক সময় **سَمِعْنَا** ও **حَدَّثْنَا** -এর ব্যবহার পাওয়া যায়, তবে খুব কম।

إِخْبَارٌ এবং **تَعْدِثٌ** -এর মধ্যে পার্থক্য : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে **التَّعْدِثُ** ও **الْإِخْبَارُ** -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের অর্থ খবর তথা সংবাদ দেওয়া। তবে পরিভাষাগত কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা—

১. পূর্ব এলাকার মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আওয়ায়ী, ইমাম মুসলিম সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত হলো, পরিভাষায় **تَعْدِثٌ** ও **إِخْبَارٌ** -এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, **تَعْدِثٌ** বুঝায় **قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التَّلْمِيزِ** -কে আর **إِخْبَارٌ** বুঝায় **قِرَاءَةُ الشَّيْখِ عَلَى التَّلْمِيزِ** -কে।

২. পশ্চিম এলাকার মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত : ইমাম বুখারী, ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী, আহলে হিজায় এবং আহলে কুফার অভিমত হলো, আভিধানিকের মতো পরিভাষাগতভাবেও **تَعْدِثٌ** ও **إِخْبَارٌ** -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়।

তবে যেহেতু অঞ্চলবিশেষে **تَعْدِثٌ** ও **إِخْبَارٌ** -এর অর্থের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে, তাই এখন পার্থক্য করাই ভালো। অর্থাৎ **قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التَّلْمِيزِ** শব্দের ব্যবহার, পক্ষান্তরে **قِرَاءَةُ الشَّيْخِ** বুঝাতে **إِخْبَار** শব্দের ব্যবহার করতে হবে।

قِرَاءَةُ الشَّيْخِ উভয়টি যদিও **سَمَاعٌ** ও **تَعْدِثٌ** : -এর মর্যাদা বেশি : **سَمَاعٌ** -এর তুলনায় **تَعْدِثٌ** -এর চেয়ে দু (**حَدَّثْنَا** - **حَدَّثْنِي**) **سَمِعْتُ** - **سَمِعْنَا**) টা **تَعْدِثٌ** বুঝায়; কিন্তু **سَمَاعٌ** -এর কারণে বেশি মর্যাদা রাখে। যথা—

১. **سَمَاعٌ** -এর মাঝে শায়খ থেকে সরাসরি ও স্বয়ং শোনার বিষয়টি বেশি স্পষ্ট। এতে মাঝখানে মধ্যস্থতার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

২. **حَدَّثْنِي** -এর ব্যবহার অনেক সময় এমন **إِجَازَةٌ** -এর উপর হয় যাতে তাদলীস আছে। পক্ষান্তরে **سَمَاعٌ** -এর ব্যবহার এ ধরনের **إِجَازَةٌ** -এর উপর কখনই হয় না।

৩. **سَمَاعٌ** -এর প্রকারভেদ : **سَمَاعٌ عَنِ الشَّيْخِ** তথা শায়খ থেকে হাদীস শোনাটা দু প্রকার। যথা—

১. **سَمَاعٌ** -এর সাথে সাথে শায়খের **الْفَاظُ** ছাত্রের লেখে নেওয়া। একে **إِمْلَاءٌ** (ইমলা) বলে।

২. ছাত্র শায়খের শব্দ শুধু শোনে, লেখে না। শায়খও ছাত্রের লেখানোর প্রতি তাকিদ করেন না। প্রথম প্রকারটি দ্বিতীয় প্রকার এমনকি হাদীস বর্ণনার সমস্ত শব্দ হতে উত্তম। কেননা, এখানে শোনার সাথে সাথে লেখেও নেওয়া হয়। যাতে করে ভুলের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই কেউ যদি **حَدَّثْنِي** বা **سَمِعْتُ الشَّيْخَ** বলে, তাহলে তা **حَدَّثْنِي الشَّيْخَ** অথবা **سَمِعْتُ الشَّيْخَ** ইমলা বলে, তাহলে তা **حَدَّثْنِي الشَّيْخَ** বা **سَمِعْتُ الشَّيْخَ** -এর উপর প্রাধান্য পাবে।

وَالثَّالِثُ وَهُوَ أَخْبَرَنِي كَالرَّابِعِ وَهُوَ قَرَأْتُ عَلَيْهِ لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَى الشَّيْخِ فَإِنْ جَمَعَ كَانَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا وَقَرَأْنَا فَهُوَ كَالْخَامِسِ وَهُوَ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّعْبِيرَ بِقَرَأْتُ لِمَنْ قَرَأَ خَيْرٌ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالْإِخْبَارِ لِأَنَّهُ أَفْصَحُ بِصُورَةِ الْحَالِ .

تَنْبِيهُ الْقِرَاءَةِ عَلَى شَيْخٍ أَحَدٌ وَجَّهَ التَّحْمِيلَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَابْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَقَدْ اشْتَدَّ انْكَارُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَدِينِيِّينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ حَتَّى بَالَعَ بَعْضُهُمْ فَرَجَّحَهَا عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَذَهَبَ جَمْعٌ جَمَّ مِنْهُمْ الْبُخَارِيُّ وَحَكَاهُ فِي أَوَائِلِ صَحِيحِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَثَمَةِ إِلَى أَنَّ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ يَغْنِي فِي الصَّحَّةِ وَالْقُوَّةِ سَوَاءً وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْإِنْبَاءُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةِ وَاصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ إِلَّا فِي عُرْبِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ كَعَمَلِهَا فِي عُرْبِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْإِجَازَةِ .

অনুবাদ : তৃতীয় শব্দটি অর্থাৎ আখবারানী চতুর্থটি অর্থাৎ করা 'তু আলাইহি -এর মতোই। করা 'তু আলাইহি ব্যবহৃত হয় তার ক্ষেত্রে যে যিনি স্বয়ং শায়খকে পাঠ করে শুনিয়েছেন।

যদি এ দুটি শব্দ বহুবচন ব্যবহৃত হয় যেমন- রাবী বলেন, 'আখবারানা' বা 'করা'না আলাইহিস', তাহলে তখন এ দুয়ের মর্যাদা হবে পঞ্চমটি অর্থাৎ 'কুরিয়া আলাইহি ওয়া আনা আসমাউ' -এর মতো। এ থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি পাঠ করেছেন তার পক্ষে 'আখবারানী' শব্দ ব্যবহার না করে 'করা'তু' ব্যবহার করা অধিক সমীচীন। কেননা, 'করা'তু আলাইহি' শব্দ বাস্তব অবস্থাকে বেশি প্রকাশ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে শায়খের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণের অন্যতম পদ্ধতি হলো তাকে পাঠ করে শোনানো। যারা এটি অস্বীকার করেন তাদের অভিমত মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ইরাকের কোনো কোনো মুহাদ্দিস এটি অস্বীকার করেন। ইমাম মালিকসহ মদীনার অনেক মুহাদ্দিস এ অভিমতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এমনকি অনেকে এ ব্যাপারে অতিরঞ্জিতও করেছেন এবং শায়খের শব্দ শোনার চেয়ে এটিকে (শায়খের সামনে পড়াকে) অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম বুখারীসহ মুহাদ্দিসীনে কেরামের একটি বিরাট দল এ অভিমত পোষণ করতেন যে, শায়খের শব্দ শোনা ও শায়খকে শোনানো সমান মর্যাদা রাখে। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ -এর শুরুতে হাসান বসরী (র.), সুফিয়ান ছাওরী (র.), মালিক (র.) প্রমুখ ইমামের অভিমত উল্লেখ করেছেন যে, শায়খের শব্দ শোনা ও তাকে শোনানো শুদ্ধতা ও শক্তির দিক দিয়ে সমান।

আনবা'আ শব্দটি অভিধান ও মুতাকদ্দিমীনের পরিভাষায় আখবারা -এর অর্থই প্রদান করে। কিন্তু মুতাআখখিরীনের রীতিতে তা নয়। তাদের মতে এটি 'আন' -এর মতোই শুধুমাত্র অনুমতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। মুতাআখখিরীনের রীতিতে 'আন' ব্যবহৃত হয় অনুমতি বুঝাতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَخْبَرَنِي -এর দুটি সীগাহ। أَخْبَرَنَا ও أَخْبَرْنَا। আর عَلَى الشَّيْخِ -এর জন্য ব্যবহার হয় তিন সীগাহ। ১. قَرَأْتُ عَلَيْهِ ২. قَرَأْنَا عَلَيْهِ ৩. قَرَأْنَا عَلَيْهِ ৪. قَرَأْتُ عَلَيْهِ ৫. قَرَأْتُ عَلَيْهِ -এর

মাঝে পার্থক্য হলো, **أَخْبَرَنِي** ও **قَرَأْتُ عَلَيْهِ** শুধু ঐ রাবীর জন্য ব্যবহৃত হয় যিনি একা শায়খের সামনে হাদীস পড়েছেন আর শায়খ তা শোনেছেন, তাই **حُكْمًا** ও **إِصْطِلَاحًا** এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ সূরতে **أَخْبَرَنِي** বলার চেয়ে **قَرَأْتُ عَلَيْهِ** বলা বেশি ভালো। কারণ, **قَرَأْتُ عَلَيْهِ** -এর মাঝে **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ** -এর বিষয়টি বেশি প্রকাশমান।

আর **قَرَأْتُ عَلَيْهِ** এবং **أَخْبَرَنَا** এবং **قُرِئَ عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ** ব্যবহার হয় ঐ রাবীদের ক্ষেত্রে, শায়খের সামনে একজন হাদীস পড়েছেন আর বাকিরা তা শুনেছেন।

تَحْتَلُّ حَدِيثٌ -এর অর্থ শায়খ থেকে **تَحْتَلُّ حَدِيثٌ** -এর অর্থ শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ করা। এর অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- ১. **سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ** ২. **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ** ৩. **إِجَازَةٌ** ৪. **مُتَاوَلَةٌ** ৫. **وَجَادَةٌ** ইত্যাদি। অবশ্য এর মধ্যে **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ** তথা শায়খকে শোনানো -এটা **تَحْتَلُّ حَدِيثٌ** তথা হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. জুমহুরের অভিমত : তাঁদের মতে এটিও **تَحْتَلُّ حَدِيثٌ** -এর একটি সূরত বা পদ্ধতি।
২. ইরাকীদের অভিমত : আবু আসিম, ওকী প্রমুখ ইরাকীদের অভিমত হলো, **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ** এটি **تَحْتَلُّ حَدِيثٌ** -এর অন্তর্গত নয়। কারণ, এ পন্থায় ছাত্র ওস্তাদ হতে হাদীস গ্রহণ করে না; বরং শায়খকে পড়ে শোনায় মাত্র।

সঠিক মাযহাব ও তার দলিল : উক্ত দু মাযহাবের মধ্যে জুমহুরের মাযহাবই সর্বোচ্চ সঠিক ও বাস্তবসম্মত। আর ইরাকীদের মাযহাবটি সত্য ও বাস্তবতা হতে অনেক দূরে অবস্থিত। জুমহুরের মাযহাব সঠিক হবার কারণ হলো, ছাত্র শায়খকে হাদীস পড়িয়ে শোনান এমনই নয়; বরং ছাত্র ওস্তাদকে এ উদ্দেশ্যে শোনায় যাতে শায়খ ছাত্রের ভুল সংশোধন করে দেন। বস্তুত এ কারণে ইমাম মালিক প্রমুখ আহলে ইরাকীদের মাযহাবের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ অতিরঞ্জিত করে **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ** -কে **سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْখِ** থেকেও উত্তম বলেছেন।

قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ -এর মর্যাদা : যাদের মতে **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْখِ** হাদীস গ্রহণের একটি পদ্ধতি, তাদের পরাম্পরের মাঝে এ প্রশ্নে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْখِ** -এর মর্যাদা কেমন ?

১. কারো কারো মত হলো, **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْখِ** টা **سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْখِ** থেকে অগ্রগণ্য।
২. ইমাম বুখারী, ইমাম মালিক, ছাওরী, হাসান বসরী প্রমুখের মতে শক্তি এবং বিদগ্ধতার দিক দিয়ে উভয় বরাবর; একটি অপরটির উপর অগ্রগণ্য নয়।
৩. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর মতে উভয়টা বরাবর নয় এবং **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْখِ** টা **سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْখِ** থেকে অগ্রগণ্যও নয়; বরং **سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْখِ** টা হাদীস বর্ণনার সকল শব্দের মধ্যে সর্বোত্তম। **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْখِ** -এর অপর নাম কতিপয়ের মতে **عَرَضٌ**। কেননা, হাদীসের পাঠকারী তার পাঠ শায়খের সামনে আরজ তথা পেশ করে।

أَنْبَأَنِي -এর অর্থ ও ব্যবহার : আভিধানিক অর্থ হিসেবে **إِنْبَاءٌ** ও **إِخْبَارٌ** -এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে পরিভাষাগতভাবে পার্থক্য আছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. মুতাকদ্দিমীন মুহাদ্দিসগণের মতে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং **أَخْبَرَنِي** ও **أَنْبَأَنِي** -এর ব্যবহার শুদ্ধ।
২. মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণের মতে পার্থক্য রয়েছে। **إِخْبَارٌ** ব্যবহার হয় **قِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْখِ** -এর ক্ষেত্রে, আর **إِنْبَاءٌ** ব্যবহার হয় **عَنْ** -এর মতো অনুমতি বুঝাতে।

وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَاصِرِ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُرْسَلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً فَشَرَطُ حَمْلِهَا عَلَى السَّمَاعِ ثُبُوتُ الْمُعَاصِرَةِ إِلَّا مِنَ الْمُدَلِّسِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ وَقِيلَ يَشْتَرِطُ فِي حَمْلِ الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصِرِ عَلَى السَّمَاعِ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا أَيْ الشَّيْخِ وَالرَّوَايِ عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً لِيَحْصَلَ الْأَمْنُ فِي بَاقِي الْعَنْعَنَةِ عَنْ كُفْرِهِ مِنَ الْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ تَبَعًا لِعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ النَّقَّادِ .

অনুবাদ : সমসাময়িক ব্যক্তির আনআনা -কে শোনার অর্থে গ্রহণ করতে হবে। সমসাময়িক না হলে শোনার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না; বরং তখন সেটি মুরসাল কিংবা মুনকাতি' হবে। সুতরাং আনআনাকে শোনার অর্থে গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো সমসাময়িকতা সাব্যস্ত হওয়া। তবে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে তাদের ক্ষেত্রে যারা মুদাল্লিস নন। মুদাল্লিস হলে সমসাময়িক ব্যক্তির আনআনাকেও শোনার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না।

অনেকের মতে সমসাময়িক ব্যক্তির আনআনাকে শোনার অর্থে গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো, শায়খ ও রাবীর মধ্যে একবার হলেও সাক্ষাৎ সাব্যস্ত হওয়া। তাহলে অবশিষ্ট আনআনা হাদীসগুলো মুরসালে খফী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকবে। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী প্রমুখ হাদীস যাচাইকারী মনীষীর অনুসরণে এই অভিমতটিই অধিক পছন্দনীয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ -এর সংজ্ঞা : শব্দ দ্বারা রেওয়ায়েত করাকে عَنْعَنَةٌ বলে। যে হাদীস عَنْ শব্দ যোগে রেওয়ায়েত করা হয়, তাকে حَدِيثٌ مُعَنْعَنْ বলে। যেমন- فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ভাবে রেওয়ায়েত করা।

سَمَاعٌ -এর হুকুম ও শর্ত : জুমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে কিছু শর্তসাপেক্ষে عَنْعَنَةٌ ও مُنْقَطِعٌ হিসেবে ধর্তব্য করা হবে।

১. مُعَاصِرَةٌ বা সমসাময়িকতা। مَرْوَى عَنْهُ এবং رَاوَى যদি مُعَاصِرٌ বা একই যুগের হন অর্থাৎ রাবীর مَرْوَى থেকে শোনা সম্ভব হয়, তাহলে عَنْعَنَةٌ -কে مُتَّصِلُ السَّنَدِ ধরা হবে। আর যদি مُعَاصِرٌ (সমসাময়িক) না হন, তাহলে তাবেয়ীর عَنْعَنَةٌ হলে তাকে মুরসাল অথবা পরবর্তী কারো عَنْعَنَةٌ হলে তাকে মুনকাতি' ধরা হবে।

২. রাবীর মুদাল্লিস না হতে হবে। রাবী মুদাল্লিস হলে তার عَنْعَنَةٌ -কে مُتَّصِلٌ ধরা হবে না।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, مُتَّصِلُ السَّنَدِ হওয়ার জন্য রাবী ও مَرْوَى عَنْهُ -এর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ শর্ত। ইমাম বুখারী (র.), আলী ইবনুল মাদীনী (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ মতের শ্রবক্তা। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এটাকেই رَاجِعٌ বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, مَرْوَى عَنْهُ -এর সাথে রাবীর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হলে তার হাদীসে মুআনআন মুরসালে খফী হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তা আর বাকি থাকে না।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) -এর মতে حَدِيثٌ مُعَنْعَنْ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য সমসাময়িক হওয়াটাই যথেষ্ট, সাক্ষাৎ হওয়াটা জরুরি নয়। এমনকি যারা এটাকে শর্ত করেছেন মুসলিম শরীফের ভূমিকায় তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

وَأُطْلِقُوا الْمُسَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ الْمُخَلَّفِ بِهَا تَجَوُّزًا وَكَذَا
 الْمَكَاتِبَةُ فِي الْإِجَازَةِ بِهَا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ
 بِخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يُطْلِقُونَهَا فِيمَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ مِنَ
 الْحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ سَوَاءً أَذِنَ فِي رِوَايَتِهِ أَمْ لَا لَا فِيمَا إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ
 بِالْإِجَازَةِ فَقَطْ وَاشْتَرَطُوا فِي صَحَّةِ الرَّوَايَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ إِقْتِرَانَهَا بِالْإِذْنِ
 بِالرَّوَايَةِ وَهِيَ إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ لِمَا فِيهَا مِنَ
 التَّغْيِينِ وَالتَّشْخِصِ وَصَوَّرْتُهَا أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ
 لِلطَّالِبِ أَوْ يُحْضِرُ الطَّالِبُ أَصْلَ الشَّيْخِ وَيَقُولُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ هَذِهِ
 رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَلَرَوُهُ عَنِّي وَشَرَطُهُ أَنْ يُمَكِّنَهُ أَيْضًا مِنْهُ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ
 أَوْ بِالْعَارِيَةِ لِيَنْقُلَ مِنْهُ وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ وَالْأَنْ نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ فِي الْحَالِ
 فَلَا يَتَبَيَّنُ أَرْفَعِيَّتُهُ لَكِنَّ لَهَا زِيَادَةً مَزِيدَةً عَلَى الْإِجَازَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَهِيَ أَنْ
 يُجِيزَهُ الشَّيْخُ بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ وَإِذَا
 خَلَّتِ الْمُنَاوَلَةُ عَنِ الْإِذْنِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَجَنَعَ مَنْ
 اعْتَبَرَهَا إِلَى أَنْ مُنَاوَلَتَهُ إِيَّاهُ يَقُومُ مَقَامَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ مِنْ بَلَدٍ
 إِلَى بَلَدٍ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صَحَّةِ الرَّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ الْمَجْرَدَةِ جَمَاعَةً مِنَ
 الْأَئِمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَقْتَرِنَ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ بِالرَّوَايَةِ كَانَتْهُمْ اِكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ
 وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الْكِتَابَ لِلطَّالِبِ وَبَيْنَ
 إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ إِذَا خَلَا كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْإِذْنِ .

অনুবাদ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম ‘মুশাফাহা’ -কে রূপকভাবে ঐ অনুমতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা মৌখিকভাবে দেওয়া হয়। অনুরূপ ‘মুকাতাবা’ রূপকভাবে ঐ অনুমতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যা লিখিতভাবে দেওয়া হয়। (নতুবা প্রকৃত মুশাফাহা হলো, হাদীস শুনিয়ে বা পড়িয়ে অনুমতি দেওয়া। অমূরূপ প্রকৃত মুকাতাবা হলো হাদীস শুনিয়ে বা পড়িয়ে তা বর্ণনা করতে লিখিতভাবে অনুমতি দেওয়া।) এ ধরনের অনুমতি মুতাআখখিরীনের অনেক রচনায় পাওয়া যায়; কিন্তু মুতাকদ্দিমীনের রচনায় তা পাওয়া যায় না। মুকাতাবা বলতে তারা বুঝিয়ে থাকেন শিক্ষার্থীর নিকট শায়খের কোনো হাদীস লেখে পাঠানো; তাতে তা বর্ণনার অনুমতি থাকুক বা না থাকুক। প্রথমাত্র অনুমতি লেখে পাঠালে সেক্ষেত্রে তারা মুকাতাবা শব্দটি ব্যবহার করেন না।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম ‘মুনাওয়ালা’ -এর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা শুদ্ধ হবার জন্য মুনাওয়ালার ‘রেওয়ায়েতের অনুমতি সম্বলিত’ হওয়া শর্ত করেছেন। এ শর্তযুক্ত মুনাওয়ালা অনুমতির সর্বোচ্চ প্রকার। কেননা, এতে ব্যক্তির সুনির্দিষ্টতা রয়েছে। মুনাওয়ালা হলো, শায়খ তার নিজ (হাদীসের) কপি অথবা প্রতিলিপি

(ফটোস্টিট বা কম্পোজ কপি) শিক্ষার্থীকে দেবেন অথবা শিক্ষার্থী (তার কাছে থাকা) শায়খের আসল কপি (শায়খের সামনে) উপস্থিত করবে আর উভয় অবস্থায় শায়খ শিক্ষার্থীকে বলবেন, এটা অমুক হতে আমার রেওয়ায়েত: তুমি তা আমার বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করতে পার।

(মুনওয়ালার) অনুমতির সর্বোচ্চ প্রকার হওয়ার (আরেকটি) শর্ত হলো, শায়খ শিক্ষার্থীকে মূলকপি হতে (উপকৃত হওয়ার) সুযোগ দেবেন; চাই তা মালিক বানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা ধার (কর্জ) দেওয়ার মাধ্যমে হোক। যাতে শিক্ষার্থী মূলকপি হতে হাদীস তুলে (লেখে) নিতে পারে এবং মূল কপির সাথে তার প্রতিলিপির তুলনা করে নিতে পারে। নতুবা শায়খ যদি তাকে মূলকপি দিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ ফেরত নেন, তাহলে এই মুনওয়ালার অনুমতির সর্বোচ্চ প্রকার হওয়া প্রকাশ পাবে না (অর্থাৎ এমতাবস্থায় তা সর্বোত্তম অনুমতি হবে না)। তথাপি তা ইজাযতে মু'আয়্যানার উপর অগ্রাধিকার পাবে।

ইজাযতে মু'আয়্যানা হলো, শায়খ শিক্ষার্থীকে কোনো (অনুপস্থিত) সুনির্দিষ্ট কিতাব রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেবেন সেই সাথে তিনি তা রেওয়ায়েতের পদ্ধতিতে নির্ধারণ করে দেবেন।

মুনওয়ালার সাথে যদি অনুমতি যুক্ত না থাকে, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যারা গ্রহণ করেন, তারা এটিকে এক শহর থেকে অন্য শহরে শায়খের কিতাব পাঠানোর অনুরূপ মনে করেন। বর্ণনার অনুমতি ছাড়া শুধুমাত্র লেখে পাঠানো হাদীস একদল মুহাদ্দিসের মতে বর্ণনা করা শুদ্ধ। তারা লেখে পাঠানোকেই অনুমতির নিদর্শন বলে বিবেচনা করেন। আমার নিকট অনুমতি ছাড়া ছাত্রকে শায়খের কিতাব দেওয়া ও এক শহর থেকে অন্য শহরে কিতাব পাঠানোর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمُتَّفَقَةُ -এর সংজ্ঞা: الْمُتَّفَقَةُ শব্দটি مُتَّفَقَةً -এর মাসদার। هُنَّ হতে এটা নির্গত। এর অর্থ- মুখোমুখি কথাবার্তা বলা। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় الْمُتَّفَقَةُ হলো, শায়খ যদি নির্দিষ্ট একটি হাদীস বর্ণনা করতে কাউকে মৌখিকভাবে অনুমতি দেন, তাহলে এটিকে রূপক অর্থে ইজাযত বিল মুশাফাহা বলে। প্রকৃত মুশাফাহা হলো, হাদীসটি শুনিয়ে বা পড়িয়ে অনুমতি দেওয়া।

شَاهِدِي بِالْإِجَازَةِ -এর মর্মার্থ: الْإِجَازَةُ -এর অর্থ হলো, শায়খ কর্তৃক কাউকে তার সূত্রে হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করা। চাই সে সরাসরি শায়খ থেকে হাদীস শোনে থাকুক বা না শোনে থাকুক। অনুমতি কখনো শায়খ মৌখিকভাবে প্রদান করেন। যেমন- কাউকে লক্ষ্য করে বলেন, أَجَزْتُ لَكَ الْإِجَازَةَ অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার সূত্রে রেওয়ায়েতের অনুমতি দিচ্ছি।

কখনো অনুমতি লিখিত আকারে প্রদান করেন। যেমন, কাগজে লেখে দেন- أَجَزْتُ لَكَ الْإِجَازَةَ عَنِّي। মৌখিক অনুমতি প্রদানকে مُتَّفَقَةُ বলে। আর লিখিত অনুমতিকে মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণের মতে مُكَاتَبَةُ بِالْإِجَازَةِ বলে।

مُكَاتَبَةُ -এর সংজ্ঞা: مُكَاتَبَةُ শব্দটি مُتَّفَقَةُ -এর মাসদার। এর অর্থ- পত্র লেখা। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُكَاتَبَةُ হলো, শায়খ যদি কাউকে হাদীস বর্ণনার লিখিত অনুমতি দেন, তাহলে তাকে রূপক অর্থে ইজাযত বিল মুকাতাবা বলে।

مُكَاتَبَةُ -এর অর্থ নিয়ে মতভেদ: مُكَاتَبَةُ -এর মর্মার্থ কি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. মুতাকদ্বিমীন মুহাদ্দিসগণের মতে مُكَاتَبَةُ হলো, শায়খ কর্তৃক কাগজে হাদীস লেখে কারো কাছে পাঠানো। চাই তাকে তার সূত্রে রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করুক বা না করুক।

২. মুতাআখখিরীনদের মতে হাদীস ছাড়া শুধু লিখিত অনুমতিকে مُكَاتَبَةُ بِالْإِجَازَةِ বলে।

مُكَاتَبَةُ -এর সূত্রে রাবী হাদীস বর্ণনার সময় বলবেন- مُتَّفَقَةُ আর مُكَاتَبَةُ -এর সূত্রে বলবেন- كُتِبَ لِيَ فُلَانٌ حَدَّثَنِي فُلَانٌ مُكَاتَبَةً অথবা كُتِبَ لِيَ فُلَانٌ حَدَّثَنِي فُلَانٌ مُكَاتَبَةً।

وَأُطْلِقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ الْمُنْلَفِظِ -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-
 وَأُطْلِقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا تَجَوُّزًا كَيْفُ بَاسْتَبَاقِ دَرْجَتِهِ فِي الْمَقَامِ الْمَكْتُوبِ بِهَا تَجَوُّزًا وَكَذَا الْمَكْتُوبَةُ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا تَجَوُّزًا
 وَأُطْلِقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا تَجَوُّزًا وَكَذَا الْمَكْتُوبَةُ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا تَجَوُّزًا
 -এর সংজ্ঞা : -এর মাসদার। এর অর্থ- দান করা, দেওয়া
 ইত্যাদি। উসুল হাদীসের পরিভাষায় مُنَافَاة হলো-

أَنْ يَذْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ أَوْ يُخْضِرَ الطَّالِبُ أَصْلَ الشَّيْخِ وَيَقُولُ لَهُ فِي
 الصُّورَتَيْنِ هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَأَرَوْهُ عَيْنِي .

অর্থাৎ শায়খ স্বীয় কিতাবের মূলকপি অথবা প্রতিলিপি যদি শিক্ষার্থীকে প্রদান করেন অথবা শায়খের যে
 মূলকপি ছাত্রের কাছে আছে তা ছাত্র শায়খের সম্মুখে পেশ করেন এবং শায়খ তাকে তা প্রদান করে
 বলেন যে, এটা অমুক থেকে আমার রেওয়ায়েত, তুমি তা আমার থেকে রেওয়ায়েত করো।

مُنَافَاة -এর শর্ত : ইজাযতের সর্বোত্তম পদ্ধতি مُنَافَاة হওয়ার শর্ত দুটি।

১. মুনাওয়ালার সাথে রেওয়ায়েত করার অনুমতিও থাকবে।
২. শায়খ ছাত্রকে হাদীসের মূলকপি অথবা প্রতিলিপির হয়তো মালিক বানিয়ে দেবেন অথবা তা হতে
 হাদীস উঠিয়ে নিতে ধারস্বরূপ দেবেন।

مُنَافَاة -এর প্রকারভেদ : مُنَافَاة দু প্রকার। যথা-

১. مُنَافَاة بِالْإِجَازَةِ অর্থাৎ শায়খ স্বীয় কিতাবের মূলকপি অথবা প্রতিলিপি প্রদানের সাথে সাথে এই
 বলে অনুমতি দেন যে, هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَأَرَوْهُ عَيْنِي

অর্থাৎ এগুলো আমি অমুক ওস্তাদ থেকে নিচ্ছি। এখন থেকে তুমি আমার সূত্রে রেওয়ায়েত করো।
 এ সূত্রে ছাত্র রেওয়ায়েত করার সময় বলবে- أَخْبَرَنِي فُلَانٌ مُنَافَاةً অথবা حَدَّثَنِي فُلَانٌ مُنَافَاةً

২. مُنَافَاة عَنِ الْإِجَازَةِ অর্থাৎ শায়খ ছাত্রকে কিতাবের মূলকপি অথবা প্রতিলিপি দেবেন; কিন্তু
 অনুমতি উল্লেখ করবেন না। শুধু বলবেন- هَذَا سَمَاعِي أَوْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ

مُنَافَاة -এর হুকুম : مُنَافَاة -এর প্রথম প্রকারের হুকুম হলো, এ সূত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ঐ
 শায়খের সূত্রে ঐ কিতাব থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করা জায়েজ।

আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ مُنَافَاة টা যখন অনুমতিশূন্য হবে, তখন তা রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে
 কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. জুমহুরের অভিমত : তাঁদের মতে অনুমতিহীন مُنَافَاة হলে, তখন রেওয়ায়েত করা জায়েজ নেই।
২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলিমের মতে অনুমতিহীন مُنَافَاة -ও রেওয়ায়েত করা জায়েজ।

দ্বিতীয় পক্ষের দলিল : যারা অনুমতিহীন مُنَافَاة রেওয়ায়েত জায়েজের পক্ষে তারা তাদের দাবির
 সমর্থনে দুটি দলিল পেশ করেন। যথা-

১. শায়খ ছাত্রকে কোনো কিতাব দিলে ঐ কিতাব থেকে তার রেওয়ায়েত করা জায়েজ হয়, যদিও
 সেখানে অনুমতির কথা না থাকে। সুতরাং এখানেও তদ্রূপ অনুমতিহীন مُنَافَاة হলেও তা
 রেওয়ায়েত করতে পারবে।

২. ছাত্রের কাছে কপি পাঠালেই তা রেওয়ায়েতের অনুমতির উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা, কপি
 পাঠানোর মধ্যে এ ছাড়া অন্য কোনো ফায়দা নেই। সুতরাং অনুমতিহীন কপি পেলেও তা হতে
 রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে।

সঠিক অভিমত : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মত হলো, যেহেতু
 অনুমতিহীন কিতাব পাঠানো এবং কপি পাঠানোর মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই, তাই দ্বিতীয় পক্ষের
 অভিমত শক্তিশালী বলে প্রতিভাত হয়।

وَكَذَا اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ فِي الْوِجَادَةِ وَهِيَ أَنْ يَجِدَ بِخَطِّ يَغْرِفُ كَاتِبَهُ فَيَقُولُ
وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ وَلَا يَسْرُوعُ فِيهِ إِطْلَاقُ أَخْبَرَنِي بِمَجْرَدِ ذَلِكَ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ
مِنْهُ إِذْنٌ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ وَأَطْلَقَ قَوْمٌ ذَلِكَ فَنَغْلِطُوا ، أَوْ كَذَا الْوَصِيَّةِ
بِالْكِتَابِ وَهِيَ أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ
بِأَصُولِهِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرَوِيَ تِلْكَ
الْأَصُولَ عَنْهُ بِمَجْرَدِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ
إِجَازَةٌ وَكَذَا اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ بِالرَّوَايَةِ فِي الْأَعْلَامِ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ
الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي أَرَوِي الْكِتَابَ الْفُلَانِي عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ
أُغْتَبِرَ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ .

অনুবাদ : অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিজাদা -এর ক্ষেত্রে অনুমতির শর্ত করেছেন। বিজাদা হলো, শিক্ষার্থী কোথাও হতে একটি লিখিত কপি পান, যার লেখককে তিনি চেনেন। অতঃপর তিনি (তা রেওয়ায়েত করতে গিয়ে) বলেন, আমি অমূকের লেখায় (এ হাদীস) পেয়েছি। শুধু এতটুকুর কারণে তার ক্ষেত্রে আখবারানী বলা (অর্থাৎ তা বলে রেওয়ায়েত করা) জায়েজ হবে না। হ্যাঁ, তবে শায়খ থেকে তা রেওয়ায়েতের অনুমতি তার সাথে থাকলে জায়েজ হবে (আখবারানী বলে রেওয়ায়েত করা)। যারা অনুমতি না থাকলেও আখবারানী ফুলানুন ধলে তা বর্ণনা করা শুদ্ধ মনে করেন, তারা ভুল করেন। অনুরূপভাবে কিতাবের অসিয়তের ক্ষেত্রেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম অনুমতি শর্ত করেছেন। অসিয়াত বিল কিতাব হলো, কোনো মুহাদ্দিস তার ইস্তেকাল কিংবা সফরের সময় তার হাদীসের আসল কপি বা কপিসমূহ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদানের অসিয়ত করে যাওয়া। মুতাকদ্দিমীনের একদল শুধুমাত্র অসিয়তের কারণে অসিয়তকৃত ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কিতাবসমূহ হতে হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ বলে মনে করেন; কিন্তু জুমহুরে মুহাদ্দিসীন এই জায়েজ হওয়াকে অস্বীকার করেন। অবশ্য যদি অসিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য অসিয়তকারী হতে রেওয়ায়েতের অনুমতি থাকে, তাহলে জায়েজ আছে।

অনুরূপভাবে ই'লাম-এর মধ্যেও অনুমতির শর্ত করেছেন। ই'লাম হলো, কোনো ছাত্রকে শায়খের জানানো যে, অমুক ব্যক্তি থেকে যদি আমি অমুক কিতাব বর্ণনা করি। সুতরাং শায়খ থেকে ছাত্রের জন্য যদি অনুমতি থাকে, তাহলে এ ই'লাম ধর্তব্য হবে। নতুবা এমন (অর্থাৎ অনুমতিহীন) ই'লাম ধর্তব্য হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وِجَادَةٌ -এর সংজ্ঞা : মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় وَجَادَةٌ হলো-

إِسْمٌ لِمَا أُخِذَ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيفَةٍ مِنْ غَيْرِ سَاعٍ وَلَا إِجَازَةٍ وَلَا مَسَاوَلَةٍ .

এটিকে সহজ ভাষায় এভাবে বলা যায়, ছাত্র কারো কাছ থেকে হাদীসের লিখিত একটি কপি পায়, যার লেখককে সে চিনে যে, তা অমূকে লেখেছে। এ রকম কপি পাওয়াকে وَجَادَةٌ বলে।

وَجَادَ -এর হুকুম : জুমহরের মতে وَجَادَ -এর মাধ্যমে হাদীস রেওয়ায়েত করা তখন জায়েজ যখন ঐ কিতাবের লেখক তাকে রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেবে। অনুমতি পেলে তখনই কেবল তা أَخْبَرَنِي দ্বারা রেওয়ায়েত করা জায়েজ। আর অনুমতি না হলে أَخْبَرَنِي বলে তা রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে না। তবে এভাবে বলতে পারে- وَجَدْتُ بِعَظْمٍ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের লেখায় পেয়েছি।

তবে কারো কারো মত হলো, কিতাবের লেখকের পক্ষ হতে অনুমতি থাকুক বা না থাকুক وَجَادَ -কে أَخْبَرَنِي -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ; কিন্তু তাদের এই অভিमत সঠিক নয়।

وَصَّيْتُ بِالْكِتَابِ -এর সংজ্ঞা : যদি কোনো মুহাদ্দিস তাঁর ইন্তেকাল কিংবা সফরের সময় এ মর্মে অসিয়ত করে যান যে, আমার এ কিতাব বা কিতাবসমূহ অমুককে দেবে, তাহলে এর নাম وَصَّيْتُ بِالْكِتَابِ।

অসিয়তকারীকে আরবিতে مُوصِي বলে আর যার জন্য অসিয়ত করা হয় তাকে مُوصَىٰ বলে।

وَصَّيْتُ بِالْكِتَابِ -এর হুকুম : অসিয়তের সাথে সাথে যদি مُوصَىٰ لَهُ -এর জন্য مُوصَىٰ -এর পক্ষ হতে রেওয়ায়েতের অনুমতি থাকে, তাহলে তা রেওয়ায়েত করা এবং তার জন্য اخبرني শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ।

আর যদি مُوصَىٰ হতে রেওয়ায়েতের অনুমতি না থাকে, তাহলে তা রেওয়ায়েত করা এবং তার জন্য اخبرني শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. জুমহরের মতে নাজায়েজ।

২. কতিপয় মুতাকদ্বিমীদের মতে জায়েজ।

إِعْلَامٌ -এর সংজ্ঞা : بَابُ إِفْعَالٍ শব্দটি إِعْلَامٌ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- জানানো, অবগত করানো ইত্যাদি। উসুল হাদীসের পরিভাষায় إِعْلَامٌ হলো-

هُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَيِّ نَوْءٍ أَرَوَى الْكِتَابَ الْفُلَانِي عَنْ فُلَانٍ.

অর্থাৎ কোনো ছাত্রকে শায়খের এ কথা জানানো যে, অমুক ব্যক্তি হতে আমি অমুক কিতাব রেওয়ায়েত করি।

إِعْلَامٌ -এর হুকুম : إِعْلَامٌ -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো, অনুমতি সম্বলিত হতে হবে। যদি إِعْلَامٌ -এর সাথে অনুমতি না থাকে, তাহলে তা রেওয়ায়েত করা জায়েজ কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. মুহাদ্দিসীন, ফোকাহা এবং অধিকাংশ উসুলীনদের মত হলো, إِعْلَامٌ -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ। যদিও তার সাথে অনুমতি না থাকুক।

২. তবে শাফেয়ী মতালম্বী ও অধিকাংশ মুহাক্কিকের অভিमत হলো, إِعْلَامٌ -এর দ্বারা হাদীস রেওয়ায়েত করা জায়েজ নেই। কারণ, কখনো এমনও হয় যে, শায়খ তার ছাত্রকে তার রেওয়ায়েত-সূত্র জানান, কিন্তু তাকে রেওয়ায়েতের অনুমতি দেন না।

كَالِإِجَارَةِ الْعَامَّةِ فِي الْمَجَازِ لَهُ لَا فِي الْمَجَازِ بِهِ كَانَ يَقُولُ أَجَزْتُ
لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِمَنْ أَدْرَكَ حَيَاتِي أَوْ لِأَهْلِ الْقَلْبَيْنِ أَوْ
لِأَهْلِ الْبَلَدَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّحَّةِ لِقُرْبِ الْإِنْحِصَارِ وَكَذَا
الْإِجَارَةُ لِلْمَجْهُولِ كَانَ يَقُولُ مِنْهُمَا أَوْ مُهْمَلًا وَكَذَا الْإِجَارَةُ لِلْمَعْدُومِ كَانَ
يَقُولُ أَجَزْتُ لِمَنْ سَبَّوْكَ لِفُلَانٍ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ صَحَّ كَانَ
يَقُولُ أَجَزْتُ لَكَ وَ لِمَنْ سَبَّوْكَ لَكَ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الصَّحَّةِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ
الْإِجَارَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ لِمَعْدُومٍ عَلِقَتْ بِمَشِيئَةِ الْغَيْرِ كَانَ يَقُولُ أَجَزْتُ لَكَ إِنْ
شَاءَ فَلَانٌ أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فَلَانٌ لَا أَنْ يَقُولُ أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ .

অনুবাদ : যেমন- মুজায়-লাহু তথা ছাত্রের জন্য ইজায়তে আয়াহ তথা ব্যাপকতর সাধারণ অনুমতির কোনো ধর্তব্য নেই। তবে মুজায়-বিহী তথা হাদীসের ক্ষেত্রে নয় (অর্থাৎ আম হাদীসের ব্যাপারে অনুমতি দিলে তার ধর্তব্য রয়েছে)। ইজায়তে আয়াহ হলো, যেমন- শায়খ বলবেন, আমি সকল মুসলমানকে অনুমতি দিলাম অথবা যারা আমার জীবদ্দশায় আমাকে পাবে তাদের অনুমতি দিলাম অথবা অমুক মহাদেশের লোকদের অনুমতি দিলাম অথবা অমুক শহরের লোকদের অনুমতি দিলাম। এটা অর্থাৎ কোনো শহরবাসীকে অনুমতি দেওয়াটা কিছুটা সীমাবদ্ধতার কারণে বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী। (অর্থাৎ এসব অনুমতির মধ্যে কেবল এই শেষটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।)

অনুরূপভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তির অনুমতিরও কোনো ধর্তব্য নেই। যেমন- শায়খ দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্টভাবে বলবেন (আমি এক ব্যক্তিকে বা আল্লাহর এক বান্দাকে অনুমতি দিলাম)।

অনুরূপভাবে অস্তিত্বহীন অনুমতির কোনো ধর্তব্য নেই। যেমন- শায়খ বলবেন, অমুকের যে ছেলেটি জন্ম নেবে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। অবশ্য কেউ কেউ (আবু বকর ইবনে আবু দাউদ) বলেছেন, যদি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বহীনের উপর সংযোগ (আতফ) করে বলে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। যেমন- শায়খ বলবেন, আমি তোমাকে এবং তোমার যে সন্তান জন্ম নেবে তাকে অনুমতি দিলাম। তবে সহীহ না হওয়াটাই সত্যের বেশি নিকটবর্তী।

অনুরূপভাবে উপস্থিত বা অস্তিত্বহীনের জন্য ঐ অনুমতিরও ধর্তব্য নেই যা অপরের ইচ্ছার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন- শায়খ বলবেন, যদি অমুক ব্যক্তি চায় তাহলে তোমাকে অনুমতি দিলাম। অথবা অমুক ব্যক্তি যাকে চায় আমি তাকে অনুমতি দিলাম। শায়খ এটা বলেন না যে, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যদি তুমি চাও (কেননা, এমন বলাটা শুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইজায়ত বা অনুমতির জন্য চারটি বিষয় প্রয়োজন হয়। ১. অনুমতির শব্দ উচ্চারণ করা। যেমন- এমন বলা, أَجَزْتُ لَكَ তথা আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। ২. مُجِيزٌ অর্থাৎ অনুমতিদাতা কোনো একজন হওয়া। ৩. مَجَازٌ অর্থাৎ কোনো এক ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া। এর অপর নাম لَهُ مَجَازٌ অর্থাৎ যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৪. مَجَازٌ بِهِ অর্থাৎ যার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আর তা হলো হাদীস।

إِجَارَةٌ-এর সংজ্ঞা : এর অর্থ- সাধারণ অনুমতি। তবে উসুলুল হাদীসের পরিভাষায় إِجَارَةٌ বলা হয়, শায়খ যদি বলেন- সকল মুসলমানকে কিংবা যারা আমার জীবদ্দশায় বর্তমান রয়েছে তাদেরকে কিংবা অমুক মহাদেশের লোকদেরকে কিংবা অমুক শহরের লোকদেরকে আমি অনুমতি দিলাম, তাহলে এর নাম ইজায়তে আয়াহ।

ইজাযতে আম্মাহ -এর আরেকটি অর্থ হলো, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শায়খ তার সকল হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেবেন। যেমন- বলবেন- **أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَرْوَاتِي** অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার সকল হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি দিলাম।

এ সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে প্রথম সংজ্ঞায় **مَجَازٌ لَّهِ** অর্থাৎ ছাত্র **عَام** বা অনির্দিষ্ট, আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় **مَجَازٌ لَّهِ** **عَام** হলেও **مَجَازٌ** তা **عَام**।

إِجَازَةٌ عَامَّةٌ -এর **হুকুম** : **إِجَازَةٌ عَامَّةٌ** -এর মধ্যে **مَجَازٌ** অর্থাৎ হাদীস **عَام** হলে- এমন **إِجَازَةٌ عَامَّةٌ** জায়েজ। তবে যদি **مَجَازٌ** আম বা সাধারণ হয়, তাহলে উপরোল্লিখিত সুরতের মধ্যে মাত্র একটি সুরত জায়েজ হতে পারে। আর তা হলো, শায়খ বলবেন- **أَجَزْتُ لِأَهْلِ الْبَلَدَةِ الْفُلَانِيَّةِ** অর্থাৎ আমি অমুক শহরের লোকদের অনুমতি দিলাম। এ ছাড়া বাকি কোনো **إِجَازَةٌ عَامَّةٌ** ধর্তব্য নয়।

إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُولِ -এর সংজ্ঞা : মুবহাম অথবা মুহমাল ব্যক্তিকে ইজাযত দেওয়াকে **إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُولِ** বলে। অন্য ভাষায় একে এভাবে বলা যায় যে, শায়খ কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে রেওয়ায়েতের অনুমতি দেন। যেমন- তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অথবা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে রেওয়ায়েতের অনুমতি দিলাম। অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকেই দেন কিন্তু সে নামটি অনেক ব্যক্তির হওয়ায় ব্যক্তি অজ্ঞাত থেকে যায়। যেমন- বলেন যে, আমি মুহাম্মদকে অনুমতি দিলাম। অথচ মুহাম্মদ কয়েক ব্যক্তির নাম।

إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُولِ -এর **হুকুম** : এমন অনুমতির দ্বারা হাদীস রেওয়ায়েত করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ।

إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُولِ -এর সংজ্ঞা : শায়খ কোনো ব্যক্তিকে অজ্ঞাত হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেওয়া যেমন- এমন বলা, **أَجَزْتُ لَكَ بَعْضَ مَسْنُوعَاتِي** অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার শ্রুত কিছু হাদীস রেওয়ায়েতের অনুমতি দিলাম।

إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُولِ -এর **হুকুম** : **إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُولِ** -এর ন্যায় এর দ্বারাও রেওয়ায়েত করা নাজায়েজ।

إِجَازَةٌ لِلْمَعْنُومِ -এর সংজ্ঞা : অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদানের নাম **إِجَازَةٌ لِلْمَعْنُومِ**। যেমন- শায়খ বলেন, **أَجَزْتُ لِمَنْ سَوَّلَكَ الْفُلَانُ** অর্থাৎ অমুকের যে বাচ্চা জনা নেবে তাকে অনুমতি দিলাম।

إِجَازَةٌ لِلْمَعْنُومِ -এর **হুকুম** : এমন **إِجَازَةٌ** জায়েজ আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. জুমহুরের মতে জায়েজ নেই।

২. মুতাকদিমীনের মধ্য হতে আবু বকর ইবনে আবু দাউদ সাযিসতানী এবং আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দা বলেছেন, যদি **مَعْنُوم** -কে **مَوْجُود** -এর উপর **عُطِفَ** করে যেমন বলে- **أَجَزْتُ لَكَ وَلِمَنْ سَوَّلَكَ** অর্থাৎ আমি তোমাকে ও তোমার যে পুত্র জনা নেবে তাকে অনুমতি দিলাম, তাহলে তা জায়েজ হবে।

তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, **إِجَازَةٌ لِلْمَعْنُومِ** -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ না হওয়াটাই সত্যের বেশি নিকটবর্তী।

إِجَازَةٌ مُعَلَّقَةٌ -এর সংজ্ঞা : অনুমতিকে কারো ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করাকে **إِجَازَةٌ مُعَلَّقَةٌ** বলে। যেমন- শায়খ বলেন, **أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ الْفُلَانُ** অর্থাৎ আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যদি অমুকে চায়। অথবা বলেন- **أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ الْفُلَانُ** অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি যাকে চায় আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

إِجَازَةٌ مُعَلَّقَةٌ -এর **হুকুম** : এমন **إِجَازَةٌ** -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. জুমহুরের মতে নাজায়েজ।

২. তবে আবু বকর ইবনে আবু খায়ছামাহ -এর মতে জায়েজ।

অবশ্য শায়খ যদি এমন বলেন যে, **أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ** অর্থাৎ আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যদি তুমি চাও। তাহলে এমন অনুমতির মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ হবে।

وَهَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَقَدْ جَوَزَ الرَّوَاةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى
الْمَجْهُولِ مَا لَمْ يَتَّبِعِ الْمُرَادُ مِنْهُ الْخَطِيبُ وَحِكَاةُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ
مَشَائِخِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْإِجَازَةَ لِلْمَعْدُومِ مِنَ الْقُدَمَاءِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي دَاوُدَ وَأَبُو
عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَةَ وَاسْتَعْمَلَ الْمُعْلَقَةَ مِنْهُمْ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَيْثَمَةَ وَ
رَوَى بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ جَمْعٌ كَثِيرٌ جَمَعَهُمْ بَعْضُ الْحَفَاطِ فِي كِتَابٍ وَ
رَتَّبَهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ لِكَثْرَتِهِمْ وَكُلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ
تَوَسَّعَ غَيْرُ مَرَضِيٍّ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ الْخَاصَّةَ الْمُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا
إِخْتِلَافًا قَرِيبًا عِنْدَ الْقُدَمَاءِ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ اسْتَقَرَّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا عِنْدَ
الْمُتَأَخِّرِينَ فَهِيَ دُونَ السَّمَاعِ بِالْإِتِّفَاقِ فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ فِيهَا الْإِسْتِرْسَالُ
الْمَذْكُورُ فَإِنَّهَا تَزْدَادُ ضَعْفًا لِكِنَّهَا فِي الْجُمْلَةِ خَيْرٌ مِنْ إِبْرَادِ الْحَدِيثِ
مُغْضَلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالِئِذَا هُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ فِي أَقْسَامِ صَنِيعِ الْأَدَاءِ .

অনুবাদ : মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যতীত উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে খতীবে বাগদাদী (র.) হাদীস বর্ণনা
জায়েজ মনে করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজের কতিপয় শায়খের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন।
মুতাকাদিমীনের মধ্য থেকে আবু বকর ইবনে আবু দাউদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মান্না (র.) মা'দুম ও
অস্তিত্বহীনকে অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর ইবনে আবু খায়ছামা প্রমুখ মুতাকাদিম শর্তসাপেক্ষে
অনুমতি দিয়েছেন। ইজাযতে আম -এর উপর ভিত্তি করে বিরাট একদল হাদীস বর্ণনা করেছেন।
কোনো কোনো হাফিজুল হাদীস বর্ণক্রমানুসারে তাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করেছেন। কিন্তু ইবনুস
সালাহ -এর মতে অনুমতির ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপকতা সমীচীন নয়। কেননা, সুনির্দিষ্টরূপে পাঠ ছাড়া
ইজাযতে মু'আয্যানা (মুতাআখখিরীন যা আমল করেন) সম্পর্কেই মুতাকাদিমীনের কড়া দ্বিমত ছিল।
সে কারণে প্রত্যক্ষভাবে শোনার চেয়ে এর মর্যাদা সকলেরই মতে কমে গেছে। অতঃপর এ ধরনের
ব্যাপকতার কারণে অনুমতির মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তথাপি কোনো একটি হাদীসকে মু'যাল বা
মু'আল্লাকরূপে বর্ণনা করার চেয়ে এ ধরনের অনুমতির উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করাও অধিক উত্তম।
আল্লাহ ভালো জানেন। হাদীস বর্ণনার শব্দের প্রকারসমূহের আলোচনা সমাপ্ত হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১. **إِجَازَةٌ عَامَّةٌ** ২. **إِجَازَةٌ لِلْمَعْدُومِ** ৩. **إِجَازَةٌ مُعْلَقَةٌ** ইত্যাদি নাজায়েজ হওয়াটা হলো জুমহুরের
অভিমত। আর এটাই সর্বাধিক বিতর্কিত। তবে এগুলো খতীবে বাগদাদীর মতে জায়েজ; অবশ্য **إِجَازَةٌ**
لِلْمَجْهُولِ -এর ক্ষেত্রে অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় না পাওয়া গেলে তখন আবার এটা নাজায়েজ। আর
যদি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে তা জায়েজ।

إِجَازَةٌ خَاصَّةٌ -এর সংজ্ঞা : শায়খ ছাত্রকে অনুমতি দেবেন; কিন্তু ছাত্র শায়খের সামনে কিছু পড়বে না-
এর নাম **إِجَازَةٌ خَاصَّةٌ**।

إِجَازَةٌ خَاصَّةٌ -এর **হুকুম** : মুতাকাদিমীনের মাঝে এটা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কঠিন মতভেদ থাকলেও
মুতাআখখিরীনের মতে তা জায়েজ। এমন ইজাযতের মতবাদের জুমহুরের মতে **سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ** থেকে নিম্নের।
কিন্তু তারপরেও তা অর্থাৎ এমন ইজাযত **مُغْضَلٌ** বা **مُعْلَقٌ** করে হাদীস বর্ণনার চেয়ে ভালো। অবশ্য তকী ইবন
মুখার্রাম প্রমুখের মতে **إِجَازَةٌ خَاصَّةٌ** এবং **سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ** মর্যাদাগত দিক দিয়ে উভয় বরাবর।

ثُمَّ الرُّوَاةُ إِنْ اتَّفَقَتْ أَسْمَائُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا وَاخْتَلَفَتْ
أَشْخَاصُهُمْ سَوَاءٌ إِنْ اتَّفَقَ فِي ذَلِكَ إِثْنَانٍ مِنْهُمْ أَمْ أَكْثَرُ وَكَذَلِكَ إِذَا اتَّفَقَ
إِثْنَانٍ فَصَاعِدًا فِي الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ فَهُوَ التَّنَوُّعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُتَّفَقُ
وَالْمُفْتَرَقُ وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ خَشْيَةٌ أَنْ يُظَنَّ الشَّخْصَانِ شَخْصًا وَاحِدًا وَقَدْ
صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ كِتَابًا حَافِلًا وَقَدْ لَحَّضْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا
كَثِيرًا وَهَذَا عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّنَوُّعِ الْمُسَمَّى بِالْمُهْمَلِ لِأَنَّهُ يَخْشَى
مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الْوَاحِدُ إِثْنَيْنِ وَهَذَا يَخْشَى أَنْ يُظَنَّ الْإِثْنَانِ وَاحِدًا .

অনুবাদ : যদি দুই বা ততোধিক রাবীর নাম, তাদের পিতার নাম এবং তারও উপরের (অর্থাৎ পিতামহের) নাম এক হয়, অনুরূপ উপনাম ও বংশ পরিচয় এক হয় কিন্তু ব্যক্তি পৃথক পৃথক হয়, তাহলে তাকে বলে মুত্তাফিক ও মুফতারিক (নামের দিক দিয়ে মুত্তাফিক তথা এক কিন্তু অপর দিক তথা ব্যক্তির দিক দিয়ে মুফতারিক তথা ভিন্ন ভিন্ন)। এটি জানার উপকারিতা হলো, দুই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা। খতীবে বাগদাদী (র.) এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি তার সারসংক্ষেপ করেছি এবং তাতে আরো অনেক বিষয় সংযোজন করে দিয়েছি। এ শ্রেণিরই বিপরীত হলো ইতঃপূর্বে উল্লিখিত মুহমাল (বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়বিশিষ্ট একক রাবী)। সেখানে একই ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তি বলে ধারণা করার আশঙ্কা থাকে। আর এখানে একাধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করার আশঙ্কা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের কয়েক প্রকারের আলোচনা ইতঃপূর্বে চলে গেছে। আর তা হলো, ১. সাবিক-লাহিক, ২. মুহমাল, ৩. মুবহাম, ৪. মান হাদাছা ওয়া নাসিয়া এবং ৫. মুসালসাল। এখান থেকে রাবীদেরই আরো কয়েক প্রকারের আলোচনা করা হচ্ছে। তবে এটা হলো রাবী নির্ণয়ে সন্দেহের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাবীদের নাম, উপনাম, ইত্যাদি এক হওয়ার কারণে অনেক সময় সন্দেহ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এখানে ব্যক্তি একজনই নাকি একাধিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ রাবী নির্ণয়ে জটিলতার দিক দিয়ে রাবী তিন প্রকার। ১. মুত্তাফিক-মুফতারিক, ২. মুতালিফ-মুখতালিফ ও ৩. মুতাশাবিহ।

مُتَّفِقٌ - مُفْتَرِقٌ সম্পর্কে আলোচনা : লেখক এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ১. সংজ্ঞা, ২. ফায়দা ও ৩. এদের ও মুহমালের মধ্যে পার্থক্য। নিম্নে এ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ - إِسْمٌ فَاعِلٌ হতে **بَابُ إِنْتِعَالٍ** -এর আভিধানিক অর্থ : **مُفْتَرِقٌ - مُتَّفِقٌ** (মুত্তাফিক) অর্থ- এক, একমত ইত্যাদি। আর **مُفْتَرِقٌ** (মুফতারিক) অর্থ- ভিন্ন, পৃথক ইত্যাদি।

مُتَنَرِّقٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় مُتَنَرِّقٌ ও مُتَنَرِّقٌ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-
مَوْماً اِئْتَفَقَتْ اَسْمَاءُ الرِّوَاةِ اَوْ مَعَ اَسْمَاءِ الْاَبَاءِ فَصَاعِدًا فِى اِنْسَانٍ مِنْهُمْ اَمْ اَكْثَرُ وَكَذَلِكَ اِئْتَفَقَ
اِنْسَانٌ فَصَاعِدًا فِى الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ وَاخْتَلَفَتْ اِخْتِصَاصُهُمْ.

অর্থাৎ দুই বা ততোধিক রাবীর নাম অথবা তাদের নামের সাথে সাথে তাদের পিতা, পিতামহের নাম, উর্ধ্বতন পুরুষের নাম অনুরূপ উপনাম ও বংশ পরিচয় এক হওয়া; কিন্তু তাদের ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া।

নামকরণ : এমন রাবীদের নাম যেহেতু উচ্চারণে ও লেখায় এক হয়, তাই একে মুত্তাফিক বলে। সাথে সাথে যেহেতু তারা ব্যক্তি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই একে মুফতারিক বলে।

مُتَنَرِّقٌ -এর কয়েকটি সূরত : এদের কয়েকটি ধরন হতে পারে।

১. কয়েকজন রাবীর নিজের নাম ও পিতার নাম এক। যেমন- খলীল ইবনে আহমাদ নামে কয়েকজন রাবী রয়েছেন।
২. কয়েকজন রাবীর নিজের নাম, পিতার নাম এবং দাদার নাম এক। যেমন- আহমাদ ইবনে জা'ফর ইবনে হামদান নামে একই স্তরের চার রাবী রয়েছেন।
৩. কয়েকজনের কুনিয়াত এবং নিসবত এক। যেমন- আবু ইমরান জাওনী নামে দুজন রাবী রয়েছেন।
৪. কয়েকজন রাবীর নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের নিসবত এক। যেমন- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী নামে দুজন রাবী আছেন।
৫. কয়েকজন রাবীর কুনিয়াত এবং পিতার নাম এক। যেমন- আবু বকর ইবনে আব্বাস নামে তিনজন রাবী রয়েছেন।

مُتَنَرِّقٌ -এর ফায়দা : এরা ফায়দা ও লাভ দুটি। যথা-

১. দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে মনে করা হতে নিরাপদ থাকা যায়।
২. একই নামের কয়েকজন রাবীর মধ্য হতে কেউ নির্ভরযোগ্য হন, কেউ হন দুর্বল। مُتَنَرِّقٌ ও مُتَنَرِّقٌ -এর عِلْمٌ না থাকলে কে নির্ভরযোগ্য আর কে দুর্বল তা জানা যায় না; বরং صَمِيغٌ ও ثِقَةٌ নির্ণয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

مُتَنَرِّقٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে تَبَايُنٌ -এর নিসবত অর্থাৎ একটি অপরাট হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও বিপরীত। আর তা হলো, مُتَنَرِّقٌ -এর মধ্যে এক রাবীকে কয়েকজন রাবী মনে করার সম্ভাবনা থাকে। আর مُتَنَرِّقٌ -এর মধ্যে একাধিক রাবীকে একজন মনে করার আশঙ্কা থাকে।

وَأَنَّ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا سِوَاهُ كَانَ مَرْجِعُ الْإِخْتِلَافِ
النَّقْطُ وَالشَّكْلُ فَهُوَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ وَمَعْرِفَتُهُ مِنْ مِهْمَاتِ هَذَا
النِّصْنِ حَتَّى قَالَ عَلَى بْنُ الْمَدِينِيِّ أَشَدَّ التَّضْحِيفِ مَا جَمَعَ فِي الْأَسْمَاءِ وَ
وَجْهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ وَلَا قَبْلَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا
بَعْدَهُ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ لِكُنْهَ أَضَافَهُ إِلَى كِتَابِ
التَّضْحِيفِ لَهُ ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِالتَّالِيفِ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فَجَمَعَ فِيهِ
كِتَابَيْنِ كِتَابًا فِي مُشْتَبِهِ الْأَسْمَاءِ وَكِتَابًا فِي مُشْتَبِهِ التَّنْسِبِ وَجَمَعَ
شَيْخُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا ثُمَّ جَمَعَ الْخَطِيبُ ذَيْلًا ثُمَّ جَمَعَ
الْجَمِيعُ أَبُو نَصْرِ بْنُ مَازُولًا فِي كِتَابِهِ الْإِكْمَالِ وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي
كِتَابٍ آخَرَ فَجَمَعَ فِيهِ أَوْهَامَهُمْ وَبَيَّنَّهَا وَكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعَ مَا جُمِعَ فِي
ذَلِكَ وَهُوَ عُمْدَةٌ كُلِّ مُحَدِّثٍ بَعْدَهُ وَقَدْ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ ثَقَطَةَ
مَا فَاتَهُ أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَهُ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ ثُمَّ ذَيْلٌ عَلَيْهِ مَنْصُورُ بْنُ سَلِيمٍ
بِفَتْحِ السِّينِ فِي مُجَلَّدٍ لَطِيفٍ وَكَذَلِكَ أَبُو حَامِدٍ بْنُ الصَّابُونِيِّ وَجَمَعَ
الذَّهَبِيُّ فِي ذَلِكَ مُخْتَصَرًا جَدًّا اعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى الضَّبْطِ بِالْقَلَمِ فَكَثُرَ
فِيهِ الْغَلَطُ وَالتَّضْحِيفُ الْمُبَايْنُ لِمَوْضُوعِ الْكِتَابِ وَقَدْ يَسَّرَنَا اللَّهُ
تَعَالَى لِمَوْضُوعِهِ فِي كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ بِتَبْصِيرِ الْمُتَنَبِّهِ بِتَحْرِيرِ
الْمُشْتَبِهِ وَهُوَ مُجَلَّدٌ وَاحِدٌ فَضَبَّطْتُهُ بِالْحُرُوفِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَرْضِيَّةِ وَزِدْتُ
عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيرًا مِمَّا أَهْمَلَهُ أَوْ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ .

অনুবাদ : যদি একাধিক রাবীর নাম লেখার পদ্ধতিতে এক হয় কিন্তু উচ্চারণের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে এর নাম হয় মু'তালিফ ও মুখতালিফ। উচ্চারণের পার্থক্যের কারণ হয় নুকতা আবার কখনো হয় আকৃতি। এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা ইলমুল হাদীসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি আলী ইবনুল মাঈনী (র.) বলেন, নামের ক্ষেত্রে যে বিকৃতি হয় তা খুবই জটিল। কেননা, এটি যেমন যুক্তিতে ধরা পড়ে না, তেমনি আগ-পিছের বর্ণনা থেকেও বুঝা যায় না। এ বিষয়ে আবু আহমদ আসকারী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি এটিকে তার 'আত-তাসহীফ' কিতাবের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, তাই আব্দুল গনী ইবনে মাযীদ স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি তিনি দু পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বে বিভ্রাটপূর্ণ নামসমূহ এবং দ্বিতীয় পর্বে বিভ্রাটপূর্ণ পরিচয়সমূহ উল্লেখ করেছেন। আব্দুল গনীর শায়খ ইমাম দারাকুতনীও এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতঃপর খতীব বাগদাদী এর পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। অতঃপর এসব কিতাবকে আবু নসর মাকুলা তার 'ইকমাল' গ্রন্থে একত্রিত করে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে যেসব বিষয় বাদ পড়ে

গিয়েছিল আবু নসর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সেগুলোকে উল্লেখ করে সকলের সন্দেহকে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বস্তুত আবু নসরের কিতাবে যেহেতু সকল কিতাবের বিষয়বস্তু সমাবিষ্ট হয়েছিল সেজন্য তার পরের মুহাদ্দিসগণের নির্ভরতা ছিল এ কিতাবের উপর। আবু নসরের কিতাব থেকে যা কিছু বাদ পড়ে গিয়েছিল কিংবা পরবর্তীতে উদ্ধৃত হয়েছিল, সেগুলোর অভাব পূরণ করেন আবু বকর ইবনে নুকতা তার এক বৃহৎ গ্রন্থে। অতঃপর মানসুর ইবনে সালীম ও আবু হামিদ সাবুনী এরও পরিশিষ্ট রচনা করেন। ইমাম যাহাবীও এ বিষয়ে একটি খুব সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এতে তিনি হরকত ও নুকতা শুধুমাত্র চিহ্ন দ্বারা দিয়েছেন (শব্দে বর্ণনা করেননি), তাই তাতে প্রচুর বিকৃতি ও ভুল হয়েছে, যা কিতাবের বিষয়বস্তুর সাথে সাযুজ্যহীন। (কেননা, কিতাবটি লেখাই হয়েছে ভুল শোধরানোর জন্য।) আল্লাহ তা'আলা আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। আমি এগুলোকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি এক গ্রন্থে যার নাম 'তাবনীকুল মুনতাবিহ বিতাহরীরিল মুশতাবিহ'। এটি একটি বৃহৎ কিতাব। এতে আমি নামগুলোকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে বর্ণমালা দ্বারা আয়ত্ত করে দিয়েছি। তা ছাড়া ইমাম যাহাবী যে বিষয়গুলো বাদ দিয়েছিলেন এবং যা তিনি অবহিত ছিলেন না, সেগুলোকেও আমি এর সাথে সংযোজন করে দিয়েছি। এর সকল প্রশংসা আল্লাহর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاجِدٌ مُدَّتَرٌ - اسمٌ فاعِلٌ - হতে بِابِ اِفْعَالٍ - এর আভিধানিক অর্থ : مُخْتَلِفٌ - এর مُؤْتَلِفٌ - একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া। আর مُخْتَلِفٌ - ভিন্ন হওয়া।

مُخْتَلِفٌ - এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُؤْتَلِفٌ - এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ - مُؤَانٌ تَاتِلُ الْاَنْسَاءُ اَوِ الْاَلْقَابُ اَوِ الْاَتْسَابُ خَطَا وَتَخْتَلِفُ نُطْقًا

অর্থাৎ যদি দুই বা ততোধিক রাবীর নাম অথবা উপাধি কিংবা বংশের নাম লেখায় এক রকম হয় কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন হয়, তবে তাকে الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ বলে।

উদাহরণ : যেমন- ১. مِسْرُ (মীম যের, সীন সাকিন এবং ওয়াও যবর) এবং مِسْرُ (মীম পেশ, সীন যবর, ওয়াও মুশাদ্দাদ যবর)। ২. سَلَامٌ (সালাম) তামাদীদ ছাড়া এবং سَلَامٌ (সালাম) তামাদীদযুক্ত ইত্যাদি।

নামকরণের কারণ : যেহেতু এ সকল রাবীর নাম লেখায় এক রকম হয়, তাই তাকে مُؤْتَلِفٌ বলে। পক্ষান্তরে উচ্চারণে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই তাকে مُخْتَلِفٌ বলে।

مُؤْتَلِفٌ - مُخْتَلِفٌ জানার ফায়দা : এর বড় লাভ হলো, এর মাধ্যমে বিকৃতি এবং পরিবর্তন হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

تَضَعِيفٌ فِي السَّنَدِ ২. تَضَعِيفٌ فِي الْمَتْنِ ১. বা বিকৃতি দু প্রকার। ১. تَضَعِيفٌ فِي الْمَتْنِ : এর মধ্যে দ্বিতীয়টি বুঝা প্রথমটি হতে বেশি জটিল। কেননা, তার জন্য এমন কোনো নির্দেশনা থাকে না, যা দ্বারা তাসহীফ বা বিকৃত হওয়া না হওয়া জানা যায়। কিন্তু تَضَعِيفٌ فِي الْمَتْنِ তা এর বিপরীত। কেননা, সেখানে আগে-পিছে দেখে তাসহীফ হওয়া না হওয়া সম্পর্কে জানা যায়।

الْمُتَّفِقُ وَالْمُتَّفِرُّ - এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে পার্থক্য হলো, الْمُتَّفِقُ وَالْمُتَّفِرُّ - এর মধ্যে রাবীর নাম উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়; পক্ষান্তরে الْمُتَّفِقُ وَالْمُتَّفِرُّ - এর মধ্যে রাবীর নাম উচ্চারণে এক হয়।

وَأِنْ اِتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًا وَنُطْقًا وَاخْتَلَفَتِ الْأَبَاءُ نُطْقًا مَعَ اِتِّفَاقِهَا خَطًا كَمُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يَضْمُهَا فَالْأَوَّلُ نَيْسَابُورِيُّ وَالثَّانِي فَرَبَائِيٌّ وَهُمَا مَشْهُورَانِ وَطَبَقْتُهُمَا مُتَّفَاقَةً أَوْ بِالْعَكْسِ كَانَ يَخْتَلِفُ الْأَسْمَاءُ نُطْقًا وَيَاتَلِفُ خَطًا وَيَتَّفِقُ الْأَبَاءُ خَطًا وَنُطْقًا كَشُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ وَسُرَيْحِ ابْنِ النُّعْمَانِ الْأَوَّلُ بِالسِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ تَابِعِيُّ يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالثَّانِي بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ وَهُوَ مِنْ شَيْوخِ الْبُخَارِيِّ فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُتَشَابِهُ وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ الْاِتِّفَاقُ فِي الْإِسْمِ وَإِسْمِ الْآبِ وَالْاِخْتِلَافُ فِي التَّنْسِبَةِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ كِتَابًا جَلِيلًا سَمَاهُ تَلْخِصَ الْمُتَشَابِهِ ثُمَّ ذَلَّلَ عَلَيْهِ أَيْضًا بِمَا فَاتَهُ أَوَّلًا وَهُوَ كَثِيرُ الْفَائِدَةِ.

অনুবাদ : যদি রাবীদের নামের আকৃতি ও উচ্চারণ সমান হয়, কিন্তু তাদের পিতার নামের আকৃতি সমান ও উচ্চারণ পৃথক হয়, যেমন- মুহাম্মদ ইবনে আকীল ও মুহাম্মদ ইবনে উকাইল; প্রথমজন নিশাপুরী, অপরজন ফিরয়াবী, দুজনেই প্রসিদ্ধ এবং দুজনের স্তর কাছাকাছি, অথবা এর বিপরীত রূপ অর্থাৎ রাবীদের নামের আকৃতি সমান কিন্তু উচ্চারণ পৃথক এবং তাদের পিতার নামের আকৃতি ও উচ্চারণ সমান। যেমন- শুরায়হ ইবনুন নুমান ও সুরায়জ ইবনুন নুমান, প্রথমজন শীন ও হা সহকারে, তাবেরী, হযরত আলী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয়জন সীন ও জীম সহকারে, ইমাম বুখারীর অন্যতম শায়খ। এ ধরনের রাবীদেরকে বলা হয় মুতাশাবিহ। তেমনি যদি রাবীদের ও তাদের পিতার নামে উচ্চারণ ও আকৃতির দিক দিয়ে মিল থাকে, কিন্তু বংশ পরিচয় ভিন্ন হয়, তাহলে তাকেও মুতাশাবিহ বলা হয়।

মুতাশাবিহ সম্পর্কে খতীবে বাগদাদী একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার তিনি নাম দিয়েছেন তালখীসুল মুতাশাবিহ। অতঃপর তার একটি পরিশিষ্ট রচনা করে প্রথমে যেসব বিষয় বাদ পড়ে গিয়েছিল তা পূরণ করে দিয়েছেন। গ্রন্থটি খুবই উপকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَشَابِه - মূলত কোনো একক প্রকার না; বরং তা পূর্বোক্ত দু প্রকারের মাধ্যমে গঠিত হয়। নিম্নে **مُتَشَابِه** -এর সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

مُتَشَابِه -এর আভিধানিক অর্থ : **مُتَشَابِه** শব্দটি **تَفَاعُل** হতে **بَابِ فَاعِلٍ** হতে **إِسْمُ فَاعِلٍ** -এর **وَاجِدٌ مُدْكَرٌ** -এর অর্থ- সদৃশ, সাদৃশ্যপূর্ণ, সাদৃশ্য ইত্যাদি।

مُنْشَاهُ -এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হলো-

مُوَازِنٌ تَفْقَهُ اسْمَاءُ الرُّوَاةِ لَفْظًا وَخَطًّا وَتَخْتَلِفُ اسْمَاءُ الْآبَاءِ لَفْظًا لَا خَطًّا أَوْ الْعَكْسُ .

অর্থাৎ যদি দুই বা ততোধিক রাবীর নাম উচ্চারণ ও লেখায় এক রকম হয়, কিন্তু তাদের পিতাদের নাম উচ্চারণে ভিন্ন তবে লেখায় এক রকম অথবা রাবীদের পিতার নাম উচ্চারণে ও লেখায় এক, কিন্তু রাবীদের নাম উচ্চারণে ভিন্ন অথচ লেখায় এক রকম, তাহলে একে বলে মুতাশাবিহ।

مُنْشَاهُ -এর সুরত : এ সংজ্ঞা প্রমাণ করে যে, الْمُنْشَاهُ -এর সুরত তিনটি। যথা-

১. এ এক নামীয় রাবী যাদের পিতার নাম লেখতে এক, কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন। যেমন- مُحَمَّدُ بْنُ -
مُعْمَدُ بْنُ عَقِيلٍ এবং عَقِيلُ । এর মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ হলো মুহাম্মদ ইবনে আকীল আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ মুহাম্মদ ইবনে উকাইল। প্রথমজন নিশাপুরী আর দ্বিতীয়জন ফিরয়াবী।
২. রাবীদের পিতার নাম উচ্চারণ ও লেখায় এক কিন্তু রাবীদের নাম উচ্চারণে ভিন্ন, কিন্তু লেখায় এক।
যেমন- سُرَيْجُ بْنُ عُفَّانٍ এবং سُرَيْجُ بْنُ عُفَّانٍ । এর মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ শুরায়হ ইবনে নু'মান আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ সুরায়য ইবনে নু'মান। প্রথমজন তাবেয়ী আর দ্বিতীয়জন ইমাম বুখারীর ওস্তাদ।
৩. রাবীদের এবং তাদের পিতার নাম লেখায় এবং উচ্চারণে এক কিন্তু নিসবত উচ্চারণে ভিন্ন হলেও লেখায় এক। যেমন- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَخْرِمِيٍّ এবং مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَخْرِمِيٍّ । এর মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ মাখিরমী আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ মাখিরমী। প্রথমজন ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম নাসায়ীর শায়খ আর দ্বিতীয়জন ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র।

وَيَتَرَكَبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَحْصُلَ الْإِتْفَاقُ أَوْ الْإِسْتِبَاهُ فِي الْأِسْمِ
وَالِاسْمِ الْأَبِ مَثَلًا إِلَّا فِي حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ فَكَثُرَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا وَهُوَ
عَلَى قِسْمَيْنِ أَمَّا بِأَنْ يَكُونَ الْإِخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيرِ مَعَ أَنَّ عَدَدَ الْحُرُوفِ ثَابِتَةٌ
فِي الْجِهَتَيْنِ أَوْ يَكُونَ الْإِخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيرِ مَعَ تَقْصَانِ بَعْضِ الْأَسْمَاءِ عَنْ
بَعْضٍ فَمِنْ أَمْثَلِهِ الْأَوَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ بِكسْرِ السِّينِ الْمُهِمْلَةِ وَتَوْنَيْنِ
بَيْنَهُمَا أَلِفٌ وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْعَوْفِيُّ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالْوَارِثُ ثُمَّ الْقَافُ شَيْخُ
الْبُخَارِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَبَّارٍ يَفْتَحُ السِّينِ الْمُهِمْلَةَ وَتَشْدِيدُ الْبَاءِ التَّخْتَانِيَّةِ
وَبَعْدَ الْأَلِفِ رَاءٌ وَهُمْ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْبَسَامِيُّ شَيْخُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ
وَمِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهِمْلَةِ وَتَوْنَيْنِ الْأَوَّلَى مُفْتُوحَةٌ
بَيْنَهُمَا يَاءٌ تَخْتَانِيَّةٌ تَابِعِيُّ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ
بِالْجِيمِ بَعْدَهَا بَاءٌ مَوْحَدَةٌ وَآخِرُهُ رَاءٌ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ تَابِعِيُّ
مَشْهُورٌ أَيْضًا وَمِنْ ذَلِكَ مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ وَمُطَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ
بِالطَّاءِ بَدَلُ الْعَيْنِ شَيْخٌ آخَرُ يَرْوِي عَنْهُ أَبُو حَازِمَةَ النَّهْدِيُّ وَمِنْهُ أَيْضًا أَحْمَدُ
بْنُ الْحُسَيْنِ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَآخَرُونَ وَ أَحَبُّ بَنِي الْحُسَيْنِ مِثْلُهُ لَكِنْ
بَدَلُ النِّمِيمِ يَاءٌ تَخْتَانِيَّةٌ وَهُوَ شَيْخُ بُخَارِيِّ يَرْوِي عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
النِّبْكَانْدِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ شَيْخُ بُخَارِيِّ مَشْهُورٌ مِنْ طَبَقَةِ
مَالِكٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ شَيْخُ مَشْهُورٌ شَيْخُ لَعْبِيدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْكُوفِيِّ
الْأَوَّلِ بِالْحَاءِ الْمُهِمْلَةِ وَالْفَاءِ بَعْدَهَا صَادٌ مُهِمْلَةٌ وَالثَّانِي بِالْجِيمِ وَالْعَيْنِ
الْمُهِمْلَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ ثُمَّ رَاءٌ.

অনুবাদ : মুতাফিক, মু'তাফি ও মুতাশাবিহ -এর সংমিশ্রণে আরো কিছু শ্রেণি সৃষ্টি হয়। যেমন-

১. রাবীদের বা তাদের পিতার কিংবা উভয়ের নামে একা কিংবা সাদৃশ্য (ইতিফাক বা ইশতিবাহ) থাকলেও কোনো একটিতে এক হরফ, দুই হরফ কিংবা ততোধিক হরফে গড়মিল থাকে, কিংবা উভয়টিতে গড়মিল থাকে। এটি আবার দু প্রকার।

ক. ইতিফাক বা ইশতিবাহ সৃষ্টি হয়েছে বিকৃতির কারণে। বস্তুত হরফ-সংখ্যা দু জায়গাতেই (সমানভাবে) বহাল আছে।

খ. কোনো একটি নামে হরফ-সংখ্যা কমিয়ে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ : مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (মুহাম্মদ ইবনে সিনান)। নুকতাহীন 'সীন' -এ যের ও

দুটি 'নূন' যাদের মাঝে একটি 'আলিফ' রয়েছে। এ নামে অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম বুখারীর শায়খ আওয়াকী (عَوَاقِي)। 'আইন' ও 'ওয়াও' -তে যবর অতঃপর দুই নুকতাবিশিষ্ট 'কুফ'।

مُعَمَّدُ بْنُ سَبَّارٍ (মুহাম্মদ ইবনে সায়য়ার)। নুকতাহীন সীনে যবর, নিচে নুকতাবিশিষ্ট ইয়া -এ তাশদীদ এবং আলিফ -এর পরে 'রা'। এ নামেও অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। একজন হলেন ওমর ইবনে ইউনুস -এর শায়খ যামামী (রা.)।

مُعَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ (মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন)। নুকতাহীন 'হা' পেশ অতঃপর দুটি 'নুন', যাদের মাঝখানে একটি নিচে নুকতাবিশিষ্ট 'ইয়া', প্রথম 'নুন' -এ যবর। ইনি একজন তাবেয়ী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

مُعَمَّدُ بْنُ جَبْرِ (মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর)। 'জীম' -এ পেশ অতঃপর এক নুকতাবিশিষ্ট 'বা', শেষে 'রা'। ইনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম, একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী।

مُعَرَّرُ بْنُ وَاصِلٍ (মুআররফ ইবনে ওয়াসিল) কুফী। ইনি খুব প্রসিদ্ধ।

مُطَرَّرُ بْنُ وَاصِلٍ (মুতাররফ ইবনে ওয়াসিল)। 'আইন' -এর স্থলে ত্বা। ইনি অপর এক মনীযী। আবু হযায়ফা নাহদী তাঁর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنٍ (আহমাদ ইবনে হুসাইন)। ইনি হলেন ইব্রাহীম ইবনে সা'দ-এর সাথি। এছাড়া এ নামে আরো অনেক ব্যক্তি রয়েছেন।

أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنٍ (আহমাদ ইবনে হুসাইন)। এখানে 'মীম' -এর স্থলে নিচে নুকতাবিশিষ্ট 'ইয়া'। ইনি বুখারার জনৈক মুহাদ্দিস। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আলবিকান্দী তাঁর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ (হাফস ইবনে মায়সারা)। ইনি বুখারার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং ইমাম মালিকের সমসাময়িক।

جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ (জা'ফর ইবনে মায়সারা)। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা আল-কুফী শায়খ।

প্রথম ব্যক্তির (শেষ দুজনের মধ্য হতে) নামে নুকতাহীন 'হা' ও এক নুকতাবিশিষ্ট 'ফা', শেষে 'সাদ'। দ্বিতীয়জনের নামে রয়েছে 'জীম' ও নুকতাহীন 'আইন', শেষে 'ফা' ও 'রা'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَنَلِّفٌ - مُتَغَلِّفٌ এবং مَتَّابٌ এ দু প্রকারের সংমিশ্রণে অতিরিক্ত আরো কয়েক প্রকার গঠিত হয়। যথা-

১. রাবীর নাম এবং তাদের পিতার নাম সমস্ত হরফে এক হবে, কিন্তু দু-একটি অক্ষর এক হবে না। যে হরফসমূহে এ একা ও ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তা আবার দু প্রকার। যথা-

ক. ভিন্নতা কোনো অক্ষর পরিবর্তন হওয়ার কারণে হবে; কিন্তু হরফ-সংখ্যা একই থাকবে। যেমন-
أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنٍ এবং أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ। এরা দুজন রাবী। এদের মধ্যে শুধু মীম ও ইয়া -এর ক্ষেত্রে ভিন্নতা, কিন্তু উভয়ের হরফ-সংখ্যা একই। সম্মানিত লেখক এর আরো কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন-
مُعَمَّدُ بْنُ سَبَّارٍ এবং مُعَمَّدُ بْنُ سَبَّانٍ। অনুরূপ جَبْرِ بْنُ جَبْرِ এবং حُسَيْنِ بْنُ حُسَيْنٍ। অনুরূপ وَاصِلِ بْنِ مُعَرَّرٍ এবং وَاصِلِ بْنِ مُطَرَّرٍ ইত্যাদি।

খ. ভিন্নতা হবে দু-এক হরফে পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং হরফ-সংখ্যাও সমান হবে না; বরং কমবেশি হবে। যেমন-
جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ এবং حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ। এরা দুজনের মধ্যে হরফের পরিবর্তনের সাথে সাথে হরফ-সংখ্যাও এক নেই। কারণ, حَفْصُ -এর মধ্যে جَعْفَرُ থেকে এক হরফ কম। এর আরো উদাহরণ লেখক পেশ করেছেন।

جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ এবং حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ -কে সম্মানিত লেখক جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ এবং حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ -কে প্রথম প্রকারের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে শুধু অক্ষরের পরিবর্তন ঘটে, অক্ষর-সংখ্যা সমান থাকে। কিন্তু এ প্রকারের উদাহরণ হিসেবে جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ ও حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ উল্লেখ করাটা ভুল হয়েছে। কেননা, এখানে অক্ষরের পরিবর্তনের সাথে সাথে অক্ষর সংখ্যাও কমবেশি হয়েছে। কেননা, جَعْفَرُ -এর মধ্যে হরফ-সংখ্যা চারটি; পক্ষান্তরে حَفْصُ -এর মধ্যে হরফ-সংখ্যা তিনটি। তাই এটাকে প্রথম প্রকারের উদাহরণ না বলে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত করাই উচিত।

وَمِنْ أَمْثَلَةِ الثَّانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ صَاحِبُ
الْأَذَانِ وَإِسْمُ جَدِّهِ عَبْدُ رَبِّهِ وَرَأَوِي حَدِيثَ الْوُضْوءِ وَإِسْمُ جَدِّهِ عَاصِمٌ وَهُمَا
أَنْصَارِيَّانِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بَزِيَادَةُ بَيَاءٍ فِي أَوَّلِ إِسْمِ الْآبِ وَالزَّيَّ
مَكْشُورَةٌ وَهُمْ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِي الصَّحَابَةِ الْخَطْمِيُّ يُكْنَى أَبَا
مُوسَى وَحَدِيثُهُ فِي الصَّحَابَةِ وَالْقَارِئُ لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْخَطْمِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ
وَمِنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى وَهُمْ جَمَاعَةٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْيٍ بِضَمِّ النُّونِ
وَقَتَحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ تَابِعِيُّ مَعْرُوفٍ يَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ.

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ (আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ)। এ নামে অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। একজন হলেন সাহাবী, যিনি আজানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর দাদার নাম আবদু রাব্বীহী। আরেকজন হলেন অজুর হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর দাদার নাম আসিম। দুজনই আনসারী সাহাবী।

(২) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ (আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ)। পিতার নামের গুরুতে 'ইয়া' যবর অতঃপর যা (زا) -এ যের। এ নামেও অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। একজন হলেন সাহাবী, যিনি খাতমী, তাঁর উপনাম আবু মুসা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আরেকজন হলেন প্রসিদ্ধ কারী। হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীসে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। অনেকে মনে করেন ইনি খাতমীই। বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ।

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى (আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া)। এ নামেও অনেক ব্যক্তি রয়েছেন।

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْيٍ (আব্দুল্লাহ ইবনে নুজাই)। 'নূনে' পেশ, 'জীমে' যবর, 'ইয়া' -এ তাশদীদ। প্রসিদ্ধ তাবয়ী। তিনি হযরত আলী (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় সূরত অর্থাৎ যার মধ্যে হরফে পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে হরফ-সংখ্যাতেও কমবেশি হবে- তার কয়েকটি উদাহরণ লেখক আলোচ্য অংশে উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ -এর তুলনায় عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ এবং عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ। এদের মধ্যে

অক্ষর কম।

২. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ও نُجَيْيٌ : এদের মধ্যে عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيْيٍ এবং عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى দুটি ভিন্ন নাম হওয়ার সাথে সাথে

نُجَيْيٌ -এর তুলনায় عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى -এর মধ্যে

أَوْ يَخْصُلُ الْإِتِّفَاقُ فِي الْخَطِّ وَالنُّطْقِ لَكِنْ يَخْصُلُ الْإِخْتِلَافُ أَوْ الْإِسْتِثْنَاءُ
بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ إِمَّا فِي الْأَسْمَيْنِ جُمْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَأَن يَقَعَ
التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي الْأِسْمِ الْوَاحِدِ فِي بَعْضِ حُرُوفِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا
يَسْتَبْطِئُ بِهِ مِثَالُ الْأَوَّلِ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .
وَمِنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمِثَالُ الثَّانِي أَيْوُبُ بْنُ
سَيَّارٍ وَأَيْوُبُ بْنُ يَسَّارٍ الْأَوَّلُ مَدْنَى مَشْهُورٌ لَيْسَ بِالنُّقُوتِ وَالْآخِرُ مَجْهُولٌ .

অনুবাদ : ২. আকৃতি ও উচ্চারণে মিল রয়েছে; কিন্তু গড়মিল বা বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে আগ-পিছ হবার কারণে। এই আগ-পিছ হতে পারে একসাথে দুই নামের মধ্যে অথবা একই নামের অক্ষরসমূহের মধ্যে। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো **يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ** (আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ) এবং **يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ** (ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ)। এটা সুস্পষ্ট (অর্থাৎ তার প্রথম প্রকার হতে হওয়া সুস্পষ্ট)। আরেকটি হলো **يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** (আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ) এবং **يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** (ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ)।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ : **أَيْوُوبُ بْنُ سَيَّارٍ** (আইয়ুব ইবনে সাইয়্যার) এবং **أَيْوُوبُ بْنُ يَسَّارٍ** (আইয়ুব ইবনে ইয়াসার)। প্রথমজন মদীনার অধিবাসী ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) নন। অপরজন মাজহুল বা অজ্ঞাত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রাবীদের নাম লেখা ও উচ্চারণে এক, কিন্তু ভিন্নতা হবে আগ-পিছ হওয়ার কারণে। এটাও আবার দু প্রকার।

ক. উভয় রাবীর নাম একসাথে আগ-পিছ হয়ে ভিন্নতা হবে। **يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ** এবং **يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ**।

এমনিভাবে **يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ** এবং **يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ**।

খ. একই নামের অক্ষরসমূহের মধ্যে আগ-পিছ হওয়ার কারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হবে। যেমন **أَيْوُوبُ بْنُ سَيَّارٍ** এবং **أَيْوُوبُ بْنُ يَسَّارٍ**।

এ দু প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের তুলনায় প্রথম প্রকারটি সুস্পষ্ট। এখানে মূল নামটাই আগ-পিছ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সুরতে নাম আগ-পিছ হয় না; বরং একই নামের অক্ষরসমূহের মাঝে আগ-পিছ হয়।

خَاتِمَةً وَمِنَ الْمِهِمِّ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرِّوَاةِ
وَفَائِدَتُهُ الْأَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الْمُشْتَبِهِينَ وَإِمَّا كَانَ الْإِطْلَاعُ عَلَى تَبْيِينِ
التَّبْدِيلِ وَالْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُرَادِ مِنَ الْعَنْعَنَةِ وَالطَّبَقَةِ فِي
إِصْطِلَاحِهِمْ عِبَارَةً عَنْ جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي السِّنِّ وَلِقَاءِ الْمَشَائِخِ وَقَدْ
يَكُونُ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ مِنْ طَبَقَتَيْنِ بِإِعْتِبَارِنِ كَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ
مِنْ حَيْثُ ثُبُوتِ صُحْبَتِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلَّمَ يُعَدُّ فِي طَبَقَةِ الْعَشْرَةِ مَثَلًا وَمِنْ حَيْثُ صَغَرِ السِّنِّ يُعَدُّ فِي طَبَقَةِ
مَنْ بَعْدَهُمْ فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الصَّحَابَةِ بِإِعْتِبَارِ الصُّحْبَةِ جَعَلَ الْجَمِيعَ
طَبَقَةً وَاحِدَةً كَمَا صَنَعَ ابْنُ جَبَّانٍ وَغَيْرُهُ وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِإِعْتِبَارِ قَدْرِ
زَائِدٍ كَالسَّبْقِ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ شُهُودِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ أَوْ الْهَجْرَةِ جَعَلَهُمْ
طَبَقَاتٍ وَإِلَى ذَلِكَ جَنَعَ صَاحِبُ الطَّبَقَاتِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ
الْبَغْدَادِيُّ وَكِتَابُهُ أَجْمَعُ جُمِعَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكُتُبِ وَكَذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ
الصَّحَابَةِ وَهُمْ التَّابِعُونَ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِإِعْتِبَارِ الْأَخْذِ عَنْ بَعْضِ
الصَّحَابَةِ فَقَطْ جَعَلَ الْجَمِيعَ طَبَقَةً وَاحِدَةً كَمَا صَنَعَ ابْنُ جَبَّانٍ أَيْضًا
وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِإِعْتِبَارِ اللَّقَاءِ قَسَمَهُمْ كَمَا فَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ
وَلِكُلِّ مِنْهُمَا وَجْهٌ.

অনুবাদ : উপসংহার : হাদীস চর্চাকারীগণের জন্য রাবীদের স্তরসমূহ জানা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে। যথা- বিভাটপূর্ণ রাবীগণকে পরস্পর গুলিয়ে ফেলা থেকে মুক্ত থাকা, তাদদীস উদ্ঘাটনে সক্ষম হওয়া, আনআনা পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ জানা (মুত্তাসিল না মুনকাতি') ইত্যাদি।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তবকা বা স্তর বলতে বুঝায় এমন একটি দল যাদের মধ্যে বয়স ও শায়খদের সাথে সাক্ষাতের দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

একই ব্যক্তি দু দিক দিয়ে দুই স্তরের হতে পারেন। যেমন- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য লাভের দিক দিয়ে তাঁকে আশারয়ে মুবাশশারা -এর স্তরে গণ্য করলে যেতে পারে; কিন্তু কম বয়সী হবার দিক দিয়ে আবার তাঁকে পরবর্তী স্তরে গণ্য করা হয়। যারা সাহাবীগণকে

শুধুমাত্র নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য লাভের দিক দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তারা সকলকে একটি মাত্র স্তরে গণ্য করেছেন। ইবনে হিব্বান প্রমুখ যেমন করেছেন। আর যারা অতিরিক্ত বিষয় বিবেচনা করেছেন, যেমন- ইসলাম গ্রহণে প্রবীণতা, প্রসিদ্ধ জিহাদসমূহে শরিক থাকা, হিজরত ইত্যাদি- তারা সাহাবীদেরকে কতিপয় স্তরে বিভক্ত করেছেন। এদিকে যুক্তিহীন ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’ -এর গ্রন্থকার আবু আব্দুল্লাহ ইবনে সা‘দ বাগদাদী। তার কিতাবটি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ।

সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরের ব্যক্তি অর্থাৎ তাবয়ীদের ব্যাপারেও এরূপ হয়েছে। যারা তাদেরকে শুধুমাত্র যে কোনো একজন সাহাবী থেকে হাদীস গ্রহণের দিক দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তারা তাদেরকে একটি মাত্র স্তরে গণ্য করেছেন। ইবনে হিব্বান এ ক্ষেত্রেও যেমনটি করেছেন। আর যারা তাদেরকে সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাতের (অধিক ও স্বল্পসংখ্যক সাহাবী) দিক দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তারা তাদেরকে শ্রেণিকরণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে সা‘দ যেমনটি করেছেন। অবশ্য প্রত্যেকেরই যুক্তি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিতাবের শেষ পর্যায়ে এসে সম্মানিত লেখক খাতেমা বা সমাপনীতে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, ১. রাবীদের স্তর জানার গুরুত্ব, ২. রাবীদের জন্ম ও ইন্তেকালের সময় সম্পর্কে জানার গুরুত্ব, ৩. রাবীদের শহর এবং দেশ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব, ৪. জরাহ ও তা‘দীল সম্পর্কে রাবীদের অবস্থা জানার গুরুত্ব, ৫. জরাহ -এর স্তর জানা ও ৬. তা‘দীলের স্তর জানা।

এগুলো রাবীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়, যা জানা প্রত্যেক হাদীস পাঠক বিশেষ করে হাদীসের ছাত্রের জন্য জানা আবশ্যিক। সম্মানিত লেখক এ সকল বিষয়ে গভীর আলোচনা না করে; বরং প্রতিটি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় দিক সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

طَبَقَاتُ বা রাবীদের স্তর জানার ফায়দা : রাবীদের স্তর জানার ফায়দা তিনটি। যথা-

১. একই নামীয় ব্যক্তিদ্বয়কে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করা হতে বাঁচা যায়।

২. তাদলীস সম্পর্কে জানা যায়।

৩. হাদীসে মু‘আনআন -এর সনদ মুত্তাসিল না মুনকাতি‘ তা জানা যায়।

طَبَقَاتُ -এর সংজ্ঞা : **طَبَقَاتُ** শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো **طَبَقَاتُ**। এর আভিধানিক অর্থ- স্তর, শ্রেণি ইত্যাদি। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় **طَبَقَاتُ** -এর সংজ্ঞা হলো-

هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَسَاعَةِ اسْتَرْكَرْنَا فِي السِّنِّ وَلِقَاءِ الْمَنَاحِ.

অর্থাৎ তারা এমন একটি দল যারা বয়সের দিক দিয়ে (প্রায়) সমান এবং (একই) শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের দিক দিয়ে সম-অংশীদার হয়।

একই ব্যক্তির বিভিন্ন দিক : কখনো কোনো রাবী দুই দিক বিবেচনায় দুই তবকার অন্তর্ভুক্ত হন। যেমন- হযরত আনাস (রা.) সাহাবী হওয়ার দিক দিয়ে আশারায়ে মুবাশশারা তবকার অন্তর্গত। আবার তিনিই বয়স কম হওয়ার দিক বিবেচনায় সিগারে সাহাবা -এর তবকার অন্তর্গত হন।

ইবনে হিব্বান (র.) সমস্ত সাহাবীকে একই তবকায় গণ্য করেছেন। কারণ, সকলেই সাহাবী। কিন্তু ইবনে সা‘দ (র.) সাহাবীদের মাঝে বিভিন্ন স্তর কায়ম করেছেন। হিজরত, জিহাদ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দিক বিবেচনায় তিনি এই বিভক্তি করেছেন। সাহাবীদের ন্যায় সমস্ত তাবয়ীকেও ইবনে হিব্বান (র.) এক তবকায় গণ্য করেছেন; কিন্তু শ্রেণিকারগণ বিভিন্ন দিক বিচারে তাদের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যেহেতু এই ভাগ করা না করাটা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য মাত্র, তাই এতদূষের মাঝে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। অর্থাৎ কেউ বিশেষ দিক বিবেচনায় এনেছেন বিধায় বিভিন্ন স্তর কায়ম করেছেন

আর কেউ এমন বিবেচনা করেননি বিধায় তারা সবাইকে এক কাতারে গণ্য করেছেন। উভয়টা নিজ নিজ স্থানে সঠিক এবং নির্ভুল।

الْكَفَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ নামে রিজালশাস্ত্রের সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম হাফিজ আব্দুল গনী মাকদেসী (র.) (মৃত্যু ৬০০ হি.)। হাফিজ আবুল হাজ্জাজ ইফসুফ মিয়যী (র.) (মৃত্যু ৭৪২ হি.) এ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে এর পূর্ণতাদানের জন্য অষ্টম শতাব্দীর সর্বজনপ্রিয় ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহযীবুল কামাল' রচনা করেন। 'তাহযীবুল কামাল' -এর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য হাফিজ যাহাবী (র.) সহ অনেকে এটি অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে আল্লামা আলাউদ্দীন মুগলতায়ী (র.) (মৃত্যু ৭৬২ হি.) অন্যতম। তাঁর গ্রন্থের নাম 'ইকমালু তাহযীবিল কামাল'।

পূর্ববর্তীতে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) (মৃত্যু ৮৫২ হি:) হাফিজ মিয়যী ও আল্লামা মুগলতায়ীর কিতাবদ্বয়কে সংক্ষেপ করে এবং নিজের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াবলি সংযোজন করে রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহযীবুত তাহযীব'। এ গ্রন্থ রচনার পর থেকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ রিজালশাস্ত্রের ব্যাপারে এর উপরই নির্ভর করে আসছেন। তবে এ গ্রন্থে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রাবীদের تَعْدِيلُ ও جَرَحُ -এর ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত ও রায় ব্যক্ত করেননি; বরং ঐ রাবী সম্পর্কে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ কে কি বলেছেন তা-ই উল্লেখ করেছেন।

'তাহযীবুত তাহযীব' বিশাল গ্রন্থ, তাই শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) এরপর 'তাকরীবুত তাহযীব' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি রাবীদের সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখ করেননি; বরং জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতামতের ভিত্তিতে তিনি রাবীদের تَعْدِيلُ ও جَرَحُ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। এতে তিনি রাবীদের تَعْدِيلُ ও جَرَحُ -এর বিষয়ে আইশ্বায়ে জরায় ও তাদীলগণ যেসব শব্দ বা বাক্য কিংবা বাক্যাবলি ব্যবহার করেছেন তার বিচারে রাবীদেরকে বারো স্তরে বিভক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে রাবীদের জন্ম-মৃত্যু ও হাদীস আহরণের দিক বিচারে রাবীদেরকে বারো তবকায় ভাগ করেছেন। রাবীদের তবকা : নিম্নে সে বারো তবকা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলো।

১ম তবকা : الصَّحَابَةُ 'সাহাবায়ে কেরাম'। হাফিজ ইবনে হাজার (র.) সকল সাহাবীকে এক তবকাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুতাকাদিমীন মুহাদ্দিসগণের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণে প্রবীণতা, প্রসিদ্ধ জিহাদসমূহে অংশগ্রহণ, হিজরত ইত্যাদির বিচারে সাহাবায়ে কেরামকে কয়েক তবকায় সন্নিবেশিত করেছেন।

২য় তবকা : كِبَارُ التَّابِعِينَ । এরা হলেন সাহাবায়ে কেরামের সমবয়স্ক। যেমন- সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, মুখায়রামগণ। মুখায়রাম হলেন যিনি জাহিলিয়া-যুগও পেয়েছেন, ইসলাম-যুগও পেয়েছেন; কিন্তু ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাননি। এদের সংখ্যা প্রায় বিশ।

৩য় তবকা : الطَّبَقَةُ الرَّوْضِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ । এরা হলেন প্রথম স্তরের তাবয়ী। যেমন- হাসান বসরী (র.), মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) প্রমুখ।

৪র্থ তবকা : طَبَقَةُ تَلِي الرَّوْضِيِّ مِنَ التَّابِعِينَ । এ তবকায় তারা, যাদের সাহাবীদের থেকে রেওয়ায়েত কম; كِبَارُ التَّابِعِينَ থেকেই যাদের রেওয়ায়েত বেশি। যেমন- ইমাম যুহরী (র.), হযরত কাতাদা (র.) প্রমুখ।

৫ম তবকা : الطَّبَقَةُ الصُّغْرَى مِنَ التَّابِعِينَ । এ তবকায় তারা, যারা মাত্র এক দুজন সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। কেউ কেউ শুধু সাহাবীদের দেখেছেন, কিন্তু তাদের থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন। যেমন- হযরত আমাশ (র.), ইমাম আবু হানীফা (র.)।

৬ষ্ঠ তবকা : **الْآخِرَةُ مِنَ التَّائِبِينَ** । এ তবকায় তারা, যারা পঞ্চম তবকার রাবীদের সমকালীন, কিন্তু তারা কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পাননি। যেমন- ইবনে জুরাইজ (র.)।

৭ম তবকা : **كِبَارُ أَتْبَاعِ التَّائِبِينَ** । যেমন- ইমাম মালিক (র.), হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)।

৮ম তবকা : **الطَّبَقَةُ الْوُسْطَى مِنْ أَتْبَاعِ التَّائِبِينَ** । যেমন- সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.), সুফিয়ান ইবনে উলাইয়া (র.)।

৯ম তবকা : **الطَّبَقَةُ الصُّغْرَى مِنْ أَتْبَاعِ التَّائِبِينَ** । যেমন- ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), আবু দাউদ তয়ালসী (র.), আব্দুর রাযযাক (র.) প্রমুখ।

১০ম তবকা : **كِبَارُ الْأَخْذِينَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّائِبِينَ** । এরা তাবোয়ীদের সাক্ষাৎ পাননি। যেমন- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)।

১১শ তবকা : **الطَّبَقَةُ الْوُسْطَى مِنَ الْأَخْذِينَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّائِبِينَ** । যেমন- ইমাম যুহলী (র.), ইমাম বুখারী (র.)।

১২শ তবকা : **صِفَارُ الْأَخْذِينَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّائِبِينَ** । যেমন- ইমাম তিরমিযী (র.)।

বি. দ্র. প্রথম দুই তবকার রাবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন ১০০ হিজরির পূর্বেই। ৩য় তবকা হতে ৯ম তবকা পর্যন্ত রাবীগণ ইন্তেকাল করেছেন ২০০ হিজরির পূর্বে। আর ৯ম থেকে বাকি তবকার রাবীগণ ইন্তেকাল করেছেন ২০০ হিজরির পরে।

مَرَاتِبُ الرُّوَاةِ বা রাবীদের স্তর : **جَزَعٌ وَتَعْدِيلٌ** হিসেবেও হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রাবীদেরকে বারো ভাগ করেছেন। যথা-

১ম স্তর : সাহাবায়ে কেরাম। সকল সাহাবায়ে কেরাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ অনুযায়ী আদিল। হাদীসে এসেছে- **الْصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْلٌ** তথা সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ।

২য় স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যাদেরকে **تَعْدِيلٌ** বা প্রত্যয়ন করা হয়েছে দৃঢ়তার সাথে। এর দুই সুরত।

এক. **فُلَانٌ أَثْبَتَ النَّاسِ**, **فُلَانٌ أَوْثَقُ النَّاسِ** -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- **إِسْمُ نَفِضِيلٍ** ইত্যাদি।

দুই. প্রশংসাজ্ঞাপক একই শব্দ একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- **فُلَانٌ ثَبَتٌ**, **فُلَانٌ ثَقَّةٌ ثَقَّةٌ** ইত্যাদি। অথবা, প্রশংসাজ্ঞাপক অনুরূপ অর্থবোধক পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- **فُلَانٌ ثَقَّةٌ** ইত্যাদি। **فُلَانٌ ثَقَّةٌ حَافِظٌ**, **فُلَانٌ حَافِظٌ حَجَّةٌ** ইত্যাদি।

৩য় স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যাদের ক্ষেত্রে একটি **صِفَّةٌ مَادِحَةٌ** ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- **فُلَانٌ ثَبَتٌ**, **فُلَانٌ مُتَّقِنٌ**, **فُلَانٌ عَدْلٌ** ইত্যাদি।

৪র্থ স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যারা তৃতীয় স্তরের চেয়ে একটু নিম্নপর্যায়ের। এদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে- **صَدُوقٌ لَا بَأْسَ بِهِ**, **لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ** শব্দদ্বয়ের যে কোনো একটি।

৫ম স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যাদের জন্য নিম্নের ছয় প্রকারের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) **صَدُوقٌ سَرَى الْجَنْظِ** (২) **صَدُوقٌ بِهِمْ** (৩) **صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ** (৪) **صَدُوقٌ يَخْطِئُ** (৫) **صَدُوقٌ تَغَيَّرَ بَأْخَرُهُ** (৬) **فُلَانٌ رَمَى بِالرُّفِضِ**, **فُلَانٌ رَمَى بِالْقَدَرِ**।

অর্থাৎ কোনো গোমরাহ ফেরকার দিকে সম্পর্ক করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ স্তর : যে সকল রাবী থেকে অল্প হাদীস রেওয়ায়েত আছে এবং তাদের ব্যাপারে এমন কোনো جَرَح সাবেত নেই যার কারণে তাদের হাদীস মারদূদ হয়ে যায়। যদি একরূপ রাবীর مُتَابِع পাওয়া যায়, তবে তার ক্ষেত্রে مَقْبُول শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেনমই হোক না কেন। যদি مُتَابِع না পাওয়া যায়, তাহলে فَلَانٌ لِّئِنْ অথবা فَيُؤَكِّدُ অথবা لِّئِنْ الْحَدِيثِ ব্যবহার হয়।

৭ম স্তর : এমন রাবীগণ যাদের শাগরেদ কম, তবে একের অধিক। তাদের সম্পর্কে কোনো ইমামের تَوْثِيق (প্রত্যয়ন) নেই। এদের জন্য ব্যবহৃত হয় দুই শব্দ ১. فَلَانٌ مَّجْهُولُ الْعَالِ ২. فَلَانٌ مَّسْتُورٌ।

৮ম স্তর : ঐ সকল রাবী যাদের থেকে রেওয়ায়েতকারী কম, তবে একাধিক এবং কোনো ইমাম তাদেরকে এমন جَرَح করেন, যে جَرَح প্রতিক্রিয়াশীল। তার জন্য ব্যবহার হয় এক শব্দ- فَلَانٌ ضَعِيفٌ।

৯ম স্তর : ঐ সকল রাবী যাদের শাগরেদ একজন এবং কোনো ইমাম তাদেরকে جَرَح করেননি, -ও করেননি, فَلَانٌ مَّجْهُولٌ -ও করেননি। এদের জন্য ব্যবহার হয় مَجْهُول শব্দ। যেনম- فَلَانٌ مَّجْهُولٌ।

১০ম স্তর : ঐ সকল রাবী যাদেরকে মজবুত جَرَح করা হয়েছে। এদের জন্য ব্যবহার হয় চার শব্দ- (১) وَاهِمُ الْحَدِيثِ (২) مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ (৩) مَتْرُوكٌ (৪) سَاقِطُ الْحَدِيثِ

১১শ স্তর : ঐ সকল রাবী যারা مَتْرُوكٌ بِالْكُذِبِ। এদের জন্য ব্যবহার হয় فَلَانٌ رُمِيَ بِالْكُذِبِ। مَتْمٌ بِالْكُذِبِ।

১২শ স্তর : ঐ সকল রাবী যাদের ব্যাপারে প্রমাণিত হয় যে, তারা কুম করে হলেও একটি হাদীস وَضَع (তৈরি) করেছেন। এদের জন্য ব্যবহৃত হয়-

(১) فَلَانٌ كَذَّابٌ (২) فَلَانٌ وَضَّاعٌ (৩) فَلَانٌ أَكْذَبَ النَّاسِ (৪) فَلَانٌ رَكَّنَ الْكُذِبَ (৫) فَلَانٌ دَجَّالٌ (৬) فَلَانٌ مَنبَغُ الْكُذِبِ (৭) فَلَانٌ مَعْدَنُ الْكُذِبِ

এ স্তরকে নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) দু স্তরে বিভক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ ১২ স্তরের তারতীব 'তাকরীবুত তাহযীব' অনুযায়ী। অন্যান্য رجال-এর কিতাব এই তারতীবের মুযাফিক নাও হতে পারে। তাহযীবুত তাহযীবে প্রত্যেক রাবী সম্পর্কে ৮/৯ উক্তি নকল করা হয়েছে। হাফিজ ইবনে হাজার (র.) تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ -এ ১২ই উক্তির সারকথ্যক সংক্ষেপে বুঝানোর জন্য এ ১২ স্তর উদ্ভাবন করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত ১২ স্তরের মধ্যে প্রথম তিন স্তরের রাবীদের হাদীস সহীহ, পরের দুই স্তরের রাবীদের হাদীস হাসান। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরের রাবীদের হাদীস لَيْفِيهِ, ৭ম ৮ম ও ৯ম স্তরের রাবীদের হাদীস যা'ঈফ। ১০ম ও ১২শ স্তরের রাবীদের হাদীস মারদূদ।

وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ مَوَالِيهِمْ وَوَفْيَاتِهِمْ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهَا يَحْصُلُ
الْأَمْنُ مِنْ دَعْوَى الْمُدْعَى لِلْقَاءِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَ كَذَلِكَ
وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ وَفَائِدَةُ الْأَمْنِ مِنْ تَدَاخُلِ
الْإِسْمَيْنِ إِذَا اتَّفَقَا لَكِنْ ائْتَرَقَا بِالنَّسَبِ .

وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ أَحْوَالِهِمْ تَعْدِيلًا وَتَجَرِينًا وَجِهَالَةً لِأَنَّ الرَّأْيَ
إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ عَدَالَتُهُ أَوْ يُعْرَفَ فِسْقُهُ أَوْ لَا يُعْرَفُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ
أَهَمِّ ذَلِكَ بَعْدَ الإِطْلَاعِ مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَجْرَحُونَ
الشَّخْصَ بِمَا لَا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حَدِيثِهِ كَلِمَةٍ وَقَدْ بَيَّنَّا أَسْبَابَ ذَلِكَ فَبِمَا
مَضَى وَحَصَرْنَاهَا فِي عَشْرَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهَا مُفْصَلًا وَالْغَرَضُ هُنَا ذِكْرُ
الْأَلْفَافِ الدَّالَّةِ فِي إِصْطِلَاحِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْمَرَاتِبِ .

অনুবাদ : হাদীস চর্চাকারীদের জন্য রাবীগণের জন্ম-মৃত্যু তারিখ জানাও জরুরি। এটা জানার ফলে কোনো ব্যক্তি যদি নবী করীম ﷺ, কোনো সাহাবী কিংবা কোনো তাবয়ীর সাথে সাক্ষাতের দাবি করেন অথচ বাস্তবে তা না হন, তাহলে তা সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

রাবীদের দেশ ও তাদের বাসস্থান সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা জরুরি। এর ফলে একই নামের দুজন রাবীকে তাদের স্থান পরিচয়ের ভিত্তিতে পৃথক করা সম্ভব হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তা'দীল, জরাহ ও জাহালাতের দিক দিয়ে রাবীগণের অবস্থা অবগত হওয়া অর্থাৎ কোনো রাবী সম্পর্কে জানতে হবে যে, তিনি আদিল, অভিযুক্ত না অপরিচিত। কেননা, যে কোনো রাবী সম্পর্কে হয়তো তার আদিল হবার কথা জানা যাবে, নইলে ফাসিক হবার কথা অথবা কোনোটাই জানা যাবে না। (এটি জানা না গেলে হাদীসটি সহীহ কিনা তা নির্ণয় করা যাবে না।)

রাবীদের অবস্থা জানার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা জানা জরুরি তা হলো, জরাহ ও তা'দীলের স্তরসমূহ জানা। কারণ, অনেক সময় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন জরাহ বা অভিযোগ করা হয়, যার দরুন তার সমস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যাম করা জরুরি হয় না। (বরং কোথাও আংশিক প্রত্যাখ্যান আবার কোথাও আদৌ প্রত্যাখ্যান না করা জরুরি হয়।) জরাহ বা অভিযোগের কারণসমূহ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দশটি বিষয় সনাক্ত করা হয়েছে এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো মুহাদ্দিসীনে কেরামের পুরিতাযায় যে শব্দগুলো উক্ত স্তরসমূহ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তা উল্লেখ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবীদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ জানা : কোন রাবী কোন সনে জন্মগ্রহণ করেছেন আর কোন সনে ইন্তেকাল করেছেন হাদীসের ছাত্রদের সেটাও জানা জরুরি। এতে অনেক ফায়দা নিহিত আছে। তন্মধ্যে দুটি ফায়দা নিম্নরূপ—

১. কোনো রাবী কোনো শায়খের সাথে সাক্ষাতের মিথ্যা দাবি করলে তা প্রমাণ ও প্রকাশিত হয়ে যাবে। আর বাস্তবে এমনটি হয়েছেও। অনেকেই এরূপ মিথ্যা দাবি করেছে। ইতিহাস ও সন-তারিখের সুবাদে তাদের দাবির মিথ্যা হওয়া প্রকাশ পেয়েছে। যার ফলে তারা প্রশংসিত হওয়ার পরিবর্তে লালিত হয়েছেন।

২. জন্ম-মৃত্যু তারিখ জানার আরেকটি ফায়দা এই যে, এর দ্বারা মুরসাল, মু'আল্লাক, মুনকাতি, মু'যাল সম্পর্কে জানা যায়। অবশ্য এটা রাবীদের স্তর হতেও জানা যায়।

রাবীদের দেশ ও বাসস্থান জানা : কোন রাবীর জন্মস্থান কোথায়, দেশ কোনটি, কোথায় বসবাস করেন তাও জানা জরুরি। এতে করে লাভ হলো, দুই রাবী নাম ইত্যাদির দিক দিয়ে মিলে গেলে দেশ-বাসস্থানের পরিচয়ে তাদের পৃথক করা যায়।

রাবী সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত বিষয় জানা জরুরি তার মধ্য হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'রাবীদের অবস্থা'। কেননা, রাবীদের কে আদিল, কে আদিল নয়, কে নির্ভরযোগ্য, কে নির্ভরযোগ্য নয়, কে পরিচিত, কে অপরিচিত এসব কিছু রাবীদের অবস্থা থেকেই জানা যায়। এ সমস্ত দিক বিচারে রাবী যদি প্রসিদ্ধ আদিল হয়, তাহলে তার হাদীস মাকবুল হয়, অন্যথায় মাকবুল হয় না। মোটকথা, হাদীসের ব্যাপারে সব রকম ফয়সালা রাবীদের অবস্থা জানার উপরই নির্ভরশীল।

جَرَح -এর আভিধানিক অর্থ : **الْجَرَحُ** (জীম বর্ণে যবর ও রা বর্ণে সাকিন) -এর আভিধানিক অর্থ-লোহা ইত্যাদি দ্বারা শরীর কাটা, ক্ষত করা, আহত করা।

جَرَح -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূল হাদীসের পরিভাষায় **جَرَح** বলা হয়, রাবীকে এমন দোষে দোষী ও অভিযুক্ত করা, যা তার ন্যায্যপরায়ণতাকে ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত করে।

عَدَّالَتْ جَرَح -এর বিপরীত এবং **طَعَن** -এর সমার্থক। **جَرَح** -এর আসবাব বা কারণ দশটি। এগুলো আবার বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট। এসব জানা প্রয়োজন। এতে লাভ হলো, অনেক সময় ইমামগণ কোনো রাবীকে এমন শব্দ দ্বারা জরাহ বা অভিযুক্ত করেন, যাতে ঐ রাবীর সমস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক হয় না; বরং কোথাও আংশিক প্রত্যাখ্যান আবার কোথাও আদৌ প্রত্যাখ্যান না করা জরুরি হয়।

جَرَح ও **تَعْدِيل** -এর শরয়ী হুকুম : **تَعْدِيل** অর্থ- কাউকে ভালো বলা, প্রশংসা করা। এটা যে জায়েজ তা বলাই বাহুল্য এবং এর জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তির কথা জানা যায় না। কিন্তু **جَرَح** এর ব্যতিক্রম। **جَرَح** অর্থ- দোষ দেওয়া, দোষী করা, মন্দ বলা ইত্যাদি। যেহেতু এর মাধ্যমে কারো দোষ বর্ণনা করা হয়, তাই অনেকের কাছে ব্যাপারটি দৃশ্যত গিবত বলে মনে হয়। আর গিবত যেহেতু নাজায়েজ, তাই **جَرَح** -কেও নাজায়েজ বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, **جَرَح** ও **تَعْدِيل** করা- এটা গিবত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই **جَرَح** -**تَعْدِيل** করেছেন। তিনি কাউকে বলেছেন- **يَنْسُ أَخُو الْعَشِيرَةِ** -**عَبْدُ اللّٰهُ رَجُلٌ صَالِحٌ** আবার কাউকে বলেছেন- **يَنْسُ أَخُو الْعَشِيرَةِ** -**عَبْدُ اللّٰهُ رَجُلٌ صَالِحٌ** এর মধ্যে প্রথমটি **تَعْدِيل** আর দ্বিতীয়টি **جَرَح**। সুতরাং খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যেহেতু **جَرَح** -**تَعْدِيل** সাবেত, তাই তা নাজায়েজ হওয়ার প্রশ্ন আসে না এবং তা গিবতও নয়।

শ্রু হতে পারে, সাধারণ দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হাদীসের আলোকে গিবত হলেও রাবীর **جَرَح** করাটা গিবত হবে না কেন? এর উত্তর হলো, শরয়ী কোনো প্রয়োজন ছাড়া নিছক কাউকে হয়ে প্রতিপন্ন করতে যদি কারো দোষচর্চা করা হয়, তাহলে সেটা গিবত হয়। কিন্তু কারো দোষের উল্লেখটা যদি শরয়ী প্রয়োজন, দীনের হেফাজত এবং কারো হক সংরক্ষণার্থে হয়, তাহলে তখন তা গিবত হয় না। যেহেতু রাবীর উপর হাদীসের সহীহ হওয়া না হওয়াটা নির্ভর করে আর রাবীর মধ্যে দোষ থাকলে হাদীস সহীহ হয় না, তাই তার মধ্যে দোষ থাকলে তা প্রকাশের মধ্যে দীনের হেফাজত নির্ভরশীল। সুতরাং এই দোষ বর্ণনাটা যেহেতু তাকে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য হয় না; বরং দীনের হেফাজতের উদ্দেশ্য করা হয়, তাই তা শরিয়তের দৃষ্টিতে গিবত বলে কথিত হয় না।

وَلْيَجْرِحْ مَرَاتِبُ أَسْوَأَهَا الرِّوْضُ بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ وَأَصْرَحَ ذَلِكَ
التَّغْيِيرُ بِأَعْلَى كَاذِبِ النَّاسِ وَكَذَا قَوْلُهُمْ إِلَيْهِ الْمُنتَهَى فِي الرِّوْضِ أَوْ هُوَ
رُكْنُ الْكَذِبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ثُمَّ دَجَّالٌ أَوْ وَضَاعٌ أَوْ كَذَّابٌ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَوْعٌ
مُبَالَغَةٍ لِكِنَّهَا دُونَ الَّتِي قَبْلَهَا وَأَسْهَلُهَا أَيْ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْجَرَحِ
قَوْلُهُمْ فَلَنْ لَيْسَ أَوْ سَيُّءُ الْحِفْظِ أَوْ فِيهِ أَذْنَى مَقَالٍ وَبَيْنَ أَسْوَأِ الْجَرَحِ وَأَسْهَلِهِ
مَرَاتِبُ لَا يَخْفَى، فَقَوْلُهُمْ مَتَرُوكٌ أَوْ سَاقِطٌ أَوْ فَاحِشُ الْفَلَطِ أَوْ مُنْكَرُ
الْحَدِيثِ أَشَدُّ مِنْ قَوْلِهِمْ ضَعِيفٌ أَوْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ أَوْ فِيهِ مَقَالٌ.

অনুবাদ : অভিযোগের কয়েকটি (প্রধানত তিনটি) স্তর রয়েছে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, এমন বিশেষণ ব্যবহার করা যা মুবালাগা বা চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশ করে। সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয় যদি তা কোনো ইসমে তাফযীল (তুলনাবোধক বিশেষণ) দ্বারা বর্ণনা করা হয়। যেমন- أَكْذَبُ النَّاسِ (সবচেয়ে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি), অথবা বানোয়াটের চূড়ান্ত, অথবা رُكْنُ الْكَذِبِ (মিথ্যার ঝুঁটি) এবং এ জাতীয় শব্দ। পরবর্তী স্তরের শব্দসমূহ হলো- دَجَّالٌ, وَضَاعٌ, كَذَّابٌ ইত্যাদি। এগুলোতে যদিও কিছুটা মুবালাগা রয়েছে, কিন্তু তা প্রথম স্তরের চেয়ে একটু কম।

অভিযোগের সবচেয়ে নরম শব্দসমূহ হলো- لَيْسَ (নমনীয়), سَيُّءُ الْحِفْظِ (স্বীতি দুর্বল), فِيهِ أَذْنَى (তার সম্পর্কে নিম্নতম কথা রয়েছে) ইত্যাদি। বলাবাহুল্য নিকৃষ্ট ও নরম অভিযোগের মাঝখানে অনেক স্তর রয়েছে। যেমন- مَتَرُوكٌ, سَاقِطٌ, فَاحِشُ الْفَلَطِ, مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ইত্যাদি শব্দসমূহ لَيْسَ ইত্যাদির তুলনায় গুরুতর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَرَحَ -এর স্তরসমূহ : মূলত جَرَحَ -এর তিন স্তর। ১. أَسْوَأُ الْجَرَحِ (সবচেয়ে নিকৃষ্ট অভিযোগ), ২. أَوْسَطُ الْجَرَحِ (মধ্যম মানের অভিযোগ) ও ৩. أَسْهَلُ الْجَرَحِ (সবচেয়ে নরম অভিযোগ)। অতঃপর প্রত্যেকটোর অধীনে আরও অনেক স্তর রয়েছে।

১. সবচেয়ে নিকৃষ্ট جَرَحَ হলো, যা এমন শব্দে হয়, যা চূড়ান্ত অভিযোগ বুঝায়। আর তা হলো, إِسْمٌ أَكْذَبُ النَّاسِ (সে সবচেয়ে মিথ্যাক)। এ শ্রেণিরই আরও শব্দ হলো- إِلَيْهِ الْمُنتَهَى فِي الرِّوْضِ (তার মাধ্যমে বানোয়াট চূড়ান্ত হয়েছে), هُوَ رُكْنُ الْكَذِبِ (সে মিথ্যার ঝুঁটি), هُوَ مَنَبْعُ الرِّوْضِ أَوْ الْكَذِبِ (সে বানোয়াট কিংবা মিথ্যার উৎস) ইত্যাদি। এর থেকে নিম্নমানের হলো- هُوَ وَضَاعٌ هُوَ دَجَّالٌ ইত্যাদি মুবালাগার শব্দ।

২. মধ্যম স্তরের جَرَحَ হলো, মুহাদ্দিসগণের উক্তি- هُوَ سَاقِطٌ, هُوَ مَتَرُوكٌ ইত্যাদি। এর চেয়ে একটু নিম্নমানের হলো- هُوَ ضَعِيفٌ, هُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ইত্যাদি।

৩. সবচেয়ে নরম শব্দ হলো, মুহাদ্দিসীনে কেরামের এই ভাষায় جَرَحَ করা যে, فُلَانٌ لَيْسَ, فُلَانٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ ইত্যাদি।

মোটকথা, أَسْوَأُ الْجَرَحِ এবং أَسْهَلُ الْجَرَحِ -এর শব্দ বাতীত বাকি সমস্ত শব্দ হলো أَوْسَطُ الْجَرَحِ -এর। এ তিন স্তরের হুকুম হলো, যে রাবীর ব্যাপারে উল্লিখিত তিন ধরনের শব্দের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হলে তার কোনো হাদীস মাকবুল হবে না।

وَمِنَ الْمِهِمِ ابْنًا مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ وَأَرْقَعُهَا الْوَصْفُ ابْنًا بِمَا دَلَّ عَلَى الْمَبَالِغَةِ فِيهِ وَأَصْرَحَ ذَلِكَ التَّغْيِيرُ بِأَفْعَلْ كَأَوْتَقُ النَّاسِ أَوْ أَثَبَّتِ النَّاسِ وَالْبِنُو الْمُنتَهَى فِي الثَّبُتِ ثُمَّ مَا تَأْكُدُ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْدِيلِ أَوْ صِفَتَيْنِ كَثِيفَةٍ ثِقَةٍ أَوْ ثَبَّتْ ثَبَّتْ أَوْ ثِقَةً حَافِظٌ أَوْ عَدْلٌ ضَاطِطٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَدْنَاهَا مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيعِ كَشَيْخٍ يُرَوِّى حَدِيثَهُ وَيُغْتَبَرُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مَرَاتِبٌ لَا يَخْفَى .

অনুবাদ : তা'দীল বা প্রত্যয়নের স্তর জানাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্বোচ্চ স্তর হলো এমন বিশেষণ ব্যবহার করা যা মুবালাগা বা চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশ করে। এখানেও সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয় যদি তা ইসমে তাফযীল দ্বারা বর্ণনা করা হয়। যেমন-**أَثَبَّتِ النَّاسِ**, **أَوْتَقُ النَّاسِ** (সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি), **إِنِّهِ**, **الْمُنْتَهَى فِي الثَّبُتِ** (নির্ভরতার চূড়ান্ত) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তর হলো, প্রত্যয়নবোধক একটি বা দুটি বিশেষণ দ্বারা জোরদার করা। যেমন-**ثِقَةً ثِقَةً** বা **ثَبَّتْ ثَبَّتْ** (নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য), **ثِقَةً حَافِظٌ** (নির্ভরযোগ্য হাফিজ), **عَدْلٌ ضَاطِطٌ** (নির্ভরযোগ্য আয়ত্তকারী) ইত্যাদি।

সর্বনিম্ন হলো, এমন শব্দসমূহ যা নিম্নতম অভিযোগের কাছাকাছি হবার কথা বুঝায়। যেমন-**شَيْخٌ** (একজন মনীষী), **يُرَوِّى حَدِيثَهُ** (তার হাদীস বর্ণনা করা হয়), **يُغْتَبَرُ بِهِ** (তাকে বিবেচনা করা হয়) এবং এ জাতীয় শব্দ। এ দু স্তরের মাঝে যে আরো অনেক স্তর আছে সে বিষয়টি গোপন নয়, অর্থাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْدِيلٌ -এর আভিধানিক অর্থ : **بَابُ تَفْعِيلٍ** শব্দটি **تَعْدِيلٌ** -এর মাসদার। এর অর্থ হলো-ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত করা, প্রত্যয়ন করা।

تَغْيِيرٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূল হাদীসের পরিভাষায় তা'দীল হলো, কোনো রাবীকে ভালো ও সং বলে সাব্যস্ত ও প্রত্যয়ন করা।

تَغْيِيلٌ -এর স্তর : **جَزَعٌ** -এর মতো **تَعْدِيلٌ** -এরও তিনটি স্তর রয়েছে।

১. সর্বোচ্চ স্তর, ২. মধ্যস্তর ও ৩. নিম্নস্তর। নিম্নে প্রত্যেক স্তরের বিবরণ দেওয়া হলো।

১. সর্বোচ্চ স্তর : সর্বোচ্চ স্তরের তা'দীল হলো, যার মধ্যে মুবালাগা বিদ্যমান থাকে। যেমন-**هُوَ أَوْتَقُ النَّاسِ** ইত্যাদি। **إِنِّهِ الْمُنتَهَى فِي الثَّبُتِ**, **أَعْدَلُ النَّاسِ**, **فُلَانٌ أَحْفَظُ النَّاسِ**, **فُلَانٌ أَثَبَّتِ النَّاسِ** ইত্যাদি।

২. মধ্যস্তর : আর তা হলো ঐ তা'দীল যা তা'দীলবাচক একটি শব্দের দ্বারা জোরালো করা হয়। যেমন-**فُلَانٌ ثَبَّتْ ثَبَّتْ**, **فُلَانٌ ثِقَةً ثِقَةً** অথবা দুটি শব্দ দ্বারা জোরালো করা হয়। যেমন-**فُلَانٌ عَدْلٌ ضَاطِطٌ** ইত্যাদি।

৩. নিম্নস্তর : নিম্নস্তরের তা'দীল হলো, এমন শব্দ দ্বারা তা'দীল করা, যা নরম অভিযোগের কাছাকাছি হয়। যেমন-**يُرَوِّى حَدِيثَهُ** তার হাদীস র্বেওয়ায়েত করা যায়, **يُغْتَبَرُ بِهِ** তার হাদীস মুতা'আবাত এবং শাহিদ হিসেবে নেওয়া যায়, ইত্যাদি।

وَهَذِهِ أَحْكَامٌ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَذَكَرْتُهَا هُنَا تَكْمِلَةً لِلْفَائِدَةِ فَأَقُولُ تَقْبَلُ
التَّزْكِيَةَ مَنْ عَارَفَ بِأَسْبَابِهَا لَا مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ لَيْثًا يُزَكِّي بِمَجْرَدِ مَا
يُظْهَرُ لَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُعَارَسَةٍ وَإِخْتِبَارٍ وَلَوْ كَانَتِ التَّزْكِيَةُ صَادِرَةً مِنْ
مُزَكٍّ وَاجِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ اثْنَيْنِ
إِلْحَاقًا لَهَا بِالشَّهَادَةِ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّزْكِيَةَ
يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةً الْحُكْمِ فَلَا يَشْتَرُطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ مِنَ الشَّاهِدِ
عِنْدَ الْحَاكِمِ فَافْتَرَقَا وَلَوْ قَبِلَ يَفْصَلُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ فِي
الرَّأْيِ مُسْتَنِدَةً مِنَ الْمُزَكِّيِّ إِلَى اجْتِهَادِهِ أَوْ إِلَى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهِ لَكَانَ
مُتَّجِهَاً لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا يَشْتَرُطُ فِيهِ الْعَدَدُ أَصْلًا لِأَنَّهُ حَ بَكُونُ
بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ أَيْضًا
لَا يَشْتَرُطُ فِيهِ الْعَدَدُ لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يَشْتَرُطُ فِيهِ الْعَدَدُ فَكَذَا مَا
يُتَفَرَّعُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : সামনে কিছু আহকাম বর্ণনা করছি, যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমি এখানে তা উল্লেখ করছি ফয়দার পূর্ণতার জন্য। সুতরাং আমি বলছি : বিশুদ্ধতার অভিমত অনুযায়ী এক ব্যক্তির প্রত্যয়নও গ্রহণযোগ্য। তবে প্রত্যয়নকারীকে প্রত্যয়নের কারণ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। সে ব্যক্তির প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে না, যিনি প্রত্যয়নের কারণ সম্পর্কে জানেন না। কেননা, কারণ না জেনে প্রত্যয়ন করলে তিনি কোনো অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই প্রাথমিক দৃষ্টিতে যা বুঝবেন তাই বলে দেবেন। অনেকেই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা সাক্ষ্য প্রদানের প্রত্যয়নের উপর কিয়াস করে অর্থাৎ সাক্ষীকে প্রত্যয়নের ব্যাপারটির যুক্তিকে এ ক্ষেত্রে পেশ করে বলতে চান যে, কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি কোনো রাবীকে আদিল বলে প্রত্যয়ন না করলে সে প্রত্যয়ন বিবেচনা করা যাবে না। কেননা, সাক্ষীর প্রত্যয়নেও বিশুদ্ধতার অভিমত অনুযায়ী কমপক্ষে দুজন হওয়া জরুরি। কিন্তু এই যুক্তি সঠিক নয়। কেননা, সাক্ষীর প্রত্যয়ন ও আদিলের প্রত্যয়নের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আদিলের প্রত্যয়ন হলো এক ধরনের রায়, যেখানে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। পক্ষান্তরে সাক্ষীর প্রত্যয়ন হলো বিচারকের সামনে সাক্ষ্য প্রদানের ন্যায়। তাই সেখানে সংখ্যার শর্ত রয়েছে।

এ মতপার্থক্য সেক্ষেত্রে হতে পারে না যা ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হয়; বরং অন্যের কথা উদ্ধৃত করে প্রত্যয়ন করা হলে সেক্ষেত্রে হতে পারে। তবে উদ্ধৃতিমূলক প্রত্যয়নেও সংখ্যার শর্ত নেই। সুতরাং শাখায় তা কিরূপে শর্ত হতে পারে?

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَزْكِيَةٌ -এর অর্থ : تَزْكِيَةٌ শব্দটি تَنْعِيْلُ -এর মাসদার। এর অর্থ- প্রশংসা করা, সত্যতা প্রতিপাদন করা, বৃদ্ধি করা। পরিভাষায় تَزْكِيَةٌ শব্দটি تَعْدِيلُ -এর সমার্থবোধক। উদ্দেশ্য, কোনো রাবীর প্রশংসা বর্ণনা করা তথা তার প্রত্যয়ন করা।

تَرْكِيَّة গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত : প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত কয়েকটি। যথা—

১. প্রত্যয়নকারী প্রত্যয়নের কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া।
২. প্রত্যয়নকারী নিজে আদিল হওয়া।
৩. অলসতা-উদাসীনতামুক্ত হওয়া।

প্রত্যয়নকারীর সংখ্যা : প্রত্যয়নকারী কমপক্ষে দুজন হতে হবে নাকি একজন হলেই চলবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা—

১. **জুমহুরের অভিমত :** তাঁদের মতে রাবীর প্রত্যয়নে কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা শর্ত নয়; বরং সর্বনিম্ন একজনই যথেষ্ট। কারণ, রাবীর প্রত্যয়নকারী যদি নিজের পক্ষ হতে ইজ্তিহাদ করে প্রত্যয়ন করে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যয়নকারী হাকিম -এর মতো। আর যদি তিনি অন্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করে প্রত্যয়ন করেন, তাহলে এক্ষেত্রে তিনি মুখবির বা সংবাদদাতা। আর হাকিম ও সংবাদদাতার ক্ষেত্রে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। অতএব, একজনের প্রত্যয়নই যথেষ্ট ও ধর্তব্য হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত।

২. **কতিপয়ের অভিমত :** কেউ কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তারা রাবীর প্রত্যয়নকে সাক্ষ্যের প্রত্যয়নের উপর কিয়াস করে বলেন, যেভাবে কোনো সাক্ষ্যের প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হতে প্রত্যয়নকারী দুজন হওয়া শর্ত এবং একজনের প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হয় না, ঠিক তেমনিভাবে রেওয়ায়েতের প্রত্যয়নের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়নকারী দুজন হতে হবে— একজনের প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাদের কিয়াসের বিশ্লেষণ : রেওয়ায়েত প্রত্যয়নকে সাক্ষ্যের প্রত্যয়নের উপর কিয়াস করা যুক্তিহীন। কেননা, রাবীর প্রত্যয়নে প্রত্যয়নকারী হাকিমের (বিচারকের) মতো হন আর বিচারকের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যার শর্ত নেই। পক্ষান্তরে সাক্ষ্যের প্রত্যয়নে প্রত্যয়নকারী হন একজন সাক্ষীর মতো। আর সাক্ষী কমপক্ষে দুজন হতে হয়। এ বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় রাবী প্রত্যয়নের প্রশ্নে জুমহুরের অবস্থান ও অভিমত সর্বোচ্চ সঠিক।

تَرْكِيَّة -এর প্রকারভেদ ষনাম মতভেদ : **تَرْكِيَّة** দু প্রকার। ১. প্রত্যয়নকারী নিজে ইজ্তিহাদের ভিত্তিতে কোনো রাবীকে প্রত্যয়ন করবেন, অথবা ২. প্রত্যয়নকারী অন্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কাউকে প্রত্যয়ন করবেন। এর মধ্যে প্রথম প্রকারটি আসল প্রত্যয়ন, আর দ্বিতীয় প্রকারটি প্রথম প্রকারের শাখা। প্রত্যয়নকারীর সংখ্যা নিয়ে যে মতভেদ আছে তা প্রথম প্রকারের মধ্যে নয়; বরং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই যে, প্রত্যয়নকারী যদি নিজের ইজ্তিহাদীভাবে কাউকে প্রত্যয়ন করেন, তাহলে এক্ষেত্রে তার একার প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য। এখানে দুজন হওয়ার শর্ত কেউ করেন না এবং তা হওয়ারই কোনো অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে প্রত্যয়নকারী যদি অপরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কোনো রাবীকে প্রত্যয়ন করেন, তাহলে এক্ষেত্রে কতিপয় বলেন, এমন প্রত্যয়নের জন্য প্রত্যয়নকারী কমপক্ষে দুজন হতে হবে। কিন্তু তাদের এ দাবি সঠিক নয়। কেননা, দু প্রকারের প্রত্যয়নের মধ্যে যেটা আসল তার জন্য যখন সর্বসম্মতিক্রমে সংখ্যার শর্ত নেই, তখন যে প্রত্যয়নটা প্রথমটার শাখা তার জন্য সংখ্যার শর্ত কিভাবে হতে পারে ? সংখ্যার শর্ত না হওয়ার পূর্বে আরেকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, অন্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কারো প্রত্যয়ন করলে এক্ষেত্রে প্রত্যয়নকারী মূলত একজন সংবাদদাতা হন, আর এটা সবার জানা ও মানা কথা যে, সংবাদদাতার ক্ষেত্রে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। অর্থাৎ এমন শর্ত নেই যে, কোনো একটি সংবাদ গ্রহণযোগ্য হতে হলে সংবাদদাতার কমপক্ষে এতজন হতে হবে।

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْجَرَحُ وَالتَّعْدِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَّبِعٍ فَلَا يَقْبَلُ جَرَحُ مَنْ أَفْرَطَ فَجَرَحَ بِمَا لَا يَفْتَضِي رَدًّا لِحَدِيثِ الْمُحَدِّثِ كَمَا لَا يَقْبَلُ تَرْكِهَ مَنْ أَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ فَأَطْلَقَ التَّرْكِهَ وَقَالَ الدُّهَيْبِيُّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَسْتِفْرَاءِ الثَّامِ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ لَمْ يَجْتَمِعْ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّانِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ وَلَا عَلَى تَضْعِيفِ ثِقَةٍ انْتَهَى وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ أَنْ لَا يُتْرَكَ حَدِيثُ الرَّجُلِ حَتَّى يَجْتَمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ وَلِيَحْذَرَ الْمُتَكَلِّمُ فِي هَذَا النَّقْلِ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ فَإِنَّهُ إِنْ عَدَلَ بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ كَانَ كَالْمُثَبِّتِ حُكْمًا لَيْسَ بِثَابِتٍ فَيَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي زَمْرَةٍ مِنْ رَوَيْ حَدِيثًا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ وَإِنْ جَرَحَ بِغَيْرِ تَحَرُّزٍ أَقْدَمَ عَلَى الطُّغْيَانِ فِي مُسْلِمٍ بَرِيٍّ مِنْ ذَلِكَ وَاسْمُهُ يَمْسِمُ سُوءٍ يَبْقَى عَلَيْهِ عَارُهُ أَبَدًا وَالْأَفْئَةُ تَدْخُلُ فِي هَذَا تَارَةً مِنَ الْهَوَى وَالْغَرَضُ الْفَاسِدِ وَكَلَامُ الْمُتَقَدِّمِينَ سَالِمٌ مِنْ هَذَا غَالِبًا وَتَارَةً مِنَ الْمُخَالَفَةِ فِي الْعَقَائِدِ وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَلَا يَنْبَغِي إِطْلَاقَ الْجَرَحِ بِذَلِكَ فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَ الْحَالِ فِي الْعَجَلِ بِرَوَايَةِ الْمُتَبَدِّعَةِ

অনুবাদ : এমন ব্যক্তির প্রত্যয়ন ও অভিযোগ গ্রহণযোগ্য যিনি আদিল ও সচেতন। সুতরাং এমন ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়, যিনি অভিযোগের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনকারী। তিনি হয়তো এমন বিষয়ের ভিত্তিতে অভিযোগ করবেন, যে কারণে উক্ত রাবীর হাদীস প্রত্যাখ্যান করা জরুরি হয় না। তেমনি এমন ব্যক্তির অভিযোগ ও গ্রহণযোগ্য নয় যিনি স্থূলদৃষ্টিতে যা বুঝা যায় তার উপর ভিত্তি করে অভিযোগ করেন। ইমাম যাহাবী (র.) ব্যক্তি যাচাইয়ে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ের (ব্যক্তি যাচাইয়ের) দুজন আলিম কখনও একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দুর্বল সাব্যস্ত করতে কিংবা একজন দুর্বল ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করতে একমত হননি। এ কারণে ইমাম নাসায়ী (র.) -এর নীতি হলো, কোনো ব্যক্তির হাদীস প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে সর্বকালে একমত না হলে তিনি তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করতেন না।

যারা জরহ ও তা'দীল করবেন তাদের উচিত কোনো প্রকার শৈথিল্য অবলম্বন না করা। কেননা, কোনো যুক্তি ছাড়া কাউকে আদিল সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, একটি ভিত্তিহীন হাদীসকে প্রামাণ্য হাদীস সাব্যস্ত করা। এতে করে সেই হাদীসের হুঁশিয়ারবাণী প্রযোজ্য হবার আশঙ্কা থাকবে, যাতে বলা

হয়েছে- “যে ব্যক্তি এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবে যে ব্যাপারে তার ধারণা হলো যে সেটি অসত্য, সে হবে অন্যতম মিথ্যাবাদী।”

আর যদি তিনি অসতর্কভাবে জরাহ বা অভিযোগ করেন, তাহলে তিনি একজন নিরপরাধ মুসলমানের উপর এমন অভিযোগ আরোপ করলেন যার চিহ্ন তার কপালে চিরকাল থেকে যাবে।

অভিযোগে বাড়াবাড়ি অনেক সময় প্রবৃত্তির তাড়নায় আবার কখনো বৈরিতা ও হিংসার কারণে হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী ইমামগণের বক্তব্য সাধারণভাবে এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে পবিত্র (মুক্ত)। আবার কখনো আকিদাগত বিরোধের কারণেও হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের মধ্যে এ ধরনের অতিরঞ্জন প্রচুর রয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে আকিদাগত বিরোধের কারণে অভিযোগ করা বৈধ নয়। বিদআতপন্থীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি এটি বিশ্লেষণ করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কারণ অভিযোগ-প্রত্যয়ন ধর্তব্য? যে কেউ অভিযোগ কিংবা প্রত্যয়ন করলে তা গৃহীত ও ধর্তব্য হয় না; বরং এর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা-

১. কেবলমাত্র তারই অভিযোগ ও প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে, যে তার কারণ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তবে তাদের জন্য ধরাবাঁধা কোনো সংখ্যার শর্ত নেই। এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোকপাত হয়েছে।
২. প্রত্যয়নকারীকে আদেল, চৌকস ও হুঁশিয়ার হতে হবে। কেননা, অভিযোগে বাড়াবাড়ি করলে তা ধর্তব্য হয় না, যে রূপভাবে ঐ প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হয় না, যা কেবল বাহ্যিক অবস্থা দেখে করা হয়। যেমন- সূফিয়ায়ে কিরাম করে থাকেন।
৩. শৈথিল্য ও উদাসীনতা হতে মুক্ত থাকতে হবে। কারণ, কাউকে বিনা যুক্তিতে প্রত্যয়ন করার অর্থ একটি অসাব্যস্ত হাদীসকে সাব্যস্ত করে দেওয়া। যার দরুন সে **مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِعَدِيَّتٍ بَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ مُرَادُ الْكَافِرِينَ** -এর অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে।

ঠিক এমনভাবে অসতর্কবশত কোনো এমন মুসলমানকে অভিযুক্ত করা, যিনি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এতে করে একজন নিরপরাধকে এমনভাবে কালিমায়ুক্ত করে দেওয়া হয়, যা চিরদিন তাকে লজ্জিত করে। মোটকথা, উল্লিখিত তিন শত যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায়, তবেই তার অভিযোগ ও প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় নয়।

অভিযোগ আরোপে বাড়াবাড়ির কারণ : আন্নামা ইবনে দাকীকুল ইদ বলেন, এর কারণ সাধারণত পাঁচটি। যথা-

১. প্রবৃত্তির তাড়না তথা হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি।
২. আকিদাগত বিরোধ।
৩. সাধারণ আলিম ও সূফী-দরবেশদের মধ্যে উষ্মবিরোধ।
৪. ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানহীনতা।
৫. একচেটিয়া নিন্দার দিকটা বিবেচনা করা।

وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ وَأُطْلِقَ ذَلِكَ جَمَاعَةً وَلَكِنَّ مَحَلَّهُ إِنْ صَدَرَ
مُبَيَّنًا مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَسِّرٍ لَمْ يَفْدَحْ فِيمَنْ ثَبَتَتْ
عَدَالَتُهُ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ بِالْأَسْبَابِ لَمْ يُعْتَبَرِ بِهِ أَيْضًا فَإِنْ خَلَا
الْمَجْرُوحُ عَنِ التَّعْدِيلِ قُبِلَ الْجَرْحُ فِيهِ مُجْمَلًا غَيْرَ مُبَيَّنٍ السَّبَبِ إِذَا
صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ عَلَى الْمُخْتَارِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْدِيلٌ فَهُوَ فِي حَيْزِ
الْمَجْهُولِ وَإِعْمَالُ قَوْلِ الْمَجَارِحِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ وَمَا لِبْنِ الصَّلَاحِ فِي
مِثْلِ هَذَا إِلَى التَّوَقُّفِ .

অনুবাদ : একদল মুহাদ্দিস সাধারণভাবে জরাহকে তা'দীলের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জরাহটা অগ্রগামী হওয়ার স্থান হলো, যদি জরাহ -এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ হতে জরাহটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়, তাহলে তখন জরাহটা তা'দীলের উপর অগ্রগামী হবে। কেননা, জরাহটা যদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হয়, তাহলে এমন জরাহ-এ ঐ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হবে না যার আদালত সাব্যস্ত। অনুরূপভাবে জরাহটার যদি প্রকাশ পায় এমন ব্যক্তির থেকে যে জরাহের কারণ জানে না, তাহলে তার জরাহটাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর জরাহকৃত ব্যক্তি যদি তা'দীলশূন্য হয়, তাহলে সহীহ মত অনুযায়ী তার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত তথ্য বিস্তারিত নয়- এমন জরাহও গ্রহণযোগ্য হবে। যদি জরাহ প্রকাশিত হয় ঐ ব্যক্তির থেকে যে জরাহের কারণ সম্পর্কে জানে। কেননা, রাবীর ব্যাপারে যখন তা'দীল সাব্যস্ত হয় না তখন সে মাজহুলের মতো হয়ে যায়। আর জরাহকারীর বক্তব্যকে অকার্যকর না করে কার্যকর করাই উত্তম। অবশ্য ইবনুস সালাহ (র.) এরূপ ক্ষেত্রে তাকে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকার পক্ষপাতী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জরাহ অগ্রগামী না তা'দীল? যদি কোনো রাবী সম্পর্কে ইমামগণের পক্ষ হতে দু'ধরনের বক্তব্য এভাবে পাওয়া যায় যে, কেউ তাকে তা'দীল করেন আবার কেউ তাকে জরাহ করেন, তখন জরাহ প্রধান্য পাবে নাকি তা'দীল অগ্রগামী হবে- এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. উসূলীনদের এক জামাআতের মত হলো, কোনো রাবী সম্পর্কে জরাহ ও তা'দীল নিয়ে **تَعَارُضٌ** (দ্বন্দ্ব) দেখা দিলে তখন চূড়ান্তভাবে জরাহটা প্রাধান্য পাবে।
২. তবে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ ব্যাপারে প্রকৃত কথা হলো দুটি শর্তের সাথে জরাহটা অগ্রগামী হবে। যথা-

ক. জরাহটা সবিস্তারে হতে হবে; অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত হলে হবে না।

খ. জরাহটা এমন ব্যক্তির থেকে প্রকাশ পেতে হবে যিনি জরাহ -এর কারণ সম্পর্কে অবগত।

যদি এই দুই শর্তের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তখন জরাহ -এর উপর তা'দীল প্রাধান্য পাবে।

তা'দীলবিহীন জরাহ -এর হুকুম : যদি কোনো রাবীর ব্যাপারে ব্যাখ্যাহীন জরাহ পাওয়া যায়- তা'দীল না পাওয়া যায়, তাহলে তার হুকুম-নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. বিসুদ্ধ মত অনুযায়ী তখন জরাহটা মাকবুল হবে। চাই জরাহটা সবিস্তারে হোক কিংবা অস্পষ্ট হোক। তবে এর জন্য শর্ত একটি। আর তা হলো, জরাহটা এমন ব্যক্তি থেকে হতে হবে, যে তার কারণ স্বন্ধে অবগত। কেননা, জরাহকারীর বক্তব্যকে বাতিল করা থেকে আমল করা উত্তম।

২. আল্লামা ইবনুস সালাহ (র.) -এর মতে, এ সময়েও (ব্যাখ্যাহীন জরাহ -এর ক্ষেত্রে) জরাহ মাকবুল হবে না; বরং জরাহটা স্থগিত থাকবে।

মোটকথা যে, রাবীর জরাহ করা হয় তা দু প্রকার। ১. জরাহ -এর সাথে সাথে তার ব্যাপারে তা'দীলও পাওয়া যাবে। এমন অবস্থায় 'বিসুদ্ধ মত অনুযায়ী' দু শর্তে জরাহটা তা'দীলের উপর অগ্রগামী হবে। ২. শুধু জরাহ পাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় বিসুদ্ধ মত অনুযায়ী একটি শর্তে জরাহটা প্রাধান্য পাবে। আর তা হলো জরাহটা হতে হবে এমন ব্যক্তি হতে যে তার কারণ জানে।

جَرَح -এর প্রকারভেদ : জরাহ দু প্রকার। ১. جَرَحٌ مُّبَيَّنٌ ও ২. جَرَحٌ مُبْهَمٌ। নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. جَرَحٌ مُّبَيَّنٌ : জরাহ -এর সাথে সাথে যদি জরাহ-এর কারণ, সুরত, দলিল ইত্যাদি উল্লেখ থাকে, তাহলে তাকে جَرَحٌ مُّبَيَّنٌ বা সুস্পষ্ট জরাহ বলে। যেমন, এভাবে বলা-فُلَانٌ مِّنْهُمْ الْكَذِبِ ইত্যাদি। এর অপর নাম جَرَحٌ مُّكْتَرٍ বা সবিস্তারে জরাহ।

২. যদি জরাহ -এর সাথে তার কারণ, দলিল উল্লেখ না থাকে, তাহলে তাকে বলে جَرَحٌ مُبْهَمٌ। এর অপর নাম جَرَحٌ مُجْمَلٌ (অস্পষ্ট জরাহ) এবং جَرَحٌ غَيْرٌ مُّبَيَّنٌ (ব্যাখ্যাহীন জরাহ)। যেমন, এভাবে বলা-فُلَانٌ مَجْرُوحٌ অমুক অভিযুক্ত। কিন্তু কেন অভিযুক্ত, তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি তা উল্লেখ থাকে না।

فَصَلِّ وَمِنَ الْمَهْمِ فِي هَذَا الْفَنِّ مَعْرِفَةُ كُنْيَةِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ اشتهر باسمِهِ وَلَهُ كُنْيَةٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَأْتِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَكْنِيًّا لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُ آخَرُ وَمَعْرِفَةُ أَسْمَاءِ الْمَكْنَيْنِ وَهُوَ عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَعْرِفَةُ مَنْ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ وَهُمْ قَلِيلٌ وَمَعْرِفَةُ مَنْ اخْتَلَفَ فِي كُنْيَتِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ وَمَعْرِفَةُ مَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ كِبَارِنِ جُرَيْجٍ لَهُ كُنْيَتَانِ أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو خَالِدٍ أَوْ كَثُرَتْ نَعْوَتُهُ وَالْقَابَةُ وَمَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ كَأَبِي إِسْحَاقَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ أَحَدَ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ نَفَى الْغُلْطِ عَمَّنْ نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ فَتَنَسَّبَ إِلَى التَّضَحُّيفِ وَإِنَّ الصَّوَابَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَوْ بِالْعَكْسِ كَأِسْحَاقَ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيْعِيِّ أَوْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ كَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَأُمُّ أَيُّوبَ صَحَابِيَّانِ مَشْهُورَانِ أَوْ وَافَقَ اسْمُ شَيْخِهِ اسْمَ أَبِيهِ كَالرَّبِيعِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ هَكَذَا يَأْتِي فِي الرِّوَايَاتِ فَيُظَنَّ أَنَّهُ يَرَوِي عَنْ أَبِيهِ كَمَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُوهُ وَلَيْسَ أَنَسٌ شَيْخُ الرَّبِيعِ وَالِدُهُ بَلْ أَبُوهُ بَكْرِيُّ وَشَيْخُهُ أَنْصَارِيُّ وَهُوَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ وَلَيْسَ الرَّبِيعُ الْمَذْكُورُ مِنْ أَوْلَادِهِ .

অনুবাদ : হাদীসশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—

১. যে রাবী নামে প্রসিদ্ধ তার কোনো কুনিয়াত থাকলে তা জানা। নইলে কোথাও তাকে উপনামে উল্লেখ করা হলে তাকে অন্য ব্যক্তি বলে ধারণা করা হতে পারে।
 ২. যে রাবী কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ তার নাম জানা। নইলে কোথাও তাকে তার নামে উল্লেখ করা হলে ভিন্ন ব্যক্তি বলে ধারণা হতে পারে।
 ৩. কোনো রাবীর নাম ও কুনিয়াত একই হলে তা জানা। অবশ্য এরূপ খুব কম হয়।
 ৪. কোনো রাবীর কুনিয়াত সম্পর্কে মতভেদ থাকলে তা জানা। এরূপ প্রচুর রয়েছে।
 ৫. কারো কুনিয়াত অনেক থাকলে তা জানা। যেমন— ইবনে জুরাইজের দুটি কুনিয়াত। আবুল ওলীদ ও আবু খালিদ।
 ৬. কোনো রাবীর কুনিয়াত তার পিতার নামের অনুরূপ হলে তা জানা। যেমন— আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক মাদানী। তিনি একজন বিশিষ্ট তাবয়ী। যেহেতু আবু ইসহাকের পিতার নামও ইসহাক, সুতরাং তাকে ইবনে ইসহাক কুনিয়াতেও উল্লেখ করা ভুল হবে না।
- তেমনি সে রাবীকেও চেনা দরকার যার নাম তার পিতার কুনিয়াতের অনুরূপ। যেমন— ইসহাক ইবনে আবু ইসহাক সাবীয়া।
- সে রাবীকেও চেনা দরকার যার কুনিয়াত তার স্ত্রীর কুনিয়াতের অনুরূপ। যেমন— আবু আইয়ূব আনসারী ও উম্মে আইয়ূব আনসারী। উভয়েই প্রসিদ্ধ সাহাবী।

যে রাবীর শায়খের নাম তার পিতার নামের অনুরূপ তাকেও চিনতে হবে। যেমন- রবী ইবনে আনাস বর্ণনা করেন আনাস থেকে। বিভিন্ন বর্ণনায় এরূপ আসে। ফলে তখন ধারণা হতে পারে রবী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। বুখারী শরীফে আছে, আমির ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন সা'দ থেকে। এখানে সা'দ হলেন আমির-এরই পিতা। কিন্তু রবী যে আনাস থেকে বর্ণনা করেন তিনি তার পিতা বনু বকরের আনাস নন; বরং প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.): রবী তার পুত্র নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্মানিত লেখক সমাপনী -এর আলোচনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করার পর তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি আহকাম উল্লেখ করেছেন। তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে ফিরে আবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অবতারণা করছেন।

যারা নামে প্রসিদ্ধ : সাহাবীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁদের স্বতন্ত্র কুনিয়াত থাকলেও তারা তাতে পরিচিত ছিলেন না। এমন কয়েকজন হলেন-

হযরত তুলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)। এদের সকলের কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মদ। অনুরূপ হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত জাবির (রা.), হযরত সালমান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.)। এদের সকলের কুনিয়াত হলো আবু আব্দুল্লাহ। তাঁদের কুনিয়াত থাকলেও তাঁরা নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যারা কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ : এর বিপরীত কিছু সাহাবীর স্বতন্ত্র নাম থাকলেও তারা কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.)। তাদের সকলের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। কিন্তু তাঁরা নামে নয়; বরং কুনিয়াতে বেশি পরিচিত ছিলেন। ঠিক তদ্রূপ হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এটা তাঁর কুনিয়াত। তাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান।

নামই কুনিয়াত : যেমন- আবু বিলাল আশযারী। তিনি শরীকের ছাত্র ছিলেন। অনুরূপ আবু হুসাইন। তিনি হাতিম রাবীর ছাত্র ছিলেন।

কুনিয়াতের মধ্যে মতভেদ : যেমন- উসাম ইবনে যায়দ (রা.)। তাঁর কুনিয়াত নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে আবু যায়দ, কারো মতে আবু মুহাম্মদ, আবার কারো মতে আবু খারিযা।

বিভিন্ন কুনিয়াত : যাদের কুনিয়াত একাধিক তাদেরও জানা দরকার, যাতে কুনিয়াতের পরিবর্তনে তাকে চিনতে ভুল না হয়। যেমন- হযরত আবু বকর (রা.)। তাঁর দুটি লকব সিদ্দীক এবং আতীক।

مَدِينِي এবং مَدِينِي -এর মধ্যে পার্থক্য : উভয় শব্দই শহরের দিকে নিসবত। তবে প্রভেদ হলো,, مَدِينِي শব্দটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শহর মদীনা মুনাওয়ারার সাথে সংশ্লিষ্ট, আর مَدِينِي যে কোনো শহরের দিকে নিসবত। অবশ্য এ নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম হলেন হযরত আলী ইবনুল মাদীনী (র.)। তিনি ইমাম বুখারী (র.)-এর শায়খ। আলীর পিতা مَدِينِي হলেও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শহর মদীনার অধিবাসী ছিলেন।

রাবীর শায়খের নাম এবং পিতার নাম এক : কখনো রাবীর পিতার নাম এবং ওস্তাদের নাম এক হয়।

তখন ধারণা হয় যে, রাবী হয়তো নিজ পিতা হতে রেওয়ায়েত করছেন। অথচ বাস্তবে তা নয়। যেমন-

رَبِيعُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ -এর মধ্যে রবীর পিতা এবং ওস্তাদ উভয়ের নাম এক অর্থাৎ আনাস। কিন্তু পিতা আনাস যিনি, তিনি হলেন বকারী আর ওস্তাদ আনাস যিনি, তিনি হলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাদেম ছিলেন।

অবশ্য কখনো এমন হয় যে, রাবী তার পিতা হতে রেওয়ায়েত করেন। তখন গিয়ে পিতা এবং শায়খ একই ব্যক্তি হন। যেমন- বুখারীর সনদ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ -এ সংঘটিত হয়েছে।

وَمَعْرِفَةُ مَنْ نَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ كَالْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسَدِ نَسَبٌ إِلَى الْأَسَدِ
الزُّهْرِيُّ لِأَنَّهُ تَبَنَاهُ وَإِنَّمَا هُوَ الْمَقْدَادُ بْنُ عَمْرِوٍ أَوْ نَسَبٌ إِلَى أُمِّهِ كَابْنِ عُلَيْيَةَ وَهُوَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِقْسَمٍ أَحَدِ الْقِفَاتِ وَعُلَيْيَةُ اسْمُ أَبِيهِ اشتهرَ بِهَا وَكَانَ
لَا يُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ ابْنُ عُلَيْيَةَ وَلِهَذَا كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ أَنَا إِسْمَاعِيلُ الَّذِي
يُقَالُ لَهُ ابْنُ عُلَيْيَةَ أَوْ نَسَبٌ إِلَى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ كَالْحَدَاءِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ
مَنْسُوبٌ إِلَى صَنَاعَتِهَا أَوْ بَيْعِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ يُجَالِسُهُمْ فَنَسِبَ
إِلَيْهِمْ وَكُسِّلِمَانُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي التَّيْمِ وَلَكِنْ نَزَلَ فِيهِمْ وَكَذَا مَنْ نَسِبَ
إِلَى جَدِّهِ فَلَا يُؤْمِنُ النَّبَاسَةُ بِمَنْ وَافَقَ إِسْمُهُ إِسْمُهُ أَبِيهِ اسْمُ الْجَدِّ الْمَذْكُورِ

অনুবাদ : ৭. যে রাবীর পরিচয় তার পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে তাকে জানা। যেমন- মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ যুহরী। মেকদাদের পিতার নাম আমর। কিন্তু আসওয়াদ তাকে পালকপুত্র বানিয়েছিলেন। সেজন্য তার নামের সাথেই মেকদাদের পরিচয় ঘটেছে।

সে রাবীকেও চিনতে হবে যিনি তার মাতার নামের সাথে পরিচিত। যেমন- ইবনে উলাইয়া। তিনি হলেন ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মিকসাম। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তার মায়ের নাম ছিল উলাইয়া। মায়ের নামের সাথেই তার পরিচয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইসমাঈল নিজে মায়ের নামের সাথে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন না। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলতেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল, যাকে ইবনে উলাইয়া বলা হয়।

সে রাবীকেও চেনা প্রয়োজন যাকে এমন একটি বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করা হয় যা সহজে বুঝা যায় না। যেমন- হায্যা। দৃশ্যত মনে হয় তিনি জুতা তৈরি কিংবা তার ব্যবসা করতেন। তাই তাকে হায্যা বলা হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। বস্তৃত তিনি জুতা ব্যবসায়ীদের সাথে উঠাবসা করতেন, তাই তাকে তাদের সাথে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে।

তেমনি সুলাইমান তাইমী মূলত তাইম গোত্রের লোক ছিলেন না; কিন্তু তাদের মাঝে অবস্থান করতেন বলে তাকে তাইমী বলা হয়।

আবার অনেককে তার দাদার নামের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এরূপ রাবীকেও চিনতে হবে। অন্যথায় এরূপ রাবীর সাথে বিভ্রাট ঘটবে যার নাম অনুরূপ এবং তার পিতার নাম উক্ত রাবীর দাদার নামের অনুরূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পিতা নয় এমন ব্যক্তির দিকে নিসবত : যে সমস্ত রাবীদের পিতার দিকে ব্যতীত অন্যের দিকে নিসবত করা হয় তাও জানা দরকার। যাতে করে কোনো সনদে পিতার দিকে নিসবত হলে ধোঁকায় না পড়তে হয়। যেমন- হযরত মেকদাদ (রা.) -এর পিতার নাম আমর; কিন্তু তাকে আসওয়াদ যুহরীর দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হয় মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ। কেননা, আসওয়াদ তাকে পালকপুত্র বানিয়ে ছিলেন।

মায়ের দিকে নিসবত : কোন রাবীকে মায়ের প্রতি নিসবত দেওয়া হয় তাও জানা দরকার। যেমন- ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম তার মায়ের দিকে নিসবত হয়ে ইবনে উলাইয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও তিনি এ নামে পরিচিত হওয়া পছন্দ করতেন না।

বুঝা যায় না এমন বস্তুর দিকে নিসবত : কখনো রাবীকে নিসবত দেওয়া হয় এমন বস্তুর দিকে, সে বস্তুর থেকে যেটা বুঝে আসে তা উদ্দেশ্য হয় না। যেমন- খালিদ হায্যা। হায্যা -এর অর্থ- মুচি। সুতরাং এ শব্দ থেকে সাধারণত বুঝে আসে যে তিনি মুচি ছিলেন। আসলে ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়; বরং তাকে হায্যা বলার কারণ হলো তিনি তাদের সাথে বেশি উঠাবসা করতেন।

তেমনিভাবে সুলাইমান তাইমী। এর থেকে বুঝে আসে যে, তিনি তাইমী গোত্রের ছিলেন; কিন্তু আসলে ব্যাপারটি তা নয়। তিনি তাইমী গোত্রে অবস্থান করতেন বলে এ বংশীয় নামে তিনি পরিচিত হন।

মোটকথা, পিতা ব্যতীত অন্যের দিক নিসবতের কয়েকটি সুরত। যথা-

১. পালক পিতার দিকে। যেমন- মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ।
২. মায়ের দিকে। যেমন- ইবনে উলাইয়া।
৩. যে অর্থ বুঝা যায় না তার দিকে। যেমন- খালিদ হায্যা।
৪. দাদা বা পরদাদার দিকে। যেমন- আহমদ ইবনে হাখল।
৫. দাদার দিকে। যেমন- ইয়া'লা ইবনে মুনাব্বাহ।

وَمَعْرِفَةُ مَنْ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدَهُ كَالْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
 الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَقَدْ يَقَعُ أَكْثَرُ
 مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْمُسْلَسِلِ وَقَدْ يَتَّفِقُ الْإِسْمُ وَاسْمُ الْآبِ مَعَ اسْمِ
 الْجَدِّ وَاسْمِ أَبِيهِ فَصَاعِدًا كَأَبِي الْيَمَنِ الْكِنْدِيُّ هُوَ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
 زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ اتَّفَقَ اسْمُ الرَّأْوِيِّ وَاسْمُ شَيْخِهِ
 وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا كَعِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْأَوَّلِ يُعْرَفُ
 بِالْقَصِيرِ وَالثَّانِي أَبُو رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيُّ وَالثَّلَاثُ ابْنُ حُصَيْنِ الصَّحَابِيُّ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَسَلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَوَّلِ ابْنِ
 أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبْرَانِيِّ وَالثَّانِي ابْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيِّ وَالثَّلَاثُ ابْنُ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيِّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ شَرْحِبِيلٍ وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ لِلرَّأْوِيِّ
 وَشَيْخِهِ مَعَ كَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ الْعَطَّارِ مَشْهُورٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي
 عَلِيٍّ الْإِضْبَهَانِيِّ الْحَدَّادِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ فَاتَّفَقَا فِي ذَلِكَ وَافْتَرَقَا فِي الْكُنْيَةِ
 وَالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَلَدِ وَالصَّنَاعَةِ وَصَنَّفَ فِيهِ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ
 جُزْءًا حَافِلًا.

অনুবাদ : ৮. অনেক রাবীর নাম, তার পিতার নাম ও দাদার নাম একই। এটিও জানা দরকার। যেমন- হাসান ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব। কখনো কখনো সমনামের ধারাবাহিকতা এর চেয়েও বেশি হয়। এটিও মুসালসাল সনদের একটি প্রকার।

কখনো কখনো এরূপ হয় যে, রাবীর ও তার দাদার নাম এবং রাবীর পিতা ও তার দাদার নাম একই। যেমন- আবুল ইয়ামান কিন্দি যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে হাসান।

অনেক সময় রাবীর নাম, তার শায়খের নাম ও শায়খের শায়খের নাম একই হয়ে থাকে। যেমন- ইমরান ইমরান হতে, ইমরান (দ্বিতীয়জন) ইমরান হতে। প্রথম ইমরান পরিচিত কাসীর নামে, দ্বিতীয়জন আবু রজা আতারিদী এবং তৃতীয়জন হলেন ইবনে হুসাইন (রা.) সাহাবী।

তেমনি সুলাইমান সুলাইমান থেকে, সুলাইমান (দ্বিতীয়জন) সুলাইমান হতে। প্রথম ব্যক্তি হলেন ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ূব তাবারানী, দ্বিতীয়জন ইবনে আহমাদ ওয়াসিতী এবং তৃতীয়জন ইবনে আব্দুর রহমান দিমাশকী, যিনি ইবনে বিনতে শুরাহবীল হিসেবে প্রসিদ্ধ।

কখনো কখনো এই নামের এক হওয়াটা রাবীর ও তার শায়খের সাথে একই সাথে ঘটে। অর্থাৎ রাবীর নাম ও তার পিতা-পিতামহের নাম এবং রাবীর শায়খের নাম ও শায়খের পিতা-পিতামহের নাম একই হয়ে থাকে। যেমন- আবু আ'লা হামদানী আল-আন্তার। তিনি আবু আলী ইস্পাহানী হাদ্দাদ থেকে রেওয়ায়েতে মশহূর। উভয়ের (শায়খ ও ছাত্রের) নাম হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ। দুজনই নামের দিক দিয়ে একই কিন্তু কুনিয়াত, শহরীয় নাম এবং পেশার দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন। আবু মুসা মাদানী এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কয়েক পুরুষের একই নাম : কখনো রাবীর কয়েক পুরুষের নাম একই হয়। যেমন- ইবনে মাজাহ শরীফে একজন রাবী আছেন, যার নাম হাসান ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী (রা.)। এমনভাবে ইমাম গাযালী (র.) -এর নাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী। তাযকিরাতুল হুফাজ গ্রন্থে আছে, এমনও উদাহরণ আছে, যেখানে চৌদ্দপুরুষ ধরে ধারাবাহিকভাবে 'মুহাম্মদ' নাম চলেছে।

রাবী ও তার দাদার নাম এবং রাবীর পিতা ও তার দাদার নাম এক : কখনো কোনো রাবীর নাম ও রাবীর দাদার নাম একই হয়। অনুরূপ রাবীর পিতা ও পিতার দাদার নাম একই হয়। যেমন- আবুল ইয়ামান কিন্দী নামে একজন রাবী আছেন। তার নাম য়ায়েদ ইবনে হাসান ইবনে য়ায়েদ ইবনে হাসান ইবনে য়ায়েদ ইবনে হাসান। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাবীর নাম ও তার দাদার নাম একই। আর তা হলো 'য়ায়েদ'। অনুরূপ রাবীর পিতা ও পিতার দাদার নাম এক। আর তা হলো 'হাসান'।

রাবীর নাম, শায়খের নাম এবং শায়খের শায়খের নাম এক : কখনো কোনো রাবীর নাম এবং তার শায়খের নাম ও শায়খের শায়খের নাম এক হয়। যেমন- **عَمْرَانُ عَنْ عَمْرَانَ عَمْرَانَ** সূত্রের রেওয়ায়েতে। প্রথম ইমরান জাসীর নামে দ্বিতীয় ইমরান আবু রজা আতারিদী এবং তৃতীয় ইমরান সাহাবী হিসেবে পরিচিত। তারা বিভিন্ন উপনামে পরিচিতি হলেও সকলের নাম একই। আর তা হলো ইমরান।

রাবীর নাম পিতার নাম এবং দাদার নাম এক : কখনো কখনো রাবীর নিজের নাম, তার পিতার নাম এবং দাদার নাম যা হয়, তাই রাবীর শায়খের, তার পিতার ও দাদার নাম হয়। যেমন- আবু আ'লা হামদানী আল-আন্তারের শায়খ হলেন আবু আলী ইস্পাহানী হাদ্দাদ। আর উভয়ের নাম হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ। সুতরাং নামের দিক দিয়ে উভয়ই এক। অবশ্য রাবীর কুনিয়াত আবু আ'লা আর শায়খের কুনিয়াত আবু আলী। অনুরূপ রাবীর নিসবত হামদানী আর শায়খের নিসবত ইস্পাহানী। রাবীর পেশা আন্তার (আতর বিক্রেতা) আর শায়খের পেশা হাদ্দাদ (কর্মকর)।

وَمَعْرِفَهُ مَنْ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّأَوِيُّ عَنْهُ وَهُوَ نَوْعٌ لَطِيفٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ
لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفَائِدَتُهُ رَفَعُ اللَّبْسِ عَنْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ فِيهِ تَكَرُّرًا أَوْ
إِنْقِلَابًا فَمِنْ أَمْثَلَتِهِ الْبُخَارِيُّ رَوَى عَنْ مُسْلِمٍ وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ فَشَيْخُهُ
مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَادِيسِيُّ الْبَصْرِيُّ وَالرَّأَوِيُّ عَنْهُ مُسْلِمٌ ابْنُ الْحَجَّاجِ
النُّفَسِيَّ صَاحِبُ الصَّحِيحِ وَكَذَا وَقَعَ ذَلِكَ لِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ أَيْضًا رَوَى
عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ ابْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ
حَدِيثًا بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ يَعْنِيهَا وَمِنْهَا يَنْحَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ رَوَى عَنْ هِشَامٍ
وَرَوَى عَنْهُ هِشَامٌ فَشَيْخُهُ هِشَامُ بْنُ عُزْرَةَ وَهُوَ مِنْ أَقْرَائِهِ وَالرَّأَوِيُّ عَنْهُ
هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ وَمِنْهَا ابْنُ جُرَيْجٍ رَوَى عَنْ هِشَامٍ وَ
رَوَى عَنْهُ هِشَامٌ فَالْأَعْلَى ابْنُ عُزْرَةَ وَالْأَذْنَى ابْنُ يُونُسَ الصَّنْعَائِيُّ وَمِنْهَا
الْحَكَمُ ابْنُ عَتِيبَةَ رَوَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَعَنْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَالْأَعْلَى
عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْأَذْنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورِ وَأَمْثَلَتُهُ كَثِيرَةٌ.

অনুবাদ : ৯. অনেক সময় কোনো রাবীর শায়খ ও শিষ্য একই নামের হয়। যদিও এটি একটি মজার বিষয়, কিন্তু ইবনুস সালাহ এ বিষয়ের প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টিপাত করেননি। এটি জানার উপকারিতা হলো, এর ফলে পুনরাবৃত্তি বা স্থান পরিবর্তনের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যেমন- ইমাম বুখারীর শায়খের নাম মুসলিম, শিষ্যের নামও মুসলিম। শায়খ হলেন মুসলিম ইবনে ইবরাহীম ফারাদিসী রসরী এবং ছাত্র হলেন ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী- মুসলিম শরীফের গ্রন্থকার।

তেমনি আবাদ ইবনে হুমাইদ -এর শায়খ হলেন মুসলিম ইবনে ইবরাহীম এবং ছাত্র হলেন ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ। মুসলিম শরীফে তার এই সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর-এর শায়খ হলেন হিশাম আবার ছাত্রের নামও হিশাম। শায়খ হলেন হিশাম ইবনে উরওয়া। তিনি তার সমসাময়িক। আর ছাত্র হলেন হিশাম ইবনে আবু আব্দুল্লাহ দাস্তাওয়ায়ী।

ইবনে জুরায়জ -এর শায়খ হিশাম, আবার ছাত্রও হিশাম। প্রথমজন হলেন ইবনে উরওয়া এবং শেষের জন্য ইবনে ইউসুফ সানআনী।

হাকাম ইবনে উতায়বার শায়খ ইবনে আবু লায়লা, ছাত্রও ইবনে আবু লায়লা। প্রথম ব্যক্তি হলেন আব্দুর রহমান এবং পরের ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে উক্ত আব্দুর রহমান। এরূপ অনেক নজির রয়েছে।

وَمِنَ الْمُهِمِّ فِي هَذَا الْفَنِ مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْمَجْرَدَةِ وَقَدْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ
مِنَ الْأَيْمَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَهَا بِغَيْرِ قَبِدٍ كَابِنٍ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ وَابْنِ
إِسَى خَبَشَمَةَ وَالْبُخَارِي فِي تَارِيخِهَا وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرِحِ
وَالْتَّعْدِيلِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الثِّقَاتِ كَالْعَجَلِيِّ وَابْنِ حِبَّانٍ وَابْنِ شَاهِينَ
وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الْمَجْرُوحِينَ كَابِنِ عَدِيٍّ وَابْنِ حِبَّانٍ أَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ
تَقَيَّدَ بِكِتَابٍ مَخْصُوصٍ كِرَجَالِ الْبُخَارِيِّ لِأَبِي نَضْرٍ الْكَلَابَازِيِّ وَرِجَالِ
مُسْلِمٍ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ مَنْجُونَةَ وَرِجَالِهَا مَعَ لَا بِسَى الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ وَ
رِجَالِ أَبِي دَاوُدَ لِأَبِي عَلِيٍّ الْجَيْبَانِيِّ وَكَذَا رِجَالُ التِّرْمِذِيِّ وَرِجَالُ النَّسَائِيِّ
لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَرِجَالُ السَّيْتَةِ الصَّحِيحِينَ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ لِعَبْدِ الْغَنِيِّ الْمُقَدِّسِيِّ فِي كِتَابِ الْكَمَالِ ثُمَّ هَذَبَهُ
الْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ وَقَدْ لَحِظْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً
وَسَمَّيْتُهُ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ وَجَاءَ مَعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَدْرُ
ثُلُثِ الْأَصْلِ.

অনুবাদ : ১০. হাদীসশাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যাদের নামের সাথে কোনো কুনিয়াত ইত্যাদি উল্লেখ করা হয় না তাদের জানা। একদল ইমাম তাদের নামের সংকলন তৈরি করেছেন। কেউ কেউ কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই তাদের নাম সংকলন করেছেন। যেমন- সা'দ তার তাবাকাত গ্রন্থে, ইবনে আবু খায়ছামাহ ও ইমাম বুখারী তাদের ইতিহাস গ্রন্থে এবং ইবনে আবু হাতিম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে।

কেউ কেউ শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রাবীদেরই নাম একত্রিত করেছেন। যেমন- ইজলী, ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন প্রমুখ। আবার কেউবা শুধুমাত্র অভিযুক্তদের নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যেমন- ইবনে আদী, ইবনে হিব্বান।

কেউ কেউ কোনো একটি নির্দিষ্ট কিতাবের রাবীদের নামে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন- আবু নসর কালাবাহী তার 'রিজালুল বুখারী' ও আবু বকর ইবনে মানজুর তার 'রিজালুল মুসলিম' গ্রন্থে। উভয়ের ব্যক্তিবর্গের সংকলন করেছেন আবুল ফযল ইবনে তাহির। আবু দাউদ শরীফের রাবীদের নাম সংকলন করেছেন আবু আলী জিয়ানী। তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের রাবীদের নামের সংকলন করেছেন পশ্চিম এলাকার কতিপয় আলিম। সিহাহ সিন্তা অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে

মাজাহ শরীফের সকল রাবীর নাম একত্রে সংকলন করেছেন আব্দুল গনী মুকাদ্দিসী তার 'আল-কামাল' গ্রন্থে। অতঃপর তার পরিমার্জন করেছেন আল-মিযযী তার 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থে। আমি তার সারসংক্ষেপ করেছি এবং তাতে অনেক বিষয় সংযোজন করেছি। এর নাম দিয়েছি 'তাহযীবুল তাহযীব'। এটি (তাহযীবুল তাহযীব) মূল কিতাবের (তাহযীবুল কামালের) এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তাতে বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও মূল কিতাবের তিনভাগের একভাগের পরিমাণ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُجَرَّدَةٌ -এর সংজ্ঞা : কতক রাবী এমন আছেন যাদের শুধু নাম আছে; কুনিয়াত, লকব নেই তাদেরকে مُجَرَّدَةٌ বা শুধু নাম বলে। এমন রাবী সম্পর্কেও জানা দরকার।

مُجَرَّدَةٌ -এর নামের সংকলন তৈরি : ওলামায়ে কেরাম مُجَرَّدَةٌ -এর নামের তালিকা কয়েক পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন। যথা-

১. কেউ কেউ তাদেরকে নির্বিচারে উল্লেখ করেছেন, ضَوْفٌ - বাছাই করেননি; অনুরূপ কোন কিতাবের হাদীস তাও দেখেননি। যেমন- ইবনে সা'দ তাবাকাত গ্রন্থ এবং ইবনে হাতীম আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থ রচনা করেছেন।
২. কেউ কেউ শুধু ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন। যেমন- ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন এবং ইজলী।
৩. কেউ কেউ কেবল অভিযুক্ত ও সমালোচিতদের সংকলন তৈরি করেছেন। যেমন- ইবনে আদী এবং ইবনে হিব্বান।
৪. কেউ কেউ সুনির্দিষ্ট কিতাবের রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বুখারী বা মুসলিম কিতাবের রাবীদের। যেমন- বুখারীর রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন আবু নসর কালাবাযী আর মুসলিমের রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন আবু বকর ইবনে মানজুয়া।

মোটকথা, মুহাদ্দিসীনে কেরামের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র রুচি অনুযায়ী তারা একেক দিক বিবেচনায় একেক ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

وَمِنَ الْمُهِمِّ فِي هَذَا النَّفْنِ مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْمَجْرَدَةِ وَقَدْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ
مِنَ الْأَئِمَّةِ فَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَهَا بِغَيْرِ قَبْدٍ كَابْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ وَابْنِ
إِسَى خَبَشَمَةَ وَالْبُخَارِي فِي تَارِيخِهِمَا وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرَحِ
وَالْتَعْدِيلِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الثِّقَاتِ كَالْعَجَلِيِّ وَابْنِ حِبَّانٍ وَابْنِ شَاهِينَ
وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَدَ الْمَجْرُوحِينَ كَابْنِ عَدِيٍّ وَابْنِ حِبَّانٍ أَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ
تَقَيَّدَ بِكِتَابٍ مَخْصُوصٍ كِرَجَالِ الْبُخَارِيِّ لِأَبِي نَصْرِ الْكَلَابَازِيِّ وَرَجَالِ
مُسْلِمٍ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ مَنْجُونَةَ وَرَجَالِهِمَا مَعَ لَايْسِي الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ وَ
رَجَالِ أَبِي دَاوُدَ لِأَبِي عَلِيٍّ الْجَيْيَانِيِّ وَكَذَا رَجَالُ التِّرْمِذِيِّ وَرَجَالُ النَّسَائِيِّ
لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُغَارِبَةِ وَرَجَالُ السِّتَةِ الصَّحِيحِينَ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ لِعَبْدِ الْغَنِيِّ الْمُقَدِّسِيِّ فِي كِتَابِ الْكَمَالِ ثُمَّ هَذِبَهُ
الْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ وَقَدْ لَحَضْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً
وَسَمَّيْتُهُ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ وَجَاءَ مَعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَدْرُ
ثُلُثِ الْأَصْلِ.

অনুবাদ : ১০. হাদীসশাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যাদের নামের সাথে কোনো কুনিয়াত ইত্যাদি উল্লেখ করা হয় না তাদের জানা। একদল ইমাম তাদের নামের সংকলন তৈরি করেছেন। কেউ কেউ কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই তাদের নাম সংকলন করেছেন। যেমন- সা'দ তার তাবাকাত গ্রন্থে, ইবনে আবু খায়ছামাহ ও ইমাম বুখারী তাদের ইতিহাস গ্রন্থে এবং ইবনে আবু হাতিম আল-জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে।

কেউ কেউ শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রাবীদেরই নাম একত্রিত করেছেন। যেমন- ইজলী, ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন প্রমুখ। আবার কেউবা শুধুমাত্র অভিযুক্তদের নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যেমন- ইবনে আদী, ইবনে হিব্বান।

কেউ কেউ কোনো একটি নির্দিষ্ট কিতাবের রাবীদের নামে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন- আবু নসর কালাবায়ী তার 'রিজালুল বুখারী' ও আবু বকর ইবনে মানজুয়া তার 'রিজালু মুসলিম' গ্রন্থে। উভয়ের ব্যক্তিবর্গের সংকলন করেছেন আবুল ফযল ইবনে তাহির। আবু দাউদ শরীফের রাবীদের নাম সংকলন করেছেন আবু আলী জিয়ানী। তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের রাবীদের নামের সংকলন করেছেন পশ্চিম এলাকার কতিপয় আলিম। সিহাহ সিত্তা অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে

কেমনা, ইবনে আবু হাতিম তার 'আল-জারহ ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে বলেছেন, সুগদী কৃষীকে ইমাম ইবনে মাসীন নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। আর ইতঃপূর্বে উল্লিখিত সুগদী ইবনে সিনানকে তিনিও দুর্বল বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুগদী এক ব্যক্তি নয়; বরং দু' ব্যক্তির নাম।

ইমাম উকাইলী তার ইতিহাস গ্রন্থে লেখেছেন, সুগদী ইবনে আব্দুল্লাহ যিনি কাতাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণিত হাদীস গায়রে মাহফূয অর্থাৎ শায।

আমার মনে হয় এই সুগদী হলেন তিনিই- ইবনে আবু হাতিম যার উল্লেখ করেছেন। তবে উকাইলী তাকে দুর্বলদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন সেই হাদীসের কারণে যা ইমাম উকাইলী তার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে হাদীসের দুর্বলতা সুগদীর কারণে আসেনি; বরং তার শিষ্য আনবাসা ইবনে আব্দুর রহমানের কারণে। আব্দুহই ভালো জানেন।

এরূপ আরেকটি নাম হলো سَنَدَر (সানদার)। নুকতাহীন সীন ও নূন সহকারে, জা'ফর (جَفَنَر)-এর ওয়নে। তিনি যিনবা আল-জুযামী -এর মাওলা এবং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তার প্রসিদ্ধ কুনিয়াত হলো আবু আব্দুল্লাহ। আমার জানা মতে এই নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। কিন্তু ইবনে মানদার 'মারিফাতুস সাহাবা' -এর পাদটীকায় আবু মুসা লেখেছেন, সানদার-এর কুনিয়াত আবুল আসওয়াদ। তিনি তার একটি হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, সানদার নামে আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু তার বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আবু মুসা যে সানদার-এর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি সে-ই ব্যক্তিই, ইবনে মানদা তার মারিফাতুস সাহাবা গ্রন্থে যার উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে মানদা যার উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন যিনবা আল-জুযামী -এর মাওলা। মোটকথা, দু' স্থানে একই ব্যক্তি উদ্দেশ্য। মুহাম্মদ ইবনে রবী মিসরে বসতি স্থাপনকারী সাহাবীদের ইতিহাসে উল্লিখিত হাদীসটি যিনবা-এর মাওলা সানদার-এর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। আমি আমার সাহাবী সংক্রান্ত গ্রন্থেও এরূপই উল্লেখ করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَسْمَاءُ مُفْرَدَةٌ -এর সংজ্ঞা : কিছু রাবী এমন আছেন যাদের নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই তাদের নামকে أَسْمَاءُ مُفْرَدَةٌ বলে। যেমন- لَبَّى بَنُ لَبَا (লুবা ইবনে লাবা), أَحْمَدُ بْنُ عَجَبَانَ (আহমাদ ইবনে আজযান), سَنَدَر (সানদার) ইত্যাদি।

سَنَدَر নামীয় একক ব্যক্তি : সানদার একজন সাহাবীর নাম। তিনি যিনবা জুযামীর মাওলা ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ। যেহেতু سَنَدَر নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই, তাই এ নামটি أَسْمَاءُ مُفْرَدَةٌ -এর অন্তর্গত।

অবশ্য আবু মুসা مَعْرُوفُ الصَّعَابَةِ -এর পরিশিষ্টে এক سَنَدَر -এর উল্লেখ করেছেন, যার কুনিয়াত হলো আবুল আসওয়াদ। এ থেকে বুঝা যায় যে, সানদার নামে এক ব্যক্তি ছিলেন না; বরং দুই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়; বরং প্রকৃত তথ্য হলো আবু মুসা সানদার বলে যার উল্লেখ করেছেন তিনিই পূর্ববর্তী সানদার। অতএব, সানদার দুজন হলেন না; বরং একজনই হলেন।

وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْكِنَى الْمُجَرَّدَةِ وَالْمُفْرَدَةِ وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْأَلْقَابِ وَهِيَ تَارَةٌ
يَكُونُ بِلَفْظِ الْأِسْمِ وَتَارَةٌ بِلَفْظِ الْكُنْيَةِ وَتَقَعُ بِسَبَبِ عَاهَةٍ كَالْأَعْمَشِ أَوْ
حَرْفَةٍ وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْأَنْسَابِ وَهِيَ تَارَةٌ يَقَعُ إِلَى التَّجَانُّلِ وَهُوَ فِي
الْمُتَقَدِّمِينَ أَكْثَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَأَخِّرِينَ وَتَارَةٌ إِلَى الْأَوْطَانِ وَهَذَا فِي
الْمُتَأَخِّرِينَ أَكْثَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَقَدِّمِينَ وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْوَطَنِ أَعَمُّ مِنْ
أَنْ يَكُونَ بِلَادًا أَوْ ضِيَاعًا أَوْ سِكَكًا أَوْ مُجَاوِرَةً وَتَقَعُ إِلَى الصَّنَائِعِ
كَالْخَبَاطِ وَالْحِرَفِ كَالْبَزَازِ وَيَقَعُ فِيهَا الْإِتْفَاقُ وَالِاسْتِثْبَاءُ كَالْأَسْمَاءِ وَقَدْ
تَقَعُ الْأَنْسَابُ الْقَابَا كَخَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيِّ كَانَ كُوفِيًّا وَيُلَقَّبُ
بِالْقَطَوَانِيِّ وَكَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا -

অনুবাদ : ১২. যে সকল রাবীর শুধুমাত্র কুনিয়াত রয়েছে বা সে কুনিয়াত আর কারো নেই তা জানা। তেমনি রাবীর উপাধিও জানা। এটি কখনো নামে, কখনো কুনিয়াতে আবার কখনো হয় কোনো বিপর্যয়ের কারণে। যেমন- আমাশ (দিনকানা)। কিংবা পেশার কারণে। (যেমন- বাঘঘাঘ তথা কাপড় ব্যবসায়ী)।

১৩. রাবীদের সম্পর্কীয় পরিচয় জানাও জরুরি। এটি কখনো হয় গোত্রের সাথে, পরবর্তীদের তুলনায় পূর্ববর্তীদের মধ্যে যা বেশি দেখা যায়। আবার কখনো হয় বাসস্থানের সাথে, পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরবর্তীদের মধ্যে যা বেশি দেখা যায়। বাসস্থানের সম্পর্ক হয় শহর, কিংবা চাম্বাবাদের স্থান, কিংবা গলি কিংবা পান্থবর্তী স্থানের সাথে। আবার কখনো দক্ষতা যেমন- দর্জি ও পেশা যেমন- কাপড় ব্যবসায়ী -এর সাথেও হয়। নামের মতোই এক্ষেত্রেও মিল ও বিভ্রাট সৃষ্টি হতে পারে। কখনো কখনো নিসবতই উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- খালেদ ইবনে মাখলাদ কাতওয়ানী। তিনি ছিলেন কুফার অধিবাসী, কিন্তু কাতওয়ানী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এ উপাধি উল্লেখে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُنْيَتُ الْمُجَرَّدَةِ -এর সংজ্ঞা : কিছু রাবীর শুধু কুনিয়াতই থাকে- নাম, লকব কিছুই থাকে না। এমন কুনিয়াতকে বলে কُنْيَتُ مُفْرَدَةٍ। যেমন- أَبُو الْعَنَسَا এটা উসামার কুনিয়াত ছিল। অনুরূপ عُبَيْدُ بْنُ (আবু উবাইদাইন) এটা মুয়াবিয়া ইবনে সাবুরার কুনিয়াত। এ দু কুনিয়াত কেবল তাঁদেরই ছিল, অন্য কারো ছিল না।

لَقَبُ -এর কয়েকটি সূরত : লকব বা উপাধির ধরন কয়েকটি হয়।

১. লকব কখনো নাম হয়। যেমন- হযরত সাফীনা (রা.)।

২. লকব কখনো কুনিয়াতে পরিণত হয়। যেমন- আবু তুরাব হযরত আলী (রা.)-এর কুনিয়াত ও লকব।

৩. কখনো কোনো দোষ-ত্রুটি লক্বে পরিণত হয়। যেমন- **سَلِيمَانَ أَعْمَشَ** (অর্থ- দিনকানা অর্থাৎ দিনের আলেতে দেখতে পায় না), **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجَ** (অর্থ- ল্যাংড়া), **أَلْبَطِينُ** (অর্থ- পেটুক) ইত্যাদি।

৪. কখনো পেশা লক্বে পরিণত হয়। যেমন- **عَطَّار** (আতর ব্যবসায়ী)।

নিসবতের কয়েকটি সূরত : নিসবতের সূরত কয়েকটি। যথা-

১. নিসবত কখনো গোত্রের দিকে হয়। যেমন- হাশেমী, কুরাইশী ইত্যাদি।

২. কখনো দেশের দিকে হয়। যেমন- বুখারী, মিসরী, বাংলাদেশী ইত্যাদি।

৩. কখনো **صَنَاعَتٌ** তথা কারিগরি বা দক্ষতার দিকে। যেমন- **خَبَّاطٌ** (দর্জী)।

৪. কখনো হয় **حِرْفَةٌ** তথা পেশার দিকে। যেমন- **عَطَّار** (আতর ব্যবসায়ী)।

وَطْنٌ -এর দিকে নিসবত : **وَطْنٌ** -এর দিকে নিসবতটা **عَامٌ** বা ব্যাপক। নিসবতে ওতনীর দ্বারা কখনো উদ্দেশ্য হয় শহর। যেমন- **مَكِّيٌّ**, **مَدَنِيٌّ** অথবা চাষাবাদের স্থান অথবা কোনো গলি, অথবা শুধু পড়শি হওয়ার কারণেও নিসবত হয়।

وَطْنِيٌّ নিসবতটা এ দৃষ্টিতেও **عَامٌ** যে, যাকে কোনো **وَطْنٌ** -এর দিকে নিসবত দেওয়া হয় সেখানে সে পূর্ব হতেই থাকতে পারে, অথবা পরবর্তীতে এসে বসবাস করতে পারে অথবা কিছুদিন ছিল এমনও হতে পারে। অর্থাৎ এ সমস্ত অবস্থায়ও কোনো ব্যক্তিকে **وَطْنٌ** -এর দিকে নিসবত দেওয়া হয়।

নিসবতের মধ্যে মিল-অমিল : যেরূপভাবে রাবীদের পরস্পরের নামের মধ্যে অনেক সময় একজনের নাম অপরজনের সাথে উচ্চারণ ও লেখায় মিলে যায় আবার কখনো শুধু উচ্চারণে মেলে লেখায় মেলে না, ঠিক তেমনি নিসবতের মধ্যেও মিল-অমিলের ঘটনা ঘটে। যেমন- হানাফী। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসারীদেরকে হানাফী বলা হয়। অনুরূপ আরবের একটি গোত্র আছে বনু হানীফ। তাদের লোকদেরকেও বলে হানাফী। আর উভয়টাই বলতে ও লেখতে একই।

وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ سَبَابِ ذَلِكَ أَيْ الْاَلْقَابُ وَالنَّسَبُ الَّتِي بَاطِنُهَا عَلَى خِلَافٍ ظَاهِرِهَا وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ بِالرَّيِّ أَوْ بِالْحَلْفِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَوْلَى وَلَا يُعْرَفُ تَمَيُّزُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّنْصِصِ عَلَيْهِ وَمَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْقَدَمَاءُ كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ .

অনুবাদ : ১৪. যে উপাধি বা নিসবত বাহ্যিক অবস্থার পরিপন্থি তার কারণ জানাও হাদীস চর্চাকারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৫. কোনো রাবী মাওলা হলে তার সম্পর্কে যাচাই করা দরকার যে, তিনি আজাদকারী না আজাদকৃত। তা ছাড়া তাকে মাওলা বলার কারণ কি গোলামি না সহায়তা-চুক্তি, না কারো নিকট ইসলাম গ্রহণ। কেননা, এই তিন কারণের যে কোনো একটি থাকলে মাওলা বলা হয়। স্পষ্ট বর্ণনা ছাড়া তা সনাক্ত করা যায় না।

১৬. আরেকটি জানার বিষয় হলো, কোনো রাবী কার ভাই বা কার বোন। মুতাকদ্দিমীর মধ্যে ইমাম আলী ইবনে মাদীনী এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

লকব ও নিসবতের কারণ জানা : যে সমস্ত রাবীর লকব বা নিসবত রয়েছে, তাদের ঐ লকবের কারণ, নিসবতের কারণও জানা দরকার। বিশেষত যখন তা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হয়। যেমন-হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমির (রা.) -কে বদরী বলা হয়। কিন্তু তা এ কারণে না যে, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; বরং এ কারণে যে, তিনি বদর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতেন।

مَوْلَى-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : مَوْلَى শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো مَوَالِي শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. আজাদকারী, ২. আজাদকৃত গোলাম। প্রথম ব্যক্তিকে مَوْلَى আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে مَوْلَى বলে।

৩. যার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা-চুক্তির অঙ্গীকার করা হয়েছে।

৪. যার হাতে ইসলাম কবুল করা হয়েছে।

যেহেতু এ সকল অর্থে مَوْلَى শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাই জানা দরকার যে, আলোচ্য স্থলে مَوْلَى-এর কোন অর্থ উদ্দেশ্য।

মাওলা এবং ভাই-বোন জানার উপকারিতা : এতে কয়েকটি উপকারিতা নিহিত। যথা-

১. একই জাতীয় দুই নামের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

২. একাধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করা হতে বাঁচা যায়।

৩. কখনো এমন হয় যে, দুই রাবীর পিতার নাম একই হওয়ার কারণে তাদেরকে ভাই-ভাই বলে মনে করা হয়, অথচ বাস্তবে তারা সহোদরা নয়। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার এবং আমর ইবনে দীনার। বাহ্যিকভাবে পিতার নাম এক হওয়ায় আব্দুল্লাহ ও আমরকে ভাই-ভাই বলে মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে তাঁরা সহোদরা নন।

وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي تَضَعِيعِ
النِّيَّةِ وَالتَّطَهِيرِ عَنِ إِعْرَاضِ الدُّنْيَا وَتَحْسِينِ الْخُلُقِ وَيَنْفَرُ الشَّيْخُ بَأَن
يُسْمِعَ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ وَأَن لَا يُحَدِّثَ بِبَلَدٍ فِيهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بَلْ يُرْشِدُ
إِلَيْهِ وَلَا يَتْرُكُ إِسْمَاعَ أَحَدٍ لِنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ وَأَن يَتَطَهَّرَ وَيَجْلِسَ بِوَقَارٍ وَلَا
يُحَدِّثُ قَائِمًا وَلَا عَجَلًا وَلَا فِي الطَّرِيقِ إِلَّا أَن يَضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَأَن يُنْمِسَكَ
عَنِ التَّحْدِيثِ إِذَا حَاشَى التَّغَيُّرَ أَوْ النَّسْيَانَ لِمَرْضٍ أَوْ هَرَمٍ وَإِذَا اتَّخَذَ
مَجْلِسَ الْأَمَلَاءِ أَن يَكُونَ لَهُ مُسْتَمِلٌ يَقْظُ وَيَتَفَرَّدُ الطَّالِبُ بَأَن يُوقَّرَ
الشَّيْخُ وَلَا يَضْجَرَهُ وَيُرْشِدَ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ وَلَا يَدْعُ الْإِسْتِفَادَةَ لِحَبَائٍ أَوْ
تَكْبِيرَ وَيَكْتُبَ مَا سَمِعَهُ تَامًّا وَيَعْتَنِيَ بِالتَّقْيِيدِ وَالضُّبْطِ وَيُذَكِّرُ
بِمَحْفُوظِهِ لِيَرْسَخَ فِي ذَهْنِهِ .

অনুবাদ : ১৭. হাদীস শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারীর আদবসমূহ জানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
কয়েকটি বিষয় শায়খ ও শিষ্যকে সমানভাবে পালন করতে হয়। যথা- নিয়ত শুদ্ধ হওয়া, মনকে
পার্থিব স্বার্থচিন্তা থেকে পবিত্র রাখা, চরিত্র সুন্দর করা।

শায়খের জন্য আদব হলো, প্রয়োজনের সময় তিনি হাদীস বর্ণনা করবেন। যে শহরে তার চেয়ে বড়
মুহাদ্দিস রয়েছেন সেখানে তিনি হাদীস বর্ণনা করবেন না; বরং তার দিকে ইঙ্গিত করে দেবেন। অসং
নিয়তের কারণে কাউকে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত রাখা যাবে না। পবিত্রতা ও গাঞ্জীরের সাথে হাদীস
বর্ণনা করতে হবে। দাঁড়িয়ে, তাড়াহুড়ো করে কিংবা রাস্তায় চলতে চলতে কখনো হাদীস বর্ণনা করবেন
না। অবশ্য নিরুপায় হলে ভিন্নকথা। রোগ-ব্যাদি কিংবা বার্বক্যের কারণে যদি বিস্মৃত বা এলোমেলো
হবার আশঙ্কা হয়ে যায়, তখন হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকবেন। যখন তিনি একদল ছাত্রকে হাদীস
লেখাবেন তখন তার পক্ষ থেকে একজন সচেতন মোষক (শায়খের আওয়াজের মুবাল্লিগ) থাকতে হবে।
শিক্ষার্থীর জন্য আদব হলো, শায়খকে সম্মান করা। তাকে বিরক্ত না করা। নিজে যা শুনবে তা অন্যকে
শোনানো। লজ্জা বা গর্ববোধের কারণে শিক্ষাগ্রহণ ও প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে না। যা শুনবে
পুরোপুরি লেখবে। লিখিত রেওয়াজে তসমূহের হরকত ও সাকিন কথায় আয়ত্ত করবে। মুখস্থ
হাদীসসমূহ সর্বদা চর্চা করতে থাকবে যাতে তা স্মৃতিতে মজবুত হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ক্ষেত্রে শায়খ ও ছাত্র উভয়ের আদব : হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কিছু আদব এমন
রয়েছে, যা শায়খ-ছাত্র উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং তা উভয়ের জন্য রক্ষা বা পালন করা জরুরি।

এমন তিনটি আদব সম্মানিত লেখক নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. নিয়ত বিশুদ্ধ করা অর্থাৎ খালেস নিয়তে হাদীসের পঠন-পাঠন করা।
২. পার্থিব স্বার্থচিন্তা থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।
৩. আখলাক-চরিত্র (হাদীসের আলোকে) সুমার্জিত করা। এ তিনটি ছাড়াও আরো কিছু জরুরি আদব
রয়েছে। যথা-
৪. ইলমে হাদীসের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা প্রদান করা।
৫. হাদীসের পঠন-পাঠনের সময় কথাবার্তা না বলা।
৬. সর্বোচ্চ বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা।

৭. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আবশ্যিকভাবে পালন করা।
 ৮. অনায়া-গুনাহ সম্পূর্ণ পরিহার করে চলা।
 ৯. সর্বদা এর উপর শুকরিয়া আদায় করা যে, আল্লাহ তা'আলা হাদীস পড়ানো বা পড়ার তৌফিক দান করেছেন।
 ১০. হামদ, সালাত ও সালামের মাধ্যমে হাদীসের দরস প্রদান কিংবা গ্রহণ শুরু করা।
 ১১. হাদীসের পঠন-পাঠনের সময় সুন্নত তরীকায় অজু করা এবং সম্ভব হলে আতর ব্যবহার করা।
 ১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম এলে দরুদ পড়া, সাহাবায়ে কেরামের নাম এলে রাযিয়াল্লাহু আনহু পড়া এবং সালাফে সালাহীনের নাম এলে রহমাতুল্লাহি আলাইহি পড়া।
- শায়খের একক আদব : হাদীসের মুবারক দরস দানে শায়খের জন্য একান্ত কিছু আদব রয়েছে, যা কেবল তাঁকেই পালন করতে হয়। আর তা সম্মানিত লেখকের দৃষ্টিতে নিম্নরূপ—
১. প্রয়োজনের সময় হাদীস বর্ণনা করা।
 ২. যে এলাকায় তার চেয়ে বড় মুহাদ্দিস আছেন সেখানে হাদীস বর্ণনা না করা; বরং হাদীস শিক্ষার্থীকে ঐ বড় মুহাদ্দিসের কাছে পাঠানো।
 ৩. অসং নিয়তের কারণে কাউকে হাদীস বর্ণনা করা বাদ না দেওয়া।
 ৪. পবিত্রতা ও ভাবগম্ভীর্যতার সাথে বসে হাদীস রেওয়ায়েত করা। দাঁড়িয়ে অথবা তাড়াহুড়ো করে হাদীস বর্ণনা না করা। অনুরূপ রাস্তা-ঘাটে হাদীস বর্ণনা না করা। তবে একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন সে অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করা দৃশ্যীয় নয়।
 ৫. হাদীসে পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা অসুস্থতা বা বার্বাক্যের কারণে হাদীস বর্ণনায় ভুলের আশঙ্কা হলে হাদীস বর্ণনা না করা।
 ৬. একদল ছাত্রদেরকে হাদীস লেখানোর সময় কোনো চৌকস মুবাল্লিগ (প্রয়োজনে একাধিক) নিযুক্ত করা, যারা শায়খের আওয়াজকে দূরে পৌঁছে দেবে।
- এ ছাড়া শায়খের জন্য আরও কয়েকটি আদব আছে। যথা—
৭. সহীহ হাদীস রেওয়ায়েত করা মুনকার ও জাল হাদীস রেওয়ায়েত না করা। আর করলেও সাথে সাথে তার মুনকার বা জাল হওয়ার কথা বর্ণনা করে দেওয়া।
 ৮. ছাত্রদের সাথে কোমল ও হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ আচরণ করা।
- ছাত্রের একক আদব : হাদীসের মুবারক দরস গ্রহণকালে হাদীসের ছাত্রের জন্য একান্ত কিছু আদব রয়েছে, যা কেবল তাঁকেই পালন করতে হয়। আর তা সম্মানিত লেখকের দৃষ্টিতে নিম্নরূপ—
১. ছাত্র শায়খকে সম্মান করবে।
 ২. শায়খ বিরক্ত হন— এমন আচরণ করবে না।
 ৩. হাদীসের দরস থেকে যা শুনবে অপরকে তা জানাবে।
 ৪. লজ্জা ও অহঙ্কারবশত হাদীস শ্রবণ ত্যাগ করবে না।
 ৫. শ্রুত হাদীস পূর্ণরূপে লেখে রাখবে।
 ৬. লিখিত হাদীসে হরকত সাকিন কথায় লেখে রাখবে।
 ৭. মুখস্থ হাদীস যাতে ঠোঁটস্থ হয়ে যায় তার জন্য হাদীসের চর্চা অব্যাহত রাখবে। মুখস্থ হাদীস বারবার আওড়াবে বা রিতাইজ দেবে।
- এ ছাড়াও ছাত্রের জন্য আরো কতিপয় আদব রয়েছে। যথা—
৮. সবকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দরসে উপস্থিত থাকবে। সম্ভব হলে সর্বদা শায়খের সাথে থাকলে আরও ভালো হয়।
 ৯. কিতাব এবং দরসগাহ তথা শ্রেণিকক্ষের যথাযথ সম্মান করবে।
 ১০. ইবাদাত ও ফায়্যেল-বিষয়ক যে হাদীসটি পড়বে তৎক্ষণাৎ তার উপর আমল করবে। কারণ, এ আমল করাই হলো হাদীসের যাকাত ও প্রাণ।
 ১১. হাদীসের দরস গ্রহণে প্রথমে সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমকে রাখবে। এরপরে সুনানে আরবাবা তথা আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, অতঃপর মুসনাদসমূহ এরপরে গিয়ে **علل** -এর কিতাব পড়বে। অর্থাৎ হাদীস গ্রহণে কিতাবের স্তরের প্রতি খেয়াল রাখবে।
 ১২. হাদীস পড়ার সময় অন্যকিছু লেখা, কথাবার্তা বলা অথবা তন্দ্রা জাতীয় এমন কিছু করবে না, যা হাদীস শ্রবণকে ব্যাহত করে।

وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ سِنِّ التَّحْمَلِ وَالْأَصَحُّ اِغْتِبَارُ سِنِّ التَّحْمَلِ
بِالتَّمْيِيزِ هَذَا فِي السَّمَاعِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْحَدِيثَيْنِ بِإِحْضَارِهِمْ
الْأَطْفَالَ مَجَالِسَ الْحَدِيثِ وَيَكْتُبُونَ لَهُمْ أَنْهُمْ حَضَرُوا وَلَا بُدَّ لَهُمْ فِي
مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ إِجَارَةِ الْمُسْمِعِ وَالْأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَنْ يَتَأَهَّلَ
لِذَلِكَ وَيَصِحُّ تَحْمَلُ الْكَافِرِ أَيْضًا إِذَا آدَاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَكَذَا الْفَاسِقُ مِنْ
بَابِ الْأَوَّلَى إِذَا آدَاهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَتُبُوهُ عَدَالَتِهِ .

وَأَمَّا الْآدَاءُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا اِخْتِصَاصَ لَهُ بِزَمَنِ مُعَيَّنٍ بَلْ يُقَيَّدُ
بِالِإِحْتِيَاجِ وَالتَّأَهُّلِ لِذَلِكَ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِإِخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَقَالَ ابْنُ
خَلَدٍ إِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَرَبِينَ وَتُعْقَبُ بِمَنْ
حَدَّثَ قَبْلَهَا كَمَالِكٍ .

অনুবাদ : ১৮. হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ ও তা বর্ণনা করার বয়স জানাও জরুরি। বিশুদ্ধতর অভিমত অনুযায়ী বুঝজ্ঞানের বয়সই হাদীস শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিবেচ্য। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভ্যাস ছিল তারা ছোট ছেলেদেরকে হাদীসের মজলিসে উপস্থিত করতেন এবং লেখে দিতেন যে, সে বা তারা হাদীসের মজলিসে হাজির হয়েছিল। তবে এরূপ ক্ষেত্রে হাদীস শিক্ষকের অনুমতি একান্ত আবশ্যিক। বিশুদ্ধ মত অনুযায় হাদীস শিক্ষার জন্য বয়সের কোনো শর্ত নেই; বরং যোগ্যতা ও উপযুক্ততা জরুরি। কাফিরের হাদীসগ্রহণ শুদ্ধ যদি সে তা ইসলাম গ্রহণের পরে বর্ণনা করে। তেমনি ফাসিকের হাদীস গ্রহণ তো আরো যুক্তিযুক্ত, যদি সে তা বর্ণনা করে তওবা ও তার আদিল হবার বিষয় সাব্যস্ত হবার পরে। হাদীস বর্ণনার জন্য আগেই বলা হয়েছে, কোনো সময়ের সাথে তা সীমাবদ্ধ নয়; বরং যখন প্রয়োজন পড়বে ও তিনি তা বর্ণনার যোগ্যতা অর্জন করবেন তখনই বর্ণনা করবেন। আর এটি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ইবনে খাল্লাদ বলেছেন, কোনো রাবী পঞ্চাশ বছর বয়সে উপনীত হলে হাদীস বর্ণনার যোগ্য হন। তবে চল্লিশ বছর বয়সের সময় কেউ যদি বর্ণনা করেন, তাহলে তার প্রতি বিরূপ হওয়া যাবে না।

ইমাম মালিক (র.) প্রমুখ যারা চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বেই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে নজির হিসেবে উল্লেখ করে ইবনে খাল্লাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সময়কাল : শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের জন্য বিশেষ কোনো বয়সের প্রয়োজন আছে কিনা, নাকি এর পূর্বেও হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করা যায়—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা—

১. হাদীসগ্রহণের সর্বনিম্ন বয়স পাঁচ বছর। এর পূর্বে হাদীস শুনে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কারো কারো মতে বিশ বছর।

৩. কারো কারো মতে, কমপক্ষে ত্রিশ বছর।

৪. কিন্তু সম্মানিত লেখকের অভিমত অনুযায়ী এ ব্যাপারে বিস্তৃত উক্তি হলো, হাদীসগ্রহণে বয়সের ধর্তব্য হচ্ছে বুঝ-জ্ঞানের সাথে। অর্থাৎ এমন বয়স হওয়া যে, সে সম্বোধন বুঝে এবং সঠিকভাবে কথার জবাব দিতে পারে— এই বয়সে উপনীত হলে তার জন্য হাদীসগ্রহণ করা বৈধ। চাই এতে তার যে বয়সই হোক না কেন।

এ মতভেদ হলো হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে। নতুবা বরকত বা রহমত-লাভের উদ্দেশ্যে যদি এসে থাকে, তাহলে এর জন্য বিশেষ কোনো বয়স ধরাবাঁধা নেই। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভ্যাস ছিল, তারা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও হাদীসের দরসগাহে হাজির করতেন এবং বাচ্চাদেরকে এটা লেখে দিতেন যে, সে হাদীসের মজলিসে উপস্থিত হয়েছিল। তবে এ উপস্থিতি ও শ্রবণের মাধ্যমে হাদীস রেওয়ায়েত করা জায়েজ নেই; যতক্ষণ মুহাদ্দিস সাহেবের থেকে হাদীস বর্ণনার ইজাযত (অনুমতি) না মিলবে। মোটকথা, হাদীস অর্জনের জন্য বয়স শর্ত নয়; যোগ্যতা মূল শর্ত।

কাফির ও ফাসিকের জন্য হাদীসগ্রহণ ও বর্ণনা : কাফিরের জন্য হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ করা জায়েজ। তবে হাদীস বর্ণনার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। অর্থাৎ ইসলাম আনয়নের পূর্বে যদি কাফির রেওয়ায়েত করে, তবে তা ধর্তব্য হবে না।

অনুরূপভাবে ফাসিকের জন্য হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ করা জায়েজ। হাদীস বর্ণনা করার জন্য ফিসক হতে তওবা করা এবং পুনরায় আদিল সাব্যস্ত হওয়া শর্ত।

হাদীস বর্ণনার সময়কাল : হাদীস বর্ণনা তথা অন্যের কাছে হাদীস পৌছানোর জন্য সুনির্দিষ্ট বয়সের শর্ত নেই; বরং দুটো বিষয় জরুরি ও শর্ত।

১. হাদীস বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দেওয়া।

২. হাদীস বর্ণনা করার যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা।

এ যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এক রকম হয় না; বরং ব্যক্তির বিভিন্নতায় বিভিন্ন রকম হয়।

ইবনে খাল্লাদ বলেছেন, বয়স ৫০ কমপক্ষে ৪০ হলে এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার যোগ্য হয়। কিন্তু তার এ অভিমত সঠিক নয়। কেননা, ইমাম মালিক (র.) প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিস ৪০ বছর বয়স হবার পূর্বেই হাদীস রেওয়ায়েত করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

وَمِنْ أَلْهُمَّ مَعْرِفَةُ صِفَةِ الصَّبْطِ فِي الْكِتَابِ وَصِفَةُ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَنْ يَكْتُبَهُ مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا فَيُسْكَكِلَ الْمُسْكَكِلَ مِنْهُ وَيَنْقِطُهُ وَيَكْتُبَ السَّاقِطَ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى مَا دَامَ فِي السَّطْرِ بَقِيَّةً وَلَا فَيُفِي الْيُسْرَى وَصِفَةُ عَرْضِهِ وَهُوَ مُقَابَلَتُهُ مَعَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ أَوْ مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِهِ أَوْ مَعَ نَفْسِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَصِفَةُ سَمَاعِهِ بِأَنْ لَا يَتَشَاغَلَ بِمَا يُخَلِّ بِه مِنْ نَسْخٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ نُعَايٍ وَصِفَةُ إِسْمَاعِهِ كَذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ أَوْ مِنْ فَرْعٍ قُوبِلَ عَلَى أَصْلِهِ فَإِنْ تَعَزَّرَ فَلْيَجْبِرْهُ بِالْإِجَارَةِ لِمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ وَصِفَةُ الرَّحْلَةِ فِيهِ حَيْثُ يَبْتَدِئُ بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ فَيَسْتَوْعِبُهُ ثُمَّ يَرْحَلُ فَيَحْصُلُ فِي الرَّحْلَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَيَكُونُ إِعْتِنَاؤُهُ بِتَكْثِيرِ الْمَسْمُوعِ أَكْثَرَ مِنْ إِعْتِنَائِهِ بِتَكْثِيرِ الشُّيُوخِ ، وَصِفَةُ تَصْنِيفِهِ وَذَلِكَ إِمَّا عَلَى الْمَسَانِيدِ بِأَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلَى حِدَةٍ فَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى سَوَابِقِهِمْ وَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ وَهُوَ أَسْهَلُ تَنَاوُلًا أَوْ تَصْنِيفِهِ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا بِأَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ بَابٍ مَا وَرَدَ فِيهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِنْبَاتًا أَوْ نَفْيًا وَالْأَوَّلَى أَنْ يَفْتَصِّرَ عَلَى مَا صَحَّ أَوْ حَسَنَ فَإِنْ جُمِعَ الْجَمِيعُ فَلْيَبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعِيفِ أَوْ تَصْنِيفِهِ عَلَى الْعِلَلِ فَيُذَكِّرُ الْمَتْنَ وَطَرَفَهُ وَيَبَيِّنُ اخْتِلَافَ نَقْلَتِهِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَرْتَبِّهَا عَلَى الْأَبْوَابِ لِیَسْهَلَ تَنَاوُلُهَا أَوْ يَجْمَعَهُ عَلَى الْأَطْرَافِ فَيُذَكِّرُ طَرَفَ الْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ وَيَجْمَعُ أَسَانِيدُهُ إِمَّا مُسْتَوْعِبًا أَوْ مُتَقَيِّدًا بِكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ .

অনুবাদ : ১৯. কিতাবের হরকত ও সাকিন আয়ত্ত করার এবং হাদীস লেখার পদ্ধতিও জানা দরকার। লেখার নিয়ম হলো, লেখা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হতে হবে। জটিল শব্দগুলোতে হরকত ও নুকতা দিতে হবে। ভুলক্রমে কোনো শব্দ বা অংশ বাদ পড়ে গেলে খাতার ডান কিনারায় লেখবে, যদি বাদ পড়ে যাওয়া অংশের পরে কোনো শব্দ বাকি থাকে আর পরে শব্দ না থাকলে বাম কিনারায় লেখবে। (মোটকথা, লাইনের মধ্য হতে বাদ পড়লে ডান পাশে আর লাইনের শেষে গিয়ে বাদ পড়লে বাম পাশে লেখবে।)

লিখিত হাদীসকে মিলিয়ে দেখার নিয়মও জানা দরকার। মিলিয়ে নিতে হবে শায়খের সাথে যিনি হাদীসটি শুনিয়েছেন। কিংবা অন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাথে কিংবা নিজে অল্প অল্প করে মিলিয়ে দেখবে।

হাদীস শোনার নিয়মও জানা দরকার। হাদীস শোনার সময় লেখা, কথাবার্তা বলা, ঘুম ইত্যাদি ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।

হাদীস শোনানোর সময়ও এগুলো প্রযোজ্য। তা ছাড়া তিনি ঠিক সে-ই মূলখাতা থেকে হাদীস শোনাবেন যা দেখে তিনি নিজ শায়খ থেকে শুনেছেন অথবা এমন অনুলিপি থেকে যা মূলখাতার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। যদি মিলিয়ে দেখা খাতা না হয়, তাহলে না মেলানো খাতা থেকেই শুনিতে দেবেন। কিন্তু তা থেকে হাদীস বর্ণনার সময়ে ভিন্নভাবে অনুমতির প্রয়োজন হবে যাতে না মেলানোর ক্ষতিটুকু পূরণ হয়ে যায়।

হাদীস শিক্ষার জন্য সফর করার নিয়ম হলো, প্রথমত নিজ শহরের হাদীসসমূহ পুরোপুরি শিখে নেবে, অতঃপর সফর করবে। তখন তার নিজের যা জানা নেই তা হাসিল করে নেবে। তা ছাড়া শায়খের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে হাদীসের সংখ্যা বাড়ানোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

২০. হাদীসের গ্রন্থ রচনার নিয়ম : (এর অনেক পদ্ধতি রয়েছে—)

ক. মুসনাদ হিসেবে রচনা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক সাহাবীর সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা। সাহাবীদের নামের ক্রমবিন্যাস ইসলাম গ্রহণের সময় হিসেবে করা যায়; আবার বর্ণমালার ক্রমানুসারেও করা যায়। এটিই আয়ত্ত করার পক্ষে সহজ।

খ. ফিক্হ বা অন্য কোনো বিষয়ের পরিচ্ছেদ অনুসারে বিন্যস্ত করা। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এমন হাদীস উল্লেখ করতে হবে যাতে উক্ত পরিচ্ছেদের হুকুম বাবাস্ত কিংবা নাকচ হয়। উত্তম হলো, শুধুমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস উল্লেখ করে স্কাভ হওয়া।

যদি সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়, তাহলে দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার কারণও বলে দিতে হবে।

গ. ইলাল বর্ণনার পদ্ধতিতে— প্রত্যেক মতনের সাথে তার সকল সনদ বর্ণনা করে অতঃপর বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা উল্লেখ করা। (যেমন— কেউ মারফু', কেউ মুরসাল, কেউ মাওকুফ সনদে বর্ণনা করে থাকলে তা উল্লেখ করে দিতে হবে।) এক্ষেত্রেও অধ্যায় অনুসারে সাজানো উত্তম, তাহলে আয়ত্ত করা সহজ হয়।

ঘ. প্রান্ত বর্ণনার পদ্ধতিতে— প্রতিটি হাদীসের একটি অংশবিশেষ উল্লেখ করবে, যাতে অবশিষ্ট অংশ বুঝা যায়। অতঃপর তার সনদসমূহ, সকল কিংবা নির্দিষ্ট কিতাবসমূহ যেসব সনদে সেটি বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্মানিত লেখক হাদীস লেখার যে নিয়ম-কানুন এখানে উল্লেখ করেছেন, তা ঐ সময়কার যখন হাদীসের কিতাবাদি ছাপানো ছিল না। এখনও যদি কেউ হাতে হাদীস লেখে, তাহলে তাকেও এ নিয়ম ফলো করতে হবে যে, লিখিত হাদীসকে অন্য কোনো কপির সাথে মিলিয়ে নেবে।

পণ্ডিত অংশ সংযোজন : সম্মানিত লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাদীস লেখতে গিয়ে যদি কোনো অংশ ভুলক্রমে বাদ পড়ে যায়, তাহলে তা সংযোজনের দু পদ্ধতি। যথা—

১. দেখতে হবে বাদ পড়া অংশের পরে লাইন শেষ নাকি লাইনের মধ্যখান থেকে বাদ পড়েছে, যার পরে আরও কিছু শব্দ লেখা হয়েছে। যদি প্রথম সুরত হয় অর্থাৎ লাইনের শেষ হতে বাদ পড়ে, তাহলে বাদ পড়া অংশ কিতাবের বাম পাশের হাশিয়ায় বা সাদা অংশে সংযোজন করতে হবে।

২. আর যদি বাদ পড়াটা লাইনের মধ্যখান থেকে হয়, যার দু পাশে অন্য লেখা আছে, তাহলে এমতাবস্থায় পড়ে যাওয়া অংশ কিতাবের ডান হাশিয়ার তথা সাদা অংশে সংযোজন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, সংযোজনের এ নিয়ম লেখকের সময়কার। কেননা, তখন কিতাবের দু পাশে ফাঁকা রেখে মাঝখানে লেখা হতো। এখন যেহেতু নিয়ম পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন কিতাবের প্রথম (ডান পাশের) পাতার ডান পাশে একটু বেশি খালি জায়গা রাখা হয়। আর ডান পাশের তুলনায় বাম পাশে একেবারে কম জায়গা রাখা হয়। অনুরূপ দ্বিতীয় (বাম পাশের) পাতার বাম পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়; কিন্তু ডান পাশে সে তুলনায় কম ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। তাই লেখকের বর্ণিত নিয়মটা এ যুগে কার্যকর নয়। এখন পড়ে যাওয়া অংশ যে পাশে খালি জায়গা থাকে সে পাশে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সংযোজন করে দিতে হবে।

হাদীসের গ্রন্থ রচনার নিয়ম : হাদীসের গ্রন্থ রচনার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এর সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি। অবশ্য প্রত্যেক পদ্ধতির জন্য সুনির্দিষ্ট শব্দও রয়েছে। যখন ঐ শব্দ বলা হয় তখন তার দ্বারা বুঝা যায় যে, কিতাবটি একটি বিশেষ পন্থায় লেখা হয়েছে। তাই এখন ঐ শব্দগুলো বললে তার দ্বারা পরিভাষায় প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য হয়।

মুসনাদ -এর পন্থা : **مَسْنَدٌ** শব্দটি একবচন। এর বহুবচন **مَسَانِدٌ**। মুসনাদ ঐ কিতাবকে বলে যাতে সাহাবায়ে কেরামের নামানুসারে হাদীস সংকলন করা হয়। অর্থাৎ এক সাহাবীর সকল বর্ণনা এক স্থানে এরপর আরেক সাহাবীর সকল বর্ণনা এক স্থানে- এভাবে হাদীস জমা করা হয়। যেমন- মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে হুমায়দী ইত্যাদি।

সাহাবায়ে কেরামের বিন্যাসটা কয়েকভাবে হতে পারে। যথা-

১. ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতার দিক বিবেচনায় অর্থাৎ যিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রথমে- এভাবে বিন্যাসটা হতে পারে।
২. আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে। অর্থাৎ যে সমস্ত সাহাবীর নাম আলিফ (হামযা) দ্বারা শুধু তাদের বর্ণিত হাদীস প্রথমে উল্লেখ করা। এরপর যাদের নামের শুরুতে 'বা' রয়েছে তাদের হাদীস উল্লেখ- এভাবে আরবি বর্ণমালা হিসেবে হাদীস জমা করা।

অধ্যায়গতভাবে পন্থা : ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় কায়ম করে হাদীস সংকলন করা যেতে পারে। প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে হুকুম সাব্যস্তকারী কিংবা নাকচকারী হাদীস জমা করা হয়। অধ্যায়গতভাবে রচিত হাদীসের সংকলনকে **جَامِع** (জামি') বলে। যেমন- বুখারী, তিরমিযী। কেউ কেউ অধ্যায়গতভাবেই কিন্তু শুধু সহীহ হাদীস জমা করেন। যেমন- বুখারী, মুসলিম। আবার কেউ হাসান হাদীসও জমা করেন। যেমন- তিরমিযী। এ ছাড়া অন্যভাবেও হাদীস জমা করা হয়।

ইলাল -এর পন্থা : ইলাল হাদীসের ঐ কিতাবকে বলে, যাতে প্রত্যেক মতনের সাথে তার সমস্ত সনদ উল্লেখ করা হয়। সাথে সাথে রাবীদের মধ্যে মারফু', মুরসাল, মাওক্ফ হিসেবে যে মতভেদ ঘটে তা উল্লেখ করে দেওয়া হয়। যেমন- ইমাম তিরমিযী (র.) -এর **الْعِلَلُ الْكَبِيرُ** এবং **الْعِلَلُ الصَّغِيرُ**। অনুরূপ ইবনে আবি হাতিমের **كِتَابُ الْعِلَلِ** ইত্যাদি।

আতরাফ (প্রান্ত) -এর পন্থা : **أَطْرَافٌ** হাদীসের ঐ কিতাবকে বলে, যাতে হাদীসের প্রথম অংশ উল্লেখ করে তার সমস্ত সনদ জমা করা হয়। অথবা, সুনির্দিষ্ট কিতাবে যে সনদ আসে তাকে জমা করা হয়। যেমন- ইমাম মিয়যী (র.) -এর **تُحْفَةُ الْأَسْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ** ইত্যাদি।

وَمِنَ الْمُهِّمِّ مَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ وَقَدْ صُنِفَ فِيهِ بَعْضُ الشُّبُوحِ
لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ابْنِ الْفَرَاءِ الْعَنْبَلِيِّ وَهُوَ أَبُو حَنْصِ الْعُكْبَرِيِّ وَقَدْ
ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَنُ دَقِيقِ الْعَبِيدِ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ عَصْرِهِ شَرَعَ فِي
جَمِيعِ ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ مَا رَأَى تَضْيِيفَ الْعُكْبَرِيِّ الْمَذْكُورَ وَصَنَّفُوا فِي
غَالِبِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ عَلَى مَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ غَالِبًا وَهِيَ أَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةُ
فِي هَذِهِ الْخَاتِمَةِ نَقْلٌ مَخْصُ طَاهِرَةٌ التَّغْرِيفِ مُسْتَفْهِمَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ
وَحَضَرَهَا مُتَعَسِّرٌ فَلْيَرَاجِعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا لِيَحْصَلَ التَّوَقُّفُ عَلَى حَقَائِقِهَا
وَاللَّهُ الْمَوْقُوفُ وَالْهَادِي لِلْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَعَتَرَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ -

অনুবাদ : ২১. হাদীসের কারণ জানাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসের কারণ বিষয়ে কাজি আবু ই'য়লা ইবনে ফাররা হাশ্বীর ওস্তাদ আবু হাফস উকবুরী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শাযখ তকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.) লেখেছেন যে, তার সময়ের জনৈক মনীষী এ বিষয়গুলো সংকলন করতে শুরু করেছেন। হয়তো তিনি উকবুরীর রচনা দেখেননি।

হাদীসের অধিকাংশ বিষয়ে ইমামগণের রচনা রয়েছে। অধিকাংশ কিতাবের প্রতি আমি ইস্তিতও করে এসেছি। তবে পরিশিষ্টে যেসব শ্রেণির কথা বর্ণিত হয়েছে, আমি শুধু সেগুলোর নামই উল্লেখ করেছি। এগুলোর সংজ্ঞা সুস্পষ্ট- সকলের জানা। তার উদাহরণের অপেক্ষা রাখে না (অর্থাৎ উদাহরণের প্রয়োজন নেই)। এগুলো আয়ত্ত করাও দুষ্কর। এসবের জন্য (অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ও উদাহরণ জানার জন্য) বড় বড় গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হবে। যাতে করে তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবগতি লাভ হয়। আল্লাহ তৌফিকদাতা এবং সঠিক পথের দিশারী। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাযুদ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দয়ালু নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি দরুদ ও রহমত বর্ষণ করুন। রহমত বর্ষণ করুন কিয়ামত দিন পর্যন্ত; আরো তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথি, স্ত্রীগণ এবং সন্তানসন্ততির উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের প্রেক্ষাপট জানা : অনেক হাদীস এমন রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় এই নেপথ্য ও প্রেক্ষাপটকে বলা হয় শানে উরুদ বা হাদীসের কারণ। হাদীসের প্রেক্ষাপট সুনির্দিষ্ট হলেও হুকুম হয় ব্যাপকভিত্তিক। যদিও হুকুমের বিবেচনায় হাদীসের প্রেক্ষাপট ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তথাপি এই প্রেক্ষাপট জানার মধ্যে অনেক ফায়দা নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ :

১. হাদীসের প্রেক্ষাপট জানা থাকলে হাদীসের পরস্পর বিরোধের সময় হাদীসকে তার স্ব-স্ব স্থানে প্রযোজ্য করা সম্ভব হয়।
২. হাদীসের মতলব ও উদ্দেশ্য বুঝতে প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সহায়ক হয়, ইত্যাদি।